যুগ সন্ধিক্ষণের পৃথিবী

আবুল আসাদ

যুগ সন্ধিক্ষণের পৃথিবী

যুগ সন্ধিক্ষণের পৃথিবী

www.icsbook.info

যুগ সন্ধিক্ষণের পৃথিবী

আবুল আসাদ

মিজান পাবলিশার্স

www.icsbook.info

প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪, বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল ঃ ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১১২৩৯১

প্রথম প্রকাশ □ ২১শে বইমেলা ২০০৬

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

বর্ণবিন্যাস
লাভলী কম্পিউটার
৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯৫

মূল্য
৩০০ টাকা

ISBN
984-8685-56-1

Zug Sandhikkhaner Prithivi, Written by Abul Asad
Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary,
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka- 1100.
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24, Srish Das Lane, Dhaka- 1100.

www.icsbook.info

উ ৎ স র্গ

দুঃসময়ের নিরব সাথী
সুসময়ের
সরব সমালোচক
স্ত্রী জেব-উল-নিসাকে

www.icsbook.info

www.icsbook.info

সূচিপত্র

গ্লোবালাইজেশন ও সেন্ট্রালাইজেশন ৯
দক্ষিণ এশিয়ার নতুন যাত্রা? ১৪
মার্কিন মুসলমানদের নতুন ইসলাম ২২
নাইপলের দু'টি উপন্যাস ২৬
দুইটি তথ্য অন্তর্ঘাত ৩০
ভয়াবহ এক ঠাণ্ডা অস্ত্র ৩৪
আকাশ দখলের যুদ্ধ এবং তারপর ৩৭
চোখ বন্ধ করে সূর্যোদয় ঠেকানো যায় না ৪২
কায়রো সম্মেলনের ব্যালান্স শীট ও ভবিষ্যত ৪৭
বাণিজ্য যুদ্ধ ৫৬
দুই সভ্যতার সংঘাত ও সমঝোতার প্রশ্ন ৬৯
দক্ষিণ এশিয়ার পারমানবিক অস্ত্রের বিস্তার ৮০
সূর্যসেন ও ইতিহাস ৮৫
এসোসিয়েশেনস অব প্রেস কাউন্সিলের কাঠমণ্ডু ডিক্লারেশন ৯২
গণতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ ৯৮
সবুজ আতংক ১০২
ষড়যন্ত্র বনাম দেশপ্রেমের লড়াই ১০৬
এডওয়ার্ড জেরা জিয়ানের একটি সাক্ষ্য ১১২
'বাঙালিত্ব সাধনার যাত্রাবিন্দু? ১১৫
পলাশী উত্তর রাজনীতির স্বরূপ ১২০
যুগসন্ধিক্ষণের বিশ্ব ও যুব মুসলিম প্রজন্ম ১৪৩
নজরুল ও দ্বিজাতিতত্ত্ব ১৭২
স্বাধীনতা যুদ্ধকালিন মত বিভক্তির পটভূমি ১৭৬
তুরস্কের জাগরণ ২০৩
২০৭ কুগ্রহ আই এম এফ
২১০ কম্যুনিজম হিসাব মেলাতে পারেনি
২২০ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মার্থাদের ষড়যন্ত্র
২২৩ বাম বুদ্ধিজীবীদের ধর্মজ্ঞান
২২৬ অশ্লীলতা, একটি রুলিং ও একটি রিপোর্ট
২২৯ বাংলাভাষার ব্যবহার
২৩২ আমাদের পানি ব্যবহার ও চীনের দৃষ্টান্ত
২৩৬ অস্ত্রবিরোধ প্রয়াস ঃ দুইটি দৃশ্য
২৪২ গোয়েন্দাবৃত্তি-সমস্যা
২৪৬ ছদ্মবেশী ষড়যন্ত্র
২৫০ ফিলিস্তিন ট্রাজেডি
২৬০ ফিলিস্তিনীদের নতুন পরাধীনতা
২৬৪ আসামে ভারতের একটি পাপ
২৬৮ ইসরাইলী সন্ত্রাস ওতার সহযোগীর চেহারা
২৭২ সার্কের একটি অনুষ্ঠান
২৭৬ ভিয়েতনাম জাতীয় আন্দোলনের এক অজানা অধ্যায়
২৮০ আনন্দ মঠের রাজনীতি
২৮৪ সুকর্ণ সুহার্ত ও ইন্দোনেশিয়া
২৮৮ উপনিবেশিকদের দেয়া স্বাধীনতা
২৯২ মার্কিন ইতিহাসে ইহুদি প্রশ্ন
২৯৬ বিশ্বের সম্পদ ও দারিদ্র
৩০০ নারীবাদী ফ্রেডম্যানের সমীক্ষা
৩০৪ ইহুদি দিবাস্বপ্ন
৩০৯ বাংলাদেশের নিরাপত্তা

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বিশ্বায়ন বা 'গ্লোবালাইজেশন' নাম হিসাবে নতুন, বিষয় নতুন নয়। জানাশোনা বাড়ার সাথে সাথে আন্তঃদেশ, আন্তঃসমাজ সম্পর্ক ও লেন-দেনের যাত্রা শুরু হয় মানুষের। সেই বিশ্বব্যাপী বিস্তার প্রবণতাটাই আজকের বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন। 'Surmounting Challenge of Globalization' প্রবন্ধে এডওয়ার্ডো অ্যানিনাত লিখেছেন, 'আমরা যাকে গ্লোবালাইজেশন বলছি সে রকম বিশ্বায়নের একের পর এক ঢেউ আমরা দেখে আসছি কমপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপলোর সময় থেকে।'[১] সে সময় বাণিজ্যের বিশ্ব-মুখীতা, প্রযুক্তির বিস্তার, মানুষের দেশান্তর এবং আন্তঃসংস্কৃতি মলিন ও সমৃদ্ধির মতো যে বিষয়গুলোকে সামনে এগুতে দেখি, তার সাথে আজকের বিশ্বায়নের সাধারণ চরিত্রের কোনো পার্থক্য নেই। এমনকি এই বিশ্বায়নকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরও ৬শ' বছর আগে সপ্তম শতাব্দীতেও টেনে নেয়া যায়। তখনকার ইসলামী সভ্যতার বিস্তারের মধ্যে বিশ্বায়নের সব বৈশিষ্ট্যই ছিল। শত শত বছরের পথ পরিক্রমার এক পর্যায়ে, মিঃ এডওয়ার্ডো অ্যানিনাত-এর মতে, উনিশ শতকের শেষে এসে দেখা গেল 'the world was highly globalized'। গ্লোবালাইজেশনের আবার নতুন ঢেউ শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। তথ্য প্রযুক্তির আকাশ -স্পর্শী উন্নতি এই গ্লোবালাইজেশনকে দিয়েছে অবিশ্বাস্য এক গতিবেগ। নব্বই দশকের শুরুতে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গ্লোবালাইজেশন এককেন্দ্রীকতা লাভ করায় বিশ্বায়ন যেমন বিশ্ব সয়লাবী হয়ে উঠেছে, তেমনি এককেন্দ্রীক একটা নিয়ন্ত্রণও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। আজকের বিশ্বায়নের এই প্রবণতা উদ্বেগজনক। কারণ কোনো কেন্দ্রীয় স্বার্থ সক্রিয় থাকা বা কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চেপে বসা বিশ্বায়ন -তত্ত্বের পরিপন্থী। গ্লোবালাইজেশন হলো, 'Global nature of capital and emergence of a global economy'. খুব বেশী হলে গ্লোবালাইজেশন -এর মধ্যে "certain homogenizing tendency' থাকতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্লোবালাইজেশনে কিছু ক্ষেত্রে homogenization পর্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু centralization কোনোভাবেই নয়। এ সম্পর্কিত একটা মন্তব্যে বলা হয়েছে, "Globalism can be best understood contrasting it with the idea of centralization. The centralization conceives of the world as one, but clearly identifies what is the center and what constitute the periphery. In a system undergoing centralization, a global power asserts its

www.icsbook.info

domination over others' by locating itself as the normative political and economic centre of the universe . It marginalize the rest of the world and simulteneously assumes often through coercive means the role of the leader in normal as well as material terms. There is a clear hierarchy in the system and the center is the undisputed hegemony. Thus when the periphery emulates the center, it often does so out of fear as insecurity and the resulting homogenization is actually hegemonization." 2 এই কথাগুলো বলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয়তে। সম্পাদকীয়টি খুব সুন্দরভাবে গ্লোবালাইজেশন ও সেন্ট্রালাইজেশন -এর মধ্যেকার পার্থক্য তুলে ধরেছে। গ্লোবালাইজেশন ও সেন্ট্রালাইজেশন উভয়ই এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখে। গ্লোবালাইজেশনের বিশ্ব হয় পারস্পরিক সমতার, সহযোগিতার, কিন্তু সেন্ট্রালাইজেশনের একক বিশ্বে থাকে একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের গ্লোবাল পাওয়ার বিশ্বে গড়ে আধিপত্যের একটা সিস্টেম। এই সিস্টেম রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুকে কেন্দ্রীয়করণের এক আগ্রাসী শক্তিতে পরিণত হয়। গ্লোবালাইজেশনের নির্দোষ 'homogenization' এই সেন্ট্রালাইজেশনে এসে পরিণত হয় 'hegemogenization'- এ।

আজকের গ্লোবালাইজেশনকে আমরা এই রূপেই প্রত্যক্ষ করছি। গ্লোবালাইজেশন এখন একক এক হেজিমোনাইজেশনের রূপ পরিগ্রহ করছে। গ্লোবালাইজেশনের আজকের এই সর্বশেষ ঢেউটি সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের পর একমাত্রিক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র গ্লোবাল পাওয়ার হওয়ার প্রোগ্রাম নতুনভাবে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। তাদের সার্বিক জাতীয় কৌশল তৈরি হয় এই লক্ষ্য সামনে রেখেই। ব্রান্ডেস ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সের অধ্যাপক এবং 'হারভার্ট সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্সের এসোসিয়েট রিসার্চার রবার্ট জে. আর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই জাতীয় কৌশলকে পাঁচটি দফায় ভাগ করেছেন।[৬] দফা পাঁচটি হলো, (এক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে হুমকি সব পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার প্রতিরোধ করা, (দুই) জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি যা শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সহযোগিতায় ধস নামিয়ে মার্কিন সমৃদ্ধির ক্ষতি করতে পারে, তাকে রোধ করা, (তিন) এমন অবস্থা যা মুক্ত অর্থনীতির ধ্বংস এবং পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার ত্বরান্বিত করে, তার অবসান ঘটানো, (চার) পারস্য উপসাগরের তেল-মওজুদের উপর আঞ্চলিক কোনো শক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করা এবং সেখানে মার্কিন প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হতে না দেয়া এবং (পাঁচ) ইসরাইল ও দক্ষিণ

www.icsbook.info

কোরিয়ার উপর কাউকে বিজয়ী হতে দেয়া যাবে না এ জন্যে যে মার্কিন আশ্রয় নিরাপদ নয় এ ধারণা যাতে কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্টি না হয়।

মার্কিন এই কৌশলের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একক এক কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটেছে । এই বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বলেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার 'ন্যাভাল পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্কুল' এর সহযোগী অধ্যাপক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত RAND Corporation এর উপদেষ্টা ক্রিস্টোফার লীন। তিনি লিখেছেন, "After the Cold war's onset, American pre -eminence ... was the driving force behind U.S grand strategy. In the important National Security Council Paper, NSC - 68, which laid the intellectual ground work for policy of militarized and globalized containment , stated that : (1) the purpose of American power has to foster a world -environment in which the American system can survive and flourish and (2) the strategy of pre -ponderance ... preponderance -hegemony-is a realist strategy that aims to perpetuate America's post cold-war geopolitical dominance... the strategy of preponderance identifies Europe, East Asia and the Persian Gulf as regions where the United States has vital security interest. Europe and East Asia are important because they are the regions from which new great power's could emerge and where future great powers wars could occur, central to the functioning of an independent international economic system, and vital to U. S prosperity. The Persian Gulf is important because of oil.. The United States must also be concerned with the Peripheries ' - regions that are geographically removed from the core.. because turmoil there could affect the core. "[8] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল' - এর ডকুমেন্টে এমন 'বিশ্বপরিবেশ' -এর নীল-নকশা আঁকা হয়েছে যাতে' কোল্ড ওয়ার' - এর মধ্যেও মার্কিন পদ্ধতি সুরক্ষিত ও বিকশিত হতে পারে এবং এমন একটা প্রাধান্য ও আধিপত্যের কৌশল স্থির করা হয়েছে যাতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ উত্তরকালে তার ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য নিশ্চিত হয়। এই লক্ষ্যে ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ায় নতুন বৃহৎ শক্তির উত্থান প্রতিরোধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সম্পদের উপর মার্কিন অধিকার ক্ষুণ্নকারী কোনো আঞ্চলিক শক্তির আবির্ভাব বানচাল নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই সাথে পৃথিবীর কোথাও কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষতি করতে পারে এমন বিশৃংখলা বরদাশত না করার কথা বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গ্লোবালাইজেশনের যে নতুন ঢেউ আছড়ে পড়েছে, তা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এই মার্কিন নীল-নক্শা ধরেই অগ্রসর হচ্ছে- রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই। মার্কিন ন্যাশনাল সিকুরিটি কাউন্সিল'-এর ডকুমেন্টে যে অনুকূল ' বিশ্ব পরিবেশ' চাওয়া হয়েছে, তাকে নিশ্চিত করার জন্যেই ইউরোপ, পূর্ব-এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা দুনিয়ায় লাখ লাখ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়েছে। অন্যদিকে অর্থনীতির global system কে ওপেন রাখার নামে বিশ্ব অর্থনীতিকে বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইউএস এইড', 'বিশ্বব্যাংক,' 'আইএমএফ,' 'ডব্লিউটিও' এবং শিল্পোন্নত বিশ্বের ' দাতা গ্রুপকে' সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকের গ্লোবালাইজেশনে এমনকি মানবাধিকার, আইন-শৃংখলা ইত্যাদির মত জাতি বা দেশ পর্যায়ের কিছু বিষয়কেও একটা নিয়ামক হিসেবে ধরে এর উপরও 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ' আরোপ করা হচ্ছে। হাভার্ডের 'কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট'এর ডীন এবং মার্কিন ডিফেন্সের সাবেক সহকারী সেক্রেটারী জোসেফ এস, জুনিয়র লিখেছেন, "United States has a general interest in developing and maintaining laws and institution that deal not just with trade and the environment, but with the arms proliferation, peace keeping, humanrights and other concern. Those who denigrate the importance of law and institution forget that the United States is a status - quo-power. They also ignor the extent to which legitimacy is a power reality. True realists would not make such a mistake."[৫] মিঃ জোসেফ জুনিয়রের এই বক্তব্যে গ্লোবালাইজেশনের উপর সাধারণ একটা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের চাইতেও অনেক বড় কিছুর কথা বলা হয়েছে। United states is a status -quo -power এবং legitimacy is a power reality' - এই দুটি কথা শক্তিনির্ভর অনড় একটা পলিসি নিয়ন্ত্রণের চিত্র তুলে ধরে যা উপেক্ষা করার মত mistake কারও পক্ষেই, তাদের মতে, সম্ভব নয়।

এভাবে আজকের গ্লোবালাইজেশনের যে সার্বিক চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠছে, তাতে সব বৈশিষ্ট্যের বিচারে 'গ্লোবালাইজেশন' এক ধরনের সেন্ট্রালাইজেশন এবং এই সেন্ট্রালাইজেশন পরিকল্পিত একটি কর্মসূচি। এ কারণেই আজকের গ্লোবালাইজেশন স্বাভাবিক মানব চাহিদার কোন স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশও নয়। আই এম এফ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিচেল ক্যামডেশাস এক যুগের বেশি আগে বলেছিলেন, 'Globalization is not human destiny, but human destiny develops itself, I believe, in this long lasting trend of unification of the world. Globalization is only acceleration of it."[৬]

www.icsbook.info

মিচেল ক্যামডেশাস গ্লোবালাইজেশনকে 'মানুষের ভাগ্য' বলতে চাননি। বরং বলেছেন, বিশ্বকে একীকরণের মানুষের দীর্ঘস্থায়ী চাহিদার মধ্যেই মানুষের ভাগ্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। মানুষের এই দীর্ঘস্থায়ী চাহিদাকে গ্লোবালাইজেশন দ্রুততর করেছে মাত্র। কিন্তু আজকের গ্লোবালাইজেশন মানুষের সেই long lasting trend of Unification -এর চাহিদার পথ ধরে এগুচ্ছে না। নতুন নাম গ্লোবালাইজেশন মানুষের long lasting চাহিদা অনুসরণে বিশ্বকে সমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে 'এককরণের' বদলে বিশ্বের কেন্দ্রীয়করণ করছে যা মানুষের রাষ্ট্রের ও জাতির সমতা, স্বাতন্ত্র্য ও সম্মানের বিলয় ঘটাতে পারে।

তথ্যসূচি :

১. Eduardo Aninat, 'Surmounting Challenge of Globalization', Finance & Development, March 2002, vol-93, No. 1

২. Editorial, Globalization : Centralization not globalism,' The American Journal of Islamic Social Sciences, Page - 111, Vol. 15, number 3, Foll 1998

৩. Robert Art J., A Defensible Defense,' International Security, vol - 15, No. 4, Spring, 1991

৪. Cristopher Layn, Rethinking American Grand Strategy : Hegemony or balance of power in the twenty first century, World Policy Journal, vol-15, No. 2 Summer, 1998

৫. Joseph S, Nye Jr., Redefining the National Interest,' Foreign Affairs, vol - 78, No. 4 July- Aug. 1999

৬. Moises Naim, A talk with Michel Camdessus about God. Globalization and years of running IMF, Foreign Policy No. 120 Sept. - Oct. 2000

৩১ মে, ২০০৫

www.icsbook.info

ইসলামাবাদে ১২ তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সাথেই প্রশ্ন উঠেছে, ইসলামাবাদ সম্মেলনের দলিল, যাকে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করা হচ্ছে, পারবে কি দক্ষিণ এশিয়ার জমে থাকা বাধার সব জঞ্জাল ভাসিয়ে নিয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে?

এই প্রশ্ন নানা জটিল বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে। কাকতালীয়ভাবে আমি নিজেও এই জটিল বিষয়গুলোর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম খোদ শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনের হলে বসে এক ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্র সন্দেহ-সংশয়ের সব জটিল বিষয়ই ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নে উঠে এসেছিল। শুরুতেই এই আলোচনা সেরে নেয়া শীর্ষ সম্মেলনের দলিল ও ঘোষণা বিষয়ক আমার মূল আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

অনেক বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ভারতীয় সাংবাদিক। শুরুটা ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথা উঠেছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিন্ন মুদ্রা ও মুক্ত সীমান্তের প্রস্তাব থেকে। ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল ইউরোপ পারলে আমরা দক্ষিণ এশিয়া ইউনিয়ন' গড়তে পারবো না কেন? আমি বলেছিলাম এই অবস্থায় পৌছতে ইউরোপের বহু বছর নয়, বহু শতাব্দী লেগেছে। তার উপর এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার চেয়ে ইউরোপের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ছিল অনেক বেশী ইতিবাচক। তাদের ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও তারা ধর্ম-সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। অষ্টম শতাব্দীতে সম্রাট শার্লেম্যান ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতেই একক ইউরোপীয় সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের শেষে সম্রাট শার্লেম্যানের স্বর্ণমূর্তির পাদদেশে বসেই আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের ব্লু-প্রিন্ট রচনা করেছিলেন তদানীন্তন জার্মান চ্যান্সেলর এবং ফরাসী প্রেসিডেন্ট। এই ধরনের পশ্চাৎভূমি দক্ষিণ এশিয়ার নেই। এই বিষয় নিয়ে তার সাথে অনেক কথা হয়েছিল।

আমি বলেছিলাম এই লক্ষ্যে এগুতে হলে ভারতকে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ভারত শুধু ভারতীয়দের এবং ভারতীয় হতে হলে হিন্দু হতে হবে ভারতীয় হিন্দুদের এই আগ্রাসী মনোভাবই ছিলো ভারত বিভাগের প্রধান কারণ। ভারতীয় সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দক্ষিণ এশিয়া ইকনোমিক ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কে আমার মত কি। আমি বলেছিলাম এই বিষয়েও আমাদের অনেক পথ এগুতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত ৭টি দেশেষ অর্থনীতি শুধু দারুণ অসমই নয়, একে অন্যের বিশেষ করে বড় দেশটির অবিচারেরও শিকার। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ

www.icsbook.info

ভারত থেকে আমদানি করেছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশী পণ্য। এর সাথে ভারত থেকে ঠেলে দেয়া কালোবাজারীর পণ্যমূল্য যোগ করলে মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১২ থেকে ১৫ হাজার কোটিতে। এর বিপরীতে বাংলাদেশ ভারতে রফতানি করতে পেরেছে মাত্র ৫শ কোটি টাকার পণ্য। এই অপারগতা বাংলাদেশের অসামর্থের কারণে নয়, এর কারণ ভারতের সংরক্ষণবাদী বৈরিতা। এমন অসম ও অবিচারমূলক পরিবেশে দক্ষিণ এশিয়া ইকনোমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠতে পারে না। এর পরই তার প্রশ্ন ছিলো সাফটা (SAFTA) সম্পর্কে। বলেছিলেন, এই অধিবেশনেই তো সাফটা সই হতে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার মত কি? আমি বলেছিলাম, এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার উদ্বোধনী অধিবেশনের বক্তব্যে বলে দিয়েছেন। তার বক্তব্যের সারাংশ হলো গরীব দেশ থেকে ধনী দেশে রফতানির অবারিত সুযোগ দিতে হবে এবং অনুন্নত বা LDC দেশগুলোর বাজার উন্মুক্ত করার জন্য উপযুক্ত টাইম ফ্রেম প্রয়োজন। এ বিষয়ের উপর আমার ব্যাখ্যায় আমি বলেছিলাম, ভারত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আমদানির দরজা বন্ধ রেখে নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যকে অত্যন্ত শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাবার পর আজ তার বাজার উন্মুক্ত করার জন্যে (যদিও কার্যক্ষেত্রে তার বাজারে বিদেশী পণ্য ঢুকতে দিচ্ছে না) প্রস্তুত হয়েছে। আমাদের বাজারকেও অবারিত করার জন্যে অতটা না হলেও অনুরূপ সময় প্রয়োজন। বাজার খুলে দেয়ার আগেই আমাদের শিল্পের দুর্বল বুনিয়াদ, যে কারণেই হোক বড় ধরনের মার খেয়েছে। গত ১৬ বছরে আমাদের ৪৯টি জুটমিল বন্ধ হয়েছে। আর ভারতে মাত্র গত ৯ বছরে ২১টি বন্ধ জুটমিল খুলে গেছে। আমাদের এ দুর্ভাগ্যের জন্যে ভারত কিংবা কোনো বিদেশী রাষ্ট্র দায়ী তা বলছি না। আমরা আমাদের তৈরি করার জন্যে আরও সময় প্রয়োজন এটাই বলার বিষয়। ধেয়ে আসা মুক্তবাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ আমাদের যতটা বুঝিয়েছে, অতীতে ততটা আমরা বুঝিনি। অশিক্ষা-অসচেতনতা সঞ্জাত বোকামি আমাদের বুঝতেও দেয়নি। সে অবস্থা আজ দূর হচ্ছে। সময়ের সদ্ব্যবহার করার সচেতনতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের আরও সময় ও সুযোগ খুব বেশী প্রয়োজন।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই কথাই বলেছেন। চিটাগাং পোর্ট, গ্যাস, ট্রানজিট ইত্যাদি বিষয়ও ভারতীয় সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার মধ্যে এসেছিলো। গ্যাস সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে, বাংলাদেশ থেকে ভারতের গ্যাস আমদানির ব্যাপারটা গরীব প্রতিবেশীকে আরও ফতুর করার রাজনীতি। ভারতে বাংলাদেশের চেয়ে প্রমাণিত হিসাবেই ৬ গুণ বেশী গ্যাস মওজুদ আছে। নিজের গ্যাস মওজুদ রেখে গ্যাস আমদানির কূটনীতি সমর্থন করা যায় না। আর ট্রানজিটের সাথে আমি বলেছিলাম, নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার মার্কেটে ধনী ও গরীব দুই প্রতিবেশী যদি তাদের দরজা অবারিত করে দেয় তাহলে একটা সময় পর গরীবের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না, বিশেষ করে ধনীটি যদি সর্বগ্রাসী হয়। গত বছর ভারত শুধুমাত্র একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও দুই কোয়াড্রন জঙ্গীবিমান

www.icsbook.info

কেনা খাতে খরচ করেছে ৫ হাজার কোটি রুপী। এটা প্রতিবেশী কিংবা পৃথিবীর শান্তি বৃদ্ধির জন্যে নয়। চিটাগাং-এ বেসরকারী পোর্টনির্মাণ ব্যাপারে বিদঘুটে প্রশ্ন করেছিলো ভারতীয় সাংবাদিক। তার প্রশ্ন ছিলো চিটাগাং-এ এ ধরনের পোর্ট তৈরীর ব্যাপারে ভারত এবং চীন, এ দুয়ের কাকে আমি প্রেফার করবো। আমি বলেছিলাম, চীনের এ ধরনের পোর্ট নির্মাণের ইচ্ছা আছে কিনা জানি না। তবে আমি যে কোনো বিদেশী উদ্যোগের বিরোধী। আমাদের পোর্ট নির্মাণে তারা আমাদের সাহায্য করতে পারে মাত্র।

সার্ক-এর সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছিলো, তার সাথে কথা আর আগায়নি। সমাপ্তি অধিবেশনে ইসলামাবাদ ঘোষণা' ছাড়াও সাফটা ও সাপ্রেশন অব টেররিজ্‌ম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়াও ১২তম এই সার্ক সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হয়েছে সার্ক সোস্যাল চার্টার। ভারতীয় সাংবাদিক যেসব বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তার সবই, একমাত্র চিটাগাং পোর্ট ছাড়া, শীর্ষ সম্মেলনের এসব ঘোষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং উপরের ভূমিকায় সাথে পরের এই আলোচনাকে পরিপূরকই মনে করছি।

সার্ক ইতিহাসের সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশে অনুষ্ঠিত ইসলামাবাদের ১২ তম শীর্ষ সম্মেলন সাফল্যের বিচারে ঐতিহাসিক ফল দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইসলামাবাদ ঘোষণাকে সাফল্যের সামারি হিসাবে অভিহিত করা যায়। ঘোষণাটি আর্থিক, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক সন্ত্রাস মোকাবিলা ইত্যাদি অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে অর্থনীতিকে রাখা হয়েছে প্রথমে এবং সম্ভবত একেই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর বিচারেও একথা সত্য, অবশ্য এর মধ্যে বিতার্কিত বিষয়ও যুক্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি Poverty Alleviation সংক্রান্ত ঘোষণাও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর মধ্যে দৃশ্যমান বিতর্কিত কিছু নেই। পোভাটি এলেভিয়েশন' ঘোষণায় মূলত শীর্ষ সম্মেলন কর্তৃক পাসকৃত The Plan of Actian on Poverty Alleviation' কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর বাইরে রয়েছে ISACPA (Independent South Asian Commission for Poverty Alleviation) সুপারিশকৃত Our Future Our Responsibility শীর্ষক রিপোর্ট -এর বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ। এ ছাড়াও এ ঘোষণাটিতে রয়েছে 'সার্ক ফুড সিক্যুরিটি রিজার্ভ', 'রিজিওনাল ফুড ব্যাংক,' 'স্কিল ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, 'সার্ক হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট সেন্টার ' গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। অনুরূপভাবে ইসলামাবাদ ঘোষণার 'সমাজ' বিষয়ক অংশে শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত সার্ক সোস্যাল চার্টার' মূল বিষয়। মহিলা, শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে কিছু ঘোষণা রয়েছে এতে। সন্ত্রাস মোকাবিলার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামাবাদ শীর্ষসম্মেলন ও ইসলামাবাদ ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ দিক। ঘোষণায় মূলত শীর্ষসম্মেলনে গৃহীত সার্ক রিজিওনাল কনভেনশন অন সাপ্রেশন অব টেররিজম' শীর্ষক চুক্তিকেই প্রত্যয়িত করা হয়েছে। সমস্যার নিরিখে এই চুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টেররিজম' এর সংজ্ঞা চুক্তিতে দেয়া হয়নি। এর কারণ মনে হয় এই

www.icsbook.info

যে, সংজ্ঞার ব্যাপারে সার্ক সদস্যগুলো একমত হতে. পারেনি। যেমন কাশ্মীরের সংগ্রামীদের পাকিস্তান স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে কিন্তু ভারত বলে সন্ত্রাসী। সম্ভবত এই বিরোধের কারণেই টেররিজমের কোনো সংজ্ঞা আসেনি। এর ফলে স্বাক্ষরিত টেররিজম সংক্রান্ত বিধান কাশ্মীরী মুক্তি সংগ্রামীদের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে কিনা সে জটিলতা থেকেই যাবে। শুধু তাই নয়। এই বিধান ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মুক্তি সংগ্রামীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে কিনা সে প্রশ্নও উঠবে। এ দিকগুলো বিবেচনায় রাখলে টেররিজম মোকাবিলা সংক্রান্ত সার্ক- এর চুক্তি অকার্যকর হয়ে উঠতে পারে। আরও একটি বিষয়, সন্ত্রাস মোকাবিলা সংক্রান্ত বিধানে একক গুরুত্ব পেয়েছে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক মাধ্যমে অস্বাভাবিক টাকা হস্তান্তরের বিষয়। ধরে নেয়া হয়েছে এই টাকা সন্তাসীদের সাহায্যের জন্যেই হস্তান্তরিত হতে পারে। ওয়াকিফ হালদের মতে এই বিধান এর মারাত্মক অপব্যবহার হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই এ ধরনের আইনের অপব্যবহার করেছে। এই ধরনের আইনের বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানকার কয়েকটি মুসলিম দাতাসংস্থাকে কালতালিকাভূক্ত করেছে। দাতা সংস্থাগুলো ফিলিস্তিনের ইয়াতিম, বিধবা, অভাবগ্রস্ত এবং মসজিদ -মদ্রাসার উন্নয়নে সাহায্য করতো। এগুলোকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী কাজ আখ্যা দিয়েছে। ভারতও তার দেশে মানবিক ও ধর্মীয় কাজে যারা দান করে সেই নির্দোষ দাতা, বিশেষ করে মুসলিম দাতাদের উপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছে, যাতে কোনো প্রকার দান করতে তারা সাহস না পায়। সন্ত্রাস দমনের নামে সার্কের গৃহীত অর্থ সংক্রান্ত বিধান এই একই উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগানো হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে আশার কথা হলো, সার্কে এমন চিন্তার দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়।

সার্ক এর ইসলামাবাদ ঘোষণার অর্থনৈতিক অংশেও টেররিজম চ্যাপ্টারের মতোই প্রশ্নবোধক বা বিতর্কমূলক কিছু বিষয় রয়েছে। Economic চ্যাপ্টারের মোট নয়টি ধারার মধ্যে ৪র্থ ও ৫ম ধারা ছাড়া অন্যান্যগুলোতে সাফটার প্রত্যায়নসহ আরও কিছু বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়েছে। 'সাউথ এশিয়ান ইকনমিক ইউনিয়ন' এরও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলে একে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ঠিক এই South Asian Economic Union এর মতোই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়েছে ৪র্থ ও ৫ম ধারায়। ৪র্থ ধারায় সাউথ এশিয়ান এনার্জি কো-অপারেশনসহ সার্ক এর জন্যে এনার্জি রিং সম্পর্কে সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর ৫ম ধারায় 'ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে অঞ্চলব্যাপী পরিবহন, ট্রানজিট ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করাকে বলা হয়েছে অপরিহার্য। এ দু'ধারায় উল্লেখিত এনার্জি রিং এবং ট্রানজিট' দুটোই বিতর্কিত বিষয়। এ বিশ্বাস বাংলাদেশে খুব দৃঢ় যে, একক গ্রীড, জ্বালানি সহযোগিতা ইত্যাদির নামে ভারত একদিকে বাংলাদেশের গ্যাসসম্পদ, অন্যদিকে বিদ্যুতের মতো সভ্যতার প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ভারতের থাবা এতই

www.icsbook.info

শক্তিশালী ও কুশলী যে দুর্বল প্রতিবেশীরা কোন কিছুই প্রতিরোধ করতে পারবে না। এর একটা বড় প্রমাণ হলো, সার্ক ঘোষণায় জ্বালানি প্রশ্ন, পরিবহন প্রশ্ন, ট্রানজিট প্রশ্নসহ ভারতের চাহিদার সবই এসেছে, কিন্তু পানি প্রশ্ন আসেনি। অথচ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় পানি একটা জ্বলন্ত সমস্যা। ভারত সম্প্রতি তার দেশের জন্যে সমন্বিত একটা পানি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভারতের ফারাক্কা বাঁধ যেমন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল মরু সদৃশ করে তুলেছে ও দেশের প্রায় অর্ধেক নদীকে মেরে ফেলেছে, তেমনি ভারতের নতুন সমন্বিত পানি- পরিকল্পনা বাংলাদেশের অবশিষ্ট নদীকে শেষ করবে। পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সাথে ভুটান, নেপাল এবং পাকিস্তানের স্বার্থও জড়িত আছে। কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ পানির বিষয়টি সার্কের ইসলামাবাদ ঘোষণা কিংবা অন্য কোন চুক্তিতেও আসেনি। এর একটাই ব্যাখ্যা যে, ভারত এটা চায়নি। ভারতের সাথে সম্পর্কের উন্নয়নকামী পাকিস্তান এ নিয়ে দরকষাকষি করেনি সংগত কারণেই। অন্যদিকে অন্যান্য সার্ক দেশ দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের অনুষ্ঠান এবং যা কিছু পাওয়া যায় তাকেই বড় করে দেখেছে। তার ফলেই হয়েছে ভারতের বিজয়। সে তার স্বার্থের জ্বালানি, ট্রানজিট ইত্যাদি আলোচনায় আনতে পেরেছে এবং পানি সমস্যাকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরকৃত সাফটা (SAFTA-South Asian Free Trade Area) -এর পর্যালোচনাতেও কতকটা অনুরূপ বিষয়ই দেখা যাবে। সাফটার মূল দলিলে ২৫টি অধ্যায় রয়েছে। মৌল অধ্যায় দুটি। একটি Objective ও principles সংক্রান্ত, অপরটি 'Trade liberalisation programme' বিষয়ক। objective -এর প্রথম দফায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে সকল বিধি-নিষেধের অবসান এবং আন্তঃসীমান্ত পণ্য চলাচলে অবাধ সুযোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। Principles এর ভাগেও অনুরূপ একটা দফা রয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, ট্যারিফ, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বিধি-নিষিধের বিলোপ সাধনের মাধ্যমে সার্ক বাণিজ্য-পণ্যের অবাধ বিচরণের ব্যবস্থা করবে। মুক্ত বাণিজ্যের এই ঘোষণার সাথে সাথে সার্ক-এর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পগত উন্নয়নের পর্যায়, ধরন এবং রফতানির চিত্র ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে সুস্থ প্রতিযোগিতা, সুযোগ ও সুবিধার পারস্পরিকতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এই সুযোগ-সুবিধা কাদের জন্যে তা বলা না হলেও বক্তব্যের প্রকৃতি থেকে বুঝা যায় অনুন্নত দেশগুলোর জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সুযোগের ব্যাপারটা সুনির্দিষ্ট নয়। এই সুনির্দিষ্টকরণের কাজটা করা হয়েছে ৭ম আর্টিকেলের ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রাম' অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে মোট ৬টি দফা রয়েছে এবং রয়েছে আরও কিছু উপদফা। এর মধ্যে প্রথম দফা ও তার উপদফাই আসল। প্রথম দফার চার উপদফায় LDC এবং non-LDC দেশের মধ্যে কে কত শুল্কহ্রাস করবে সেই কথা বলা হয়েছে। LDC দেশ, যেমন বাংলাদেশ, প্রথম দু'বছরে ৩০% শুল্ক হ্রাস করবে, আর non - LDC

www.icsbook.info

দেশ, যেমন ভারত, প্রথম দু' বছরে ২০% শুল্ক হ্রাস ঘটাবে। পরবর্তী ৫ বছরে LDC হ্রাস করবে ৩০% শুল্ক, আর non- LDC করবে ২০% শুল্ক হ্রাস। এই হিসাব থেকে LDC এবং non - LDC এর মধ্যেকার ব্যবধান দেখা যাচ্ছে শতকরা মাত্র ১০ ভাগ। এর আরও অর্থ যেন এই, ১০ ভাগ ট্যারিফ সুবিধা LDC এর বাণিজ্য সমস্যার রিমেডি হিসাবে কাজ করবে। এটা হাস্যকর একটা ব্যবস্থা। গত অর্থবছরের নিরিখে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ শুল্ক হ্রাস কি এই আকাশচুম্বি ব্যবধান দূর করবে? অবশ্য এই অধ্যায়ের তৃতীয় দফায় বলা হয়েছে চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর পণ্যের একটা ' সেনসেটিভ লিস্ট' থাকবে, যাদের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসের উপরোক্ত নীতি কার্যকরী হবে না। কিন্তু তালিকার সুবিধা LDC দেশগুলোকে এককভাবে দেয়া হয়নি। একদিকে এই সুবিধা সবাইকে দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে আলোচনা ও সম্মতি সাপেক্ষ করার মাধ্যমে একে বিতর্ক ও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়া শুধু নয় বড় অর্থনীতির করুণা নির্ভরও করা হয়েছে দুর্বল অর্থনীতিকে। অষ্টম অধ্যায়ে Trade Liberalisation programme' এর কিছু বাড়তি ব্যবস্থার' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে LDC দেশগুলোকে আলাদাভাবে বিচার করা হয়নি এবং বাড়তি সুবিধারও ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং এক উপধারায় Transit facilities for efficient intra - SAARC Trade এর কথা বলে বিতর্কিত ট্রানজিট এর পক্ষে SAARC ম্যান্ডেট আরোপ করা হয়েছে। ৯ম আর্টিকেলে extension of Negotiated Concession শিরোনামে একটা অধ্যায় রাখা হয়েছে। শিরোনাম দেখলে মনে হবে এখানে LDC বা দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর জন্যে অর্থপূর্ণ ও কার্যকর কিছু সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু পড়ার পর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে হয়। অধ্যায়ে বলা হয়েছে, LDC এর জন্যে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি এমন সব সুযোগ+সুবিধা চুক্তিভুক্ত সব দেশই পাবে। ব্যাপারটা LDC এর গালে চপেটাঘাত করার মতই। এ ধরনেরই আরেকটা ঘটনা ঘটেছে ১১তম অধ্যায়ে। এই ১১তম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো Special and differential Treatment for the Least Developed countries শিরোনামেই প্রমাণ এই অধ্যায়ে LDC দেশগুলোকে বড়কিছু দেয়া হয়েছে যা তাদের দুর্বলতা ও দূরত্ব অবসানে সহায়ক হবে। কিন্তু বাস্তবে এ অধ্যায়ের প্রথম দফায় যা বলা হয়েছে তা হলো পরিস্থিতিগত কারণে যদি LDC Anti Dumping বা counterveiling এর সুযোগ নিতে চায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট বা সদস্য অন্যদেশ LDC দেশকে এ ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ দেবে। আলোচনান্তে বাস্তব হলে LDC এর রফতানি মূল্য গ্রহণ করার কথা non LDC রা বিবেচনা করতে পারে। দেখা যাবে এ বিধানটিও যথেষ্ট দুর্বল ও অর্থহীন। প্রথমত, এমন অবস্থায় LDC রা যে কারণে পড়বে তার প্রতিবিধান চুক্তিতে নেই, দ্বিতীয়ত, বিধানটির সাফল্য আলোচনা ও অন্যের ইচ্ছা নির্ভর এবং তৃতীয়ত, বিধানটি SAFTA

www.icsbook.info

এর লিবারালাইজেশন কর্মসূচী সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্তই মাত্র কার্যকর থাকবে। দ্বিতীয় উপধারায় বলা হয়েছে, সংকটজনক পরিস্থিতিতে LDC দেশগুলোর আমদানির উপর পরিমাণগত ও অন্যান্য বৈষম্যহীন ও সাময়িক বিধি-নিষেধ আরোপকে শিথিল চোখে দেখা হবে। নিঃসন্দেহে এটা একটা ভালো ব্যবস্থা। উচিত ছিল LDC দের শিল্প প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে পৌছা পর্যন্ত এই সুযোগ দেয়া। তা দেয়া হয়নি। বরং Provisionally ' ও Without discrimination এর শর্ত জুড়ে একে অনেকটা অর্থহীন করে তোলা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি দফার দুটিতে LDC এর রফতানি বাড়ানোর জন্যে non-LDC দেরকে পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টাকে স্পেসেফিক করা হয়নি। পরিমাণগত একটা অনুপাত ঠিক করে দিলে, উপযুক্ত একটা সময়ের জন্যে হলেও তা ফলপ্রসূ হতো। যেমন, ভারত থেকে আমরা ৭ হাজার কোটি টাকার পণ্য আনি, ভারতও অনুরূপ পরিমাণ পণ্য কিনবে বাংলাদেশ থেকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। যে সময়ের মধ্যে আমাদের দুর্বলতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো। শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের বক্তৃতায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মূলত এ ধরনের Time Frame এর ব্যবস্থাই চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করা হয়নি। আলোচ্য অধ্যায়ের শেষ তিনটি দফাকে LDC এর জন্যে দান-খয়রাতের মত কৃপামূলক বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে।

এগারতম অধ্যায়ের পর SAFTA চুক্তিতে LDC দেশগুলোর জন্যে প্রত্যক্ষ আর কোন সুবিধা দেয়ার কথা বলা হয়নি। বরং Safeguard Measures এর নামে ১৬ তম অধ্যায়ের প্রথম দফায় যা বলা হয়েছে তা কার্যত বড় দেশের বড় বাণিজ্যকেই নিশ্চিত করবে এবং LDC দেশগুলোর বিকল্প সন্ধানের পথ রুদ্ধ করবে। আর এই অধ্যায়ের তৃতীয় দফায় যা বলা হয়েছে তা LDC দেশগুলোর জন্যে রীতিমত হুশিয়ারি। বলা হয়েছে, Trade Liberalisation Programme এর বাস্তবায়নকালে যে Safeguard বা সুযোগ -সুবিধা দেয়া হবে তা পরবর্তীকালে আর দেয়া হবে না। এই হুঁশিয়ারির জবাবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, Trade Liberalisation Programme সমাপ্ত হওয়ার সংগে সংগেই কি LDC দেশগুলো non -LDC এর সমান হয়ে যাবে যে তাদের আর অনুরূপ কনসেশন দেয়া যাবে না?

চুক্তির এই মানসিকতা থেকে আমার মনে হয়েছে চুক্তি বাস্তবায়নকালে যে সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে , তা এক ধরনের ছেলে ভুলানো ব্যাপার বা গাধার সামনে ঝুলানো মুলা। চুক্তিকে যৌক্তিক খোলস দিয়ে একে পাস করানোই যেন এর লক্ষ্য। পার হলে পাটনি শালা' প্রবাদের মতই চুক্তি পাস ও কার্যকরী করার পর LDC স্বার্থের দিকে আর ফিরেও তাকানো হবে না, এমন ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার এই মন্তব্য কারও কাছে অতিরঞ্জন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে যে বাণিজ্য -যুদ্ধ চলছে এবং আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যের যে অবস্থা আমরা সবাই দেখছি, তাতে এমন আশংকাই আজকের বাস্তবতা।

www.icsbook.info

এ সত্ত্বেও ইসলামাবাদ ঘোষণা, সন্ত্রাস দমন চুক্তি, সার্ক সোস্যাল চার্টার, দারিদ্র্য বিমোচন প্রোগ্রাম, দক্ষিণ এশিয়া ফ্রি ট্রেড এরিয়া, ইত্যাদিতে এমন বহু ইতিবাচক দিক রয়েছে যাকে সময় ও অবস্থার বিচারে ঐতিহাসিক বলতেই হবে। তাছাড়া যেসব ব্যবস্থা নেতিবাচক বা ইতিবাচক নয় বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং যে ব্যবস্থাগুলো অসম্পূর্ণ বা অপ্রতুল বলে বিবেচিত হচ্ছে, সেগুলোও সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তনে ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে। অবস্থার এই পরিবর্তন অবশ্যই দক্ষিণ এশিয়ার non-LDC দেশগুলোর চরিত্র ও মানসিকতার পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট। লক্ষণীয় শীর্ষ সম্মেলনের ইসলামাবাদ ঘোষণায় সাউথ এশিয়ান ইকনোমিক ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, "Creation of a suitable political and economic environment would be conductive to the realization of this objective." প্রকৃতপক্ষে ইসলামাবাদ ঘোষণা ও সব চুক্তির বাস্তবায়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্যও এ শর্ত পূরণ আবশ্যক। দক্ষিণ এশিয়ার বড় দেশ বা দেশগুলোর রাজনীতি-অর্থনীতি, অন্য কথায় মানসিকতার কারণেই দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার উদ্বোধনী অধিবেশনের বক্তব্যে এই পরিস্থিতিরই একটা সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলেন, Since the last summit, our world has literally been transformed, inter state relations have become more uncertain and difficult. Multilateral institutions have been sidelined. অর্থাৎ গত শীর্ষ সম্মেলনের পর আমাদের পৃথিবী আক্ষরিকভাবেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক আজ অধিকতর অনিশ্চিত ও সংকটপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে পড়েছে অকার্যকর। শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহকে এ ধরনের অকার্যকারিতার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক ও রাজনৈতিক পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই প্রয়োজনের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলেছেন, Greater economic integration is inextricably linked to the creation of requisite political climate. কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, পলিটিক্যাল ও ইকনোমিক এই climate সৃষ্টির জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সমস্যাসমূহ দূর করার উদ্যোগ সার্ক প্লাটফরমে নেয়া হয়নি।

আমি জানি, "in a global economy no individual country can sustain a closed, self-sufficient economy." আন্তঃরাষ্ট্র, আন্তঃজাতি, আন্তঃঅঞ্চল সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সহযোগিতার জন্য চাই দেশসমূহের মধ্যে তাদের সমস্যাদি নিয়ে সাহসী, দ্বিধাহীন ও ফলপ্রসূ আলোচনা। কিন্তু সার্কের প্লাটফরমে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য যে আলোচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তা ধামাচাপ দিয়ে সহযোগিতার ট্রেন চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, এ স্রোত এক বার বইতে শুরু করলে সব জঞ্জাল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যদি তা হয় ভালই হবে।

০১-০২-২০০৩

www.icsbook.info

মার্কিন মুসলমানদের 'নতুন ইসলাম'

নিউজউইক ম্যাগাজিনের জেনারেল এডিটর ক্যারলা পাওয়ার The New Islam নামে একটা মজার প্রবন্ধ লিখেছেন। মজার বলছি এই কারণে যে, ঐ নিবন্ধে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুনিয়ার মধ্যে ভালো মুসলমান হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক গণতন্ত্র এবং বাকও ধর্মীয় স্বাধীনতার গ্যারান্টি মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য অঞ্চলের বহু মুসলিম দেশের চাইতে এখানে মুসলমানদের জীবন সহজ ও সুন্দর করেছে। মুসলমানদের আমেরিকান রাজনীতির জনৈক শিক্ষক মুহাম্মদ মোকতাদির খানের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ক্যারলা পাওয়ার : "মার্কিন সংবিধান মানুষের জীবন, সম্পদ ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রের মত কাজ করেছে।" ক্যারলা পাওয়ার সম্ভবত এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন, মার্কিন সংবিধান ইসলামের পক্ষেই কাজ করছে।

তার মজার কথাগুলোর পক্ষে ক্যারলা পাওয়ার যথেষ্ট যুক্তি সামনে এনেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নতুন ইসলাম' কিভাবে মাথা তুলছে। তাঁর মতে গত ১৪০০ বছরে যে অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার ইসলামে প্রবেশ করেছে তা থেকে ইসলামকে মুক্ত করবে এই নতুন ইসলাম। তিনি লিখেছেন আমেরিকান মুসলমানরা By going back to the basic texts (of Ouran), they are discovering an Islam founded on tolerance, social Justice and human rights. Some 6 million strong America's Muslim population is set to outstrip its Jewish one by 2010 making it America s second largest faith after christianity অর্থাৎ আমেরিকান মুসলমানরা কুরআনের মূল শিক্ষায় ফিরে গিয়ে সহনশীলতা, সামাজিক সুবিচার ও মানবাধিকারের উপর ভিত্তিশীল ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে। আমেরিকার আজকের ষাট লাখ মুসলিম জনসংখ্যা আগামী ২০১০ সালের মধ্যে ইহুদীদের সংখ্যা অতিক্রম করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনসংখ্যায় পরিণত হবে।

ক্যারলা পাওয়ার আমেরিকান মুসলমানদের খুঁজে পাওয়া সহনশীল, সামাজিক সুবিচারকামী ও মানবাধিকারবাদী ইসলামের পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছেন সাদ্দাম হোসেনের জীবাণু অস্ত্র, হেজবুল্লার সন্ত্রাস, আয়াতুল্লাহদের চরম পন্থা ও ফতওয়াকে এবং বলতে চেয়েছেন আমেরিকান মুসলমানদের ইসলামই হবে প্রকৃত ইসলাম। তিনি আরও বলেছেন, আমেরিকান মুসলমানরা বিত্ত-বৈভব, শিক্ষা ও জ্ঞান সবদিক দিয়েই হবে অগ্রসর এবং তাদের যুক্তি ও বক্তব্যই দুনিয়ার অন্য মুসলমানদের উপর প্রভাবশীল

www.icsbook.info

হয়ে উঠবে। এই আধুনিক ইসলাম রফতানি হবে সব জায়গায়। তিনি লিখেছেন, "Richer than most Muslim communities, literate and natives of the worlds sole super power, America s Muslim are intent on exporting their modern Islam. From the Mideast to central Asia, they would like to influence debate on everything from free trade to gender politics."

ক্যারলা পাওয়ার এই বড় বড় মজার কথার পাশাপাশি আমেরিকান মুসলমানদের মাইন্ডকে তুলে ধরেছেন তার দাবীর পক্ষে উদাহরণ হিসেবে। বিশেষ করে আমেরিকার নতুন প্রজন্মের মানসকে তিনি উদাহরণ হিসেবে হাজির করেছেন। তাঁর মতে বৃদ্ধ মুসলিম পিতা-মাতারা যখন মার্কিন সমাজ জীবনের মূল ধারার এক পাশে দাঁড়িয়ে তাদের পুরাতন পৃথিবীর জন্যে শোক করবে, তখন নতুন প্রজন্মের মুসলিম আমেরিকানরা মুসলিম ঐতিহ্যের পুরো সংরক্ষণের সাথে সাথে নতুন পৃথিবীতে তাদের স্থান সুচিহ্নিত করে নেবে।

'এই নতুন প্রজন্ম' , তিনি লিখেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত সর্বত্র অভাবিত এক নতুন দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টের হলগুলোতে, অভিজাত ল ফার্মের কক্ষগুলোতে সিলিকন ভ্যালির ওরেকল' ও এডাপটেক' -এর মত কোম্পানীর শূন্য বোর্ড রুমগুলোতে তরুণ মুসলিমরা নামায পড়ছে প্রতিদিন। সাউথ ক্যারোলিনার মুসলিম তরুণী মানাল ওমর স্কুলে বাস্কেট বলের তুখোড় খেলোয়াড়। কলেজে সে ডিবেটে পুরস্কার বিজয়ী। অবসর সময়ে সে মুসলিম বালক-বালিকাদের জন্য বুক সিরিজ তৈরিতে অংশ নেয়। মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে মাথায় রুমাল ও গায়ে কাপড় রাখে সে। নিউইয়র্কের লং আইল্যাণ্ডের ফারমিংডেল হাই স্কুলেই আমানি খাত্তাব বলেন, স্কুলে আমি সবার মতই একজন সবক্ষেত্রে, কিন্তু আমি মাথায় ওড়না পরি। অমুসলিম মেয়েরা বলে আমি নির্যাতিতা কারণ আমি বেশী কাপড় পরি। আমি ওদের বলি, তোমরাই নির্যাতিতা কারণ তোমরা খুব কম কাপড় পরতে পাও।' পাকিস্তানের মত দেশের মেয়েরাও মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার অনুমতি পায় না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েরা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার অধিকার পেয়েছে। সউদি আরবে মেয়েদের ড্রাইভ করা চলে না। কিন্তু ওহাইও -এর মার্কিন মুসলিম তরুণী সদ্য পাওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স হাতে নিয়ে বললেন, 'মহানবী (সঃ)-এর প্রিয় পত্নী আয়েশা (রাঃ) উটে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।' নতুন প্রজন্মের মার্কিন মুসলিমরা মনে করছে গতিশীল জীবনের ইসলাম মধ্যযুগে এসে স্থবির হয়ে পড়ে। এই স্থবিরতার বিরুদ্ধে লড়াইকেই তারা সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বলে মনে করছে। এই যুদ্ধে, ক্যারলা পাওয়ারের মতে, 'মার্কিন মুসলিম তরুণীরাই সামনের কাতারে রয়েছে।' তিনি লিখেছেন, "Women are returning to the Koran to dis-

www.icsbook.info

cover whither Islam sanctions the veil seclusion and silence many Muslim women endure. অর্থাৎ মার্কিন মুসলিম মেয়েরা কুরআনের দিকে ফিরে আসছে। এটা তারা জানতে চাচ্ছে যে, অনেক মুসলিম মেয়ে যে ধরনের পর্দা, নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতাকে অনুসরণ করে, কুরআন তা বলেছে কিনা।"

'অন্যদিকে এই একই সময়ে' লিখছেন ক্যারলা পাওয়ার, 'আমেরিকার মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম আমেরিকান হিসেবে মুসলমান হিসেবে তাদের অধিকার আদায়ে সচেতন ও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মসজিদগুলোতে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হবার জন্য ভোটের যথাযথ প্রয়োগের জন্যে মুসলমানদের শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। মুসলিম তরুণ আইনজীবীরা খোদ রাজধানী ওয়াশিংটনের রাজনীতিতে উচ্চাভিলাশী ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। মার্কিন পার্লামেন্টের অফিসার ২৮ বছরের সোহায়েল খান বলেন, যখন কেউ বলেন মুসলিম আমেরিকান অফিসিয়ালকে কখনই আমরা নির্বাচিত করব না, তখন আমি বলি প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ানো ক্যাথলিক কেনেডি সম্পর্কেও একথা বলা হয়েছিল। কোন অন্যায়কেই বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দিচ্ছে না নতুন প্রজন্মের আমেরিকান মুসলমানরা। মার্কিন এয়ারপোর্টে যখন মুসলমানদের জন্যে বিশেষ নিরাপত্তা সার্চের ব্যবস্থা করা হলো, তখনই মুসলিমরা তাদেরকে সন্ত্রাসী বিবেচনা করার তীব্র প্রতিবাদ করে। সম্প্রতি ইরাকে বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে ফোন ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে একটা প্রতিবাদী ক্যাম্পেন তারা চালায়। আরব-ইসরাইল সমস্যার ব্যাপারে আমেরিকান মুসলমানদের একটা প্রতিনিধিদল সম্প্রতি সিরিয়ায় এসেছিল।

সবমিলিয়ে মার্কিন মুসলমানদের একটা প্রবল সংস্কারের সূচনা হয়েছে বলে ক্যারলা পাওয়ার মনে করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গোটা দুনিয়া জুড়েই মুসলমানরা তাদের বিশ্বাসকে তাদের আধুনিক জীবন পরিচালনায় সেট করার কাজ তীব্র করে তুলেছে। তবে ক্যারলা পাওয়ার বলছেন "ইসলামকে পরবর্তী মিলিওনিয়ামে নেয়ার ক্ষেত্রে বিত্তবান, যোগ্য ও বহুজাতিক সংস্কৃতির অভিজ্ঞতায় গড়ে উঠা আমেরিকান মুসলমানরাই উপযুক্ত অবস্থানে রয়েছে।"

ক্যারলা পাওয়ারকে ধন্যবাদ যে তিনি একটা বড় সুখবর আমাদের শুনিয়েছেন। আমেরিকা থেকেই ইসলাম অন্যান্য মুসলিম দেশে রফতানী হবে এটা একটা মজার কথা হলেও এর সম্ভাব্যতা আমরা অস্বীকার করি না। মার্কিন মুসলমানরা একক সুপার পাওয়ার এর আসনে আসীন একটা দেশের নাগরিক। বিত্ত-বৈভব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষ অধীশ্বরও আবার দেশটা। সুতরাং মার্কিন মুসলমানদের জন্যে সামনে এগুবার সুযোগ অন্য যে কোন মুসলিম দেশের নাগরিকদের চেয়ে বেশী। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানে তারা যদি এগিয়ে আসে, তাহলে সেটা অবাক হওয়ায় মত কিছু হবে না। কিন্তু ক্যারলা পাওয়ার আমেরিকার এই ইসলামকে The New Islam নামে অভিহিত করেছেন। এখানেই আমার আপত্তি।

www.icsbook.info

ইসলামে 'নতুন ইসলাম' ও পুরাতন ইসলাম' বলার কোন সুযোগ নেই। বাইবেল যেমন অনেক জনের অনেক রকম ছিল এবং অনেক ছাটাই -বাছাই করে চারজনের চারটি বাইবেল এখনও বর্তমান রয়েছে, তেমনটা ইসলামে নেই। একাধিক কুরআনের কোন অস্তিত্ব নেই। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সঃ) -এর কথা ও কাজের বাইরে নতুন হাদিসেরও কোন সুযোগ নেই। আর কুরআনে নতুন কোন কথা সংযোজনের উপায় যেমন অতীতে ছিল না, তেমনি এখনও নেই। অথচ 'নতুন ইসলাম' হতে হলে তার নতুন ভিত্তি দরকার। নতুন ভিত্তির সুযোগ যেহেতু নেই, তাই নতুন ইসলামেরও কোন প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং 'নতুন ইসলাম' নামকরণের কোন যুক্তি নেই। ক্যারলা পাওয়ার নিজেই লিখেছেন, মার্কিন মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম তাদের জীবন জিজ্ঞাসার জবাবের জন্যে কুরআনের দিকে ফিরছে এবং কুসংস্কার ও অপপ্রভাবমুক্ত নিখাদ ইসলামকে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। এর অর্থ তারা অরিজিন্যাল ইসলামে, মূল ইসলামে ফেরত যেতে চাইছে। এটা তাদের 'নতুন ইসলাম' এর সন্ধান নয় মূল ইসলামের অনুসন্ধান। অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রজন্মের মুলসমানরা 'নতুন ইসলাম' নয়, নিখাদ ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে চাইছে। অবশ্য এই প্রত্যাবর্তনের একটা অন্তর্বর্তীকাল আছে। এই সময় নানা বিভ্রান্তি তাদের মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন নারী সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে এখন হচ্ছে। এই বিভ্রান্তিকেও নতুন ইসলাম বলা যাবে না, এটা বিভ্রান্তি। একে বিভ্রান্তিই বলতে হবে।

যাহোক, মার্কিন মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের ইসলামকে ক্যারলা পাওয়ার 'নতুন ইসলাম' বলার পেছনে তাঁর দিক থেকে যথেষ্ট কারণ আছে। মার্কিনের ঐ নতুন প্রজন্ম যেহেতু মূল ইসলামের সন্ধান করছে । তাই তাদের বলতে হয় Fundamentalist বা মৌলবাদী। কিন্তু মার্কিন মুসলমানদের এই শিক্ষিত, সচেতন, সজ্ঞান এই নতুন প্রজন্মকে মৌলবাদী বললে তো গুমর ফাঁক হয়ে যায় , মৌলবাদ বৈধ হয়ে যায়, গাল না হয়ে তা গুণ হয়ে যায় এবং যাকে মৌলবাদ' বলা হচ্ছে সেটাই যে প্রকৃত ইসলাম তা প্রমাণ হয়ে যায়। সুতরাং ক্যারলা পাওয়ার একে মৌলবাদ বা প্রকৃত ইসলাম কোনটাই বলতে পারেন না। তাহলে উপায় কি? উপায় হিসাবেই তিনি মূল ইসলামে প্রত্যাবর্তনকে The New Islam নামে ডেকেছেন। নিরুপায় তিনি যা করেছেন, তার জন্যে তাকে দোষ দেয়া যায় না। তাছাড়া ইসলাম বোঝার ক্ষেত্রেও তাদের সমস্যা আছে। ইসলাম সম্পর্কে অবগতি খুব কম। আল হামদুলিল্লাহ , মার্কিন মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম তাদের জানাবার বুঝাবার উদ্যোগ নিয়েছে ।

৩১-০৭০১৯৯৮

www.icsbook.info

নাইপলের দু'টি উপন্যাস

টাইম ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় একই লেখকের দুটি উপন্যাসের রিভিউ পড়লাম। লেখকের নাম ভি, এস, নাইপল। তার উপন্যাস দু'টির একটির নাম Among the Believers এবং অপরটি Beyond Belief. উপন্যাস দুটি তার দুটি সফরের ফল। প্রথম সফর ১৯৭৯ সালে ইরান বিপ্লবের পর। সফর করেন ইরান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া। ষোল বছর পর ১৯৯৫ সালে এই দেশগুলোই তিনি আবার সফর করেন। প্রথম সফরের পর লিখেন Among the Relievers আর দ্বিতীয় সফরের পর লিখেন Beyond Belief.

উপন্যাস দু'টি দৃষ্টি আকৃষ্ট করার মতো এই কারণে যে, লেখক এতে মুসলমানদের বিশ্বাস ও ইসলামের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আরও একটা মজার দিক হলো একই ধরনের সফর ও একই বিষয়ের উপর ১৬ বছরের ব্যবধানে তিনি দুটি উপন্যাস লিখেছেন। একই সমাজ সভ্যতাকে ষোল বছরের ব্যবধানে তিনি দুবার দেখেছেন এবং তাঁর দেখাকেই তিনি লিখেছেন।

তাঁর সব দেখা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। উপন্যাসে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বিষয়েই কিঞ্চিত আলোকপাত প্রয়োজন। তিনি প্রথম উপন্যাসে চারটি মুসলিম দেশ সফরের পর ইসলাম সম্পর্কে তার অভিমত টাইমের ভাষায়, "ইসলামী স্টেট সম্পর্কে তার মূল্যায়ন হলো, কিছু মৌলিক স্ববিরোধিতা অতিক্রম করা তার পক্ষে কঠিন। বিশ শতকের শেষে এসে একথা আর কোন দিক দিয়েই অস্পষ্ট নেই যে, বিশ্বাস নয় শুধু আধুনিকতাই সব প্রশ্ন সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আর ৪০৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি মারাত্মক অভিযোগ করেছেন ইসলামের বিরুদ্ধে। বলা হয়েছে, "ইসলামের আবির্ভাব আরবে বলেই হয়তো ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে রাজকীয় দাবী তোলে, বদলে দেয় অনুসারীদের বিশ্বদৃষ্টি, আরব হয় অনুসারীদের পবিত্র স্থান। নিজস্ব বলে যা কিছু আছে সবই পরিত্যাগ করতে হয় অনুসারীদেরকে। যা সমাজে সৃষ্টি করে প্রবল বিশৃংখলা।"

উপন্যাস দুটির লেখক ভি এস নাইপল-এর লিখাপড়া চিন্তাধারা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তবে পশ্চিমের টাইপ' চরিত্র থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন নন, তাঁর মন্তব্যগুলো থেকে তাই মনে হয়েছে। যা তিনি জানেন, তাকেই সম্পূর্ণ ধরে মন্তব্য করা পশ্চিমের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নাইপল এটাই করেছেন।

নাইপল সাহেব ইরান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকে 'ইসলামী স্টেট' ধরে নিয়েছেন। এখানেই নাইপল-এর প্রথম বিভ্রান্তি। এই চারটির কোনটিই প্রকৃত

www.icsbook.info

অর্থে 'ইসলামী স্টেট' এখনও নয়। ইরান একটা অন্তর্বর্তীকাল অতিক্রম করছে। আর পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী মুসলিম সমাজ আছে । ওগুলো মুসলিম স্টেট, ইসলামী স্টেট নয়। সুতরাং এই চারটি দেশ ইসলামী স্টেট হওয়ার ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে নাইপল ইসলামের অক্ষমতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন, তা সবই ভুল।

নাইপলের সবচেয়ে বালসুলভ হলো ইসলাম কর্তৃক আরবকে, অন্য কথায় মক্কাকে মুসলমানদের পবিত্র স্থান করার অভিযোগ। যিনি যে ধর্মের প্রচারক বা যিনি যে মতবাদের প্রবর্তক তার স্মৃতি বিজড়িত স্থানই সে ধর্ম বা মতবাদের পবিত্র স্থান হয়। বেথেলহেম এই কারণেই তো খৃষ্টানদের পবিত্র স্থান। কিন্তু মক্কার কাবা ঘর এই কারণে মুসলমানদের পবিত্র স্থান হয়নি। কাবা বিশ্বের আদি উপাসনালয়। নূহের প্লাবনে উপাসনালয়টি বিধ্বস্ত হলে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কর্তৃক এই উপাসনালয় পুনঃনির্মিত হবার পর এর যাত্রা অব্যাহত আছে। সুতরাং একশ্বেরবাদী ধর্মের আদি উপাসনালয় এটা এবং এই কারণেই কাবা মুসলমানদের পবিত্র স্থান।

ইসলাম তার অনুসারীদের বিশ্ব দৃষ্টি বদলে দেয় এবং তার সব স্বকীয়তা কেড়ে নিয়ে তাকে পুতুলে পরিণত করে- এই অভিযোগটিও নাইপলের ইসলাম সম্পর্কে না জানার ফল। নাইপল ইসলাম সম্পর্কে জানলে তিনি দেখতেন, ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ব্যক্তিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়। ব্যাক্তির কোন কাজ যদি সামাজিক ক্ষতি বা বিপর্যয়ের কারণ না হয় বা অন্য ব্যক্তির অধিকার যদি খর্ব না করে, তাহলে ব্যক্তির অধিকার বা কাজে ইসলাম হস্তক্ষেপ করে না।

এই বিষয়টি ইসলামে অত্যন্ত স্পষ্ট হবার পরেও ইসলামে ব্যক্তির মত প্রকাশ বা কাজ করার স্বাধীনতা নেই, এই অভিযোগটি পশ্চিমী মহল থেকে অহরহই উঠে থাকে। জার্মানী থেকে প্রকাশিত ফরেন এ্যাফেয়ার্স বিষয়ক পত্রিকা Aussen Polilik এর সাম্প্রতিক (Vol. 48. 4/ 97) সংখ্যায় এই সম্পর্কে একটা লিখা পড়লাম। তাতে রবার্ট হাস বলছেন, "ইসলামের তাত্ত্বিকদের স্পষ্টাস্পষ্টি কথা হলো, আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি শাসক এবং ব্যবস্থাপক বিশ্ব জগতের সার্বভৌম ক্ষমতা তারই। তিনি তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে। তার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব, সংশয় ও বিচ্যুতি এড়িয়ে তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা। ...বিশ্বজোড়া ইসলামি উম্মাহ শরিয়তকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। ....গণতন্ত্রও হবে ইসলামী পদ্ধতি অনুসারে। যার অর্থ উম্মাহ অর্থাৎ মুসলমানরা তাদের কাজে তাদের স্বাভাবিক ও মানবিক ইচ্ছার বদলে ঐশ্বরিক বিধানকেই বাস্তবায়ন করতে বাধ্য।"

এই উক্তির দ্বারা রবার্ট হাস বলতে চাচ্ছেন, মুসলমানদের কাজের কোন স্বাধীনতা নেই, বাক স্বাধীনতা নেই এবং নেই চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। সুতরাং মুসলমান মানেই নির্দেশ পালনের একটা পুতুল।

www.icsbook.info

এই অভিযোগটা পশ্চিমীরা আজ নানাভাবে উত্থাপন করে ইসলামকে মানবাধিকার বিরোধী বলে চিহ্নিত করতে চাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমীদের এই অভিযোগের রয়েছে গোড়ায় গলদ। পশ্চিমীরা বিশ্লেষণ -বিবেচনার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ এ সুনাম আমি শুনেছি। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে তাদের বিশ্লেষণ -বিবেচনা অবাক করার মত। হতে পারে ইসলাম সম্পর্কে তাদের মৌলিক পড়াশুনার অভাবের কারণেই এটা হচ্ছে। আসলেই তাই। তাদের একথা অবশ্যই যথার্থ যে, ইসলাম গ্রহণের পর একজন মানুষ ঐশ্বরিক বিধান' বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। কিন্তু এই 'ঐশ্বরিক বিধানটা' কি? এ বিধান মেনে নিলে কি মানুষের স্বাধীন কাজ, স্বাধীন কথা, স্বাধীন চিন্তা বা মত প্রকাশের সব ক্ষেত্র শেষ হয়ে যায়? পশ্চিমীরা এই প্রশ্নটা কখনই খতিয়ে দেখেনি। তাদের এই ব্যর্থতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

যে বিষয়টি পশ্চিমীরা বুঝে না তাহলো, মুসলমানদের ঐশ্বরিক বিধান আল-কুরআন' মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শনকারী গ্রন্থ, তাদের কথা ও কাজের কোন দিনপঞ্জী নয়। এই গ্রন্থে কল্যাণের পথ ও অকল্যাণের পথ আলাদা করে দেয়া হয়েছে। তাকিদ দেয়া হয়েছে মঙ্গলের পথে চলতে। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই এ দুটি পথের যে কোন একটি বেছে নিতে পারে। যারা চলার জন্যে কল্যাণের পথ বেছে নেবে, তাদের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু পথ নির্দেশিকা দিয়েছেন। এই পথ নির্দেশিকা সামনে রেখে মানুষকে স্বাধীনভাবে হাজারো কাজ কথা, চিন্তা ও মতামতের মাধ্যমে পথ চলতে হয়। যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন, মুনাফাকে হালাল করেছেন , প্রতারণা ও জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু সততা ও পরিশ্রমকে উৎসাহিত করেছেন, ক্ষতিকর মওজুদ ও সঞ্চয়কে নিষেধ করে বিতরণ ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছেন, ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিধান দেয়ার ফলে কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের করার মত সব কাজ কি শেষ হয়ে গেছে? না, তা যায়নি। বরং সব কাজই বাকি আছে এবং এ কাজগুলো ইসলামের অনুসারীরা স্বাধীনভাবেই করে থাকে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পরামর্শভিত্তিক শাসন পরিচালনার নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করার কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে কোন শাসকের নয় জনগণের মালিকানায় দেয়া হয়েছে, রাষ্ট্রকে প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, শাসকসহ সকলকে আইন ও বিচারের অধীনে আনার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, শাস্তির কিছু বিধান ও উত্তরধিকার আইন নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মানুষ বা শাসকরা স্বেচ্ছাচারিতার কোন অবকাশ না পায়, ইত্যাদি। এসব বিধানের মধ্যে রাষ্ট্রের সব কাজ কি শেষ হয়ে যায়? স্বাধীনভাবে করার হাজারো লাখো কাজ কি বাকি থাকে না? থাকে।

এসব সাধারণ কথা পশ্চিমীরা জানে না বুঝে না তা নয়। তাহলে এক্ষেত্রে তাদের মুর্খতার ভনিতা কেন?

কারণ তারা তাদের স্বেচ্ছাচারিতার গলায় শৃংখল পরাতে চায় না। তারা ফেরাউন হতে চায়, কারুন হতে চায়, সাদ্দাদ হতে চায়, নমরুদ হতে চায়। তারা চায় ফেরাউন,

www.icsbook.info

কারুন, নমরুদ, সাদ্দাদ হওয়ার স্বাধীনতা। আর ইসলাম চায় এই ফেরাউন - কারুনদের গলায় আইনের শৃংখল পরাতে যাতে মানুষকে তারা বিভিন্ন নামেও নিয়মে দাস বানাতে না পারে।

আরেকটা প্রশ্ন, মানুষের জন্যে আল্লাহর দেয়া জীবনের পথ-নির্দেশকে পশ্চিমীরা অস্বাভাবিক বলে কেন? মানুষকে তো শাসক, সংসদ, জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক আইএমএফ ধরনের অনেকেরই নির্দেশ মেনে চলতে হয়, তাহলে আল্লাহর নির্দেশ চলবে না কেন। পিতা যদি সন্তানকে নির্দেশ করতে পারে মালিক শ্রমিককে নির্দেশ করতে পারে, শাসক যদি নাগরিককে নির্দেশ দিতে পারে, তাহলে আল্লাহ তার সৃষ্ট বান্দাহদের নির্দেশ করতে পারে না কেন? থাক ও প্রসঙ্গ।

নাইপল সাহেব তাঁর প্রথম উপন্যাসে আধুনিকতা ও বিশ্বাসকে দুটি পৃথক ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয় হিসেবে সামনে এনেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, ইসলাম বিশ্বাস হিসেবে আধুনিকতার পরিপন্থী। তাই আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ইসলামের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। মিঃ নাইপল তার কথিত বিশ্বাস' বলতে প্রচলিত খৃষ্টীয় বিশ্বাসকে বুঝালে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। প্রচলিত খৃষ্টীয় বিশ্বাস বিজ্ঞানের বিরোধী। বিজ্ঞান চর্চার অপরাধে তারা ৩৫ হাজার লোককে পুড়িয়ে মেরেছে। কিন্তু ইসলাম ও আধুনিকতাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ইসলামই আধুনিকতা। অন্ধকার ইউরোপে আলো জ্বেলেছে ইসলাম, ইউরোপকে বিজ্ঞান শিখিয়েছে ও সভ্য বানিয়েছে ইসলাম। ইসলামই ইউরোপকে এনেছে আধুনিক যুগে। সুতরাং নাইপল সাহেব সব ভুলে গিয়ে মাকে মাসির গীত শোনানো মানায়নি। এই ভুল থেকে মুক্ত হলে নাইপল সাহেব দেখবেন যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ইসলাম স্যেকুলার বিজ্ঞানের চেয়ে আরও বেটার ওয়েতে দিচ্ছে।

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের এই বিভ্রান্তি কবে কাটবে জানি না। তবে যতদিন না কাটছে, ততদিন ইসলামকে আমরা পশ্চিমী মানুষের গণধর্মে রূপ দিতে পারবো না। তবে আশার কথা, পশ্চিমী দেশগুলোতে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে আলোচনা বিপুলভাবে বেড়েছে। এর অর্থ পশ্চিমী মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছে। আমি রবার্ট হাস-এর যে প্রবন্ধের কথা উপরে উল্লেখ করেছি, সে প্রবন্ধের নাম, Revelation versus Liberal Democracy-A conflict of our Times এই প্রবন্ধে রবার্ট হাস Revelation বা ওহি বলতে মূলত ঃ ইসলামকেই বুঝিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে, ইসলামের সাথে লিবারেল ডেমোক্রেসির সংঘাতই আজকের সময়ের মূল প্রবণতা।

অতএব আমাদের দেশের কবির- শামসু -হু আজাদরা চোখ বন্ধ করে তার স্বরে চিৎকার করুন ইসলাম কিছুই নয়, ইসলাম কোথাও নেই। কিন্তু চোখ খুললেই দেখবেন, অবশ্য যদি চোখের দৃষ্টি থাকে, ইসলামের মধ্যাহ্ন সূর্য তাদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে।

১৪-০৮-১৯৯৮

www.icsbook.info

এক বোমা ফাটিয়েছিলেন তসলিমা নাসরীন ১৯৯৩ সালের একুশের বই মেলায় তাঁর 'লজ্জা' উপন্যাস প্রকাশের মাধ্যমে। বোমা ফাটানোর এই কথা আমার নয়। তসলিমারই সাঙ্গ-পাঙ্গরা বই মেলা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে প্রচার করেন, তসলিমা এবার বই মেলায় বোমা ফাটাচ্ছেন। পরে বুঝা গেছে এই প্রচারটা সুপরিকল্পিত ছিল। সীমান্ত পারের আনন্দবাজারী বাবু দের মাথা এর পেছনে কাজ করেছে। বইটি বাজারে আসার আগে বইটির মার্কেট তৈরি ছিল এর লক্ষ্য। তসলিমার এই বোমাটি ঐবার বইমেলায় বেষ্ট সেলার' হয়েছিল। এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা তসলিমার বোমাকে মাথায় তুলে নিয়ে দারুণ নেচেছিল। এমনকি জাতীয় প্রচার মাধ্যম টেলিভিশনও তসলিমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে তার সাক্ষাৎকার প্রচার করে।

তসলিমার এই বোমায় ছিল বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা। তসলিমা তার লজ্জা উপন্যাসে দেখিয়েছিল কিভাবে হিন্দুরা বাংলাদেশে হত্যা -নির্যাতনের শিকার হয়, কিভাবে তাদের সম্পদ, উপাসনালয় ইত্যাদি ধ্বংস করা হয়।

সকলের মনে থাকার কথা, ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় হিন্দুরা বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে। শুধু বাবরী মসজিদ নয়, ঐদিন অযোধ্যায় আরও ২৪টি মসজিদ হিন্দুরা ধ্বংস করে। মসজিদ ধ্বংসের সাথে মুসলমানদের ৪০০ টি বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। শহর ছেড়ে পালাতে পারেনি এমন মুসলমানদের হত্যা করা হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরা এর প্রতিবাদ করলে তারাও শিকার হয় দাঙ্গার। বোম্বাই শহরে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চলে দশ দিন ধরে। সরকারী হিসেবেই নিহত হয় ৬শ মুসলমান নারী-পুরুষ। চোখে পড়েছে এমন কাউকে রেহাই দেয়া হয়নি। বোম্বাই থেকে পালিয়ে বাঁচে দেড় লাখ মুসলমান। কম্যুনিষ্ট, ধর্মনিরপেক্ষ, কংগ্রেসী, বিজেপি কোন পরিচয়ের মুসলমানরাই সেখানে রক্ষা পায়নি।

ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা এবং প্রতিবাদী মুসলমানদের ওপর এই হত্যাযজ্ঞ চালানোর ঘটনা মুসলিম বিশ্বে এবং গোটা দুনিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং ভারত সরকার সাংঘাতিক বেকায়দায় পড়ে যায়, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের কাছে।

ভারতের এই বেকায়দা অবস্থার সময় ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে তসলিমা নাসরীন তার লজ্জা উপন্যাসের বোমা' ফাটান ঢাকার বই মেলায়। সঙ্গে সঙ্গে ভারত এ বইটি লুফে নেয়। এমনকি এর ইংরেজী অনুবাদও হয় ভারতীয় উদ্যোগে বলে শুনেছি। বাংলাদেশী শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা দিয়ে ভারতীয়রা তসলিমাকে মাথায় তুলে নেয়।

www.icsbook.info

ভারতীয় এই উৎসাহের তাৎপর্য সম্পর্কে সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমদ ছফা লিখেন, 'ভারত বর্ষের অনেকেই একাট্টা হয়ে তসলিমার বইটি মূলধন করে বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের চিত্রটি পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার কাজে এতো বেশী তৎপর হয়ে কেন উঠলেন তার একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ খুঁজে বের করা মোটেই অসম্ভব নয়।... তসলিমার বইটি যখন তাদের হাতে এলো তারা পৃথিবীকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন আমরা সন্ত্রাসী নই। আসলে সন্ত্রাস চলছে বাংলাদেশে। এই যে দেখুন, তাদেরই একজন লেখক বই লিখে সব জানিয়ে দিয়েছেন।"

আহমদ ছফা সাহেব তসলিমা'র 'লজ্জা' বোমা ভারত কেন কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তার রহস্য ভেদ করেছেন, কিন্তু এই লজ্জা' -এর জন্মদাতা কে সেটা উদ্ধার করলে আরও ভালো হতো। অনেকেই মনে করেন 'লজ্জা' উপন্যাস তসলিমার গর্ভজাত হলেও এ সন্তানটি আসলে ভারতের। প্রচণ্ড এক গরজে ভারতের কেউ এটা লিখেছেন, তসলিমা এর ধারক মাত্র। এ কুঅভ্যাস তসলিমার আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ভারতের সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখা নাকি তসলিমা বাংলাদেশে তাঁর নিজের নামে চালিয়ে দেন। যা হোক, তসলিমার বোমাটি সম্পূর্ণভাবে ভারতের জন্যই যখন, তখন তা ভারতের দ্বারা হতেই পারে।

দ্বিতীয় বোমাটি ফাটিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক তাদের ২৩ পাতার একটা রিপোর্টের মাধ্যমে। ১৯৬৫ সালে শত্রু সম্পত্তি আইন পাসের পর হিন্দুদের কি পরিমাণ জমি মুসলমানরা দখল করেছে, তারই একটা সমীক্ষা হলো রিপোর্টটি। তাঁরা রিপোর্টে দেখিয়েছেন, ১৯৬৫ থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুদের ১৬ লাখ ৪০ হাজার একর জমি (যা বাংলাদেশের মোট জমির এক পঞ্চমাংশ) মুসলমানরা দখল করেছে। টাকার অংকে যার পরিমাণ, তারা বলেছেন, বর্তমান বাজার মূল্যে ৬০ হাজার কোটি টাকা। অধ্যাপক দ্বয়ের এই রিপোর্টে আছে কিনা আমি জানি না , তবে হিন্দু-বৌদ্ধ -খৃস্টান পরিষদের এক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, '১৯৬৫ সালের পর ১০ লাখ হিন্দুকে বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

তসলিমা নাসরিনের লজ্জার পর অধ্যাপকদ্বয়ের এ রিপোর্ট ভারতীয়দের জন্য দ্বিতীয় মহামূল্যবান বস্তু বলে গৃহীত হবে। তসলিমার লজ্জা বোমা'র মতো অধ্যাপক দ্বয়ের এ রিপোর্ট বোমাও ভারতীয়দের জন্য উপযুক্ত সময়ে বিস্ফোরিত হয়েছে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় শাসনকে ভারত তাদের জন্য দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ বলে মনে করছে। না চাইতেই তাদের সব পেয়ে যাবার কথা, সে ক্ষেত্রে দাবী তুলতে পারলে তো আর কোন কথাই নেই। এই অবস্থায় ভারত তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একাধিক বিকল্প নিয়ে কাজ করছে। একবার তারা বলছে, বৃটিশ আমল থেকে বাংলাভাষী যারা আজকের ভারতীয় অঞ্চল যেমন আসামে গেছে, তারা সবাই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। এদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে হবে। এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা তারা দেখাচ্ছে প্রায় সোয়া কোটির মতো (১০ই অক্টোবর

www.icsbook.info

৯৮, ইন্ডিয়া টুডের রিপোর্ট) আবার বলা হচ্ছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রায় পৌনে এক কোটির মতো (ভারতীয় পার্লামেন্টে সাবেক যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি) সম্ভবত এই হিসেবে ৪৭ -এর দেশ বিভাগের পর যারা ভারতে গেছে তাদের সবার হিসেব ধরা হয়েছে। অন্য আরেকটি হিসেবে ১৯৬৫ সালের পর ১০ লাখ এবং ১৯৭১ সালের ১০ লাখ এই মোট ২০ লাখ হিন্দু গত তিন দশকে বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। অধ্যাপকদ্বয়ের রিপোর্ট এই শেষোক্ত হিসেবের হাত মজবুত করার জন্যই ভারতের হাতে উপহার দেয়া হয়েছে। তসলিমা নাসরীনের লজ্জার মতো এই রিপোর্টের পেছনেও কালো ইতিহাস থাকতে পারে।

বিশেষজ্ঞ নয়, সাধারণ চোখেই অধ্যাপকদ্বয়ের রিপোর্ট ভূয়া প্রমাণিত হবে। তাদের রিপোর্টে হিন্দুদের অন্যায়ভাবে হস্তচ্যুত সম্পত্তির পরিমাণ দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের মোট সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ। বাংলাদেশে কোটি খানেকের মত হিন্দু এখনও আছে। এদের হাতে যে সম্পত্তি আছে তার পরিমাণ কত হবে? যে পরিমাণ হস্তচ্যুত হয়েছে কমপক্ষে সে পরিমাণ হবে নিশ্চয়। তাহলে বাংলাদেশে ১৯৬৫-উত্তর সময়ে হিন্দুদের হস্তচ্যুত হওয়া ও হাতে থাকা সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশের মোট সম্পত্তির দুই পঞ্চমাংশ বা ৪০ শতাংশ। এই অংক বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাংলাদেশে শতকরা দশ ভাগেরও কম হিন্দুর জমি ৪০ শতাংশ আর অবশিষ্ট ৯০ ভাগেরও বেশী মানুষের জমি ৬০ শতাংশ, এটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অধ্যাপকদ্বয় আসলে তাদের রিপোর্টে তসলিমা নাসরীনের লজ্জা উপন্যাসের মত আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছেন।

কিন্তু ভারতের জন্যে এমন আষাঢ়ে গল্পকে সত্য করে তোলার খুবই প্রয়োজন। ভারত চাচ্ছে ৪৭ উত্তরকালে চলে যাওয়া সকল হিন্দুকে আবার বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিতে এবং তাদের সকল সম্পত্তি তারা যাতে ফেরত পায় তার ব্যবস্থা করতে। সেই ৪৭ থেকে বিনিময় করে যাওয়া বিক্রয় করে যাওয়া সকল সম্পত্তিকে তারা জোর করে কেড়ে নেয়া বা ভুয়া দলিলের মাধ্যমে দখল করে নেয়া দেখাতে চায়। কিন্তু এই কথা ভারত বললে বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করানো যাবে না। এ জন্যেই দাঁড় করানো হয়েছে বাংলাদেশী মুসলিম অধ্যাপকদের। মনে হচ্ছে এ ধরনের বাংলাদেশী মুসলিম অধ্যাপক ভারত সামনে আরও যোগাড় করবে। টাকার অংকে দেশপ্রেম বিক্রি করতে রাজি এ ধরনের অধ্যাপক যোগাড় করা কঠিন হবে না। মনে পড়ছে সাম্প্রতিক একটা ঘটনার কথা। সম্প্রতি ভারতীয় এক মুসলিম ব্যবসায়িক কাজে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার কাছে শুনলাম, কোলকাতা থেকে আসার সময় তার কাছে কিছু পত্রিকার কাটিং ছিল। কাটিংগুলো ছিল সদ্য প্রকাশিত রামকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কিত। ১৯৯৩ সালের সংঘটিত মুসলিম বিরোধী বোম্বাই দাঙ্গার তদন্তের জন্যে এই রামকৃষ্ণ কমিশন গঠিত হয়েছিল। কোলকাতা বিমান বন্দরের কাষ্টমস পুলিশ পত্রিকার কাটিংগুলো আনতে দেয়নি। আনতে দেয়নি নিশ্চয় এই কারণে যে, যাতে দেশের বাইরের কেউ এগুলো

www.icsbook.info

ব্যবহার করতে না পারে। আমাদের দেশের যারা দেশপ্রেম বিক্রি করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা নেয়া দরকার।

বিভীষণ চরিত্রের যারা, তারা কোনদিনই শিক্ষা নেয়নি, কোন দিনই শিক্ষা নেবে না। এরপরও আমরা বলব, তসলিমারা এবং এক শ্রেণীর অধ্যাপকরা যতই অন্তর্ঘাতী বোমা ফাটান, ভারত অনুপ্রবেশের নাটক সাজিয়ে লাখ লাখ লোককে বাংলাদেশে ঠেলে দিতে পারবে না। পারবে লাখ লাখ তথাকথিত অনুপ্রবেশকারীকে সীমান্তে হাজির করে একটা গণ্ডগোল পাকাতে এবং সে গন্ডগোলের সুযোগে সে চেষ্টা করতে পারে খোদ সসৈন্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে। কিন্তু আজ পৃথিবীটা খুবই ছোট। আর ভারত পৃথিবীর একমাত্র শক্তি নয়। সুতরাং ভারত যা ইচ্ছা তা করতে পারে না।

তবে ভয়ের ব্যাপার একটাই সেটা হলো আমাদের সরকারের ভূমিকা।

বাংলাদেশী বলে কথিত ভারতীয়দের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ ও জরুরী রূপ নিয়েছে গত দু সপ্তাহ হলো। কিন্তু গত দুসপ্তাহে আমাদের সরকারের ভূমিকা শুধু দুর্বল নয়, বাংলাদেশের জন্যে ক্ষতিকরও প্রমাণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সরকার ভারতের পুশইন প্রচেষ্টার আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ করেনি, যা একটি স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় আচার। এর বদলে প্রধানমন্ত্রী অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলেছেন, ভারতে কোন বাংলাদেশী নেই। বাংলাদেশ অন্তত এই কথার উপর থাকলেও চলতো। কিন্তু গত ১৭ই আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান থেকেও সরকার সরে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী যা বলেছিলেন তার সাথে উক্ত বৈঠক আমাদের জানা মতে' শব্দগুলো যোগ করে ভারতকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, 'আমরা কিছুই জানি না।' এর অর্থ আমরা যখন জানিনা, তখন ভারতের অভিযোগ সত্যও হতে পারে। এই বৈঠক থেকে আরও বলা হয়েছে, তথাকথিত বাংলাদেশী সংক্রান্ত কোন একতরফা কার্যক্রম বাংলাদেশ মেনে নেবে না। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে জানালো যে, মেনে নেয়ার জন্যে দুইপক্ষের আলোচনা প্রয়োজন। অর্থাৎ বাংলাদেশ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত ভারতের অভিযোগ ব্যাপারে ভারতের সাথে আলোচনার দরজা খুলে দিল। এসব কথার সারাংশ হলো, ভারত উত্থাপিত 'অনুপ্রবেশ' সমস্যার বাস্তবতা বাংলাদেশ মানে। শুধু বাকি এখন সংখ্যার ব্যাপারে একমত হওয়া। আর দরকষাকষিতে শক্তিশালী পক্ষই সবসময় জিতে, তার উপর ভারত বাংলাদেশ সরকারের কাছে তো জিতারই কথা।

সুতরাং আমাদের ভয় তসলিমা নাসরীনদের কিংবা অধ্যাপকদ্বয়দের অন্তর্ঘাত নয়, ভয় আমাদের সরকারকে। আর আমাদের যেটা ভয়, সেটাই ভারতের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ।

২১-০৮-১৯৯৮

www.icsbook.info

এক সময় সিগারেট খাওয়া ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। মনে পড়ে, কলেজে ভর্তি হবার পর এক বন্ধু আমাকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার মতে সিগারেট হাতে না থাকলে কলেজ ছাত্র হওয়া মানায় না। আজ ইন্টারনেট সেই সিগারেটের মত আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ইন্টারনেট সিগারেট নয়। সিগারেটের টপ টু বটম খারাপ, ক্ষতিকর। কিন্তু ইন্টারনেট একটা সর্বাধুনিক তথ্যমাধ্যম। পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছে এই ইন্টারনেট। অফিসে এবং বাড়ীতে ইন্টারনেটের উপস্থিতি জ্ঞানগত আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আভিজাত্যের প্রতীক এ তথ্যমাধ্যমের সিগারেটের মত প্রাণ সংহারী ক্ষমতা নেই বটে,. কিন্তু গোপনীয়তার পর্দা ধ্বংস এবং তথ্য বিপর্যয় সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এর জাদুকরি ক্ষমতা রয়েছে। ইউএস ইনফরমেশন এজেন্সির স্টাফ লেখক সুসান এলিস জেমস এডামস- এর 'The Next World War' গ্রন্থের আলোচনাকালে জেমস এডাম -এর এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন, "কম্পুটার হলো অস্ত্র এবং এই অস্ত্রের ফ্রন্ট সর্বত্র।" জেমস এডামস কম্পুটারচালিত ইন্টারনেটকে তথ্যযুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ইন্টারনেট নামক এই অস্ত্রের হাত জাতীয় অবকাঠামো, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ইলেক্ট্রিক পাওয়ার গ্রীড, ব্যাংকের কম্পুটার সিস্টেম ইত্যাদি, অচল করে দিচ্ছে এবং এমনকি একজন সৈনিকেরও জীবন নষ্ট না করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় আনছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সর্বাধুনিক ও অচ্ছেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ইন্টারনেট আগ্রাসনের কাছে অসহায়। জেমস এডামস উদাহরণ হিসেবে পেন্টাগনের এক মহড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মহড়ায় একটা কম্পুটার চক্রকে শত্রু শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়, যারা চেষ্টা করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা তথ্য ব্যবস্থাকে অচল করে দিতে। এই কাজে বাজারে সহজলভ্য কম্পুটারের সাহায্য নিয়ে খুব সহজেই ঐ চক্র প্রধান মার্কিন শহরগুলোর পাওয়ার গ্রীড এবং একই সাথে টেলিফোন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনে। মহড়া প্রমাণ করে, মাত্র ৩৫ জন মানুষ সাধারণভাবে প্রাপ্তব্য তথ্য কৌশল ও কম্পুটারের মাধ্যমে মার্কিন প্রতিরক্ষা তথ্য ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটা ঘটতে পারলে দুনিয়ার কারও কোন গোপনীয়তাই (কম্পুটার নির্ভর) নিরাপদ নয়। একে ভয়াবহ এক দুর্যোগ বলে অভিহিত করা যায়।

কিন্তু এই ভয়াবহ দুর্যোগ সামরিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের চাইতে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক ক্ষেত্রের জন্যে বেশী বিপর্যয়কর হতে পারে।

www.icsbook.info

ব্যক্তি পর্যায়ে ইন্টারনেটের অবিশ্বস্ত নেটওয়ার্ক কি ক্ষতি করতে পারে, তার একটা সুন্দর উদাহরণ The Net নামের একটা ফিল্ম। ছবিটির নায়িকা এঞ্জেলা। সে ইনফরমেশন এজ এর প্রজন্ম হিসাবে তার ব্যক্তিগত দলিল-দস্তাবেজসহ সবকিছু কম্পুটারের অফিসিয়াল ফাইলে কোডবদ্ধ করে কম্পুটারের গোপন অন্দরে জমা রেখেছিল। কিন্তু এঞ্জেলা জানতো না বৈরী একটা অপরাধী চক্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে তার প্রতিটি বোতাম টেপাকে ফলো করছিল। অবশেষে তারা এঞ্জেলার গোটা অস্তিত্বকে কম্পুটার থেকে মুছে ফেলে। তারপর এঞ্জেলাকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার উদ্যোগ নেয়।

এটা ছিল সিনেমার একটা কাহিনী। এই কাহিনীই এখন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। যে কারণে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগকেও হুসিয়ারি বিজ্ঞপ্তি দিতে হচ্ছে যে, "Use of this or any other Dept of Defence Interest Computer system (DODICS) constitutes an express consent to monitoring at times ..If monitoring at times .. If monitoring of any DODICS reveals Possible violation of criminal statutes, all relevant information may be provided to law enforcing officials. কিন্তু এই সাবধান বাণী যে মার্কিন প্রতিরক্ষা সিস্টেমের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নয়, তা উপরে মহড়ার দৃষ্টান্তে দেখানো হয়েছে।

ব্যক্তি ও সংগঠনের গোপনীয়তা উন্মোচন করার মাধ্যমে ইন্টারনেট তাদের যে ক্ষতি করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি ইন্টারনেট করতে পারে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে তার সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাত দ্বারা। ফ্রম ইন্টারনেট টু সাইবারস্পেস সিটিজেন নামক নিবন্ধে Ippei Wakabayashi লিখেছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ইন্টারনেট শেখা মানে প্রযুক্তি শেখা। আমরা যদি এটাই মনে করি, তাহলে একটা মূল্যবান বিষয়কে পাশ কাটানো হবে। আজকের শিশুরা আগামীকাল পরিণত ইন্টারনেটের বোদ্ধা হয়ে উঠবে। ইন্টারনেট যখন পরিণত হবে ও অদৃশ্য প্রযুক্তিক অস্তিত্ব লাভ করবে, তখন আজকের শিশুরা কম্পিউটার সংস্কৃতির (cyberspace) প্রাত্যহিক সাথী হয়ে উঠবে।"

এর ফল কি দাঁড়াবে? আজ শিক্ষকরা শিশুদের পড়ান। কিন্তু কাল তারা পড়াবেন ইন্টারনেট কম্পিউটার সংস্কৃতি সজ্জিত নাগরিকদের। এই পরিবর্তন, Wakabayashi এর ভাষায়, সৃষ্টি করবে new social and cultural possibilities and problem for us all.

যে নতুন সংস্কৃতির সম্ভাবনা ও সমস্যার কথা Wakabayashi এখানে বলেছেন সেটা কি ইন্টারনেট তথ্য লেনদেনে স্বাধীনতার সীমান্ত অবারিত করে দেবে? তুলে দেবে মানুষের সংস্কৃতি ও পরিচয়ের (identity) সীমান্ত? তাদের উপর নির্দয়ভাবে

www.icsbook.info

এসে পতিত হবে তথ্যের পাহাড়? তারা অনুপ্রাণীত হবে বিশ্ব বিখ্যাত (?) ব্রাণ্ডের তথ্যাবলি গলধকরণ করতে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার হিসেবে?

এটা স্বাধীনতা বটে ! কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা যেমন একজন অন্ধকে মৃত্যু গহব্বরে ঠেলে দিতে পারে, তেমনি ইন্টারনেট আমাদের শিশু -কিশোরদের ও অপরিণত যুবকদের তথ্য আগ্রাসনের শিকারে পরিণত করে তাদের জাতিগত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। একে Wakabayashi 'প্রাইস অব ফ্রিডোম' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'The price of freedom is expensive for us all. you must be ready to pay the price for freedom, 'অর্থাৎ স্বাধীনতার এইমূল্য আমাদের সকলের জন্যে খুব ব্যয়বহুল। এইমূল্য দিতে আপনাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই মূল্যটা কি তাও Wakabayashi বলে দিয়েছেন। তাঁর মতে cyberservitude in the nearfuture will lead to the collapse of our society itself, (Educom Review July - Aug 97.p - 53) অর্থাৎ ইন্টারনেট কম্পিউটার-সংস্কৃতি নিকট ভবিষ্যতে খোদ আমাদের সমাজকেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

পশ্চিমের তথ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট তথ্য মাধ্যমের এই ভূমিকা তথ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত স্বীকৃত তথ্যনীতির সম্পূর্ণ খেলাফ। উন্নয়নশীল ও তৃতীয় বিশ্বের জন্যে অনুকূল ম্যাক ব্রাইড কমিশন প্রণীত রিপোর্ট বাতিল করার পর 'মেনি ভয়েসেস ওয়ান ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক ৩১২ পৃষ্ঠার নয়া তথ্য ব্যবস্থার উপর যে নতুন রিপোর্ট ইউনেস্কো' প্রণয়ন করেছে, তাতে উন্নত দেশের তথ্য ও সংস্কৃতি সামগ্রীতে ভোক্তা দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর এবং ভোক্তা দেশের আইন মেনে চলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।' সন্দেহ নেই, এই কথাগুলো রেডিও টিভি, নিউজ এজেন্সী ও নিউজ পেপারের ভূমিকার সাথেই মিলে বেশী। তবু ইন্টারনেট আধুনিক বিশ্বের বিপ্লবাত্মক তথ্য মাধ্যম হিসেবে এও তথ্য নীতিমালার আওতায় আসে।

ইন্টারনেট সম্পর্কে এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে উদ্বেগের চাইতে বিস্ময়বোধ হচ্ছে বেশী। ইন্টারনেটের মত একটা অতি জরুরী যোগাযোগ মাধ্যমকে আমরা সামাজিক সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত করছি, যেমন পরমাণুর উত্তাপ দিয়ে বানিয়েছি আমরা আণবিক বোমা।

তবে আমি হতাশ নই। ম্যাটার ও এ্যান্টি ম্যাটারের এই পৃথিবীতে অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মত সামাজিক ব্যাধির পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধও স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে থাকে। এই প্রতিরোধের কাছে সামাজিক এই মওসুমী ব্যাধি একদিন চলে যাবেই। কিন্তু ইতিমধ্যে যে মূল্য দিতে হবে সেটাই উদ্বেগের বিষয়। এই উদ্বেগের শিকার যেন আমরা না হই, তারই ব্যবস্থা আজ হওয়া দরকার।

০৪-০৯-১৯৯৮

www.icsbook.info

আকাশ দখলের যুদ্ধ এবং তারপর

আকাশ দখলের তীব্র যুদ্ধ চলছে আজ। রেডিও টেলিভিশন বিশেষ করে টেলিভিশন ব্যাণ্ড এই যুদ্ধে প্রাণপণজড়িয়ে পড়েছে। এই যুদ্ধের বয়স খুব বেশী না হলেও বলা যায়, যুদ্ধ ইতিমধ্যেই ঘোরতর হয়ে উঠেছে।

রাজ্য জয়ে প্রথম বড় ধরনের অভিযান শুরু করে সিএন এন। বাংলাদেশের মত গরীব দেশেও সিএনএন এসে হাজির হয়। বিনা পয়সায়। প্রতিদিন শেষ বিকেলের আগে বিটিভির কোন প্রোগ্রাম থাকে না, খালি থাকে বাংলাদেশের আকাশ। সি এন এন এই খালি সময়ের একটা বড় অংশ দখল করে নেয়। শুরু করে বিনা পয়সায় প্রোগ্রাম প্রচার। ব্যাপারটা বাজার সৃষ্টির অগ্র ব্যবস্থা হিসেবে স্যাম্পুল বিতরণের মতই। যেমন এ দেশে বিড়ি -সিগারেট প্রচলনের আগে বিনা পয়সায় এসব ছড়িয়ে মানুষের অভ্যাস সৃষ্টি করা হয়। তারপর শুরু হয় পকেট কাটা।

সি এন এন-এর পরপরই আকাশ দখলের প্রতিযোগিতায় অবর্তীণ হয় বিবিসি টেলিভিশন। এই প্রতিযোগিতার মুখে সংকটে পড়ে বাংলাদেশের মত দুর্বল দেশ। কাকে রাখবে, কাকে সে ছাড়বে! অবশেষে বাংলাদেশের আকাশ ভাগ-বণ্টন করা হয়। বিবিসিকে দেয়া হয় সকাল ৭টা থেকে ৮টা এবং বিকেল ২টা থেকে সাড়ে ৪টা। আর সিএনএনকে দেয়া হয় সকাল ৮টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা। দ্বন্দ্বমান দুই প্রতিযোগীকে সমান সমান ভাগ দিয়ে উভয়কেই সন্তুষ্ট করা হয়। জাপান ও জার্মানের মত অর্থনৈতিক পরাশক্তি এইভাবে দেশ জয়ে এখনও বের হয়নি। বের হলে ভাগটা আবার কেমন হবে জানি না।

আকাশ দখলের এই প্রতিযোগিতার আরেকটা চিত্রও আমাদের সামনে আছে। এই প্রতিতেযাগিতা আঞ্চলিক ধরনের। সিএনএন ও বিবিসি টেলিভিশনের মত বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে এরা নয়। উদাহরণ হিসেবে স্টার টিভি'-এর সাথে এমটিভির প্রতিযোগিতার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এ দুটি টেলিভিশন ব্যান্ড সাড়ম্বর আয়োজন নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতায় নামছে। এতদিন এমটিভি কে স্টার টিভির স্ক্রিনেই দেখা যেত। কিন্তু এখন তারা বিচ্ছিন্ন এবং একে অপরের প্রতিযোগীতে পরিণত হয়েছে। ষ্টার টিভি Channel V চালু করেছে MTV -এর বিকল্প হিসেবে। অন্যদিকে এমটিভি সিংগাপুরকে ভিত্তি করে স্বাধীনভাবে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। ষ্টার টিভি এবং এমটিভি দুইটি ব্যান্ডেরই প্রধান লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ার বাজার দখল।

www.icsbook.info

ভারতও এখন ছোট-খাট পরাশক্তি হবার দাবীদার। তার মাটি থেকে ও বেসরকারী সেক্টরকে আশ্রয় করে টেলিভিশন ব্যান্ড সাম্রাজ্য না হলেও রাজ্য বিস্তারের মহড়া জোরোশোরে শুরু করে দিয়েছে। উদাহরণ জিটিভি। এই টিভি ব্যান্ডটি তাদের বিনোদন নির্ভর ফ্রি স্টাইল প্রোগ্রাম দ্বারা বাংলাদেশের আকাশ দখলের চেষ্টা করছে। তারা বাংলাদেশের শিল্পীদের হাত করে বাংলা ভাষায় প্রোগ্রাম প্রচারের আয়োজনও নাকি করে ফেলেছে।

সব মিলিয়ে আমাদের আকাশ আজ বহুমুখী ভাগ-বাটোয়ারার শিকার। শুধু আমাদের আকাশ নয়, গোটা দুনিয়ার আকাশই আজ এই প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। এই প্রতিযোগিতার মুখে সবদেশেই জাতীয় টেলিভিশন দু রকম বিপদের সম্মুখীন। প্রথম বিপদ হলো প্রবেশ বা অনুপ্রবেশকারী টেলিভিশন ব্যান্ডের ফ্রি স্টাইল প্রোগ্রামের সাথে লড়ায়ে জাতীয় নীতি ও মূল্যবোধ নির্ভর জাতীয় টেলিভিশন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরাজিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত প্রতিযোগিতার টিকে থাকার জন্যে বৈরী ও বিকৃত টিভি সংস্কৃতির অনুসরণ করতে গিয়ে জাতীয় টেলিভিশন নিজের রূপ পাল্টাচ্ছে এবং নিজেকে বিকৃত করে তুলছে। এই দ্বিতীয় বিষয়টিই বেশী বিপজ্জক। এই বিপজ্জনক পথে জাতীয় টেলিভিশনকে ঠেলে দেবার জন্যে পঞ্চম বাহিনীরা খুবই সক্রিয়। বাংলাদেশে এখন এদের খুবই সক্রিয় দেখা যাচ্ছে। এদের বক্তব্যের সার কথা হলো, বিটিভি বিদেশী ব্যান্ডের তুলনায় দারুণ আন -পপুলার। একে পপুলার হবার জন্যে জিটিভি, এমটিভি, ইত্যাদির মত বাহারী সব প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। বিটিভি কর্তৃপক্ষ কি ভাবছেন জানি না। তবে এসব পরামর্শ মেনে কষ্ট করে বিটিভির বিদেশীকরণ বা বিজাতীয়করণ করার চাইতে সহজ পথে সিএন এন, বিবিসি জিটিভি স্টার, টিভি ইত্যাদির কাছে আমাদের আকাশটাকে ভাড়া দিয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়। ল্যাটা অবশ্যই চুকে যেত যদি ভাড়া দেয়া -নেয়ার মত অর্থকরী কিছু বিষয়ের মধ্যেই ব্যাপারটা সীমিত থাকতো।

কিন্তু তা থাকছে না। আকাশ দখল শুধু আকাশ দখল নয়, আকাশ দখল আসলে সংস্কৃতি দখল, অর্থনীতি দখল এবং রাজনীতি দখলও। কেউ কেউ এ বিষয়টিকে আমল না দিয়ে বলতে চান, বিনোদন ও সংবাদ মাধ্যমকে এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত টেনে আনা ঠিক নয়, রাজনৈতিক মতলব খোঁজা এর মধ্যে অন্যায়। এই ধরনের চিন্তা আসলে সমস্যার অবাস্তব সরলীকরণেরই ফল। যারা এই ধরনের চিন্তা করেন, তাঁরা সম্ভবত ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমস্যাকে একেবারেই সমাধিস্ত করেছেন এবং মনে করছেন যে, সেই সংঘাত আর ফিরে আসবে না। এই ধারণা থেকেই তারা মনে করছেন, পরাশক্তিদের রাজনীতি এবং সংবাদ মাধ্যমের মধ্যকার আঁতাতের সেই দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্ব ঘটনা প্রবাহের আন্তর্জাতিক সমীক্ষকরা এই ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিচ্ছেন। একজন সমীক্ষক লিখছেন, "During the last four decades the mainstream of International and national, media were

www.icsbook.info

instrumets in globalising the cold war অর্থাৎ গত চার যুগ ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রধান শক্তিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বর্তমান পরিস্থিতির দিকে অংগুলি সংকেত করে বলছেন, There is no guarantee that in the emerging world order the stand of the two centres, the media and the majore Power, will be fundamentally different অর্থাৎ বিকাশমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সংবাদ মাধ্যম এবং পরাশক্তিদের অবস্থান ভিন্নতর হবে, একথা বলা যাবে না।

কেন বলা যাবে না তার সংগত কারণও রয়েছে। আজকের সংবাদ ও তথ্য মাধ্যম সাংস্কৃতিক লড়াইটাই দৃশ্যমান মূখ্য বিষয়। একজন পশ্চিম দেশীয় সমীক্ষকের ভাষায়, "Cultural forces has come into play globally, The ideological religious and spiritual struggle of the last decades highlight both urgency and deapth of cultural clashes in international relations অর্থাৎ সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী সক্রিয় একটা বিষয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দশক গুলোতে আধ্যাত্মিকতার সংগ্রাম সাংস্কৃতিক সংঘাতের গুরুত্ব ও গভীরতাকেই জলন্ত করে তোলে।' অনেকে বলতে চান। সংবাদ ও তথ্য মাধ্যমগুলো জ্ঞান ও বিনোদনের নির্দেষ মাধ্যম। এরা সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ অথবা সব সাংস্কৃতিকেই তুলে ধরে। সুতরাং এদের পলিসি-প্রোগ্রামের মধ্যে কোন মতলব খোঁজা ঠিক নয়। এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে উক্ত সমীক্ষক বলছেন, "The notion that information media and Communication are culturally neutral is the greatest myth of our time" অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যম সাংস্কৃতিকভাবে নিরপেক্ষ, এই ধারণা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় কল্পকথা।

সুতরাং ল্যাটা চুকে যাচ্ছে না। আমরা আমাদের আকাশকে সিএনএন, বিবিসি, স্টার টিভি, এমটিভি জিটিভি ইত্যাদির হাতে তুলে দিয়ে হাত পা মুড়ে বসে থাকতে পারছি না। তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যম শুধু যে নিরপেক্ষ নয় তা নয়, সাংঘাতিক ধরনের মতলববাজ পক্ষও। বিশেষ উদ্দেশ্যে তথ্য বিকৃতি এবং জঘন্য স্বার্থ প্রণোদিত অনুষ্ঠান প্রচার এদের প্রতিদিনের কর্মসূচী। কিছুদিন আগে বিবিসি টেলিভিশনে ভারতের মিজোরামকে খৃস্টান স্টেট' বলে উল্লেখ করা হলো। মিজোরামে খৃস্টান প্রবেশের একশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রচারিত বিশেষ অনুষ্ঠানে এই ধরনের উদ্দেশ্যমূলক কথা বলা হয়। সাম্রাজ্য বিস্তারকামী তথ্য মাধ্যমগুলোতে আমাদের অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জীবন ও সমাজ থেকে ত্রুটি -বিচ্যুতিমূলক কাহিনীকেই শুধু তুলে ধরা হয়, ভাল কোন জিনিস নয়। জাতীয় মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে হতাশা সৃষ্টি করে পশ্চিমী জীবন পদ্ধতির প্রতি আগ্রহী করে তোলাই এর লক্ষ্য। অন্যদিকে পশ্চিমী সমাজ ও জীবনের ত্রুটি -বিচ্যুতি, অন্ধকার ও ক্লেদাক্ত দিককে সযতনে ঢেকে রাখা হয়।

www.icsbook.info

তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষেত্রে এশিয়া -আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলো পিছিয়ে থাকা এবং সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণেই পশ্চিমী তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যম শোষণ ও আগ্রাসনের এই বিরাট সুযোগ পেয়ে গেছে।

পশ্চিমের এই শোষণ-আগ্রাসন বন্ধের জন্যেই প্রায় দুই যুগ আগে ম্যাকব্রাইড কমিশন 'নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন এণ্ড কম্যুনিকেশন অর্ডার' (NWICO) -এর প্রস্তাব করেছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমঝোতা নিশ্চিত করার জন্যে তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে একটা নতুন, ন্যায্য ও কার্যকরী ইনফরমেশন অর্ডার প্রস্তাব করার জন্যে এই কমিশন নিয়োগ করা হয়। ম্যাকব্রাইড কমিশন দীর্ঘ অনুসন্ধান ও বিবেচনার পর নিম্নলিখিত ধরনের সুপারিশ পেশ করেছিল ঃ

(ক) রেডিও ওয়েভব্যান্ড বরাদ্দের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা (খ) উপগ্রহ ব্যবস্থার যুক্তিযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন, (গ) উন্নয়নশীল দেশে সংবাদ সরবরাহের জন্যে হ্রাসকৃত টেরিফ ব্যবস্থা (ঘ) উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে তথ্য প্রযুক্তির হস্তান্তর, (ঙ) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং (চ) এসব লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্যে বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা।

ম্যাকব্রাইড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হবার সাথে সাথে পশ্চিমা দুনিয়ায় হাহাকার পড়ে যায়। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠে পশ্চিমা দুনিয়া থেকে। তারা এই রিপোর্টকে নিছক গালগল্প বলে অভিহিত করে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল বিশ্ব ম্যাক ব্রাইড কমিশন রিপোর্টকে 'তথ্য সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তি পর্বের যাত্রা শুরুর দলিল' বলে আখ্যায়িত করে।

কিন্তু এই দুই পক্ষের সংঘাতে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমীরা জিতে যায়। সত্যই বহু আশার ম্যাকব্রাইড কমিশন রিপোর্টকে গাল-গল্পে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ ছেঁড়া কাগজের মতই একে ফেলে দেয়া হয় ডাস্টবিনে। মিথ্যা হয়ে যায় তথ্য সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তি পর্বের যাত্রা শুরুর আশাবাদ, যা উন্নয়নশীল বিশ্ব করেছিল।

তথ্য সাম্রাজ্যবাদ আজ নতুন শক্তি, নতুন মন্ত্র নিয়ে জেঁকে বসেছে উন্নয়নশীল বিশ্বের বুকের উপর। ম্যাকব্রাইড কমিশন যখন রিপোর্ট তৈরি করেন, তখন পশ্চিমের ব্রড কাস্টিং কোম্পানীগুলো রেডিও ওয়েভ ব্যান্ডের শতকরা ৯০ ভাগ দখল করেছিল। সেটা ছিল শুধু রেডিও -এর ক্ষেত্রে। তখনও পশ্চিমের টেলিভিশন ওয়েভ ব্যান্ড তার বিশ্ব জয়ের যাত্রা শুরু করেনি। কিন্তু আজ পশ্চিমের টেলিভিশন গোটা দুনিয়াই দখল করে নিয়েছে এ নামে কিংবা সে নামে। ম্যাকব্রাইডের সময় পশ্চিমের নিউজ এজেন্সিগুলো মোট তথ্যের শতকরা ৮০ ভাগ সরবরাহ করতো। এখন সেটা আরও বেড়েছে। অসম যুদ্ধ এবং পশ্চিমী ষড়যন্ত্রের কারণে পশ্চিমী এই তথ্য আগ্রাসনের মুখে উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় রেডিও জাতীয় টেলিভিশন, জাতীয় সংবাদ সংস্থা এবং

www.icsbook.info

জাতীয় সংবাদপত্র সবই মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর শুধু আকাশ নয়, মনের উপরও দখল প্রতিষ্ঠা হচ্ছে পশ্চিমের। ম্যাকব্রাইডের নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন অর্ডার -এখন পশ্চিমের কাছে হাসির বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে কোন কার্যকরী উদ্যোগ আমরা দেখছি না। ১৯৮৮ সালে ওআইসি কর্তৃক আহূত মুসলিম দেশগুলোর তথ্যমন্ত্রীদের জেদ্দা সম্মেলন 'কমিটি অব এক্সপার্ট অন ইনফরমেশন স্ট্যাটেজী' নামে একটা কমিটি গঠন করেছিল। যার উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল 'ইসলামিক ইনফরমেশন স্ট্রাটেজী' এবং 'ইসলামিক ইনফরমেশন প্ল্যান এন্ড ইটস মডিফিকেশন' এর উপর পূর্ণাঙ্গ একটা সুপারিশ পেশ করার জন্যে। পড়েছিলাম, এই কমিটি' তথ্য ক্ষেত্রে ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা' এবং ইসলামিক ইনফরমেশন চার্টার অব অনার' বিষয়ে মূল্যবান কিছু সুপারিশও পেশ করেছিল। কিন্তু ফলাফল কি হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জানা যাচ্ছে না।

এ বছরের শুরুর দিকে কাঠমণ্ডুতে অনুষ্ঠিত প্রেস কাউন্সিলসমূহের রিজিওনাল মিটিং-এ ট্রান্স ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং -এর দৃশ্যমান ক্ষতিকর দিকগুলোর ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্যে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু কে শুনবে এই আবেদন? কে করবে এই আবেদনের বাস্তবায়ন? মুক্ত বাজার অর্থনীতির জন্যে যেমন আমাদের সীমান্ত আমরা খুলে দিয়েছি, তেমনি তথ্যের ক্ষেত্রেও আমরা মুক্ত বাজার তথ্যনীতি অনুসরণ করছি। আমাদের আকাশ আমরা ছেড়ে দিয়েছি সিএনএন, বিবিসির জন্যে। আরও যারা আসবে, তাদেরকেও আমরা আগু বাড়াব।

এই আকাশ জয়ের যুদ্ধের সাথে মুক্ত বাজার অর্থ যুদ্ধের সম্পর্ক আছে এবং এ দুয়ের সাথে যোগ রয়েছে পশ্চিমের রাজনৈতিক যুদ্ধেরও। কে কার সহযোগী আমি জানি না। তবে আমার মতে এই তিনে মিলে এক এবং এই 'একক' এর নাম 'মুক্ত বাজার রাজনীতি'। এই নাম এখনও উচ্চারিত হয়নি। তবে মুক্ত বাজার তথ্যনীতি এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি একদিন মুক্ত বাজার রাজনীতি' এর মধ্যে লীন হয়ে যাবে। অনাগত সেই দুঃসময়ে জাতীয় রাজনৈতিক দল, জাতীয় রাজনীতি জাতীয় সরকার সবই মুখ থুবড়ে পড়বে মুক্ত বাজার রাজনীতির কাছে যেমন আজ মুখ থুবড়ে পড়ছে জাতীয় শিল্প -কারখানা মুক্ত বাজার অর্থনীতির কাছে এবং জাতীয় তথ্য মাধ্যম মুখ থুবড়ে পড়ছে মুক্ত বাজার তথ্যনীতির কাছে।

০১-১১-১৯৯৪

www.icsbook.info

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন ধর্মহীনতার যৌবনকাল সেই সময় পঞ্চাশের দশকে রাশিয়ার একজন শীর্ষ বুদ্ধিজীবী ছদ্মনামে লিখা 'রাশিয়ার ভাগ্য' এই শিরোনামের এক নিবন্ধে বলেছিলেন, "খৃস্টান ধর্মে ফিরে যাবার মধ্যেই রাশিয়ার উত্থান নির্ভর করছে।" সেই সময় এক ঔপন্যাসিকও বলেছিলেন, অব্যাহত যে জনস্রোত রেড স্কোয়ারে লেনিনের মাযারে যাচ্ছে আজ, সে জনস্রোত একটু সুযোগ পেলেই মুখ ঘুরিয়ে বেথেলহেমের দিকে যাত্রা শুরু করবে।' ঘটনা তাই ঘটেছে সেখানে। প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভের দেয়া গ্লাসনষ্ট ও পেরোস্ত্রয়কার সুযোগে রাশিয়ার মানুষ ধর্মহীনতাকে উপড়ে ফেলে ফিরে গেছে আবার চার্চে। রশিয়ার চার্চ আজ সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত এবং অনেক বেশি শক্তিশালী।

শুধু রাশিয়ায় নয়, খৃস্ট ধর্ম ঝড়ের বেগে মাথা তুলতে চাচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ গোটা দুনিয়ায়। খৃস্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারের আয়োজন দেখলে মনে হয়, অদৃশ্য এক বিশ্ব রাষ্ট্র যেন আজ তারা পরিচালনা করছে। খৃস্টান চার্চের হাতে আজ সম্পদের পরিমাণ কমপক্ষে ১৪৫ বিলিয়ন ডলার। ৪১ লাখ সার্বক্ষণিক খৃস্টান কর্মী কাজ করছে গোটা দুনিয়ায়। তাদের রয়েছে ১৩ হাজার বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী, ১৮শ' রেডিও এবং টিভি স্টেশন এবং ৩০ লাখ কম্পিউটার। তারা প্রতি বছর ২২ হাজার শিরোনামের সাময়িকী এবং ১০ হাজার নতুন শিরোনামের বই প্রকাশ করছে। ধর্ম প্রচারকদের ভাতা বাবদই শুধু তারা খরচ করছে ৮ বিলিয়ন ডলার প্রতিবছর। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল যে তারা কত চালাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

বৌদ্ধরাও ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। তারা দাবী করছে তারা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় শক্তি। মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল অঞ্চল জুড়ে তাদের বাস। বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিতে একটা সার্বিক ঐক্য গড়ার তারা চেষ্টা করছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও নিজেদের তারা দুনিয়ার সবচাইতে অগ্রসর শক্তি বলে মনে করছে। আদর্শ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তারা দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিতে পারে বলে তারা আধুনিক জাপানের সর্বাধুনিক দার্শনিক তাকেশী উমেহারা বলছেন, প্রাচ্য দেশীয় কোন জীবন বিধানই পারে বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করতে। তার মতে, সে জীবন বিধানটি হলো 'জাপানি সভ্যতার সাথে যুক্ত কনফুসীয় ও বৌদ্ধ মতবাদের এক সমন্বিত ধারণা। এইভাবে বৌদ্ধ ধর্ম এক আদর্শিক শক্তি হিসেবে নিজের উত্থান ঘটাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উত্থানের এই মঞ্চে ইসলামের পদচারণা আরও দ্রুততর । প্রতিটি মুসলিম দেশে এবং বিশ্বের সব জায়গায় ইসলামী পুনর্জাগরণের ঢেউ

www.icsbook.info

সবকিছুকেই ছাপিয়ে উঠতে চাচ্ছে। মিলিট্যান্ট ইসলাম, মৌলবাদের উত্থান, ইত্যাদি বলে একে একটা কদর্য রূপ দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু যাই বলা হোক, সগৌরবে ও সমূর্তিতে আজ ইসলামের পুনরুত্থান ঘটছে এটাই বাস্তবতা। H. Haddad-এর মতে মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন, "ইসলাম উৎকৃষ্টতর একক এক বিশ্বব্যবস্থার আস্থাশীল রূপরেখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ইসলামী সাহিত্য, তার ভাষা এবং বিষয় সব দিক থেকেই আধুনিক যা সাংঘাতিকভাবে বিশ শতকের। যারা ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের গাল দেয় এবং তাদেরকে অন্ধকার যুগ মধ্যযুগ অথবা সপ্তম শতকের মানুষ বলে অভিহিত করে, তারা আধুনিক জীবনে ধর্মের সাযুজ্যতা ধরতে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হন অথবা ইসলামের বিভিন্ন মতবাদের অর্থ ও বিষয়ে যে উৎকর্ষতা এসেছে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই উপেক্ষা করেন।" পাশ্চাত্যের আরেকজন সমাজ বিজ্ঞানী বরীন বাইট বলছেন, "বিশ্বব্যাপী ইসলামের উত্থান আজকের স্বাভাবিক বিশ্ব প্রবণতার অংশ। ইসলামের এই উত্থান ঘটেছে তার ধর্ম ও রাজনীতির স্বাভাবিক ও অবিমিশ্র মতবাদিক শক্তির কারণেই। এই শক্তির বলেই ইসলাম বিশ শতকের শেষে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শিক শক্তির একটিতে পরিণত হতে যাচ্ছে।"

অনুরূপভাবে বিশ্বে আজ হিন্দু, ইহুদীসহ অন্যান্য ধর্মেরও উত্থান ঘটছে। এসব ধর্মের অনুসারীরা আজ নতুন করে তাদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে এবং সেখান থেকে নতুন শক্তি সঞ্চয় করে জাতীয় শক্তিকে নতুনভাবে বিকশিত করতে চাইছে।

বিভিন্ন ধর্মের উত্থান সম্পর্কে উপরের আমার আলোচনা এই কথা বলার জন্যে যে, অষ্টাদশ শতকের শেষে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব ও রেনেসাঁর প্রাক্কালে উদার নৈতিকতাবাদের আড়ালে যে ধর্মনিরক্ষেতা ও ধর্মহীনতার যাত্রা শুরু হয়েছিল, বিশ শতকের শেষে এসে মাত্র ২শ' বছরের মধ্যে তার দিন আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। উদার নৈতিকতাবাদ সেদিন বস্তুবাদের আলখেল্লা গায়ে জড়িয়ে বলেছিল, ধর্ম শুধু নয়, ঈশ্বর সমেত যা দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না এমন কোন অস্তিত্ব আমরা মানি না। এইভাবে সেদিন খৃস্টান চার্চের স্বেচ্ছাচারিতা ও বাড়াবাড়ির মোকাবিলা করতে গিয়ে ধর্মকেই তারা উৎখাত করেছিল সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে। ধর্মীয় বাড়াবাড়ির মোকাবিলায় এই নতুন বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে সময়ই এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন, "যুক্তি মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তবে যক্তিবাদের শক্তি যত বেশিই হোক না কেন, এটা সীমাহীন নয়। মানুষের জানা দরকার, এ অনন্ত বিশ্বে শান্ত প্রাণী হিসেবে তার সবটা সে কখনও জানতে পারবে না (উদারনীতিকরা ভাবতো যে, মানুষের সকল সমস্যারই সমাধান তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেছে) সব জেনে ফেলার দাবী যুক্তিবাদী মানুষের ক্ষমতার বিপজ্জনক অতিরঞ্জন। .... যুক্তি হলো কাহিনীর অর্ধাংশ মাত্র। .... মানুষকে তার নিজের উপর ছেড়ে দিলে অদম্য প্রবৃত্তির বশে জীবন তার দুঃখময় হয়ে উঠবে এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে নিজের ও অন্যদের ধ্বংস করবে। মানুষকে তার নিজের উপর ছেড়ে দিলে সে পশুর অধম হয়ে পড়বে।"

www.icsbook.info

বার্কের কথা সত্য হয়েছে। হৃদয়হীন যুক্তিবাদ (বস্তুবাদ) মানুষকে আজ পশুর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সেদিন একটা খবরে পড়লাম, পশ্চিমী একটি দেশে ক্রমবর্ধমান ধর্ষিতার যে হার, তার ১৬ শতাংশের বয়স ১২ বছরের কম এবং এদের ৫ শতাংশ আবার তাদের পিতার দ্বারা আক্রান্ত। মানুষ পশুর পর্যায়ে নেমে যাওয়ারই এটা একটা প্রমাণ। আধুনিক সমাজের এই অধঃপতন ও উদার নৈতিকতাবাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং জাপানের 'ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর জাপানিজ স্টাডিজ'-এর ডাইরেক্টর তাকেশী উমেহারা বলছেন, "আধুনিকতা নীতিগতভাবে আজ শেষ হয়ে গেছে। ফলশ্রুতি হিসেবে আধুনিকতার উপর ভিত্তি করে যে সমাজ বিনির্মিত হয়েছে তারও ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ। আধুনিক সমাজেরই একটা অংশ মার্ক্সবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা পশ্চিমী উদার নৈতিকতাবাদেরও মৃত্যু ঘণ্টা ধ্বনিত করেছে। কথিত ইতিহাসের সমাপ্তি পর্বে ব্যর্থ মার্ক্সবাদ ও অন্যান্য আদর্শের বিকল্প হওয়ায় অনুপযুক্ত উদার নৈতিকতাবাদের পতন পরবর্তী ইস্যু হিসেবে সামনে আসছে। বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে আধুনিকতা ফুরিয়ে গেছে এবং এমনকি এখন তা আজ মানবতার জন্যে বিপজ্জনক।"

এই অবস্থায় মানুষ হিসেবে বাঁচার একমাত্র বিকল্প হিসেবে মানুষ দ্রুত ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করে ধর্মের দিকে ফিরে আসছে। বিশ্বব্যাপী আজ ধর্মের উত্থান এ কারণেই ঘটছে। ধর্মের দিকে মানুষের এই প্রত্যাবর্তনই আজ বিশ্বমানবের জন্যে প্রগতিশীলতা, যা মানুষের জন্যে সব সময় প্রগতিশীলতাই ছিল। যদিও মাঝে মাঝে শয়তানী শক্তি, ধর্মবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলতাকে প্রগতিশীলতা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

উদার নৈতিকতাবাদের তথাকথিত 'আধুনিকতা' আজ ধ্বংস হতে চললেও এর ধ্বংসাবশেষ অনেকদিন মানুষকে যন্ত্রণা দিয়ে চলবে। বিশেষ করে প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। কারণ পশ্চিমের অচল হয়ে পড়া আইডিয়া বা আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকার মত মুর্খ লোক এসব দেশে কিছু পরিমাণে সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের আহমদ শরীফ, কবির চৌধুরী, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ এই মূর্খদেরই অন্তর্ভুক্ত। তথাকথিত উদার নৈতিকতাবাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টায় বিশ্বব্যাপী মানুষ যখন ধর্মে ফিরে আসছে ঝড়ের গতিতে, তখন এই মূর্খরা বস্তাপচা দুর্গন্ধময় ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতাকে আঁকড়ে ধরে ধর্মীয় উত্থানবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠকে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাচ্ছে। বাংলাদেশে মৌলবাদ তথা ইসলামের উত্থান রোধের জন্য তারা সবাই মিলে গলদঘর্ম প্রচেষ্টায় রত হয়েছে। স্রোতের বিপরীতে চলতে গিয়ে তারা নাস্তানাবুদও কম হচ্ছে না। গত ৩০শে জুন ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আহূত হরতাল তারা প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছিল, কিন্তু যখন দেখলো অবস্থা বেগতিক, হরতাল প্রতিরোধের জন্যে মাঠে

www.icsbook.info

নামলে জনগণ কাউকে আস্ত রাখবে না, তখন তারাই মৌলবাদের প্রতিবাদে ঐ দিন হরতাল আহ্বান করলো। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলতে লাগল যে, তারা কুরআন ও ধর্মের পক্ষের শক্তি। তাদের নিরুপায় এই দুর্দশা দেখে মানুষ হেসেছে এবং বলেছে, পতনের পংকে ডুবে যাবার আগে মানুষ এমনভাবেই আবোল-তাবোল হাত-পা ছুঁড়ে থাকে।

কিন্তু এইভাবে হাত-পা ছুঁড়ে তারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার পতন এবং ধর্মের অবশ্যম্ভাবী উত্থান রোধ করতে পারবে না। বাংলাদেশে ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং ইসলামের উত্থানবাদী শক্তিকে তারা এখন সব দল ও সবাই মিলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসছে যখন ধর্মদ্রোহী বা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি সবাই এক সাথে হয়েও আর দাঁড়াতে পারবে না। অবশ্যম্ভাবী এ পতনের দিকেই তারা এগুচ্ছে।

কবির চৌধুরী ও আহমদ শরীফদের বড় অবলম্বন হলো রাষ্ট্র শক্তির সহায়তা। ধর্মনিরপেক্ষ বা সুবিধাবাদী রাষ্ট্রশক্তি তাদেরকে সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ সহযোগিতা নিয়েও তাদের শেষ রক্ষা হচ্ছে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে তুরস্কের কথাই ধরা যাক।

মোস্তফা কামাল ১৭ বার সামরিক আইন জারির আশ্রয় নিয়ে তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করেন। তুরস্কের শাসনতন্ত্র শুধু ধর্মনিরপেক্ষ নয়, ধর্মীয় উত্থান প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণেই ইসলামী আদর্শবাদী দলের রাজনীতি সেখানে বার বার বাধাগ্রস্ত হয়ে এসেছে। ইসলামী দলকে সেখানে সরকারী হুকুমে বার বার নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করতে হয়েছে। সে সব দলের নেতা ও কর্মীরা বার বার জেল-জুলুমের শিকার হয়েছে। এর পরও যখনি দেখা গেছে দেশ ইসলামী আদর্শবাদের দিকে যাচ্ছে, তখনই সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করতে চেয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও দেখা যাচ্ছে, ইসলামের প্রভাব সেখানে অবিশ্বাস্যভাবে বাড়ছে। তুরস্কের ইসলামী দল আজকের রেফাহ পার্টি তুরস্কের বিগত সাধারণ নির্বাচনে পেয়েছিল শতকরা ১৬ ভাগ ভোট, আর বিজয়ী সরকারী দল পেয়েছিল শতকরা ৩১ ভাগ ভোট। উল্লেখ্য, ঐ ইসলামী দলটিকে ইতিপূর্বে অনেক বার নাম পরিবর্তন করাসহ বিভিন্ন রকম বিধিনিষেধের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এ সবের লক্ষ্য, তারা যাতে জনগণের কাছে ঠিকভাবে যেতে না পারে এবং জনগণকে তাদের কথা বলার সুযোগ না পায়। এর পরেও এই দলের অগ্রগতি রোধ করতে পারছে না সেখানকার সকল শক্তির অধিকারী ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা। সাধারণ নির্বাচনের বছর দুই পর কয়েকদিন আগে সেখানে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হয়ে গেছে। সে নির্বাচনে সরকারী দল টুপাথ পার্টি পেয়েছে শতকরা ২৩ ভাগ ভোট, প্রধান বিরোধী দল মাদারল্যাণ্ড পার্টি পেয়েছে শতকরা ১৯ ভাগ এবং এসলামী দল বেফাহ পার্টিও

www.icsbook.info

পেয়েছে ১৯ ভাগ ভোট। সবচেয়ে বড় কথা হলো শহরাঞ্চলে রেফাহ পার্টি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। রেফাহ্ পার্টি ২৮টি শহরের মেয়র পদে জয়ী হয়েছে। আর সরকারী পার্টি ও প্রধান বিরোধী দল পেয়েছে যথাক্রমে ১৪ ও ১২টি মেয়র পদ। তুরস্কে আধুনিকতার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র রাজধানী আংকারা এবং সাবেক রাজধানী ইস্তাম্বুলের মেয়র পদ দু'টিকে দখল করেছে রেফাহ্ পার্টি। দুই রাজধানীর মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছে রেফাহ্ পার্টির লোক। তথাকথিত আধুনিকতার পতন ঘটছে এবং ধর্মের যে সেখানে আবির্ভাব ঘটছে, রাজধানীসহ প্রধান শহরগুলোতে ইসলামের জয় তারই প্রমাণ। আলজিরিয়ার সাধারণ নির্বাচনে ইসলাম পন্থী দল ভোট পেয়েছিল শতকরা ৮০ ভাগ এবং সরকারী দল পেয়েছিল মাত্র ১০ ভাগ, এ কথা আমরা সকলেই জানি। বস্তুত মুসলিম দেশগুলোতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এ ফলই সব জায়গায় হবে।

বিশ্বব্যাপী ধর্মের পুনরুত্থানেরই এটা প্রমাণ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা ধর্মহীনতার পুরাতন ও মরচে ধরা অস্ত্র দিয়ে ধর্মের এই স্বাভাবিক উত্থানকে রোধ করা যাবে না। উদার নৈতিকতাবাদের পোশাকে, বাস্তুবাদভিত্তিক যুক্তিবাদ, যা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার একটি উৎস, দু'শ বছর যে টিকেছিল এই-ই বেশি। সে সময়টা দুর্ভাগ্যক্রমে ছিল ইসলামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের কাল এবং সে সময় খৃষ্টান ধর্মের নামে শত শত বছরব্যাপী জুলুম-নির্যাতন, শোষণ- পেষণ এবং চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ-বিতৃষ্ণা পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। এসব কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা আসন গাড়ার সুযোগ পেয়েছিল ইউরোপে এবং ইউরোপ থেকে তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মাথায় ভর করে ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দুনিয়ায়। সে সময়টা ইসলামের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক পতনকাল যদি না হতো, যদি স্পেনে প্রজ্জলিত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীপ-শিখা নির্বাপিত না হয়ে অগ্রসর হতে পারতো ইউরোপের দিকে, তাহলে নতুন এক পৃথিবীর জন্ম হতো যা পাল্টে দিত পৃথিবীর ইতিহাস। কিন্তু তা হয়নি। সেদিন যা হয়নি, আজ দু'শ বছর পর তার যাত্রা শুরু হয়েছে। ইসলামের উত্থান ঘটছে ষোলকলার পূর্ণতা নিয়ে।

কবির চৌধুরী, আহমদ শরীফ, তসলিমা নাসরিনের মত প্রতিক্রিয়াশীলরা এর বিরোধিতা করতে পারে, কিন্তু তা ধর্তব্যযোগ্য কোন বিষয় নয়। আবু জেহেল, আবু লাহাবরা যা পারেনি, ১৪শ' বছর পরের তার অতি দুর্বল, অতি নগণ্য সংখ্যক দোসরারও তা পারবে না। চোখ বন্ধ করে সূর্যোদয় ঠেকানো যায় না।

৬-১০-১৯৯৪

www.icsbook.info

কায়রো সম্মেলনের ব্যালান্স শীট ও ভবিষ্যত

॥ এক ॥

জাতিসংঘ সকল জাতির মিলিত একটি সংস্থা। এই সংস্থা তার সদস্য সব জাতির অধিকার সংরক্ষণ করবে, এটাই যুক্তির দাবী এবং এই দাবী অনুসারে জাতিসংঘ সনদও সকর জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের কথা ভাবতে গিয়ে জাতিসংঘ সম্ভবত তার এই সনদের কথা ভুলে গেছে। জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা কায়রোতে অনুষ্ঠিতব্য জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের জন্যে ১১৩ পৃষ্ঠার যে দীর্ঘ খসড়া দলিল তৈরী করেছে, তা এই কথারই প্রমাণ দিচ্ছে। দলিলটি কার্যত ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধসহ পরিবার ব্যবস্থা ও সমাজ-শৃঙ্খলা ধ্বংসেরই ব্যবস্থা করেছে। ভ্যাটিকানে অনুষ্ঠিত মুসিলিম ও খৃষ্টান নেতৃবৃন্দের একটি যৌথ বৈঠক একে 'ভবিষ্যত মানবতার জন্যে একটা সংকট' বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছে যে, ধর্ম বিশ্বাসী মুসলিম-খৃস্টান কেউই জাতিসংঘের খসড়া দলিলের সাথে একমত হতে পারে না। জাতিসংঘের খসড়া দলিলের যে বক্তব্যকে সামনে রেখে এই মন্তব্য করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে এই ঃ

(ক) প্রজনন স্বাস্থ্য এবং যোগ্য, তৃপ্ত ও নিরাপদ যৌন জীবন ইত্যাদির নামে এমন একটি অযৌন অথবা মনোনীত প্রজনন ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া, যা অন্যায়, অবৈধ, অপ্রাকৃতিক এবং ধর্ম বিশ্বাসেরও খেলাফ।

(খ) 'প্রতিটি শিশুই বাঞ্ছিত শিশু'-এই শ্লোগানের আড়ালে এবং গর্ভপাতকে আইনসিদ্ধ করার মাধ্যমে গর্ভপাতকে অবাধ করে তোলা।

(গ) আইনগত, শৃঙ্খলাজনিত ও সামাজিক ধরনের সকল বাধা দূর এবং পিতা-মাতার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে বালক-বালিকা থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী পর্যন্ত সকলকে অবাধ মেলা-মেশার অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়া এবং ছোট বেলা থেকেই যৌনশিক্ষা দান করা।

(ঘ) চারিত্রিক, নৈতিক ও শরীয়তের সকল বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বিবাহ বহির্ভূত মিলন, বিবাহ বহির্ভূত একত্র জীবন যাপন, সমকামিতা, ইত্যাদিকে আইনগতভাবে বৈধ করা।

(ঙ) অবাধ যৌন অনুশীলন ও সন্তান উৎপাদনকে ব্যক্তিগত অধিকার বলে গণ্য করে ব্যাভিচারের দ্বারা গর্ভবতীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিশেষ সেবাদানের ব্যবস্থা করা।

www.icsbook.info

জাতিসংঘের খসড়া দলিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের নামে সামাজিক ক্ষেত্রে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, উপরোক্ত পাঁচটি দফা তারই সারাংশ। কায়রো সন্মেলনে জাতিসংঘের দলিলটি যদি পাস হয়, তাহলে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোকে এই কর্মসূচী অনুসারেই তাদের দেশের শিক্ষা, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। কেউ তা অস্বীকার করলে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে চাপ, অবরোধ, এমনকি হস্তক্ষেপেরও সে সম্মুখীন হতে পারে।

আর এই অবস্থায় পড়ে জাতিসংঘের এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে সেই জাতির চারিত্রিক ও ধর্মীয় দিকসহ পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই কারণেই জাতিসংঘের এই খসড়া দলিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় ও সচেতন মহল থেকে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছে। ইসলামী শিক্ষা ও চিন্তা-গবেষণার সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান আল-আজহার থেকে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

"এই দলিল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের জনগণের আকিদা, বিশ্বাস, চারিত্রিক ও ধর্মীয় দিকের প্রতি মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। .... এ দলিল পারিবারিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেছে। সমাজে এমন শ্রেণী সৃষ্টি করতে চায়, যাদের মধ্যে চরিত্র ও সামাজিকতার কোন চিহ্ন থাকবে না। .... দলিলের বক্তব্য যৌন, সন্তান উৎপাদন ও এতদসংক্রান্ত সেবাদান বিষয়ক। এতে বুঝা যায় যে, এই সম্মেলন মুলতঃ সন্তান উৎপাদন ও যৌন বিষয় আলোচনার জন্যে, জনসংখ্যা ও উন্নয়নের জন্যে নয়।"

মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল আলম আল ইসলামী জাতিসংঘের এই খসড়া দলিলটির শুধু তীব্র সমালোচনাই করেনি, অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে পৃথিবীব্যাপী তার সকল সদস্য সংস্থা-সংগঠনসমূহের কাছে চিঠি ও দলিলাদি পাঠিয়েছে–যাতে করে তারাও প্রকৃত ঘটনা সকলকে অবহিত করে জনমত গঠনে এগিয়ে আসতে পারে। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের সাথেও রাবেতা যোগাযোগ করেছে। রিয়াদভিত্তিক ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামি) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই একই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে। এই দুই সংগঠন বিশ্বের মুসলিম চিন্তাবিদ, সমাজকর্মী ও সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এই দলিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্যে। তাদের এই উদ্যোগের ফলেই, আলহামদু লিল্লাহ, অতি অল্প সময়ে জাতিসংঘের এ দলিলের বিরুদ্ধে চারদিক থেকে অজস্র কণ্ঠ আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ দলিলের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে এই দলিলের সমালোচনা করে এর বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে বলা হয়েছে, "মানব সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপকারী এই কর্মসূচী বা দলিল জাতিসংঘের কোন ফোরাম থেকে পাস হতে পারে না। এই ধরনের কোন কিছু পাস করা হলে তা একদিকে যেমন কারও গ্রহণযোগ্য হবে না, তেমনি তা শান্তিভংগেরও

www.icsbook.info

কারণ ঘটাবে।" জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে, কেউ যদি আজ এই জাতিসংঘকে অশান্তি সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে তা শুধু অন্যায় হবে না, এর দ্বারা জাতিসংঘেরও অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করা হবে। যে মিসরের রাজধানী কায়রোতে জাতিসংঘের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনটি অনষ্ঠিত হচ্ছে, সে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক চারদিকের জনমতের চাপে, ইতিমধ্যেই বলেছেন, সম্মেলনে মিসর ইসলামের শিক্ষা ও অবতীর্ণ ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ একটা দলিল পেশ করবে এবং নৈতিকতা বিরোধী যে কোন বিষয় তারা প্রত্যাখ্যান করবে। রাবেতা আলম আল ইসলামী হোসনি মোবারকের এ বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, সকল মুসলিম রাষ্ট্রের এই একই পথ অনুসরণ করা উচিত।

কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কি করবে, সম্মেলনে তাদের ভূমিকা কি হবে, কিংবা বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে বিশ্বের প্রধান দুই ধর্মের তীব্র সমালোচনার মুখে জাতিসংঘ কোন পথ অনুসরণ করবে, তা বলা মুসকিল। তবে জাতিসংঘের পাগলামি পরিত্যাগের বিষয়টা খুব সহজ নয়। তারা চেষ্টা করবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের বড় বড় আপাতঃ মহৎ কথা ও উদ্দেশ্যের আড়ালে তাদের দলিলটি পাস করে নিতে।

জাতিসংঘের দলিলটিতে উন্নয়নের নামে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন নিয়ে যে অসহনীয় পাগলামী করা হয়েছে–তাতে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, জাতিসংঘের লক্ষ্য উন্নয়ন নয়, অন্য কিছু। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খুল আজহারের অফিস থেকে প্রচারিত দলিলে এ প্রশ্নই তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, দলিলটির প্রায় শত পৃষ্ঠাব্যাপী জনগণের যৌন, সন্তান উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে, অথচ দলিলের শতকরা মাত্র ২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা। কাজেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে যে, আসলে এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি?

প্রশ্ন হলো, দলিলটির মাত্র শতকরা ২০ পৃষ্ঠায় উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা কেন? উন্নয়ন নিয়েই তো দলিলে বেশী আলোচনা প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যত উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে প্রবল আশংকা, তার কারণেই জাতিসংঘ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এনেছে এবং সে প্রশ্ন থেকেই জাতিসংঘের ঐ অসামাজিক সামাজিক কর্মসূচীটি। সুতরাং উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান দানই তো বেশি দরকার ছিল।

দরকার থাকলে কি হবে। উন্নয়ন ব্যাপারে সব কথা বলতে গেলে যে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে যাবে। প্রমাণ হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন নিয়ে যে পর্বত প্রমাণ আশংকা, তা ভুয়া এবং এই আশংকা নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে উন্মত্ততা সৃষ্টি, তারও আসলেই কোন ভিত্তি নেই। সম্পদ না বাড়াতে পারলে দরিদ্র্য পরিবেশে জনসংখ্যা অবশ্যই একটা সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যার উপর যেভাবে রং চড়ানো হচ্ছে, যে রূপে একে দেখানো হচ্ছে, তা বাস্তবতার একটা বিকৃতি।

www.icsbook.info

খাদ্য ও সম্পদের সাথে হিসেবে কষেই জনসংখ্যাকে পর্বত প্রমাণ ভারি একটা সমস্যা বলা হয। বলা হয়ে থাকে, ভবিষ্যতে খাদ্য ও সম্পদের অভাবে মানুষ মানুষকেই চিবিয়ে খাবে। এইভাবে হিসেব কষাটা মোটেই ঠিক নয়। পল এরলিক তাঁর বিখ্যাত বই 'The population Bomb'-এ লিখেছেন "বিশ্বের সব মানুষকে খাইয়ে বাঁচাবার যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছে। সত্তর ও আশির দশকে কোটি কোটি লোক না খেয়ে মারা যাবে।" কিন্তু সত্তর ও আশির দশক শেষ। পল এরলিকের কথা সত্য হয়নি। বিশ্বে খাদ্য-উদ্বৃত্ত আরও বেড়েছে। উল্লেখ্য, ১৭৯৮-এ বলা মালথাসের কথাও এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি মনে করি, ভবিষ্যতেও তাই হবে। বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞদের মতে "Population growth is necessary to force communities to abandon very primitive means of getting food." (Conditions of Agricultural growth-Ester Boserup) । এর অর্থ মানুষ শুধু সমস্যা নয়, সম্পদও। এই মানব সম্পদ বাধ্য হলেই শুধু তার প্রয়োজনে আল্লাহর অশেষ ভাণ্ডার থেকে সম্পদ খুঁজে বের করে। তাছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের মতেই বিশ্বের মোট জমির মাত্র ১১ ভাগ কৃষির আওতায় এসেছে, একে সহজেই ডবল করা যায়। আজ পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৬শ' কোটি। অথচ অর্থনীতিবিদদের ষাট-এর দশকের হিসেব মতেই ৫০শ' কোটি লোকের খাদ্য সংস্থান পৃথিবীতে আছে। তাছাড়া শিক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে ২০২৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে।

খাদ্যের মত অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা। ১৮৬৫ সালে সে সময়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ স্ট্যানলি জেভনস বলেছিলেন, পৃথিবীর কয়লা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারপর শিল্প-বিপ্লবও শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কয়লা এখনও শেষ হয়নি। তাছাড়া কয়লার বিকল্পও বেরিয়েছে বহু–যা মান ও পরিমাণেও কয়লার চেয়ে বহুগুণ বেশি। পুনরায় ১৯৭২ সালে 'The limits to growth' -এ বলা হলো ১৯৯৩ সালের মধ্যে তামা, ১৯৮১ সালের মধ্যে সোনা, ১৯৯৩ সালের মধ্যে সিস, ১৯৮৫ সালের মধ্যে পারদ, ১৯৯৪ সালের মধ্যে গ্যাস, ১৯৯২ সালের মধ্যে পেট্রোলিয়াম, ১৯৮৫ সালের মধ্যে সিলভার এবং ১৯৮৭ সালের মধ্যে টিনের বর্তমান সঞ্চয় শেষ হয়ে যাবে। পরে তিনি এই তারিখ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোন কিছুরই সঞ্চয় শেষ হয়নি, বরং বেড়েছে। সম্পদের বিলয় ও বৃদ্ধি নিয়ে দুই অর্থনীতিবিদ "The population Bomb'-এর লেখক পল এরলিক এবং 'The Ultimate Resource and Population Matters' গ্রন্থের লেখক জুলিয়াস শিমন বাজি ধরেছিলেন। পল এরলিকের বক্তব্য, সম্পদ কমবে, আর শিমন বলেছিলেন সম্পদ বাড়বে। পর্যবেক্ষণের জন্যে সময় ধরা হয়েছিল দশ বছর, ১৯৮১ থেকে ১৯৯০। বাজীতে জিতেছিলেন মিঃ শিমন এবং ৫৭৭ ডলারের একটা চেক তিনি পেয়েছিলেন পপুলেশন বম্ব-এর লেখক পল এরলিকের কাছ থেকে।

www.icsbook.info

এসব দেখা শুনার পর এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ঘোর সমর্থকরাও বলছেন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যুক্তি হিসেবে সম্পদ ঘাটতির অজুহাত তোলা ঠিক নয়। আল্লার এ সৃষ্টিতে সম্পদের শেষ নেই। যেমন 'তামা' কে এক সময় এই ক্ষেত্রে শেষ সম্পদ ভাবা হতো। কিন্তু বালি থেকে সিলিকন-এর আবিষ্কার এ ধারণা পাল্টে দিয়েছে। যা তামার চেয়ে বহুগুণে ভালো। কম্পিটিটিভ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ফ্রেড স্মিথ বলছেন, '1000 tons of copper can be replaced by as little as 25 k.g. of silicon." তার আরও মতঃ 'It is the interaction of man and science that creats resources : sand and knowledge becomes fibre optics." এইভাবেই সম্পদ সৃষ্টি হবে মানুষের জন্যে যার শেষ নেই। এ কারণেই মার্কিন 'National Academy of sciences' তার Population growth and Economic Develop-ment' শীর্ষক রিপোর্টে বলেছে, "জনসংখ্যার বৃদ্ধি যে হারে শেষ হওয়ার মত সম্পদের হ্রাস ঘটাচ্ছে, তাতে আশংকিত হবার খুব অল্পই কারণ রয়েছে।'

এই আলোচনা থেকে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বিজ্ঞান যে আশংকা প্রকাশ করতে নিষেধ করছে, সে আশংকা জাতিসংঘ প্রকাশ করতে পারে না এবং সে আশংকা নিয়ে জাতিসংঘ অবশ্যই 'জনসংখ্যা ও উন্নয়ন' বিষয়ক ঐ খসড়া দলিল তৈরি করেনি। তাহলে কোন উদ্দেশ্যে ঐ দলিল বৈরী হয়েছে? 'জনসংখ্যা ও উন্নয়ন' নিয়ে ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতা ও সমাজ ধ্বংসের ঐ উন্মত্ততা প্রকাশের তাহলে অর্থ কি? শায়খুল আজহার জাতিসংঘের খসড়া দলিল সংক্রান্ত তার বক্তব্যে এই প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন।

জাতিসংঘের ঐ দলিলটির পেছনে বিশেষ করে নর-নারীর যৌন সম্পর্ক, সন্তান উৎপাদন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্মত্ততাসূচক কর্মসূচীর পেছনে উন্নয়ন সংক্রান্ত উপযুক্ত অর্থনৈতিক কারণ যখন বর্তমান নেই, তখন বলতে হবে সামাজিক কারণই এখানে মুখ্য। এ সামাজিক কারণ হলো একটা সামাজিক লক্ষ্য। এ লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের বিনাশ সাধন করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মানবিক বিকাশ ধ্বংস করে দেয়া। এ সাংঘাতিক এক ষড়যন্ত্র। সকল জাতির সংস্থা জাতিসংঘ অবশ্যই এই ষড়যন্ত্র করতে পারে না। জাতিসংঘের ছত্রছায়া নিয়ে তাহলে অন্য কেউ কি এই ষড়যন্ত্র করছে?

ধর্ম ও মানবতার জন্যে শুধু নয়, পৃথিবীর মানব সামজের শান্তি ও স্বস্তির স্বার্থেও এই প্রশ্নের জবাব সন্ধান প্রয়োজন।

১৭-০৮-১৯৯৪

www.icsbook.info

॥ দুই ॥

কায়রো সম্মেলন শেষ হলো। বহুল বিতর্কিত সম্মেলনটি ৮দিন ৮ ঘন্টা ৪৫ মিনিটের দীর্ঘ আলোচনায় ১১৩ পৃষ্ঠার বদলে ৯৮ পৃষ্ঠার যে চূড়ান্ত দলিল অনুমোদন করেছে তা নিয়েও জয়-পরাজয়ের একটা বাদানুবাদ চলছে।

কায়রো সম্মেলন ঘিরে চারটি পক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম পক্ষ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমের শিল্পোন্নত বিশ্ব, যারা ছিল কায়রো সম্মেলনের তৈরি ১১৩ পৃষ্ঠার বিতর্কিত দলিলের নির্মাতা। সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ধরা হয় দ্বিতীয় পক্ষ। তৃতীয় পক্ষে ছিল ইসলামী সংগঠন ও মুসলিম দেশগুলো। আর ভ্যাটিকান এবং তার ক্যাথলিক অন্যান্য মিত্র সংগঠন ছিল চতুর্থ পক্ষ। কায়রো সম্মেলনকে এই চার পক্ষে ভাগ করলেও পক্ষগুলো সব সময় স্বতন্ত্র পক্ষ হিসেবে কাজ করেনি। যেমন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকারী প্রতিনিধিদল মানসিকভাবে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত পক্ষের সাথে। কিন্তু মুসলিম জনমতের ভয়ে তারা প্রকাশ্যে ইসলামী সংগঠনগুলো উত্থাপিত সংশোধনীগুলোকে সমর্থন করেছে। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর গ্রুপ আলোচ্য বিষয়ের কোন ইস্যুতে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করলেও তারা প্রকৃতই কোন কার্যকর পক্ষ ছিল না। তারা সাধারণভাবে মার্কিন পক্ষের হাতকেই মজবুত করেছে। সুতরাং পক্ষ-বিপক্ষের যোগ-বিয়োগে দেখা যাচ্ছে ভ্যাটিকানের নেতৃত্বে ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম সম্প্রদায় এবং রাবেতায়ে আলম আল ইসলাম, ওআইসি'র নেতৃত্বে ইসলামী সংগঠনসমূহের একটা সম্মিলিত সমঝোতা সম্মেলনে মার্কিন পরিচালিত শক্তিশালী পক্ষের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করেছে। জনসমর্থনের দিক দিয়ে এই পক্ষ সংখ্যাগুরুর প্রতিনিধি হলেও সম্মেলনের সরকারী ও এনজিও প্রতিনিধিদের মিছিলে এরা ছিল খুবই সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘুত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে সম্মেলনের শুরুর দিকেই। নরওয়ের মহিলা প্রধানমন্ত্রী যখন মার্কিন পক্ষের সমর্থনে তুখোড় বক্তৃতা দিলেন, তখন হাত তালিতে হলটা গম গম করে উঠেছিল। এর কারণ হলো সম্মেলনে শুধু এনজিও প্রতিনিধিই যোগদান করেছিল ৪ হাজার। মুসলিম বিশ্বের সরকারী প্রতিনিধিরাও ছিল, যা আগেই বলেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মার্কিন পক্ষের। এর সাথে বিরাট মার্কিন পক্ষ তো ছিলই। সুতরাং তাদের সম্মিলিত হাততালিতে হল গম গম করে উঠবেই।

কায়রো সন্মেলন কক্ষে এই অসম দুই পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে দুই পক্ষই সাফল্যের দাবী করেছে। ইসলামী ও ভ্যাটিকান পক্ষ বলছে, কায়রো

www.icsbook.info

সম্মেলনে প্রতিপক্ষ যা করতে চেয়েছিলো তা পারেননি। অন্যদিকে মার্কিন পক্ষের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, তারা মেক্সিকো সম্মেলনে যা পেয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে এই সম্মেলনে।

দুই পক্ষের কথাই ঠিক। ইসলামী ও ভ্যাটিকানের ধর্মীয় পক্ষ তাদের সফল প্রতিরোধের মাধ্যমে সম্মেলনে খসড়া দলিলে অনেক কাট ছাঁট করতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু এর পরেও অনুমোদিত চূড়ান্ত দলিলে বিষবৃক্ষের বীজ অনেক রয়েই গেছে এবং একেই মার্কিন পক্ষ সন্মেলনে তাদের সাফল্যের স্মারক হিসেবে অভিহিত করেছে।

খসড়া দলিলে জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন জাতিরই সংস্কৃতি, মূল্যবোধকে বিবেচনায় আনা হয়নি। কিন্তু চূড়ান্ত দলিলে এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। বলা হয়েছে, জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মুল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মান্য করা হবে। ইসলামী ও ভ্যাটিকান পক্ষের এটা এক বিজয়।

'Alternative to early marriage' -এর নামে খসড়া দলিলে কিশোর-কিশোরীদের অবাধ যৌন অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। চূড়ান্ত দলিলে এ বিষয়টা বাদ দেয়া হয়েছে। চূড়ান্ত দলিলে 'বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের যৌন শিক্ষার বিষয়টা রাখা হলেও পিতা-মাতাদের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, গর্ভপাতকে জনসংখ্যা নিরোধ কার্যক্রমের একটা মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়েছিল খসড়া দলিলে। কিন্তু চূড়ান্ত দলিলে এই ধারণা পরিহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে গর্ভপাত যেখানে আইন বিরোধী নয় সেখানেই শুধু 'নিরাপদ গর্ভপাত' ঘটানো যাবে। এসব নিঃসন্দেহে ইসলামী ও ভ্যাটিকানের ধর্মীয় পক্ষের বিজয়।

খসড়া দলিলের একটা বড় বিতর্কের বিষয় ছিল বিবাহ বহির্ভূত পরিবার ও সমকামীদের স্বীকৃতি দানের ব্যাপারটি। 'Marriages and other unions'-এর ছদ্মবেশে খসড়া দলিলে বিবাহ বহির্ভূত পরিবার ও সমকামিতাকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দান করা হয়েছিল। চূড়ান্ত দলিলে 'Marrige'-এর পাশ থেকে 'Other Union' শব্দ দুটিকে মুছে ফেলার মাধ্যমে ইসলামী ও ভ্যাটিকান পক্ষের কাছে নতি স্বীকার করা হয়েছে। তবে মার্কিন পক্ষ গ্রুপের লোকরা বলছেন, এটা মুছে ফেললেও চূড়ান্ত দলিলে এমন কিছু শব্দ ও সুযোগ আছে যা বিবাহ বহির্ভূত পরিবার ও সমকামিতার প্রতি সমর্থন দেবে। অবশ্য তারাই শুধু নন, চূড়ান্ত দলিল প্রণীত হবার পর কিছু মুসলিম পক্ষ ও দেশ হতাশার সাথে বলেছে, তারা প্রকারান্তরে সমকামী বিয়েকেই সমর্থন করেছে। চূড়ান্ত দলিল সম্পর্কে এই উক্তি আরও অনেক ক্ষেত্রেই সত্য। বস্তুত কায়রোতে পাসকৃত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক চূড়ান্ত দলিলে বিষ বৃক্ষের অনেক

www.icsbook.info

বীজ বিঘোষিত অস্তিত্ব নিয়েই রয়েছে। যা ভবিষ্যতে মহীরুহে পরিণত হয়ে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। সুতরাং কায়রো সম্মেলনে কে জিতেছে, কে হেরেছে তা চিহ্নিত করা মুশকিল।

প্রকৃতপক্ষে কায়রো সম্মেলনের ফলাফলকে কোন পক্ষের জয়-পরাজয় হিসেবে চিহ্নিত করাও ঠিক নয়। একটা চলমান যুদ্ধের মোড় পরিবর্তনকারী হলো কায়রো সম্মেলন। দুই বিশ্বাস ও দুই সভ্যতার মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে, সে যুদ্ধকেই সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান করে তুলেছে সম্মেলনটি।

এই যুদ্ধের এক পক্ষে রয়েছে তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ', অন্য পক্ষে রয়েছে ওহীভিত্তিক বিশ্বাস বা 'ধর্মীয় মানবতাবাদ'। আমি তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ'-কেও একটি বিশ্বাস বা ধর্ম হিসেবে অভিহিত করছি। কারণ এটা আসলেই একটা নব্য ধর্ম। পশ্চিমের সমাজবিজ্ঞানীরাও এ কথাই আজ বলছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক জেমস হান্টার লিখছেন, "Secular humanism will have become the dominant ideology playing much the same role as pan-protestant ideology in the 19th century. অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ একটা শক্তিশালী আদর্শ হিসেবে সামনে আসছে, যেমন এসেছিল ১৯ শতকে 'প্রোটেস্ট্যান্ট আদর্শবাদ।' কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদকে 'Quasi-religion', (ধর্মপদবাচ্য), আবার কেউ একে 'Religion-surrogate' (ধর্মরূপী) নামে অভিহিত করেছেন। তবে এই নব্যধর্মের কোন মূল নেই। বলা যায় এ ভাসমান এক স্বেচ্ছাচার। অধ্যাপক জেমস হান্টার বলছেন, "ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ একটা ধর্ম' কিন্তু এ ধর্মে কোন ঈশ্বর নেই, যেমন নেই বৌদ্ধ ধর্মে এবং কনফুসীয় ধর্মে।' জেমস হান্টার ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের কোন ঈশ্বর নেই বললেও ঈশ্বর এদের আছে। যাকে 'Quasi God' হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ ঈশ্বরের নাম 'প্রবৃত্তি'। এই 'প্রবৃত্তি' বা 'খাহেশ' নামক স্বেচ্ছাচারী দেবতার তারা পূজক। এদের কোন ধর্মগ্রন্থ নেই, স্বেচ্ছাচারিতাই এদের সংবিধান। এই সংবিধানে বিবাহবহির্ভূত পরিবার বৈধ, বৈধ সমকামিতা, বৈধ বাধাবন্ধনহীন অবাধ যৌন জীবন, বৈধ ইচ্ছামত যৌনকর্ম ও গর্ভপাত এবং বৈধ নীতি-নৈতিকতা ও ন্যায়-নীতিহীন অবাধ ও অসম প্রতিযোগিতা এবং বৈধ শুধুই শক্তিমানের বাঁচার অধিকার।

এই 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ'-এর সাথেই আজ যুদ্ধ বেধেছে ওহী ভিত্তিক ধর্ম বা ধর্মীয় মানবতাবাদের। নব্য ধর্ম এই ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ কায়রো সম্মেলনকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় তাদের স্বেচ্ছাচারী সংবিধানকে

www.icsbook.info

একটা আইনগত রূপ দিতে। এই ক্ষেত্রে তাদের ষড়যন্ত্র পুরো সফল না হলেও আংশিক সফলতা অর্জন করেছে।

নব্য ধর্ম ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ-এর সামনে বিরাট লক্ষ্য। তারা ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে এগুচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটেছে এইভাবে ঃ ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এদের সংখ্যা ছিল শতকরা ২ ভাগ। ১৯৭২ সালের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৫ ভাগ। ১৯৮২ সাল নাগাদ এই সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগে উন্নীত হয়। আর বর্তমানে এই সংখ্যা বলা হচ্ছে শতকরা ১১ ভাগ। এই হিসেবটা দিয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি'র 'বুকিং ইনস্টিটিউশন'-এর 'দি বুকিং রিভিউ।' আরেকটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ এই সেকুলার ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সেকুলার নেতৃবৃন্দ হিসেবে কষে বলছেন আসছে শতকের মাঝামাঝি নাগাদ তাদের সংখ্যা মোট বিশ্ব জনসংখ্যার ৫০ থেকে ৬০ ভাগে উন্নীত হবে। এই তথ্যটি উল্লেখ করেছেন 'উইলিয়াম্ রিজ মর্গ' তাঁর 'Towards Society Beyond Religion' শীর্ষক নিবন্ধে। তিনি তাঁর নিবন্ধে দেখিয়ে দেন, এই সেকুলাররা বিশ্ব সমাজ ও বিশ্ব-বিজ্ঞানকে উন্নয়নের নামে প্রকৃতিগত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একজন বিজ্ঞান কর্মী এ বিপর্যয়ের দিকে ইংগিত করে বলেছেন, "I am very lucky, I belong to the generation which wll see it happen, but to the last generation to which it would not be done" অর্থাৎ আমি ভাগ্যবান যে, আমি এমন কে জেনারেশনের সদস্য যে জেনারেশন এই বিপর্যয় ঘটতে দেখবে এবং আমার জেনারেশনই শেষ জেনারেশন যার উপর এই বিপর্যয় ঘটবে না।

বিশ্ব সমাজের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় সৃষ্টিরই দ্বারোদঘাটন ছিল কায়রো সম্মেলন। লক্ষ্য অর্জনে তারা আংশিক ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাকে অবলম্বন করেই তারা দ্রুত সামনে এগিয়ে যেতে চাইবে। ওহীভিত্তিক ধর্ম বা ধর্মীয় মানবতাবাদীরা কি এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন? কায়রো সম্মেলন তাদের চেতনায় একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়েছে। তাদের এই নবোত্থিত সচেতনতা কত দ্রুত সামনে এগুতে পারে, তার উপরই নির্ভর করছে দুই বিশ্বাস, দুই সভ্যতার চলমান যুদ্ধের চূড়ান্ত জয়-পরাজয়।

১৯-০৯-১৯৯৪

www.icsbook.info

॥ এক ॥

টাইম ম্যাগাজিন এবার জাপান-মার্কিন বাণিজ্য লড়াই এর উপর কভার স্টোরি করেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একদিকে রয়েছে বিশাল-বপু জাপান, মনে হবে যেন এক মেদের পাহাড়। কিন্তু সেই তুলনায় সবল নয়। দেখলে মনে হয় বড় সুবোধ, বড় অসহায় সে। অন্যদিকে রয়েছে মেদহীন ক্ষীণদেহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু দেহটা তার ক্ষীণ হলে কি হবে হাতগুলো মুগুরের মত দৃঢ় ও পেশীবহুল। টাইম ম্যাগাজিনের আর্টিস্ট এ দুটো ছবির দ্বারা মনে হয় দেখাতে চেয়েছেন যে, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী জাপানের সাথে সামরিকভাবে শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জমে ওঠা বাণিজ্য লড়াই কোন্ দিকে যাবে।

জমে ওঠা এই লড়াইটার প্রকৃতি একটু দেখা যাক। জাপানের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ বার্ষিক রফতানি হল ২৬.৯ বিলিয়ন ডলার, আর সে দেশ থেকে আমদানি হল ৮৫.৫ বিলিয়ন ডলার। অতএব জাপানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৫৮.৬ বিলিয়ন ডলার। এ ঘাটতিই জাপানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-যুদ্ধের কারণ। আর এ ঘাটতি তো এক বছরের ঘটনা নয়, বছরের পর বছর ধরে এ ঘাটতির পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে এবং এ ঘাটতির পরিধি ক্রমে বাড়ছেই। অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের কাছে হেরে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষোভ ও উষ্মার কারণ এখানেই। এ থেকেই আজকে বাণিজ্য লড়াই এর শুরু। বাণিজ্য লড়াই-এর একটা বড় অস্ত্র হলো শুল্ক। কোন দেশ থেকে আমাদনি বন্ধ বা কৃত্রিমভাবে নিজের পণ্যকে প্রতিযোগিতায় নিজের বাজারে টেকাবার জন্যে আমদানি দ্রব্যের উপর ভারী শুল্ক আরোপ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সাথে বাণিজ্য লড়াইয়ে জেতার জন্যে এই সংরক্ষণবাদী নীতিই অনুসরণ করছে। জাপান থেকে আমদানি দ্রব্যের উপর সে ভারী শুল্ক আরোপ করেছে, যাতে করে জাপান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি কমে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী বলেই এটা বেপরোয়াভাবে করতে পারছে। জাপান সে তুলনায় দুর্বল বটে, কিন্তু সেও বাঁচার জন্যে, মর্যাদার জন্যে মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের পথ অনুসরণ করতে পারে। দুর্বল জাপান এটা এখনও করেনি। করলেই লড়াইটা আরও জমে উঠবে।

টাইম ম্যাগাজিন তার ঐ কভার স্টোরিতে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যে লড়াই দেখিয়েছে। আসলে এ বাণিজ্য-লড়াই আজ শুধু জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

www.icsbook.info

মধ্যে নয়, এ লড়াই চলছে এক দেশের সাথে অন্যদেশের গোটা দুনিয়াব্যাপী। এ লড়াই এর গোষ্ঠী রূপও আছে এবং সে রূপই আজ মুখ্য। আজকের পৃথিবীর প্রধান গোষ্ঠী লড়াই তার একদিকে রয়েছে শিল্পোন্নত দেশসমূহ এবং অন্যদিকে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। এদের গোষ্ঠী লড়াই-এর প্রকৃতিও কতকটা জাপান-মর্কিন বাণিজ্য লড়াই-এর মতই। অন্তত শক্তির বিচারে তো বটেই। শিল্পোন্নত দেশগুলো সামরিক ও আর্থিক উভয় দিক দিয়েই শক্তিশালী, আর উন্নয়নশীল দেশগুলো এ দু'টো ক্ষেত্রেই দুর্বলতা ও অসুবিধায় ভোগছে। উন্নত দেশগুলো অভিভাবক সেজে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টাকা ধার দিচ্ছে, পরামর্শ ধার দিচ্ছে, ধার দিচ্ছে উন্নয়ন নীতিও। এসব দানের বহু বিঘোষিত লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে হাত ধরে টেনে তোলা, তাদের উন্নয়ন ঘটানো এবং তাদের স্বনির্ভর করা, নিজেদের পায়ে তাদের দাঁড় করানো ইত্যাদি। কিন্তু এই ঘোষণার অন্তরালের বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাতকরলে দেখা যাবে শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন প্রচেষ্টার নামে সেখানে তাদের পণ্য বিক্রির মেলা বসিয়েছে। তারা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে কিছুই কিনছেন না তা নয়। কিনছে তারা পানির দামে এ সব দেশের কাঁচামাল এবং সোনার দামে বিক্রি করছে তাদের শিল্পপণ্য এসব দেশে। শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করাতে চায় ঠিকই, কিন্তু হাঁটতে দিতে নারাজ। তারা চায়, উন্নয়নশীল দেশগুলো উদার বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে অব্যাহতভাবে কেনার শক্তি অর্জন করুক, বিক্রির শক্তি অর্থাৎ শিল্প পণ্য রফতানির শক্তি অর্জন করা তাদের চলবে না। যদি তা তারা চায় তাহলেই বিপদ, তাহলেই শুরু হবে তাদের মধ্যে জাপানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বাণিজ্য-লড়াই। এ লড়াই শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ রফতানি মার্কেটে প্রবেশ করেছে। এটা নিয়েই ঘটেছে বিপত্তি। উন্নয়নশীলরা রফতানি মার্কেটে প্রবেশ করায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর বাজার সংকুচিত হচ্ছে, তাদের পণ্য অবিক্রীত থাকছে। ফলে কমে যাচ্ছে তাদের উৎপাদন। আর তার ফলে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে মন্দা ও বেকারত্বের কালোছায়া। সুতরাং তারা হাত বাগিয়ে, মুখ খিঁচিয়ে লড়াই-এ নামছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বক্তব্য হলো, লক্ষ কোটি বিলিয়ন ডলারের ঋণের বোঝা আমাদের মাথায়। আমরা যদি আমাদের পণ্য বেচে আয় করতে না পারি, তাহলে ঋণ পরিশোধ করবো কি দিয়ে। অনেকেই ঋণ পরিশোধে অপারগতা জ্ঞাপনে বাধ্য হচ্ছে। দু'পক্ষের বিপরীতমুখী দুই স্বার্থ আজ সংঘাতের মুখোমুখি। এই সে দিন (৪/৪/৮৭) বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বললেন, জাপান-মার্কিন বাণিজ্য-যুদ্ধ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। আর আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলছেন, 'ঋণদাতা ও ঋণগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্রমেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।' বলা বাহুল্য, বাণিজ্য লড়াই ক্ষেত্রের তিক্ততাই এই উত্তেজনাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলো

www.icsbook.info

যেমন একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ১ লাখ কোটি ডলার ঋণের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে হুকুম মানাতে চাচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোও তেমনি তাদের এলাকা থেকে শিল্পোন্নত বিশ্বে লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ পাচারের কথা তুলে বিদ্রোহ করে বসছে।

শিল্পোন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল দুনিয়ার এই লড়াই এবং কাহিনী ছোটখাট পরিসরে শেষ করার মত নয়। আমি এই আলোচনায় এখন যেতে চাই না। এ লড়াই এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি ইংগিত করেই আজকের লেখা আমি শেষ করব।

কয়েক সপ্তাহ আগে এক লেখায় আমি উন্নয়নশীল বিশ্বের কৃষি সংকটের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলাম, কৃষিপণ্য বিক্রেতা শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কৃষি পণ্যে বিশেষ করে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে দিতে চায় না। তাদের খাদ্যশস্য বিক্রির মার্কেট হারাবার ভয়ই এর কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য-কৃষির শতকরা ৬০ ভাগই রফতানি-নির্ভর। সুতরাং খাদ্যশস্য রফতানি বন্ধ হয়ে গেলে তাদের কৃষি অর্থনীতিই ভেংগে পড়বে একথা তারা জানে। অন্যান্য খাদ্যশস্য রফতানিকারক দেশের ক্ষেত্রেও এই একই কথা। এ কারণেই উন্নয়নশীল দেশের কৃষিখাত তাদের তরফ থেকে বাঞ্ছিত সহযোগিতা পাচ্ছে না। এখন আবার আর একটা বড় প্রবণতা তাদের পেয়ে বসেছে সেটা হলো, উন্নয়নশীল দেশের কৃষিপণ্য অর্থাৎ খাদ্যশস্যের দাম বাড়ানো। এখানে উল্লেখ্য, খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়েকটি এশীয় দেশ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করায় এবং একই সময়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ঐ সব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ব বাজারে এ সব পণ্যের দাম ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এটা চলতে থাকলে বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। কিন্তু শিল্পোন্নত বিশ্ব এটা হতে দিতে নারাজ। কারণ এতে করে রাজকীয় খরচ ও রাজকীয় লাভের অঙ্ক তারা মেলাতে পারবে না। উপরন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে বর্তমানে যে উচ্চ খাদ্যমূল্য বিরাজমান আছে তাতে তারা মোটেই তুষ্ট নয়। তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্যশস্যের মূল্য আর এক ধাপ বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করছে। সম্প্রতি ব্যাংককভিত্তিক এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (এস-কাপ) এক রিপোর্টে কৃষিপণ্য মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্যে কৃষিখাতে আর্থিক সহায়তাদানে পশ্চিমী দেশগুলোর নীতিকেই দায়ী করা হয়েছে। এসকাপ বলছে, পণ্যমূল্য সহায়তা দানের কর্মসূচী উচ্চমূল্য ও স্বল্প পণ্য সরবরাহ পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যার ফলে বর্তমানে পণ্যের দাম ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে এবং পণ্য সরবরাহ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এসকাপ সুপারিশ করছে যে, ব্যাপক পণ্য সরবরাহের এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্যে উন্নয়নশীল দেশসূহের উচিত পণ্যমূল্য সহায়তা দানের নীতির পরিবর্তন ঘটানো। এসকাপ এর এ সুপারিশের সরলার্থ হলো পণ্যমূল্য সহায়তা দান বন্ধ করে কৃষকদের

www.icsbook.info

খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিরুৎসাহিত করা যার ফলে সরবরাহ কমে যাবে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের মত অনেক দেশে ইতিপূর্বে কৃষি সরঞ্জাম খাতে ভর্তুতি প্রত্যাহার করে ছোট ছোট কৃষকদের সর্বনাশ করে কৃষি উৎপাদন একদফা হ্রাস করা হয়েছে এবং মূল্য বাড়ানো হয়েছে। এখন পণ্যমূল্য সহায়তা বন্ধ করে উৎপাদন আরেক দফা হ্রাস করার সুপারিশ করা হচ্ছে সন্দেহ নেই। এ পথে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষিকে গলাটিপে মেরে এখানে শিল্পোন্নত দেশের কৃষিপণ্যের জন্য বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

সবার মত বাংলাদেশেও আমরা এই ষড়যন্ত্রেরই শিকার। আজ বাংলাদেশে আমরা ১২/১৩ টাকা সের দরে চাল কিনছি যা আজ অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মানুষের যখন নাভিশ্বাস উঠছে, তখন শিল্পোন্নত বিশ্বের খাদ্য বিক্রেতারা নিশ্চয়ই এই মূল্য বৃদ্ধিতে মোঁচে তাও দিয়ে হাসছেন। দিন তারা মোঁচে তাও দিন। আমাদের দুঃখ তারা না বুঝুন। কিন্তু আমাদের দুঃখ আমরা বুঝছি না কেন? তাদেরই বুদ্ধিতে আমরা কৃষি সরঞ্জামের উপর থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার করে শুধু আমাদের ছোট কৃষকের নয়, কৃষি উৎপাদনেরও একদফা সর্বনাশ করেছি। এসকাপ এর কুমন্ত্রণায় পণ্যমূল্য সহায়তা প্রত্যাহার করে কি আমরা আর একশ্রেণীর কৃষকের আরেক দফা সর্বনাশ করবো? অবশ্য পণ্যমূল্য সহায়তার ক্ষেত্রে যে ভর্তুকি আমরা দিচ্ছি, সে ভর্তুকি কৃষি সরঞ্জামে দিয়ে উৎপাদন খরচ কম রেখে খাদ্যশস্যের মূল্য কমিয়ে গরিব জনসাধারণের উপকার করা যায় যে অর্থনীতিতে, আমি সেই অর্থনীতির পক্ষপাতী) এসকাপ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি সংস্থার স্বরূপ বুঝার সময় কি আমাদের এখনো আসেনি?

২১-০৪-১৯৮৭

॥ দুই ॥

অর্থনৈতিক জোটবদ্ধতার ক্ষেত্রে অতি সম্প্রতি বড় ধরনের দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটা হলো নাফতা (NAFTA) অর্থাৎ নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোকে নিয়ে এই অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়েছে। গত ১৭ই নভেম্বর তারিখে এই জোট গঠন মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদন লাভ করেছে। এর একদিন পরেই অনুষ্ঠিত হলো 'এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন' কনফারেন্স (এপেক)। ১৫ জাতি এই এপেক কনফারেন্স-এ হাজির ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড, চীন, হংকং, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড। এই সম্মেলনে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে পরামর্শ এসেছে, এপেক অঞ্চল নিয়ে

www.icsbook.info

যদি একটা মুক্ত বাজার এলাকা গঠিত হয়, তাহলে একদিকে প্যাসেফিক তীরের দেশগুলোর একটা ঐক্য যেমন গড়ে উঠবে। তেমনি তা হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুক্ত বাজার এলাকা।

এ দুটি ঘটনা বিশ্বে আঞ্চলিক জোট গঠন প্রবণতার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত মাত্র। এই ধরনের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রবণতা খুব নতুন নয়। অনেক দিন থেকেই এ ধরনের জোট গড়ে উঠছে। কোথাও 'অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা, কোথাও 'মুক্ত বাণিজ্য এলাকা', কোথাও 'শুল্ক ইউনিয়ন' এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'কমন মার্কেট' ইত্যাদির আকার নিয়ে আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটগুলোকে গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে পুরাতন ইউরোপের ১২টি দেশ নিয়ে গঠিত "ইউরোপিয়ান একোনমিক কম্যুনিটি' (ইইসি)। সংস্থাটি স্থাপিত হয় ১৯৫৭ সালে। সেদিনের এই ইকোনমিক কম্যুনিটি আজ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংহতিতে রূপলাভ করছে। ইউরোপে আরও দুটি অর্থনৈতিক জোট আছে। একটি হলো ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইউরোপীয়ান ফ্রি ট্রেড এ্যাসোসিয়শন'। এর সাথে শামিল রয়েছে স্ক্যানডেনেভিয়ান দেশগুলোসহ মধ্য ইউরোপের ছোট ছোট দেশসমূহ। এই সংস্থাটি শুরুতে ইইসির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, কিন্তু এখন ইইসি'র শামিল হতে চাচ্ছে। ইউরোপের আরেকটা জোট 'লোম কনভেনশন।' এ সংস্থাটি কার্যত কার্যকরী নয়। আফ্রিকায় রয়েছে অনেকগুলো আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট। এগুলোর মধ্যে ১৯৭৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর গঠিত 'ইকোনমিক কম্যুনিটি অব দি গ্রেট লেক স্টেটস (ECGLS), ১৯৭৫ সালের ২৮ মে ১৬টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত 'ইকোনমিক কম্যুনিটি অব দি ওয়েষ্ট আফ্রিকান স্টেটস' (ECWAS), ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯টি দেশ নিয়ে গঠিত 'প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এরিয়া' (PTA), এবং ১৯৯১ সালের জুনে 'অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি'র দেশসমূহ নিয়ে গঠিত 'আফ্রিকান ইকোনমিক কম্যুনিটি (AEC) উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোকে কেন্দ্র করেও রয়েছে বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক জোট। যেমন, ১৯৮৯ সালে গঠিত 'ইউনিয়ন অব দি এরাব মাগরিব'। ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া এবং ইয়েমেনকে নিয়ে ১৯৬৪ সালের এক প্রস্তাব মোতাবেক গঠিত 'এরাব কমন মার্কেট' এবং ১৯৮২ সালে বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সউদি আরব ও আরব আমিরাতকে নিয়ে গঠিত 'কো-অপারেশন কাউন্সিল ফর দি এরাব স্টেটস অব দি গাল্ফ'(GCC.)। অন্যদিকে এশিয়ার বিশাল আয়তনের তুলনায় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের উপস্থিতি কম বলা যায়। ১৯৬৭ সালে ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডকে নিয়ে গঠিত 'এ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশসস' (ASEAN) কেই বলা যায় একমাত্র মোটামুটি কার্যকর অর্থনৈতক জোট। পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান

www.icsbook.info

ও মধ্য এশিয়ার কয়েকটি মুসলিম প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত হয়েছে 'ইকোনমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন'। 'সাউথ এশিয়ান প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (SAPTA) নামে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, ভূটান ও মালদ্বীপ নিয়ে গঠিত অর্থনৈতিক জোট গঠন পর্যায়ে রয়েছে। এই সব দেশ নিয়ে 'সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন অব রিজিওনাল কো-অপারেশন' (SAARC) এর বয়সও মাত্র কয়েক বছর। আমেরিকা মহাদেশে অনেকগুলো অর্থনৈতিক জোট রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৯৭৩ সালে 'ক্যারিবিয়ান কম্যুনিটি (CARICOM), ১৯৮০ গঠিত ল্যাটিন আমেরিকান ইন্টিগ্রেশন এসোসিয়েশন (LAIA),'দি সেন্ট্রাল আমেরিকান কমন মার্কেট'(CACM), ২৭টি মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশ নিয়ে ১৯৮৩ সালে গঠিত 'ক্যারিবিয়ান বেসিক ইনিশিয়েটিভ' (CBI), ১৯৮৮ সালে বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু এবং ভেনিজুয়েলাকে নিয়ে গঠিত 'আনদিস কমন মার্কেট (ACM), আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে নিয়ে ১৯৯১ সালে গঠিত 'কমন মার্কেট অব দি সাউথ' (MERCOSUR) এবং সর্বশেষে সম্প্রতি গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর 'নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট' (NAFTA) উল্লেখযোগ্য।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের এই লিস্টটা বড়ই হয়ে গেল। তবু তা সামনে আনা হলো এই কারণে যে, এ থেকে বুঝা যাবে আঞ্চলিক জোট গঠন কোন এলাকা বিশেষের ঘটনা নয়, এটা বিশ্বব্যাপী একটা প্রবলতা। উপরের অপূর্ণাঙ্গ লিস্টের ভিত্তিতেও যদি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের একটা মানচিত্র তৈরি করা হয়, তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীর কোন দেশই বলতে গেলে জোটবদ্ধতার বাইরে নেই–গোটা দুনিয়াটাই জোট-মানচিত্রে বিভক্ত হয়ে গেছে।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রবণতা একটা পুরানো ব্যাপার হলেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান এবং সামরিক জোটগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার পর এই পুরানো ব্যাপারটা ব্যাপক এবং শক্তিশালী প্রবণতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলা যায়, এই অর্থনেতক জোটগুলো সামরিক জোটগুলোর স্থান পূরণ করতে চাচ্ছে। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য বিশ্বের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার হাত থেকে আঞ্চলিক সহযোগিতার বর্ম দিয়ে নিজেদের রক্ষা করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নসাধন। তবে অনেকেই বলছেন রাজনৈতিক ভয়, রাজনৈতিক আত্মরক্ষা এবং রাজনৈতিক সংঘাত এড়াবার জন্যেও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মোড়কে অর্থনৈতিক জোট গড়ে উঠছে। যেমন ইউরোপীয়ান ইকোনমিক কমিউনিটির জন্ম হয়েছে রাজনৈতিক ভয় থেকেই। Joseph L. Brand নামের একজন সমীক্ষকের ভাষায় "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মাত্র ৫ বছর পর রাজনৈতিক ভয় থেকেই ইইসি'র গঠন প্রস্তাবিত হয়। ইউরোপীয়ান এই ঐক্যকে ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রতিষেধক মনে করা হয়েছিল।"

www.icsbook.info

তবে শুধু রাজনৈতিক ভয় নয় অনেকগুলো আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক জোট গঠনের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও কাজ করছে। বড় দেশগুলো আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব বা খবরদারী বজায় অথবা কায়েম রাখতে চায়। এর আবার অন্যদিকও আছে। যেমন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের মাধ্যমে ছোট ছোট দেশগুলো একত্রিত হবার সুযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বড় দেশের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে চায়। উদাহরণ হিসেবে সাউথ এশিয়ান আঞ্চলিক সহযোগিতা 'সার্ক'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। 'সার্ক-এর ৭টি দেশের মধ্যে ভারত বিশাল রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির দেশ। অন্য ছয়টি দেশ মিলেও ভারতের সমান নয়। সার্ক গঠনের মাধ্যমে ভারত মনে করছে সার্কের দুর্বল দেশগুলো উপর তার সব রকমের খবরদারীর একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে সার্কের অন্যান্য দেশ মনে করছে, সার্কের প্ল্যাট ফরমে তারা সম্মিলিত হাবার ফলে ভারতের অপপ্রভাব মোকাবিলার একটা সমন্বিত সুযোগ তারা পেয়েছে। এ দুটি রাজনৈতিক প্রবণতাই 'সার্ক'-এর মধ্যে সক্রিয় বলেই সার্ক-এর প্রতিটি পদক্ষেপ খুবই সাবধানী। সার্ক-এর আওতায় 'সাউথ এশিয়ান প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট, (SAPTA) গঠনের একটা সিদ্ধান্ত বেশ আগে হয়েছে, কিন্তু দ্রুত তা সামনে এগুচ্ছে না। এর কারণ সার্ক এর মধ্যে খুব বড় এবং খুব ছোট অর্থনীতি থাকায় এবং সার্ক-এর প্রধান দেশগুলোর অর্থনীতি প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় এখানে সমতা ও সহযোগিতা ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা সহজ নয়। ভয় আছে, ছোট অর্থনীতি বড় অর্থনীতির চাপে ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং বড় অর্থনীতির অসহায় বাজারে পরিণত হতে পারে ছোট অর্থনীতিগুলো। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট শক্তিশালী করার মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিশেষ করে ছোট রাষ্ট্রগুলোর অস্তিত্ব ও জাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্য দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকাও করা হয়ে থাকে। ইইসি-এর একটা দৃষ্টান্ত। ইউরোপীয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি আজ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে যা সমগ্র ইউরোপে অখণ্ড একটি রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগুচ্ছে। মোটামুটি একই সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ধর্মের অধীন ইউরোপের জন্য এটা স্বাভাবিক, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এটা স্বাভাবিক নয়। যে সব ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক নয়, সেখানে অর্থনৈতিক জোট বা এ ধরনের কোন ইউনিয়ন কখনই শোবা-সন্দেহ ও দ্বিধাগ্রস্ততার উর্ধ্বে উঠতে পারবে না। 'সার্ক' এরইএকটা দৃষ্টান্ত হতে পারে। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার একটি আঞ্চলিক ইউনিট। অনেকে একে বাণিজ্য-সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেছেন। পশ্চিমের একজন সমীক্ষক লিখেছেন, "রোমান সাম্রাজ্য থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মধ্যযুগের খৃস্টান ক্রুসেড থেকে বিশ শতকের ইসলামী আদর্শবাদ পর্যন্ত আড়াই সহস্র বছর ছিল সাম্রাজ্যের যুগ। আগের এই পুরাতন পৃথিবীর মৃত্যুর পর ধর্ম ও রাজনীতি প্রভাবিত তলোয়ার ভিত্তিক পরিবর্তনের পরিবর্তে নতুন

www.icsbook.info

পৃথিবীর উত্থান ঘটছে–যাকে নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থশক্তি, অন্য কথায় বাণিজ্য-সাম্রাজ্য।" বস্তুত অতীতের রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের বদলে আজকের বাণিজ্য সাম্রাজ্য পৃথিবীকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটসমূহ কোথাও এর পরিপূরক, কোথাও বা এর প্রতিবাদে গঠিত। সর্বত্রই চলছে অর্থনৈতিক একটা ঠাণ্ডা লড়াই। অনেকেই বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপের ইইসি' দেশগুলোর যে অর্থনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই চলছে, তারই একটা ফল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাড়াহুড়া করে অনুমোদিত হলো 'নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এ্যাগ্রিমেন্ট (NAFTA) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। "এশিয়া-প্যাসেফিক ইকনমিক কোপারেশন' (APEC) গঠনের। গ্যাট-এর খসড়া প্রস্তাব পাস হওয়ার চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৫ই ডিসেম্বর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় গ্যাট-এর ঐ প্রস্তাব পাস হোক, কিন্তু ইউরোপের বিশেষ করে ইইসি'র কিছু সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থের তা প্রতিকূল। সুতরাং তারা এই প্রস্তাব পাস হতে দেবে না। তারা যাতে এটা না করে তারই চাপ হিসেবে তাড়াহুড়ো করে NAFTA ও APEC কে সামনে এনেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যাতে করে ইউরোপ বুঝে গ্যাট পাস না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিকল্প পথ ধরবে। আবার APEC -এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশগুলোর অংশ গ্রহণকে ভালো চোখে দেখা হচ্ছে না।মালয়েশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদের মত রাজনীতিকরা APEC -এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণকে সমর্থন করেননি। তরা মনে করেন, শুধু এশীয় দেশগুলো নিয়ে পূর্ব এশিয়ায় একটি অর্থনৈতিক জোট গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই দ্বন্দ্ব আসলে বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব বর্তামনে গোটা দুনিয়ায় একটা প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে আসলে রাজনৈতিক স্বার্থ। যারা বলে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের যুগ শেষ হয়েছে, তারা আসলে দিবাস্বপ্ন দেখছেন। রাজনৈতিক সাম্রাজ্য চিন্তাই প্রকৃত পক্ষে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য পরিচালনা করছে। একজন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, "We may come to know the new economic world order as regional hegemony disguised as free trade' অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক প্রভুত্ব নতুন অর্থনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থার ছদ্মাবরণ।' আর আমরা বলতে পারি, নুতন অর্থনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থা আসলে নতুন রাজনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থার ছদ্মরূপ। সুতরাং বলা যায়, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের অধিকাংশই রাজনীতি-দুষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ফল এবং আগামী দিনের নতুন রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের মঞ্চ।

১১-০২-১৯৯৩

www.icsbook.info

॥ তিন ॥

সেদিন ইন্দোনেশিয়ায় সফল শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এশিয়া প্যাসেফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা' (APEC-এপেক- জোট তার লক্ষ্য অর্জনের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। শীর্ষ সম্মেলন বলেছে, আগামী দু'হাজার বিশ সাল নাগাদ এপেক-এর ১৮টি সদস্য রাষ্ট্র—যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, পাপুয়া নিউগিনি, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, চিলি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রুনাই, দঃ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, হংকং, জাপান এবং চীন—অবাধ বাণিজ্য এলাকা গঠন করবে। এটাই হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অবাধ বাণিজ্য এলাকা। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে APEC কে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। ১৮টি সদস্য রাষ্ট্র সকলেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এক মানের নয়, তাদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য এবং স্বার্থও এক নয় কিম্বা পরস্পরের পরিপূরক নয়। বরং এমন দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যাবে যে, এক দেশের জন্যে যা লাভ, অন্যদেশের জন্যে সেটা ক্ষতি। বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলো তথাকথিত অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তই হবে। এই কারণে তারা অবাধ বাণিজ্যের ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হলেও এজন্যে সময় বেঁধে দেয়ার তারা বিরোধিতা করেছে বা সময় বেঁধে দেয়া হোক, তা চায়নি অনেকেই। কিন্তু অবশেষে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে, তাদের আপত্তি কোন কাজে আসেনি। অবশ্য এটুকু কনসেশন তারা পেয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশগুলো দু'হাজার দশ সালের মধ্যে এ অঞ্চলের জন্যে অবাধ বাণিজ্যের দ্বার খুলে দেবে, অন্যদিকে কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদির মত বিকাশমান শিল্প অর্থনীতির দেশগুলো দু'হাজার বিশ সাল নাগাদ এই অবাধ বাণিজ্য নীতি কার্যকরী করবে।

অবশ্য এপেক-এর ঘোষণার সাথে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ-এর বক্তব্যের একটা বিরাট ফাঁক আছে। তিন পৃষ্ঠার এক বিবৃতিতে তিনি এপেক চুক্তি বাস্তবায়ন প্রশ্নে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, চুক্তিতে সময়সীমা সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় মালয়েশিয়া তার নিজস্ব গতিতেই মুক্ত বাণিজ্যের পথে এগুবো। তাঁর সাথে সদস্য রাষ্ট্রের অনেকেই একমত বলে তিনি জানান।

কিন্তু এই একমত হওয়া সত্ত্বেও এপেক-এর শীর্ষ সম্মেলন-উত্তর ঘোষণায় তাদের মতের কোন প্রতিফলন ঘটেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া যা চেয়েছে মোটামুটি সেটাই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত আকারে এসেছে। এই কারণেই ইন্দোনেশিয়ার এপেক শীর্ষ সম্মেলনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে বিরাট বিজয় বলে উল্লেখ করা

www.icsbook.info

হয়েছে। এরপরও হয়তো মালয়েশিয়ার মত স্বাধীন চেতা দেশগুলো চেষ্টা করবে অবাধ বাণিজ্যের সৌখিনতার চাইতে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি নজর দিতে। কিন্তু তাদেরকে হয় পরাজিত হতে হবে, নয়তো এক ঘরে হয়ে পড়বে। শীর্ষ সম্মেলনের বক্তব্যে এ হুমকিও পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করা হয়েছে যে, কোন দেশ না চাইলে তার ইচ্ছামত সময়ে অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থায় যোগ দিতে পারে। অর্থাৎ দু'একজনের বিরোধিতা বা দূরে থাকাকে এপেক ফোরাম এখন তেমন গুরত্ব দিচ্ছে না। যখন গুরত্ব দেয়া হতো, প্রস্তুতির সে পর্যায় এখন পার হয়ে গেছে। দরকষাকষির চাবি-কাঠি এখন এপেক নেতৃত্ব অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ ও চেষ্টা এবং অনেকের মতে তার স্বার্থেই এপেক গঠিত হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও মেক্সিকোকে নিয়ে নাফতা (NAFTA) গঠন করেছিল ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (EU) কে ভয় দেখাবার জন্যে। কিন্তু 'নাফতা'র স্বল্প পরিসর মুক্ত বাজার ইউরোপীয়ান ইউনিয়নকে ভয় দেখাতে পারেনি, নাফতা তাদের জন্যে কোন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেনি। এই ব্যর্থতার পটভূমিতেই 'এপেক-চিন্তা' কে জোরদার করা হয় এবং অবশেষে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ১৮টি দেশ নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠিত হয়। বলা যায়, এর মাধ্যমে 'ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন' এর বাইরে অবস্থিত সকল বিকশিত বা বিকাশমান শিল্প অর্থনীতির দেশসমূহকে জোটবদ্ধ করা হয়েছে মার্কিন নেতৃত্বে। কার্যত ঘিরে ফেলা হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে। ঘেরাও হয়ে পড়া EU এখন ভয় পাবার কথা।

কিন্তু EU-এর প্রতিক্রিয়া থেকে এই ভয়ের কোন আলামত দৃশ্যত প্রকাশ পায়নি। ইইউ তার প্রতিক্রিয়ায় এপেক কর্তৃক অবাধ বাণিজ্য এলাকা গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, এশিয়া উদার বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত নেয়ায় তারা খুশী হয়েছে। তবে ইইউ-এর গোটা বিবৃতির প্রতি একটু মনোযোগ দিয়ে নজর বুলালেই একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাদের আনন্দের মধ্যেও নিরানন্দ আছে। তাদের স্বাগত জানানোটা একেবারে নিঃশর্ত নয়। ইউ তার বক্তব্যে পরিষ্কার বলেছে, 'এপেক দেশগুলো যদি তাদের নিজেদের মধ্যে শুল্ক প্রাচীর অবসানের সাথে সাথে পৃথিবীর অবশিষ্ট দেশসমূহের বিরুদ্ধে নতুন শুল্কের প্রাচীর গড়ে না তোলে, তাহলে সেটা যেমন ইইউ-এর উপকার করবে, তেমনি উপকারে আসবে এপেকেরও।' ইইউ-এর এই আশাবাদের মধ্যে এপেক-এর সাথে তার প্রবল একটি শুল্ক যুদ্ধেরই আশংকা ব্যক্ত হয়েছে। এজন্যে ইইউ তার বক্তব্যের পরবর্তী অংশে গ্যাট চুক্তির প্রসঙ্গ তুলে বলেছে; 'এপেক গ্যাট চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি পুনরায় ঘোষণা করেছে এবং তারা গ্যাট চুক্তির প্রতি আশু অনুমোদন দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইইউ তার এই

www.icsbook.info

বিবৃতিতে এপেক দেশগুলোকে গ্যাট চুক্তির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির কথা এ জন্যেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়িত হলে গোটা বিশ্বই অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলে পরিণত হবে। এবং তখন এপেক এবং নাফতার বিশেষ ছোবল ইইউ-এর উপর এসে পড়বে না।

ইইউ-এর যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা কতদূর কার্যকর হবে? একটা বিষয় ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, গ্যাট চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্য যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারছে না। গ্যাট প্রণেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশগুলোই সম্ভবত এটা বেশি উপলব্ধি করছেন। তা না হলে গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিশ্ব ভিত্তিতে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টির বদলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন 'নাফতা'কে নতুনভাবে সক্রিয় করেছে, কেন আবার এপেক অঞ্চল নিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ এক মুক্ত বাজার অঞ্চল গঠন করা হচ্ছে? এর সরল অর্থ একটাই যে, গ্যাট-ফ্যাট কিছু নয়, সামনে আসছে বাণিজ্য যুদ্ধ। সে যুদ্ধের জন্যেই বড় বড় অর্থনৈতিক মোড়লরা নিজেদের শক্তি সংহত করার জন্যে নিজ নিজ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গঠনে উঠে পড়ে লেগেছেন।

আজকের পৃথিবীর চারদিকে চলমান আর্থ-বাণিজ্যিক তৎপরতা বিশেষ করে অর্থনৈতিক জোটবদ্ধতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিগত ঠাণ্ডা যুদ্ধ কালীন সংঘাত মুখর রাজনৈতিক জোটবদ্ধতার একটা প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। ঠাণ্ডা যুদ্ধকালে দুই প্রতিপক্ষের কে কাকে ঘিরে ফেলবে, তারই প্রবল প্রতিযোগিতা আমরা দেখেছি। সোভিয়েত ব্লকের ওয়ারশ জোটের মোকাবিলায় সৃষ্টি হয়েছিল ন্যাটো জোট। তারপর সোভিয়েত ও চীনকে দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্যে তৈরী হয়েছিল সিয়াটো ও সেন্টো জোট। আর এর মোকাবিলার জন্যে সোভিয়েত আশীর্বাদ নিয়ে গড়ে উঠেছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। নাম এর জোট নিরপেক্ষ হলেও এর মূল কাজ ছিল মার্কিন জোটের পাল্টা একটা শক্তির সৃষ্টি করা। আজকের অর্থনৈতিক জোটগুলোও বর্তমানে এই ধরনের প্রতিযোগিতা এবং একে অন্যকে ঠেকানোর মনোভাব নিয়েই গড়ে উঠছে। কয়েকটি মহাদেশে ইতিমধ্যে দুই ডজনেরও বেশি অর্থনৈতিক জোটের আবির্ভাব ঘটেছে। এর অনেকগুলো বেশ পুরানো। আর এগুলোর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতির পর আজ বাণিজ্য প্রতিযোগিতা তীব্রতর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব অর্থনৈতক জোটের বিকাশ ঘটছে। তাদের লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে আসন্ন বাণিজ্য যুদ্ধে জয়লাভ করা এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজ নিজ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করা। এই ইচ্ছা প্রকাশের ক্ষেত্রে এখন খুব একটা রাখ-ঢাকও করা হচ্ছে না। এপেক সম্মেলনেও এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। অবাধ বাণিজ্য সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর এপেক নেতৃবৃন্দ ইন্দোনেশিয়ায় বলেছে, তাদের ঐকমত্য ভিত্তিক আগামী শতক অভিমুখে তাদের

www.icsbook.info

অগ্রযাত্রা তাদের দেশগুলোকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করবে। তারা আরো বলেছেন, "আমরা বিশ্ব-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ জোরদার করার ব্যাপারে এপেকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয়ী।" এই একই প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছে ইউ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক জোটও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইত্যাদির মত অর্থনৈতিক পরাশক্তিও এককভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা করে যাচ্ছে। জোট এবং এই একক শক্তিসমূহের মধ্যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এই প্রতিযোগিতা ডেকে আনবে আর এক ঠাণ্ডা যুদ্ধ, অর্থনৈতিক ঠাণ্ডা যুদ্ধ। গত চার দশকের রাজনৈতিক ঠাণ্ডা যুদ্ধ বিশ্ব যুদ্ধে পরিণত হয়নি। কিন্তু অর্থনৈতিক ঠাণ্ডা যুদ্ধ সেই বিশ্ব যুদ্ধই অবশেষে ডেকে আনতে পারে। কেউ আমরা ভুলে যাইনি, পুঁজির নিরাপত্তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ছিল।

বিশ্বযুদ্ধ হোক বা অর্থনৈতিক যুদ্ধই হোক, সে যুদ্ধে আমরা বাংলাদেশের মত দেশগুলো পোল্যান্ডের ন্যায় রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারবো না। দ্বন্দ্বমান পক্ষগুলোর মার্কেট দখলের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হতে হবে আমাদের। মার্কেট দখলের এ যুদ্ধে যদি আমরা কোন পক্ষ হতে পারতাম অথবা সবল ভোক্তা ও শক্তিশালী রফতানি অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারতাম, তাহলে এ শোষণ অবস্থা থেকে বাঁচা যেতো।

এ সম্ভাবনা আমাদের কাছে স্বপ্ন। কিন্তু এশিয়ারই অনেক দেশ প্রমাণ করেছে এ স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করা কঠিন নয়। এশিয়ার দেশ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, চীন আজ এপেক-এর অংশীদার। তারা বাণিজ্য যুদ্ধে একটা অবস্থানে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারবে, কিন্তু আমরা হবো লড়াই-এর অসহায় শিকার। এশিয়ার এদেশগুলো কোন জাদু বলে এ অবস্থানে উন্নীত হতে পারল? তাদের সবারই বয়স আমাদের কাছাকাছি। জাপানের পুনর্জন্ম হয়েছে ১৯৪৫ সালে। ফিলিপাইন স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৬ সালে, কোরিয়া ১৯৪৮, মালয়েশিয়া ১৯৫৭, ইন্দোনেশিয়া ১৯৪৯, তাইওয়ান ১৯৪৯ এবং চীন ১৯৪৯ সালে। জাপান ১৯৪৫ সালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল বলা যায়। তার জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি। তার কৃষি জমি আমাদের চেয়ে কম (জাপান ১৩% আর বাংলাদেশ ৬৭%)। জাপানের খনিজ সম্পদ অনুল্লেখযোগ্য, কিন্তু বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ অনুল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু এরপরও জাপানের আজ মাথা প্রতি জাতীয় উৎপাদন ১৯ হাজার ১০০ ডলার, আর বাংলাদেশের ২০০ ডলার। যুদ্ধ বিধবস্ত কোরিয়ার এই আয় ষাট-এর দশকে ছিল ১০০ ডলারের নিচে (সম্ভবতঃ ৬৭অথবা ৮৭ ডলার), কিন্তু আজ তা ৬ হাজার ৩শ' ডলার। এশিয়ার উল্লেখিত অন্যান্য দেশের উন্নয়ন চিত্রও কমবেশি এই রকমের। আবারও প্রশ্ন দাঁড়ায় কোন জাদু বলে তারা এ অবস্থায় পৌছতে পেরেছে?

www.icsbook.info

এই প্রশ্নের সুন্দর জবাব দিয়েছেন বিশ্ব ব্যাংকের 'জন পেগ। তার মতে এশিয়ার ঐ দেশগুলোর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ থেকে পৃথক। সে বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ (ক) গত তিন দশকে উচ্চ হারের জাতীয় সঞ্চয় ভিত্তিক তাদের পুঁজির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ২০ ভাগ, (খ) তাদের জনশক্তির উচ্চমানের দক্ষতা, (গ) উচ্চ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (ঘ) শিল্পপণ্যের দ্রুত রফতানি প্রবৃদ্ধি এবং (ঙ) কৃষি খাতে বিরাট রকমের উৎপাদন বৃদ্ধি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের পেছনে দেশগুলোর সার্বিক পরিবেশগত শৃংখলাকে ভিত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে। আর একটি মজার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন অর্থনীতির রাজনীতিক সমীক্ষক মিঃ এস এস কোথারী। কলকাতায় দৈনিক স্টেটসম্যান-এ লিখা এক নিবন্ধে তিনি বলেছেন, "বড়দের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য'-কনফুসীয় সংস্কৃতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঐ দেশগুলোর উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছে।" এই বৈশিষ্ট্যকে আমি 'মজার' বলে অভিহিত করেছি, কারণ ধর্মীয় আদর্শ-সংস্কৃতি যে উন্নয়নের ভিত্তি ও শক্তি হতে পারে, তা আমাদের অনেকের কাছে ভূত দর্শনের মতই মনে হয়। আমার মতে, অনেকের কাছে যা ভূত দর্শন, সেটাই এশিয়ার ঐ দেশগুলোতে উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। বড়দের প্রতি সম্মান ও আনুগত্যের আদর্শ ছিল সে দেশগুলোতে সার্বিক পরিবেশগত শৃংখলা বিধানের এক মৌল ভিত্তি এবং সার্বিক পরিবশেগত শৃংখলাই ছিল সে দেশগুলোর উন্নয়নের চাবিকাঠি।

আর এই দুই ভিত্তির অভাবের কারণেই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন ফানুসের মত উড়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর কমপক্ষে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা পেয়েছি আমরা উন্নয়নের জন্যে। যার তিন হাজার কোটি টাকাও রফতানি শিল্পখাতে সফল বিনিয়োগ হয়নি। প্রাপ্ত সাহায্যের একটা অংশ নানা খাতে অপচয় হয়েছে, অন্য অংশ পরিণত হয়েছে কালো টাকায়। এশীয় ঐ দেশগুলোর কনফুসীয় সংস্কৃতির মত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভয় এবং ইসলামের শিক্ষা যদি আমাদে জীবনে সক্রিয় থাকতো, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই অবিচার-অপচয় হতে পারতো না। যারা বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাদের পক্ষে অর্থনীতি তো দূরে, দেশ ও জাতির বুকেও ছুরিকাঘাত করা সম্ভব। অর্থ, বিত্ত, পরিকল্পনা, প্রকল্প সব থাকা সত্ত্বেও আমরা পিছিয়ে পড়েছি এই মৌল কারণেই, এবং এই পিছিয়ে পড়া আসন্ন অর্থ-বাণিজ্য যুদ্ধে আমাদেরকে অসহায় ইন্ধনে পরিণত করবে।

২১-১১-১৯৯৪

www.icsbook.info

দুই সভ্যতার সংঘাত ও সমঝোতার প্রশ্ন

॥ এক ॥

এ বিশ্বাসটা ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কমিউনিজমের পতনের পর পুরনো সেই ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ বা সংঘাত শেষ হয়নি। মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিজয়ী শক্তি পশ্চিমী দুনিয়া এখন টার্গেট করেছে ইসলামকে। ফলে কমিউনিজমের সাথে যে সংঘাত বেধেছিল, ইসলামের সাথে সেই সংঘাত আজ বাধতে যাচ্ছে।

এই বিশ্বাস শুধু যে মুসলমানদের কারও কারও তা নয়, পশ্চিমের কিছু বড় পণ্ডিতও এই একই কথা বলছেন। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির 'জন এম, অলিন ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ'-এর ডাইরেক্টর খ্যাতনামা রাষ্ট্র বিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর 'The clash of civilizations' নিবন্ধে অতীতের বিশ্ব সংঘাতসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেছেন, সর্বশেষ পর্যায়ে আজ সংঘাত আসছে সভ্যতাসমূহের মধ্যে। এই সংঘাত হবে পশ্চিমী সভ্যতার সাথে ইসলামী সভ্যতার (there will be clash between western and Islamic civilization)।

মিঃ হান্টিংটন তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিও প্রদর্শন করেছেন। তার মতে সভ্যতাগুলোর মধ্যে বিতর্ক বাড়ছে। এর ফলে সচেতনতা বাড়বে যা সম্প্রসারণ ঘটাবে সভ্যতার, যা পুনরায় আন্তঃসভ্যতা, মতপার্থক্য ও বিরোধের পরিসর বাড়িয়ে তুলবে। তার দ্বিতীয় যুক্তি হলো, পশ্চিমী ও ইসলামী সভ্যতায় ঝগড়া চলেছে তেরশ' বছর ধরে। মাঝখানে ইউরোপের আদর্শিক বিভাজন ও বিরোধ মিটে যাবার পর পশ্চিমী ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যেকার সাংস্কৃতিক বিভাজন পুনরায় আজ মাথা তুলেছে। হান্টিংটন তৃতীয় যে কারণ দেখিয়েছেন তা হলো, ইসলাম ও পশ্চিমের মধ্যকার বহু শতাব্দীর পুরাতন সামরিক সংঘাতের বিষয়টি মুছে যেতে পারে না এবং তা মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম দেশগুলোর পশ্চিম বিরোধী প্রবণতার বৃদ্ধি ঘটাবে। চতুর্থ কারণ হিসেবে তিনি ভারতের সাংবাদিক এম, জে, আকবরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলছেন, মরক্কো থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত ইসলামী জাতিগুলোর নুতন বিশ্ব ব্যবস্থার সংগ্রাম নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে। এছাড়া মিঃ হান্টিংটন সুদান ও চাদের গৃহযুদ্ধ, নাইজেরিয়া ও আফ্রিকান শৃংগের সংঘাত, ভারতে বাবরী মসজিদ ধ্বংস হওয়া ও হিন্দু-মুসলিম দাংগা, বসনিয়া ও ফিলিপাইনে খৃস্টানদের সাথে রক্তক্ষয়ী লড়াই, ফিলিস্তিনে ইহুদী ও বার্মা থাইল্যান্ড অঞ্চলে বৌদ্ধদের সাথে দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে তাঁর যুক্তির পক্ষে পঞ্চম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

www.icsbook.info

মিঃ হান্টিংটনের দুই সভ্যতার এই যুদ্ধ-তত্ত্বকে পশ্চিম দেশের অনেকেই হাস্যকর বলে অভিহিত করছেন এবং তার যুক্তিগুলোকে কানাকড়ি মূল্য দিতে চাচ্ছেন না। এদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মিঃ এ্যান্থনী লেক খুবই উচ্চকণ্ঠ। তিনি অতি সম্প্রতি, ৬ই মে, '৯৪, ওয়াশিংটনস্থ 'ইনস্টিটিউট ফর নেয়ার ইস্ট পলিসি'র এক সেমিনারে 'দুই সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, "ভবিষ্যতের সংঘাতকে আমরা 'সভ্যতার সংঘাত' বলে মনে করি না। কেউ কেউ বলছেন, ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্ব মৌলিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যেখানে পশ্চিমী উদারনৈতিক গণতন্ত্র ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক সভ্যতার বিরোধিতা করছে। এদের তত্ত্ব অনুসারে পশ্চিম এবং অবশিষ্টদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ ছাড়া সমঝোতার কোন সাধারণ ক্ষেত্রই বর্তমান নেই। তাঁরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশিষ্ট একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে কমিউনিজমের শূন্যস্থান পূরণকারী ও পশ্চিমের প্রতি হুমকি ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করে দেবে। .... আমরা এ ধরনের মতের সাথে তীব্রভাবে দ্বিমত পোষণ করি। সন্দেহ নেই মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা দুনিয়ায় একটা মৌলিক বিভাজন আছে। কিন্তু আজকের সে ভেদরেখার মুখ্য বিষয় সভ্যতা কিংবা ধর্ম নয়। বরং এই ভেদরেকা সৃষ্টি হয়েছে গণনির্যাতন, গণমুখী সরকার, বদ্ধদ্বার নীতি এবং মুক্তপ্রাণতা এবং উদারতা এবং চরম পন্থার মধ্যে।"

মিঃ এ্যান্থনী লেক তাঁর বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন, "আমরা এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করি যে, ইসলামী বিশ্বের প্রচলিত মূল্যবোধের সাথে পশ্চিমী অথবা গণতান্ত্রিক নীতিবোধের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। কারণ, ঐ মূল্যবোধ, যার বড় বৈশিষ্ট্য হলো পরিবার ও সমাজ প্রাণতা এবং বিশ্বাস ও সৎ কাজের সাথে সংশ্লিস্টতা, আমাদের কাছে কোন অপরিচিত বিষয় নয়। আমাদের জন্যে এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার জনগণ তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে এই মূল্যবোধের পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক করছে। গোটা দুনিয়ার মতই এই অঞ্চলের মানুষ গণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠা, তাদের মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং তাদের জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার পথ সন্ধান করছে। তাদের অনেকে যে ইসলামের দিকে ফিরে তাকাবে–এটা অস্বাভাবিক নয়, বিস্ময়েরও কোন বিষয় নয়। বরং এর মধ্যেই রয়েছে সার্বজনীন বাস্তবতা। সুতরাং এটা কোন বিরোধের বিষয় হিসেবে কোথাও কাজ করছে না।"

এরপর মিঃ এ্যান্থনী লেক তার এ যুক্তির সমর্থনে দৃষ্টান্তের সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, "আজ বিশ্ব বিবেককে পীড়া দিচ্ছে যে বিষয়, তা 'সভ্যতার সংঘাত' নয়। যেমন বসনিয়াতে আমাদের শত্রু হলো জঘন্য ধরনের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ। সার্বীয়রা তাদের নগ্ন আক্রমণ ঢাকা দেয়ার জন্যে বলতে পারে যে তারা মুসলমানদের পশ্চিমমুখী অগ্রসরকে বাধা দিচ্ছে। আসলে এটা মিথ্যা কথা।

www.icsbook.info

আমরা এটা মানি না। বসনিয়ায় একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে খৃস্টান ও মুসলমানরা শান্তির সাথে বাস করবে, আমরা সমর্থন করি। সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখলের সময় ইসলামের শ্লোগান দিয়েছিল। আসলে ইসলাম সেখানে ইস্যু ছিল না। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ লিবিয়া ও রক্ষণশীল সুদান দুইয়েরই বিরোধিতা করি। ইসলাম এখানে ইস্যু নয়। আমরা বিরোধিতা করি তাদের কিছু চরম পন্থার। অনুরূপবভাবে কিছু ইসলামী গ্রুপ তাদের চরম পন্থার কভার হিসেবে ইসলামকে ব্যবহার করছে। আমরা যখন এদের বিরোধিতা করি, তখন সেটা ইসলাম বিরোধিতা অবশ্যই নয়।"

মিঃ এ্যান্থনী লেক এরপর তাদের তিন দফা রাষ্ট্রনীতির কথা ঘোষণা করেছেন-যার ভিত্তিতে তাদের বিদেশ নীতি পরিচালিত হয়। এক, উৎসাহের সাথে আরব-ইসরাইল শান্তির পথ অনুসরণ, দুই, যে সব দেশ ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষ চরমপন্থা বা সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করে তাদের নিরস্ত করা এবং তিন, যে সব দেশ মুক্ত বাজার ব্যবস্থা চালু, গণতন্ত্রের বিকাশ এবং ব্যাপক ধ্বংসকরী অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করে তাদের সহায়তা দান। সম্ভবত মিঃ এ্যান্থনী তাদের এসব নীতির ভিত্তিতেই তার উপরোক্ত বক্তব্য দাঁড় করিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মার্কিন সরকারের নিকট প্রাচ্য বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ রবার্ট পেলেট্রু 'মিডল ইস্ট পিস কাউন্সিল' কর্তৃক আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে ইসলাম সম্পর্কে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন। মৌলবাদের বিরোধিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল এ কথা স্বীকার করে তিনি বলেছেন, "ইসলামী মৌলবাদ শব্দটি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই অসংগত ব্যবহার করা হয়। কখনও সৌদি আরবের ক্ষেত্রে, কখনও যারা এমনকি গঠনমূলক পথে তাদের বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা অথবা মূল্যবোধের উজ্জীবন অথবা জীবনের পরিশুদ্ধি চায় অথবা দুর্নীতিবাজ সরকার বা পশ্চিমী অপপ্রভাবের প্রতিবাদ করে তাদের ক্ষেত্রে, কখনও যারা ইসলামী গ্রুপের নাম নিয়ে সন্ত্রাস ও সহিংসতায় লিপ্ত তাদের ক্ষেত্রে ইসলামী মৌলবাদ শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। 'পলিটিক্যাল ইসলাম শব্দেরও অনুরূপ ব্যবহার হয়। 'ইসলামীস্ট' বলতেই আজ রজনৈতিক লক্ষ্য-উজ্জীবিত মুসলিমকে বুঝানো হচ্ছে। এই বিষয়টাকে আমরা অন্যায় মনে করি না। বৈধ এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল বহু মুসলিম গ্রুপকে দেখা যাবে রাজনৈতিক লক্ষ্যে উজ্জীবিত। অবশ্য এমন কিছু ইসলামী গ্রুপ আছে যারা আইন ভংগ করে, অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের মত চরম পন্থা অনুসরণ করে। এমন চরমপন্থী গ্রুপ ধর্মনিরপেক্ষও রয়েছে।

অন্যান্য গ্রুপের মতই ইসলামী মৌলবাদী বলে পরিচিতি চরমপন্থী ইসলামী গ্রুপের কার্যকলাপের দিকে অংগুলী সংকেত করে রবার্ট পেলেট্রু বলছেন যে, "ইসলাম যদিও মহান ধর্ম, যদিও ইসলামের ঐতিহাসিক সভ্যতা আমাদের নিজেদের

www.icsbook.info

সংস্কৃতিকেও সমৃদ্ধ করেছে, যদিও অতীতে ইসলাম পৃথিবীর অনেক স্থানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছে, তবু আমাদের সংবাদ মাধ্যমে রাজনৈতিক সহিংসতা, জাতিগত দ্বন্দ্ব অথবা সন্ত্রাসমূলক কাজের মধ্যেই ইসলাম ও ইসলামী মৌলবাদকে প্রত্যক্ষ করা হয়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা, মিসর ও আলজিরিয়ায় বিদেশীদের উপর হামলা এবং ইরান ও লিবিয়ার বিভিন্ন ঘটনা মার্কিন জনগণের মধ্যে এই ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছে।"

এসব বক্তব্যের দ্বারা মিঃ এ্যান্থনি লেক এবং রবার্ট পেলেট্রু এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম একটা মহান ধর্ম, ইসলামের সাথে পশ্চিমের কোন বিরোধ নেই। তাদের বিরোধ চরমপন্থা ও চরমপন্থীদের সাথে যাদের মধ্যে কিছু ইসলামপন্থীও রয়েছে। মিডিয়ার কারণে পশ্চিমীরা সহিংসতা ও সন্ত্রাস ধরনের কাজের মধ্যেই ইসলামকে অবলোকন করছে। এ কারণে তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি আছে, বিরোধিতাও আছে। কিন্তু এর ফলে ইসলামী সভ্যতার সাথে পশ্চিমী সভ্যতার যুদ্ধ লেগে গেছে বা লাগবে এ কথা ঠিক নয়।

তাঁদের এসব কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, পশ্চিমা দুনিয়া না হয় ইসলামের নামে সংঘটিত সহিংস ও সন্ত্রাসের ঘটনায় ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত হলো, কিন্তু বিশ্বের মুসলমানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা দুনিয়া সম্পর্কে এই ধারণার কারণ কি যে, পশ্চিমীরা সার্বিকভাবে ইসলামকে বৈরিতার চোখে দেখছে এবং তারা ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে চায় না? 'চরমপন্থী' ইসলামী গ্রুপের কথিত 'সহিসংতা' ও সন্ত্রাসের যে বিরোধিতা পশ্চিম করে শুধু তা দেখেই কি মুসলিম জনমনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে? এমন সন্ত্রাস ও সহিংসতার ঘটনা দুনিয়াতে কয়টি ঘটেছে? তাছাড়া সে সব ঘটনার অধিকাংশই কোন না কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ঘটনা এবং সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কারণ থেকেই তা সৃষ্ট। এসব ঘটনার প্রতি মার্কিন বিরোধিতা এমন কোন দর্শনীয় ব্যাপার ছিল না যে, তা মুসলিম বিশ্বে মার্কিন বা পশ্চিম বিরোধী জনমত সৃষ্টি করেছে।

আসল ব্যাপার হলো মুসলিম বিশ্বে মার্কিন বা পশ্চিমবিরোধী একটা মনোভাব সৃষ্টির মূলে রয়েছে লম্বা একটা পটভূমি। সন্দেহ নেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ের মার্কিন বিরোধী বামপন্থী প্রচারণার একটা ধ্বংসাবশেষ এখনো সক্রিয় রয়েছে, তবে খোদ মার্কিন পলিসিই মুসলমানদের মার্কিন বিরোধী সেন্টিমেন্টের জন্য দায়ী। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় মার্কিন সরকারের ফিলিস্তিন-নীতির কথা। মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত মার্কিন পলিসির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইসরাইলের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বিধান। বিস্ময়ের ব্যাপার, যে ইসরাইলকে সৃষ্টির ব্যাপারে বৃটেন ও রাশিয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিল, সেই ইসলাইলকে রক্ষা ও লালনের বিষয়টাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একার কাঁধে তুলে নেয়। এটা করতে গিয়ে গোটা মুসলিম বিশ্বের জনমতকে পদদলিত

www.icsbook.info

করা হয়েছে। এই আহত জনমতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রাথমিক কাশ্মীর নীতি ও আফগান নীতির প্রলেপ দিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারেনি। তার উপর রাশিয়া কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের দৃশ্যপট থেকে সরে যাওয়ার পর এই দুই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ভোল পাল্টায়, তাতে মুসলিম জনমতের ধারণা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগের নীতিটা ছিল রুশ বিরোধিতার ফল এবং বর্তমান নীতি ইসলাম ও মুসলমানদের কোন সুযোগ না দেয়ার মত ইচ্ছারই অভিব্যক্তি। এ ধারণা যে ভুল এ কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারেনি। কুয়েত উদ্ধারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা পারন করেছে তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে প্রাপ্য প্রশংসা পায়নি। কারণ দুইটি। এক, ইরাকী দখলদারী ও ফিলিস্তিনের ইহুদি দখলদারীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক দৃষ্টিতে দেখেনি দুই, কুয়েত উদ্ধার প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেল স্বার্থ মুখ্য ছিল। তাদের এই ধারণা যে ভুল ছিল মুসলিম জনমতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা বুঝাতে সক্ষম হয়নি। বসনিয়ার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ইউরোপ থেকে অনেক ভালো, অনেক ভালো ভালো উদ্যোগ তারা নিয়েছে। কিন্তু মুসলিম জনমত দু'চোখ মেলে দেখেছে সেদিনের আগ্রাসী ইরাক এবং এ দিনের আগ্রাসী সার্বদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক দৃষ্টিতে দেখছে না, যদিও সার্বরা ইরাকের চেয়ে অনেক বেশি জঘন্য।

এসব কারণ থেকে মুসলিম জনমতের এ ধারণা স্বাভাবিকভাবেই জন্মেছে যে, বিশ্বাস ভিত্তিক দুই সভ্যতাকেই ভেদ রেখা হিসেবে ধরা হচ্ছে, ন্যায় - অন্যায়, গণতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্র, উদারতা-চরমপন্থা, ইত্যাদিকে নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি তার সম্পর্কে ভুল বা বিরূপ ধারণার জন্য দায়ী। সে দৃষ্টিভঙ্গিটা হলো, যারা গণতন্ত্রকে গণতন্ত্র ধ্বংসের বাহন হিসেবে ব্যবহার কর, তাদের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈরীমনোভাবাপন্ন (We are suspicious of those who would use the democratic process to come to power, only to destroy that process in order to retain power and political dominance). এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই আলজিরিয়ার ইসলামপন্থী গণতন্ত্রীরা নির্বাচনে জিতেও 'গণতন্ত্রের মুরব্বী' মার্কিনীদের কোন সহানুভূতি-সমর্থন পায়নি। আলজিরিয়ার স্বৈর শাসকরা যখন নির্বাচন বাতিল করে নির্বাচন বিজয়ী ইসলামী সলভেশন পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলেনি। অথচ এর পাশাপশিই মুসলিম জনমত দেখেছে, বার্মার নির্বাচন বিজয়ী সুকি ও তার দলের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গোটা পশ্চিম কত সোচ্চার এবং তারা সুকিকে নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বৈষম্য দৃষ্টির কারণ এই যে, সে এবং গোটা পশ্চিম মনে করেছে যে, আলজিরিয়ার নির্বাচন বিজয়ী ইসলামিক সলভেশন পার্টি আসলেই গণতন্ত্রী নয়, ক্ষমতায় গেলে তারা গণতন্ত্র রাখবে না। এই মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি নিছকই কল্পনাপ্রসূত-এর পক্ষে কোন

www.icsbook.info

প্রমাণ সে দিতে পারবে না। ইরানেও বহু দলীয় ব্যবস্থা আছে, নির্বাচন আছে। আর ইরান রাজনৈতিক ভাবে যা করছে, তার সবটুকুই ইসলামী এ দাবী কেউ করেনি। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আগাম ধারণা নিয়ে থাকে যে, ইসলামী সলভেশন পার্টি যেহেতু ইসলামী তাই যে গণতন্ত্রী নয় তাহলে বলতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে ইসলামকেই আসামী হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে। সে কার্যত বলতে চাচ্ছে, ইসলামে গণতন্ত্র নেই। উল্লেখ্য, এই কথা বলার মত লোক পশ্চিম দেশে কিংবা তাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেক আছে। ইসরাইলের রাষ্ট্র বিজ্ঞানী মার্টিন ক্রোমার বলেছেন, Militant Islamic groups, by nature, cannot be democratic, pluralistic, egalitarian or pro-western, এখানে মিঃ ক্রোমার-কথিত 'মিলিট্যান্ট' শব্দ এমন একটা পরিভাষা, যা সব ইসলামী দল ও গ্রুপের উপর প্রয়োগ করে বলা যায় যে, তারা ডেমোক্রেটিক নয়। আরেকজন ঐতিহসিক Bernard Lewis আরেকটু বিস্তারিতভাবে এই কথাই বলেছেন। তার মতে–"ইসলাম এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্র পরস্পর স্বাভাবিক সহযোগী হতে পারে না। (The nature and history of Islam do not make liberal democracy and Islam natural bed fellows)। ইসলাম না জেনে ইসলামিক বিশেষজ্ঞ সাজা এসব পণ্ডিতদের কথাই যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসের বিষয় হয়, তাহলে আলজিরিয়ার ইসলামপন্থী গণতন্ত্রীদের তার অবিশ্বাস করারই কথা।

যদি তাই হয়, তাহলে মিঃ এ্যান্থনী লেক এবং রবার্ট পেলেট্রর উক্তি, আজকের সংঘাত দুই সভ্যতার অর্থাৎ ইসলাম ও পশ্চিমী সভ্যতার সংঘাত নয়, ধোপে টিকছে না। কারণ ইসলামে যদি গণতন্ত্রই না থাকে, তাহলে গণতন্ত্রই যার প্রাণ বলা হয়, সেই পশ্চিমী সভ্যতার সাথে ইসলামের সহাবস্থান চলে কি করে?

আর যদি মিঃ এ্যান্থনি লেক ও রবার্ট পেলেট্রর কথা সত্য হয়, যদি সত্য হয় যে, তারা বিশ্বাস করেন ইসলামে গণতন্ত্র আছে, তাহলে আলজিরিয়ার ক্ষেত্রে তদের পলিসি ঠিক হয়নি। তাকে অবশ্যই বিশ্বাস কতে হবে যে, প্রকৃত ইসলামী গ্রুপ ও দল শতকরা একশ' ভাগই গণতন্ত্রী। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইলেকশন বা সিলেকশন-এর কথা মানুষ যখন চিন্তা করতেও শিখেনি, তখন ইসলাম মানুষকে এ জ্ঞান দিয়েছে। শুধু জ্ঞান দেয়াই নয়, তা কার্যকরী করেও দেখিয়েছে। রাষ্ট্র পদ্ধতি ও নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলাম আহলে রায়দের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে। এর কারণ, ইসলাম সব কালের, সব পরিবেশের জন্যে। এটা ইসলামের কোন সীমাবদ্ধতা নয়, বরং এটা তার প্রগতিশীলতারই একটা বড় প্রমাণ।

মূল কথা হলো, ইসলামী ও পশ্চিমী সভ্যতার সংঘাতের বিষয়টি মিঃ এ্যান্থনী লেক ও রবার্ট পেলেট্র অস্বীকার করলেও এর একটা অস্তিত্ব আছে। আবার সংঘাতের ভিন্ন রকম যে ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছেন, সেটাও একটা নিরেট বাস্তবতা। এই বাস্তবতা

www.icsbook.info

হলো, দুই সভ্যতা পাশাপাশি থাকলেই তাদের মধ্যে সংঘাত অবধারিত নয়। বিশেষ করে ইসলামী ও পশ্চিমের খৃস্টান ধর্ম প্রভাবিত সভ্যতার মধ্যে সংঘাতের চেয়ে মৈত্রীর উপাদানই বেশি। মৌল বিশ্বাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি অনেক দিক দিয়েই এ দু'য়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আবার পশ্চিমী সভ্যতাকে খৃস্টান না বলে যদি উদারনৈতিক গণতন্ত্রভিত্তিক সভ্যতা বলা হয়, তবু গণতন্ত্র, মানবাধিকার, যুক্তিবাদ, প্রভৃতি অনেক বিষয়েই এর সাথে ইসলামের অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে। এর পরেও, আমি যা বলেছি এবং মিঃ হান্টিংটন যা বলেছেন, দুই সভ্যতার মধ্যে সংঘাতের অস্তিত্ব রয়েছে। এ দুয়ের মধ্যে আজকের যে সংঘাত তার কারণ পুরোপুরিই রাজনৈতিক। সকলেই আমরা জানি, ভৌগোলিক ঔপনিবেশিকতা থেকে পশ্চিম আজ সরে গেলেও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশ সে নুতন করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর সাথে আছে তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তি। এ তিনের শক্তিতে বলিয়ান পশ্চিম আজ মুসলিম অথবা উন্নয়নশীল দেশের কাছ থেকে আনকন্ডিশনাল আনুগত্য চাচ্ছে। ইসলামের অদম্য স্বাধীন শক্তি এ পথে তাদের সবচেয়ে বড় বাধা। আর ইসলামের এ শক্তি ধারণ করছে পশ্চিমীরা যাকে মৌলবাদী বলে সেই মৌলবাদীরা, অন্য কথায় ইসলাম। এখানে এসেই এই দুই সভ্যতার সংঘাত সামনে এসে যায়, যাকে মিঃ এ্যান্থনী লেকরা অস্বীকার করছেন।

এরপরও আমরা মিঃ এ্যান্থনী লেক ও রবার্ট পেলেট্রু যা বলেছেন, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চাই। চাই আমরা দুই সভ্যতার পাশাপাশি অধিবাস। এজন্যে প্রয়োজন, পশ্চিমের বড় ভাইগিরি-রাজনীতির অবসান। তারা অবশ্যই নানা দিক দিয়ে বড়, কিন্তু এই বড়ত্বকে আগ্রাসী রূপ না দিলেই চলে। এটুকু হলেই দুই সভ্যতার লোকদের সংঘাত শতকরা শত ভাগ না হলেও আশি ভাগ কমে যাবে এবং সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ বিস্তৃত হবে। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও যে সহিংসতা ও সন্ত্রাস রয়েছে তাও দূর হয়ে যাবে। কারণ দূর হওয়ার ফলে দুই সভ্যতার সহযোগিতা ও সহনশীলতার এমন একটি সুন্দর বিশ্ব সবার কাম্য।

২৮-০৭-১৯৯৪

॥ দুই ॥

পশ্চিমের একটি মর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকা 'দি ইকনমিস্ট ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধমান সংঘাতের মূলে যে কারণ রয়েছে তাকে রাজনৈতিক বলে অভিহিত করেছে। বলেছে, যে বেসিক আইডিয়ার উপর দুই সভ্যতা দাঁড়িয়ে তাতে কোন বিরোধ নেই। 'দুই সভ্যতার মধ্যে আজকের যে সংঘাত তা প্রধানত আদর্শিক কারণজাত'- এ যুক্তি ইকনমিস্ট প্রত্যাখ্যান করে। ইকনমিস্টের মতে দুই সভ্যতার দুই অঞ্চলে এমনসব রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণ ঘটেছে যা সৃষ্টি করেছে এই বিরোধ।

www.icsbook.info

ইকনমিস্টের এই কথা অতীতে পশ্চিমের অনেকেই বলেছেন এবং এখনও অনেকেই বলছেন। এঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক ফিলিপ হিত্তি একজন। সমগ্র পৃথিবীতে সুপরিচিত ফিলিপ হিত্তি ছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমেটিক লিটারেচার প্রোগ্রাম-এর প্রধান। তিনি লিখেছেন, "আদর্শের চেয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে বেশি। আদর্শিক ঐক্যের প্রসংগে বলতে গিয়ে হিত্তি বলেছেন, জুডাইজম ও খৃস্টবাদ যথাক্রমে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এর সৃষ্টি এবং ইসলাম-এর উৎস কুরআন নামক 'থার্ড টেস্টামেন্ট'।" সাম্প্রতিককালে, পাশ্চাত্যের অনেকের মত পশ্চিমী সভ্যতার শত্রু-মিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন মারভিন সেট্রন ও টমাস টোর তাদের বিখ্যাত 'এনকাউন্টার উইথ দি ফিউচার ঃ এ ফোরকাস্ট অব লাইফ ইন্টু দি টুয়েন্টি ফার্স্ট সেনচুরি' গ্রন্থে। এ গ্রন্থের এক আলোচনায় তারা দেখিয়েছেন, খৃস্টধর্ম আজ পশ্চিমী সভ্যতার অংশ, তাই কোন চ্যালেঞ্জ তার দিক থেকে আসবে না। অন্যদিকে জুডাইজম, বৌদ্ধইজম ও হিন্দুইজম-এর কোন দিক দিয়েই সামর্থ্য নেই পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার। বাকি থাকে ইসলাম।' লেখকদ্বয়ের মতে ইসলামের সাথেই বিরোধ বাধছে পাশ্চাত্য সভ্যতার। তাদের মতে, এ বিরোধের উৎস মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। তাদের ভাষায়, "Only Islam is a threat, as it has been economically for the last 20 years, politically for the last 180 years and militarily for the 1500 years. Islam is confronting us again in Iran calling us satan for supporting the shah and challenging us in the rest of the Moslim world for supporting Israel."

এই ব্যাখ্যা বেঠিক নয় যে, ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের একটা রাজনৈতিক ও সামরিক ভীতি আছে এবং গত তিন দশক ধরে মুসলিম বিশ্বের অর্থ শক্তিকেও ভয় করতে শুরু করেছে তারা। তার উপর রয়েছে ১৫০০ বছরের সামরিক সংঘাতের ইতিহাস। সন্দেহ নেই, এই ভীতিই ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যেকার বিরোধ ও সংঘাতের উৎস এবং সন্দেহ নেই এই ভয়জনিত বিরোধ থেকেই পশ্চিম শাহ্-এর মত স্বৈরাচারী ও ইসলাম দলনকারী শাসক ও শক্তিদের সমর্থন সাহায্য দিচ্ছে এবং ইসরাইলের মত মুসলিম বৈরী শিখণ্ডীদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে এবং এসব রাজনৈতিক বিষয় নিয়েই পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠছে।

পাশ্চাত্যের এ যুক্তিগুলো অবাস্তব নয়, কারণ এসব খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে। এসবের অন্তরালে পাশ্চাত্যের কিন্তু আরেকটা রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। পাশ্চাত্য আমাদের ধর্মীয় নীতি ও মূল্যবোধকেই চ্যালেঞ্জ করছে। যেমন 'Encounter with the future : A forecast of life into the 21st century' গ্রন্থে মিঃ

www.icsbook.info

মারভিন স্ট্রেন ও মিঃ টমাস টোল বলছেন, "পশ্চিমের চোখে ইসলাম এতটা দুর্জ্ঞেয় যে, আমরা এর আচার-অনুষ্ঠান ও নীতিকে আজকের যুগে অচল বরে মনে করি। ইসলামী আইন ভঙ্গ করার জন্য বেত্রাঘাত, পাথর নিক্ষেপ, অঙ্গচ্ছেদ, প্রাণদণ্ড ইত্যাদি শাস্তিকে আমরা অভিশাপ বলে মনে করি।" তারা আরও বলেছেন, " মুসলিম বিশ্বে মসজিদ ও রাষ্ট্র পৃথক নয়। রাষ্ট্রই সেখানে মসজিদ, সেখানে ইসলামের সমালোচনাকে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি আঘাত হিসেবে দেখা হয়। একে শুধু সমালোচনা নয়, বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।"

এই বক্তব্যে যে পশ্চিমী দৃষ্টিভগি ধরা পড়েছে, ইসলামের সাথে যে পার্থক্যের প্রতি এখানে অংগুলি সংকেত করা হয়েছে, তা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতক ধরনের নয়। এসব পুরোপুরিই আদর্শিক। ইসলামের নীতি ও বিধানকে তারা অভিশাপ মনে করছেন। কারণ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তারা বুঝেন না, বুঝতেও চেষ্টা করেন না এবং এসবকে তারা বিচার করেন তাদের নীতি ও মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যই মূলত ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবধান ও বিরোধ সৃষ্টি করেছে।

উপরন্তু এই বিরোধকে পাশ্চাত্য বিরোধিতায় রূপান্তরিত করেছে। কোন বিরোধ মতপার্থক্যের পর্যায়ে থাকা দোষণীয় নয়। কিন্তু বিরোধটাকে যদি বিরোধিতা করার ইস্যুতে পরিণত করা হয়, তাহলে সেটা শান্তি বিনষ্ট করে, সহাবস্থান ব্যাহত করে এবং সংঘাত ডেকে আনে। পাশ্চাত্যের সাথে আজ ইসলামের এই সংঘাতই সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্য আজ ইসলামের শাস্তি আইনের সাথে শুধু মতপার্থক্যই পোষণ করছে না, মুসলিম দেশসহ গোটা দুনিয়ায় এর বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগান্ডাতেও নেমেছে। লক্ষ্য এই শাস্তিপদ্ধতি বিলোপ করা। এই শাস্তি আইনের কল্যাণকর দিকের কথা তারা বিন্দুমাত্রও চিন্তা করছেন না। এইভাবে ইসলামের পর্দা প্রথাকে তারা দু'চোখে দেখতে পারেন না। অথচ এর অভাবে তাদের সমাজ যে গোল্লায় যাচ্ছে, সেদিকে তাদের কোনও দৃষ্টি নেই। তারা অন্ধের মতই এ ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিবোধের বিরোধিতা করছেন। মুসলিম দেশগুলোতে তাদের এই ধরনের প্রচারণা সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করছে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশে 'ফতোয়া' বিরোধিতার নামে আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে তাদের পরিকল্পিত প্রচার অভিযানের উল্লেখ করা যায়। সকলেই জানেন যে, এনজিওদের ছদ্মাবরণে পশ্চিমীরাই এই ঘৃণ্য প্রচার অভিযান পরিচালনা করছেন। এ ব্যাপারটা শুধু বাংলাদেশে নয়, প্রতিটি মুসলিম দেশেই পশ্চিমীদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধ বিরোধী এই ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। যা পুরোপুরিই আদর্শগত, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক নয়।

www.icsbook.info

পশ্চিমের এই অভিযানকে ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। ইসলামের প্রাণ শক্তিকে ধ্বংস করার জন্যেই এই আগ্রাসন। সকলেরই জানা যে, নীতি ও আদর্শগত দৃঢ়তা এবং স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে ইসলামের অমলিন মৌলিকত্বই ইসলামের প্রাণশক্তি। এ কথা পশ্চিম আরও ভালো করে জানে। উপরোক্ত গ্রন্থে মারভিন সেন্ট্রন ও টমাস টোল ইসলামকে দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম হিসেবে অভিহিত করে নিজেরাই প্রশ্ন তুলেছেন,ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহবাদিতার যুগে ইসলাম কি করে এতটা প্রাণ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ? তারা নিজেরাই এ প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন। বলেছেন, "ইসলাম একটি মৌলবাদী ধর্ম (Islam is a Fundamentalist religion) অর্থাৎ ইসলাম তার নীতির উপর অটল এবং তার নীতিতে কোন বিকৃতির অবকাশ দেয় না। এই হিসেবে ইসলামের অনুসারীরাও মৌলবাদী। তারা ইসলামের নীতি ও বিধানের উপর অটল এবং নীতি ও আচরণের ক্ষেত্রে কোন বিকৃতির তারা আশ্রয় নেয় না, প্রশ্রয়ও দেয় না। ইসলাম ও মুসলমানদের এই বৈশিষ্ট্যই ইসলামের প্রাণশক্তি। ইসলাম তার এই মৌলবাদী বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেললে অন্যান্য ধর্মের মতই সে প্রাণহীন হয়ে পড়বে। ইসলামকে এই প্রাণহীন করার জন্যই তার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের আগ্রাসন।

এই আগ্রাসনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলামের মৌলবাদ, যেহেতু মৌলবাদই ইসলামের প্রাণশক্তি। পশ্চিমের মুখপাত্র শক্তিমান আমেরিকার শক্তিমান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন থেকে শুরু করে পশ্চিমের তস্য এজেন্ট আহমদ শরীফ ও তসলিমা নাসরিনরা পর্যন্ত ইসলামের এই মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে ইসলামের এটাই আজ মূল বিরোধীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়টিই আলজেরিয়া সংকটের মত অনেক সংকটের জন্ম দিচ্ছে। পাশ্চাত্য যদি ইসলামের বিরুদ্ধে এই আদর্শিক বিরোধিতা পরিত্যাগ করে, তাহলে ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, সুদান ইত্যাদি সংকটের সহজ সমাধান সম্ভব।

কিন্তু সমস্যা হলো পশ্চিম ইসলামের মৌলবাদ বিরোধিতাকে তার সভ্যতার একটা নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। অবশ্য পশ্চিম বলছে, তারা চরমপন্থার বিরোধী ধর্মনিষ্ঠার নয়। কিন্তু তাদের 'চরমপন্থা'-র কোন সংজ্ঞা তারা দেননি। দেখা যাচ্ছে, তারা মধ্যপ্রাচ্যের 'আলজিহাদ'-সংস্থার হত্যা ও কিডন্যাপকেও 'চরমপন্থা'বলছে। আবার গণতান্ত্রিক জামায়াতে ইসলামীর ধর্মনিষ্ঠাকেও বলছে তারা চরমপন্থা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে এসে চরমপন্থা ও মৌলবাদকে তারা এক করে ফেলেছে এবং এইভাবেই পশ্চিম ধর্মীয় আচার-আচরণের অনড় অনুসরণকে 'চরমপন্থা ও মৌলবাদিতা বলে অভিহিত করে ইসলামের অন্ধ বিরোধিতা করে চলেছে। এই ক্ষেত্রে পশ্চিম মানবাধিকারকে একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এমন একটা ধারণা তারা দিতে চাচ্ছে যে, ধর্মীয়

www.icsbook.info

অনড় বিধি-বিধান মানবাধিকারের খেলাফ। কিন্তু তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে অবাস্তব, অপ্রাকৃতিক এবং খোদ মানবাধিকারের পরিপন্থী, তা তারা চোখ বন্ধ রেখেই অস্বীকার করছে। তারা বুঝতেই পারছে না যে, তারা যা বলছে তা বস্তুবাদের বিকৃত দর্শনেরই ফলশ্রুতি।

পশ্চিমের এই দৃষ্টিভঙ্গিই, আবার বলছি, ইসলামের সাথে তার মূল বিরোধীয় বিষয়। এই বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমের বস্তুবাদী দর্শন ও ইসলামের মধ্যে, ঠিক পশ্চিমের সাথে নয়। পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শনের বয়স খুব বেশি হলে তিনশ বছর। বস্তুবাদী দর্শন আজ পশ্চিমকে গ্রাস করে ফেলেছে। পশ্চিম যদি বস্তুবাদী দর্শনের ক্ষতিকর দিকগুলো যেমন 'ধর্ম ও নৈতিকতাহীন যুক্তিবাদ' পরিত্যাগ করে তাহলে আজকের নতুন পরিস্থিতিতে পশ্চিমের সাথে ইসলামের আদর্শিক বিরোধ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে যেতে পারে। তখন আর ধর্মনিষ্ঠতা বা মৌলবাদ পশ্চিমের কাছে অচেনা কোন বিষয় বলে মনে হবে না। সেই অবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ হ্রাস করতে পারলে ইসলাম ও পাশ্চাত্য এসে এক প্লাটফরমে দাঁড়াতে পারবে। নিরিশ্বরবাদী কনফুসীয় সভ্যতার চাইতে আহলে কিতাব খৃষ্টান পশ্চিম ইসলামের কাছে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

যতদিন এই অবস্থা না আসে, ততদিন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সবাইকে স্বীকৃত হতে হবে। মতপার্থক্য নিয়েও সহাবস্থান খুবই সম্ভব। সম্ভব সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতাও, যেমন শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলছে অর্থনীতি ও বাণিজ্য জগতে। তবে এ জন্যে পশ্চিমকে বস্তুবাদের আগ্রাসী ' মৌলবাদ' বা 'চরমপন্থা,' যা তাকে ইসলামের বিরুদ্ধে অসহনীয় করে তুলেছে, পরিত্যাগ করতে হবে। উল্লেখ্য, ইসলামের বা মুসলমানদের ধর্মনিষ্ঠতা বা মৌলবাদ আত্মগঠন, অনুসরণ ও শান্তিপূর্ণ প্রচারমূলক, আগ্রাসী কোনক্রমেই নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনি তার রাসূল (সঃ) কে দারোগা করে পাঠাননি, মানুষের কাছে কথা পৌঁছিয়ে দেয়াই তার দায়িত্ব। তবে ইসলামের ভিত্তিতে আত্মগঠন, ইসলামের অনুসরণ এবং এই ব্যবস্থা রক্ষা করার ক্ষেত্রে মুসলমানরা কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজী নয়। এটা অবশ্যই মৌলবাদিতা। কিন্তু এই মৌলবাদিতাই ইসলামের প্রাণ। আল্লাহ এ মৌলবাদিতা একান্তভাবেই চান তাঁর বান্দাদের কাছে।

১৭-০৮-১৯৯৪

www.icsbook.info

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের আণবিক বোমা বিষয়ক একটা উক্তি, বলা যায়, বোমা ফাটিয়েছে। ঐ বক্তব্যে তিনি পাকিস্তান আণবিক বোমার মালিক হওয়ার কথা জানিয়েছেন। গত ২৩শে আগস্ট আজাদ কাশ্মীরে তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত করে বলছি পাকিস্তানের একটা আণবিক বোমা আছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই রয়েছে আণবিক বোমা।" ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে, তাহলে আণবিক ধ্বংস লীলার সৃষ্টি হবে -এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েই নাওয়াজ শরীফ এই উক্তি করেন।

নওয়াজ শরীফের এই উক্তি সবচেয়ে বেকায়দা অবস্থায় ফেলেছে পাকিস্তান সরকারকে। পাকিস্তান সব সময়ই আণবিক বোমার অস্তিত্ব শুধু নয়, আণবিক বোমা তৈরির কোন চেষ্টার কথাও অস্বীকার করে এসেছে। বিব্রত পাকিস্তান সরকার নওয়াজ শরীফের উক্তিকে দায়িত্বজ্ঞাহীন বলে অভিহিত করেছে।

নওয়াজ শরীফের উক্তি পাকিস্তান সরকারকে যতটা বিপদে ফেলেছে, ততটাই সুবিধা করে দিয়েছে ভারতের। পাকিস্তানের আণবিক প্রস্তুতি নিয়ে ভারত যে হৈ চৈ করে আসছিল, নওয়াজ শরীফের উক্তি তাকে বাড়িয়ে দিল। পাকিস্তানের একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর এই স্বীকৃতি কার্যত পাকিস্তানেরই আত্মস্বীকৃতি। এরপর পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে আর বাধা কোথায়, এমন কথাই ভারত বলতে চাইল অণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধে পাগলপারা পশ্চিমের আণবিক শক্তিগুলোকে।

ভারতের এই কণ্ঠকে চোরের মা'র বড় গলা বলেই মনে হয়েছে ওয়াকিফহাল সকলের কাছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় পার্লামেন্টে যে বক্তব্য ২৬শে আগস্ট তারিখে দেয়া হয়েছিল, তাতে এই ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ঐদিন ভারতের বিদেশ বিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পাকিস্তানের প্রতি ইংগিত করে বলেন, "যে সময়ে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, তা করা হবে। যার মধ্যে প্রচলিত অস্ত্রের সাথে অপ্রচলিত অস্ত্রও থাকবে।"

এই অপ্রচলিত অস্ত্র বলতে আণবিক বোমাকেই যে বুঝানো হয়েছে, এ কথা সকলেরই জানা। অর্থাৎ এর দ্বারা ভারত বলেছে, আণবিক বোমা তারও রয়েছে। এই স্বীকৃতির পর অন্যের আণবিক বোমার সমালোচনা করার অধিকার আর ভারতের থাকে না।

www.icsbook.info

প্রশ্ন উঠতে পারে, 'অপ্রচলিত' অস্ত্রকে আণবিক বোমা ধরে নিয়ে এত কথা বলা কি সাজে? অবশ্যই সাজে না। কারণ আণবিক বোমা ছাড়াও অনেক কিছু আজ "অপ্রচলিত' অস্ত্রের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এ প্রশ্ন তুলেও ভারতের আণবিক বোমা ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। এ বছরেরই জানুয়ারী মাসে ভারতের বক্তব্য তাদের আণবিক বোমার উপর থেকে আরও একবার অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করেছিল। জানুয়ারী '৯৪ -এর পয়লা তারিখে ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সেক্রেটারীরা আলোচনায় বসেছিল। এই আলোচনা সূত্রেই সম্ভবত ভারতের পক্ষ থেকে জানুয়ারীর ২৪ তারিখে পাকিস্তানের কাছে একটা নোট পাঠানো হয়। তাতে দুইটি প্রস্তাব পেশ করেছিল ভারত। তার একটিতে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, পরস্পরের আণবিক স্থাপনার উপর আক্রমণ না করার চুক্তিটি জনবহুল ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারত বলেছিল, উভয় দেশ তাদের 'আণবিক শক্তি' (Nuclear Capability) প্রথম ব্যবহারকারী দেশ না হওয়ার ব্যাপারে একমত হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবের এই 'আণবিক শক্তি' আণবিক বোমা ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত প্রস্তাবটির মধ্য দিয়ে ভারত বলে দিয়েছিল যে, আণবিক বোমা ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের কাছেই রয়েছে। ভারতের এই প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে সেখানকার পত্রিকাও এই মন্তব্যই করেছে। ভারতের বিখ্যাত পত্রিকা স্টেটসম্যান-এর স্বনামধন্য কলামিস্ট এ. জি. নূরানী 'Break the Impasse' শীর্ষক নিবন্ধে বলেন, 'It confirmed India's possessions of nuclear weapons.' অর্থাৎ প্রস্তাবটি ভারতের কাছে আণবিক বোমা থাকার কথা প্রমাণ করেছে।

সুতরাং নওয়াজ শরীফের উক্তি ভারতের কাছে নতুন কিংবা বিস্ময়কর বলে মনে হওয়া উচিত নয়। যে সত্যটাকে ভারত 'ননকনভেনশনাল উইপন' ও 'নিউক্লিয়ার ক্যাপাবিলিটি' শব্দের আড়ালে ঢেকে রেখেছিল, নওয়াজ শরীফ সে সত্যটাকেই নগ্ন করে দিয়েছেন মাত্র। জানা ও বলা সত্যের এই নগ্ন প্রকাশ দেখে ভারতের বিস্ময়বোধ করা, হৈ চৈ করা হাস্যকর।

বিস্ময়ের পালা প্রকৃতপক্ষে আমাদের, যারা এই উপমহাদেশে শান্তি চাই, স্বস্তি চাই এবং চাই এই উপমহাদেশ আণবিক বোমার ভয়ংকর উপস্থিতি থেকে মুক্ত থাকুক। কিন্তু উপমহাদেশের মানুষের এই চাওয়ার মাথায় বাড়ি দিয়েছে ভারত ১৯৭৪ সালে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। তার পরও ভারত আণবিক বোমা তৈরি ও উন্নয়নের পথ থেকে ফিরে আসতে পারত এবং পারত এই উপমহাদেশকে পারমাণবিক বোমার উত্তাপ থেকে মুক্ত রাখতে। ভারত তা করেনি। ভীত প্রতিবেশিদের আশ্বস্ত না করে এবং উপমহাদেশকে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত রাখার আলোচনা ও প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে ভারত বিশ্বের এই অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার ভয়ংকর

www.icsbook.info

পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই উপমহাদেশকে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত রাখার কোন অলোচনায় ভারত কখনও রাজী হয়নি, অথচ রাজী হয়েছে পাকিস্তানের সাথে পরস্পরের পারমাণবিক স্থাপনায় আক্রমণ না করার চুক্তি সম্পাদন করতে। ভারতের স্টেটসম্যান পত্রিকা ভারতের এ আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করেই লিখেছিল " Except for its commendable initiative in 1985, on an Indo-Pakistani accord not to attack each other's nuclear facilities, India has for the most part only reacted-not always sensibly - to proposals made by others." অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের সাথে একে অপরের পারমাণবিক স্থাপনায় আক্রমণ না করার চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগ গ্রহণ ছাড়া ভারত অধিকাংশ সময় অন্যের প্রস্তাবের প্রতি বিরুপতাই দেখিয়ে এসেছে।' সর্বশেষে এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার লক্ষ্যে ভারত ও পাকিস্তানসহ একটা বহুপক্ষীয় আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তান ছাড়াও এ আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া, জার্মানী ও জাপানকে শামিল করা হয়েছিল। সম্মেলনের জন্যে বিবেচ্য প্রস্তাব ছিল, পাকিস্তান ও ভারত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির উপকরণ উৎপাদন এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখবে। এ সংক্রান্ত তদারকির বিষয়ও প্রস্তাবের সাথে যুক্ত ছিল। ভারতের অস্বীকৃতির কারণেই এই সর্বশেষ উদ্যোগটি ভণ্ডুল হয়ে যায়।

বস্তুত ভারত তার পারমাণবিক কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি হতে পারে, এমন আলোচনায় কখনই রাজি হয়নি। সে চেয়েছে সবাই মিলে পাকিস্তানের পারমাণবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিক, আর ভারতের কার্যক্রম খোলা থাক। তার যুক্তি ছিল, চীনের যেহেতু পারমাণবিক অস্ত্র আছে, সেহেতু তারও থাকতে হবে। কিন্তু এ যুক্তিতেই যে পাকিস্তানের মত ভারতের প্রতিবেশি দেশগুলোর পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োজন, এ কথাকে ভারত কোন সময়ই উপলব্ধি করতে চায়নি। ভারতের এই স্বার্থান্ধ নীতিই আমাদের উপমহাদেশকে পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়ংকর প্রতিযোগগিতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল নিজেকে পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত করা। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধমূলক যে কোন আলোচনাই ছিল ভারতের এ লক্ষ্যের জন্য ক্ষতিকর। চীনের একটি পত্রিকাও ভারতের লক্ষ্যকে এভাবেই তুলে ধরছে। বলেছে, " ভারত তার পরমাণবিক অস্ত্রসজ্জার পথ উন্মুক্ত রাখার জন্যেই পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধ উদ্যোগের সাথে নিজেকে কখনও শামিল করতে চায়নি। সে চেয়েছে এ ব্যাপারে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেই দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ করতে।" ভারত কেন তা চেয়েছে সে কথা চীনা ঐ পত্রিকা বলেনি। সেই না বলা কথাটা হলো,

www.icsbook.info

পাকিস্তানের অস্ত্র ও অর্থগুরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে পাকিস্তানকে তার পারমাণবিক কার্যক্রম পরিত্যাগে বাধ্য করা।

এই একটিমাত্র লক্ষ্যেই ভারত সব সময় কাজ করছে। তার যদি সদিচ্ছা থাকতো এই উপমহাদেশ এবং এশিয়ার এই অঞ্চলকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত রাখা, তাহলে সে পাকিস্তান, চীন–সকলের সাথেই এ বিষয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে আসত। কিন্তু ভারত অত্যন্ত সযত্নে এই আলোচনা এড়িয়ে গেছে। এ বিষয়টা শুধু আমাদের মত বিদেশী নয়, খোদ ভারতের পর্যবেক্ষকদেরও নজর এড়ায়নি। 'Nuclear view' শীর্ষক নিবন্ধে ভারতের দৈনিক স্টেটসম্যান লেখে "India has never sought a dialogue with china on the nuclear question. For long it rejected one with Pakistan as well." অর্থাৎ ভারত পারমাণবিক প্রশ্নে কোন সময়েই চীনের সাথে আলোচনা করতে চায়নি। একইভাবে সে পাকিস্তানকেও প্রত্যাখ্যান করেছে।' এরপর স্টেটসম্যান একটা উদাহরণের উল্লেখ করে বলে, " On October 23, 1985 Rajiv Ghandhi had agreed with General Zia - ul-Haq in New York to start talks on the peaceful nature of their respective nuclear programmes. Rajiv Ghandhi said : some how we have to work together to see how to solve the problem.' within hours of the disclosure, an official spokesman denied, on Mr. Ghandis behalf, that any agreement on technical talks had been reached." অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের ২৩শে অক্টোবর নিউইয়র্কে রাজীব গান্ধী জিয়াউল হক-এর সাথে তাদের আণবিক কার্যক্রমকে শান্তির পথে পরিচালনা করার আলোচনা শুরুর ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, 'সমস্যাটির কিভাবে সমাধান করা যায়, তা দেখার জন্যে আমাদের কোনভাবে একসাথে কাজ করা দরকার।' এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই বক্তব্য অস্বীকার করে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়, টেকনিক্যাল বিষয়টির উপর আলোচনার ব্যাপারে কোন ঐকমত্য হয়নি।' এইভাবেই ভারত সব আলোচনা, সব সমঝোতার দ্বার বন্ধ করে তার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির অব্যাহত সুযোগ উন্মুক্ত রেখেছে।

মানুষ দেখেই শেখে। পাকিস্তানও ভারতের কাছ থেকে তার কৌশল রপ্ত করেছে। গত জানুয়ারির ২৪ তারিখে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার বিষয়ে ভারত পাকিস্তানের কাছে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, যাতে কেউ প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করার চুক্তি সম্পাদনের কথা ছিল, তা পাকিস্তান প্রত্যাখ্যান করেছে এই বলে যে, কাশ্মীর প্রশ্নের সুরাহা না হলে পাকিস্তান এ ধরনের চুক্তিতে যাবে না। এ

www.icsbook.info

জবাব পাকিস্তান দিয়েছিল এ বছর ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখে। গত জুনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আবার এই কথার পুনরুক্তি করেছেন। ১৯৯২ সালের জুনে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফও এই উক্তি করেছিলেন। অর্থাৎ এটা এখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতির একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা ভারতের কোনদিনই মেনে নেয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে পাকিস্তানকেও ভারতের সাথে কোন চুক্তিতে যেতে হচ্ছে না। এভাবেই ভারতের রাজনীতি ভারতের জন্যে আজ বুমেরাং হয়েছে। ভারত যেভাবে তার পারমাণবিক কার্যক্রমের যুক্তি হিসেবে চীনকে দেখিয়েছে, পাকিস্তানও আজ সেভাবে তার পারমাণবিক কার্যক্রমের যুক্তি হিসেবে ভারতেকে দেখাচ্ছে।

ভারতের একটি মহল আজ ভারত সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন যদি পারমাণবিক অস্ত্রের উপকরণ উৎপাদন বন্ধ করতে রাজি হয়, তাহলেই শুধু ভারতের উচিত এই ধরনের চুক্তিতে শামিল হওয়া। এই পরামর্শ পাকিস্তানের উপরও বর্তায়। ভারত যদি পারমাণবিক অস্ত্রের উপকরণ উৎপাদন বন্ধ করতে রাজি হয় তাহলেই শুধু পাকিস্তান ভারতের সাথে এ ধরনের চুক্তিতে যেতে পারে।

এই বাস্তবতা অবশ্যই ভারতের উপলব্ধি করা উচিত। এবং এই উপলব্ধির পর ভারত তার পুরানো কূটকৌশলের পথ পরিত্যাগ করে, বিশ্ব পর্যায়ে পারমাণবিক অস্ত্র বিলোপ এবং পারমাণবিক অস্ত্রের উপকরণের উৎপাদন বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত সম্মিলিতভাবে। এই উদ্যোগে ভারত, পাকিস্তান, কোরিয়া, জাপান ও জার্মানীসহ অপারমাণবিক শক্তি সকলকেই শামিল হওয়া জরুরী। এ' উদ্যোগ যদি সফল হয়, তাহলেই শুধু দক্ষিণ এশিয়া এবং এশিয়ার এ অঞ্চলসহ গোটা দুনিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করা যাবে। কিন্তু এ পথে না গিয়ে পারমাণবিক শক্তি সকলেই যদি ভারতের মত করে তাদের প্রতিবেশীদের নিরস্ত্র করার পরামর্শ দেয় কিংবা উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে প্রতিবেশির বোমা থেকে 'আত্মরক্ষার' প্রয়োজনেই গোটা পৃথিবী একদিন আণবিক বোমায় ভরে উঠবে। গায়ের জোরে অন্যের আত্মক্ষার অধিকার হরণ করা কিছু সময়ের জন্যে হয়তো পারা যাবে সব সময়ের জন্যে নয়।

২৭-০৯-১৯৯৪

www.icsbook.info

সূর্যসেনের জন্মশত বার্ষিকী পালন করা হচ্ছে আজ ২১ শে মার্চ। এর আয়োজন করেছে 'মাস্টারদা সূর্যসেন জন্মশত বার্ষিক উদযাপন পরিষদ।' এই সংগঠন অন্যদেরকেও এর সাথে একাত্মতা ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বেগম সুফিয়া কামাল এবং জাহানারা ইমাম। এছাড়া শত বার্ষিকী উদযাপন পরিষদ শত বার্ষিকীর অনুষ্ঠান নিয়ে মত বিনিময় করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের নাজিম উদ্দিন আলম, ছাত্র লীগের পংকজ দেবনাথ, ছাত্র ইউনিয়নের সাজ্জাদ জহীর চন্দন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বেলাল চৌধুরী প্রমুখের সাথে। মত বিবিময়কালে ছাত্র নেতৃবৃন্দ পরিষদ ঘোষিত অনুষ্ঠানমালার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছেন।

বিভিন্ন মহলের বিবৃতি আদায় করে এবং সমর্থন যোগাড় করে নিয়ে আট-ঘাট বেঁধে পরিষদের শতবার্ষিকী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। মনে হয় পরিষদ ভীত ছিলেন যে, তাদের কর্মসূচী সাধারণ্যে গৃহীত হবে না। এই কারণেই আগাম বিবৃতি ও সমর্থন যোগাড়। ভয় বোধ হয় এই কারণে যে, যারা শহীদ তিতুমীরের কোন বার্ষিকী, পালন করেন না, যারা শরীয়তুল্লাহকে স্মরণ করেন না, যাদের মুখে চট্টগ্রামের হাবিলদার রজব আলীর নাম উঠে না, তারা এক সূর্যসেনের নাম করলে তা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বৈকি! অপরাধী মন পুলিশের খোয়াব দেখা স্বাভাবিক বটে।

তবে আমি সূর্যসেন জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন পরিষদের উদ্যোগের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখি না। সূর্যসেন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের একজন নায়ক,তিনি শির নত না করে জীবন দিয়েছেন বৃটিশের হাতে। তিনি শ্রদ্ধার পাত্র, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সংগত কারণে আমি তার জন্ম বার্ষিকী পালন করি না, তবে 'মাস্টারদা সূর্যসেন জন্মশত বার্ষিকী উদ্দযাপন পরিষদ'-এর সদস্য সচিব 'সুব্রত চৌধুরী' বাবুদের মত কেউ তা পালন করলে আমি তাকে স্বাগত জানাবো। এই উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক 'বিচারপতি কামালুদ্দিন হোসেন' -এর মত করে কেউ যদি আবার এ ধরনের উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক হন, তাহলে আমার আপত্তি থাকবে। যে কারণে আমার কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে বেগম সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমামের বিবৃতির কিছু কথা। বেগম সুফিয়া কামালের মতে সূর্যসেন 'অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য লড়াই' করেছেন। আর জাহানারা ইমাম 'স্বাধীনতার সশস্ত্র লড়াইয়ের

www.icsbook.info

দীপশিখা জ্বেলে ফাঁসি কাষ্ঠে আত্মহুতি দেয়ার কারণে সূর্যসেনকে বলেছেন 'বাঙালী জাতির গৌরব'। সম্ভবত বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনও সূর্যসেন সম্পর্কে এই ধরনের অভিমত পোষণ করেন বলেই তিনি ঐ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সেজেছেন।

এই অভিমত সম্পর্কেই আমার আপত্তি। বেগম সুফিয়া কামাল এবং জাহানারা ইমাম এইধরনের অভিমত পোষণ করার মধ্যে আমি অবশ্য কোন আপত্তি দেখি না। বেগম সুফিয়া কামাল কবি মানুষ, ইতিহাস সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ থাকতে পারেন। আর জাহানারা ইমামের তো কথাই নাই। যিনি দেশের আইন স্পর্কে অজ্ঞ, ইতিহাস সম্পর্কে তিনি তো বিশেষভাবেই অজ্ঞ হবেন। অজ্ঞ বলে তারা আবোলতাবোল বকতেই পারেন। কিন্তু বিচারপতি কামালুদ্দিন হোসেনরকে তো আর ওদের মতো অজ্ঞদের তালিকায় ফেলা যায় না। বিচারপতি সাহেব তাঁদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সূর্যসেনকে 'স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ বীর বাঙালী' বলে অভিহিত করেছেন। সূর্যসেন স্বাধীনতা সংগ্রামী অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু সে স্বাধীনতা সংগ্রাম কাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল? তিনি অবশ্যই বাঙালীদের একজন বীর, কিন্তু সেই বাঙালীরা কোন বাঙালী? সূর্যসেনকে অসাম্প্রাদায়িক মানবিক সমাজ গড়ার নায়ক হিসেবে চিত্রিত করে তাকে সব বাঙালীর এবং সবার স্বাধীনতার সংগ্রামের 'অগ্নিপুরুষ' সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রয়াস কতদূর ঠিক? এসব প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই প্রকৃত পক্ষে আসল সূর্যসেনকে খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু সূর্যসেন আর ইতিহাসের স্বার্থে নয়, দেশের মানুষকে প্রতারণামূলক প্রচারণা থেকে বাঁচাবার জন্যেও সূর্যসেনের স্বরূপ সন্ধান প্রয়োজন। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সূর্যসেনের যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ফল, সে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, মুসলমানরা নয়, মুসলিম লীগ নয়। বরং মুসলমানদের বঞ্চিত করে একতরফাভাবে স্বাধীনতা কুক্ষিগত করারই একটা কৌশল ছিল এটা। কংগ্রেস প্রণীত কুখ্যাত নেহেরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে হিন্দু - মুসলিম ঐক্যের সব আশা - ভরসা মিলিয়ে গেলে বৃটিশ সরকার লন্ডনে সব পক্ষের গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। মুসলিম লীগ এ বৈঠক যোগ দিতে সম্মত হয়, কিন্তু কংগ্রেস চার দফা শর্ত আরোপ করে বলে, গোল টেবিলে ভারতবর্ষ থেকে কারা যাবে তার প্রায় সবটা নির্বাচনের দায়িত্ব তাদের না দিলে কংগ্রেস বৈঠকে যাবে না। এ দাবী বৃটিশ মানল না। ফলে কংগ্রেস গোলটেবিলে গেল না। মুসলমান ও অন্যান্যরা গেল। এরই প্রতিশোধ হিসেবে কংগ্রেস ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাদের লাহোর বৈঠকে সংসদ ও বিধান সভা থেকে পদত্যাগ, ট্যাক্স না দেয়া ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারীকে কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করল। একে কেন্দ্র করে কংগ্রেস

www.icsbook.info

অসহযোগ ও আইন আমান্য আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩০ সালের ৫ই এপ্রিল বোম্বাই-এর সমুদ্রোপকূলবর্তী ডাভী থেকে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের যাত্রা শুরু করলেন। চট্টগ্রামের অস্ত্রগার লুন্ঠন ছিল কংগ্রেস আয়োজিত এই সমগ্র ঘটনার একটা অংশ।

গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার ১৩ দিন পর চট্টগামে সূর্যসেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার লুন্ঠন হলো। তারা শুধু অস্ত্রাগার নয়, চট্টগ্রামে বৃটিশ কর্তৃত্বকেও চ্যালেঞ্জ করল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, চট্টগ্রামে তারই পূর্ণ বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছিল সূর্যসেনরা। এ বিষয়টা আরেকটু বিস্তারিত আলোচনার আগে গান্ধী পরিকল্পিত ও কংগ্রেস আহূত সূর্যসেনদের এ আন্দোলন সম্পর্কে মুসলিম লীগ তথা মুসলমানদের পলিসি সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা বলা দরকার।

কংগ্রেসের এ আন্দোলন ছিল এককভাবে কংগেসের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে। কংগ্রেসরে এই দাবী ছিল, সংখ্যাগুরু হিন্দুদের পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত স্বরাজ লাভ, যাতে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব থাকবে না। প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেসের এ আন্দোলন ছিল মুসলিম লীগের অর্থাৎ মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী পাল্টা একটি আন্দোলন। এ আন্দোলনের সাফল্যের অর্থ মুসলমানরা বৃটিশের খপ্পর থেকে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের খপ্পরে পড়া। সুতরাং, কংগ্রেসের এই আন্দোলনকে জিন্নাহ মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং এ অন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলেনে মওলানা মোহাম্মদ আলী মুসলমানদেরকে কংগেস হতে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেসের এই আন্দোলন সম্পর্কে আরও স্পষ্ট কথা বলেছিলেন, "গান্ধী উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার পক্ষে কাজ করছেন। তার যাবতীয় কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো হিন্দু রাজত্ব স্থাপন এবং মুসলমানদের পদানত করে রাখা"। এখানেই শেষ নয়। গান্ধীর আইন অমান্য শুরু হওয়ার পর মওলানা মোহাম্মদ আলী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে লিখেছিলেন, "মহাত্মা গান্ধী এবং মতিলাল নেহেরু হিন্দু মহাসভার পদাংক অনুসরণ করে চলেছেন। আমি আমার ক্ষমতার যতটুকু শক্তি আছে তার সমস্ত দিয়ে আপনার সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

চট্টগ্রামে সূর্যসেনের আন্দোলন ছিল মিঃ গান্ধীর পদাংক অনুসরণে এবং গান্ধীরই আইন অমান্য আন্দোলনের একটা অংশ। সূর্যসেন ছিলেন কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মতিলাল নেহেরু জওহর লাল নেহেরুকে লিখেছিলেন, "বাংলার বিপ্লবীরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে গভীরভাবে সাম্প্রাদয়িক মনোভাবাপন্ন।" সূর্যসেন ছিলেন এই বিপ্লবীদেরই একজন । তিনি চট্টগ্রাম জেলা

www.icsbook.info

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অস্ত্রগার লণ্ঠন পর্যন্ত যাবতীয় বিপ্লবী কার্যক্রম চট্টগ্রামের কংগ্রেসের অফিসকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হয়েছে। সূর্যসেন ছিলেন কংগ্রেস রাজনীতির সাথে একাত্ম। ১৯২৮ সালে কোলকাতার যে সম্মেলনে নেহেরু রিপোর্ট পাস করা হয় এবং যে সম্মেলনে লীগ-কংগ্রেস বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয় ও জিন্নাহ অশ্রুসজল চোখে বিদায় নেন, সে সম্মেলনে সূর্যসেন ছিলেন কংগ্রেস প্রতিনিধি এবং গান্ধী পন্থী হার্ডলাইনারদের একজন। (স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, পুর্নেন্দু দস্তিদার, পৃঃ ৮১)। লাহোরে কংগ্রেসের যে সম্মেলনে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে কংগ্রেস এককভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে, সে সম্মেলনেও সূর্যসেন চট্রগাম থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মতে এই সময় সূর্যসেন চট্রগাম জেলা কংগ্রেসের সর্বেসর্বা ছিলেন এবং তার পছন্দমত লোক তিনি কংগ্রেসের লাহোর সম্মেলনে নিয়ে গিয়েছিলেন। (ঐ পৃঃ ৯০) চরম মুসলিম বিদ্বেষী নেতা এবং হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্যের সাথেও সূর্যসেনের একাত্মতার পরিচয় এ সম্মেলনকালে পাওয়া যায়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন তৈরী করার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে ঐ সময় লাহোরে নিখিল ভারত ছাত্র কনভেনশন ডাকা হয়েছিল। সূর্যসেন এই কনভেনশনের জন্যও প্রতিনিধি নিয়ে যান। তার কংগ্রেস প্রতিনিধিদেরও অনেকে সেখানে যোগদান করে। (ঐ, পৃঃ ৯০) বস্তুত সূর্যসেন মদনমোহন মালব্যের মতই কট্টরপন্থী একজন কংগ্রেস নেতা। কংগ্রেসের সব প্রোগ্রামই আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন তিনি করেন। '১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই দিন কংগ্রেস রচিত 'স্বাধীনতা দিবসের' সংকল্প পাঠ করা হয়। ... চট্টগ্রামেও কংগ্রেস সেক্রেটারী সূর্যসেন 'স্বাধীনতা দিবসে' কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য কর্মসূচি পালন করেন। (ঐ ১০০)। ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল মিঃ গান্ধী আইন আমান্য আন্দোলন শুরু করে কংগ্রেস কর্মী ও জনগণের উদ্দেশ্যে বাণী পাঠান। তাতে বলা হলো, ইতিমধ্যে আমাদের কর্মধারা স্থির হয়ে গেছে। প্রতি গ্রামে নিষিদ্ধ লবণ তৈরি ও আমদানি শরু করা হোক। .... ছাত্রগণ সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন করুন, সরকারি চাকুরেরা চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করুন। আমরা শিগগিরই দেখতে পাব পূর্ণ স্বরাজ আমাদের দ্বারা সমাগত।" (ঐ, পৃঃ ১০২)।

স্বরাজ কবে দ্বারে সমাগত হবে তার জন্য অপেক্ষা না করে স্বরাজ হাতে তুলে নেয়ার জন্যই অস্ত্রাগার লুট করার সিদ্ধান্ত নিলেন সূর্যসেন। নিজেদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পুলিশকে বিভ্রান্ত ও সূর্যসেনদের 'ব্যাপারে সরকারকে নিশ্চিত

www.icsbook.info

রাখার জন্য ১৯৩০ সালের ১৬ই এপ্রিল একটা ইস্তাহার ছাড়লেন সূর্যসেন। ইস্তাহারটি এই ঃ

"দেশের দিকে দিকে স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি শোনা যাইতেছে। সর্বত্র আইন আমান্যের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ সালে যেই চট্টগ্রাম ছিল সবার পুরোভাগে আজ সেই চট্টগ্রাম পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে ইহা ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয়। .... কালকাতা ও অন্যান্য স্থানে লবণ আইন ছাড়া অন্য আইন (যেমনরাজদ্রোহ আইন) অমান্যও আরম্ভ হইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া আমরাও ২১শে এপ্রিল হইতে আইন অমান্য করিব স্থির করিয়াছি। ইহার জন্য সর্বসাধারণের সহানুভূতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা চাই। লোক ও টাকা চাই।

শ্রী সূর্যসেন

সম্পাদক,

চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটি

সূর্যসেনরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকালেও সূর্যসেন ছিলেন নিখাদ কংগ্রেস কর্মী এবং বন্দেমাতরমের নির্জলা সৈনিক। অস্ত্রাগারের বিরাট লোহার গেট যখন দেয়াল থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে তখন উল্লসিত বিপ্লবীদের গগনবিদারী বন্দেমাতরম ধ্বনিতে চট্টগ্রামে নৈশ-আকাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। (ঐ, পৃঃ ১২১)। একরকম বিনা আয়াসেই জেলার বিদেশী শক্তির শেষ প্রধান সশস্ত্র ঘাটি বিপ্লবীদের দখলে এসে গেল, তখন আবারও জোর গলায় ধ্বনি উঠল 'বন্দেমাতরম' 'স্বাধীন ভারত কী জয়'। রিজার্ভ ফোর্সের শেষ প্রধান এই সশস্ত্র ঘাঁটি বিনা আয়াসে দখলে আসার পেছনে একটা কাহিনী আছে। এই ঘাঁটি দখলের জন্য 'বিপ্লবীরা যখন পাহাড়ের গা বেয়ে উপর দিকে উঠছেন, তখন তারা ধ্বনি দিতে থাকেন 'গান্ধীরাজ হো গিয়া, ভাগো'। তাদের বক্তব্যেকে আকাশের দিকে গুলীর আওয়াজ দিয়ে তারা সঠিকভাবে বুঝাবারও চেষ্টা করছিল। ফলে সশস্ত্র পুলিশের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং রিজার্ভ ফোর্সের সিপাহী ব্যারাকের বিপরীত দিক থেকে পালাতে শুরু করে। (ঐ. পৃঃ ২৩)।

সূর্যসেনদের এই 'গান্ধীরাজ' ছিল মুলত পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যদের 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সূর্যসেনের বিপ্লবী সৈনিকরা ছিল গান্ধীর 'সত্যাগ্রহী সেনা', আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম' মুখরিত' 'সন্তান সেনা'। এই কারণেই সূর্য সেনের বাহিনীতে কোন মুসলমান ছিল না। যারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ নিয়েছিল, যারা জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে সূর্যসেনের সাথী ছিল, তাদের মধ্যে একজন মুসলমান ও ছিল না (ঐ, পৃঃ ১৪)। পাহাড়তলী অস্ত্রাগার লূণ্ঠনের সময় বিপ্লবীরা লালদিঘী ট্যাক্সি

www.icsbook.info

স্ট্যান্ড থেকে একজন মুসলিম ড্রাইভারকে জোর করে পাহাড়তলীতে নিয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম ছিল আহমদ। লুণ্ঠন কাজ শেষে ড্রাইভারের মুখে এসিড ঢেলে তাকে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করে দেয়া হয়েছিল। ড্রাইভারের বক্তব্য অনুযায়ী সে যেহেতু মুসলমান ছিল এবং লুণ্ঠনকারীদের চিনিয়ে দিতে পারত, এ কারণেই তার চোখে-মুখে এসিডে ঢালা হয়েছিল। আসলে সূর্যসেনের আন্দোলনটাই এমন ছিল যে, তাতে কোন মুসলমান শামিল হওয়া সম্ভব ছিল না। সূর্যসেনের সহযোগী শ্রীমতি কুন্দ প্রভা সেন তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন যে, 'পূজো করতে হবে বুকের রক্ত দিয়ে।' এই পূজোর বিবরণ দিতে গিয়ে কুন্দ প্রভা লিখেছেন, "আমি পিছু পিছু চললাম, কিছুদূর এগিয়ে একটা মন্দিরের কাছে দু'জনে পৌঁছলাম। দরজা খোলাই ছিল। মাস্টার দা আর আমি ভেতরে ঢুকলাম। তারপর তিনি টর্চ জ্বালালেন। দেখলাম, ভীষনানন এক কালী মূর্তি। মাস্টার দা এক হাতে লম্বা একখানা ডেগার বের করে আমার হাতে দিলেন, মায়ের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো কর। ওখানে বেল পাতা আছে। বুকের মাঝখানে চামড়া টেনে ধরে একটুখানি কাটার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোটা রক্ত বের হল। তা বেল পাতায় করে মাস্টার দার কাছে নিয়ে গেলাম। .... আমি মায়ের চরণে রক্ত আর মাথা রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম।" ভারতের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মোজাফফর আহমদ যথার্থই লিখেছেন, "বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।" গান্ধীর অসহযোগ, স্বারাজ, আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি সবই ছিল এই হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এই কারণেই বাংলার জননেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে গান্ধী, সূর্যসেনদের এই আন্দোলন তৎপরতাকে গণ্ডগোল বলে অভিহিত করেছিলেন। সূর্যসেনদের আস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ১৭ দিন পর গান্ধী গ্রেফতার হলে এই বিষয়ের উপর এক আলোচনায় শেরে বাংলা বলেছিলেন, "ভারতের ৭ কোটি মুসলমানের ৭০ জনও কংগ্রেসের সমর্থক নয়। মিঃ গান্ধী যে রকম গণ্ডগোল সৃষ্টি করছেন তাতে তাঁকে গ্রেফতার করে রাখার জন্যে আমি ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। (ভারত কি করে ভাগ হলো পৃঃ ১০৯)

আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, সূর্যসেনরা তাদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দায় মুসলমানদের উপর চাপাতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে সুন্দর একটি তথ্য দিয়েছেন চট্টগ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী ও সংগ্রামী পরিবারের সন্তান ব্যারিস্টার এস. এস সিদ্দিকী। তিনি বলছেন, " বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক শ্রী সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে তারই পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সম্পন্ন হলো চট্টগ্রামের অস্ত্রগার লুণ্ঠন। এই বিপ্লবী প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি ঘটনা, বলা যায় উপঘটনা। কোন ইতিহাসে সে উপ-ঘটনার কথা লেখা না হলেও আজও চট্টগ্রামের হাজার হাজার মানুষের মুখে তা

www.icsbook.info

জলজ্যান্ত সত্য হয়ে আছে। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসেই অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে সাড়া জাগানো মুসলিম কনফারেন্স। ঐ কনফারেন্সের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যে তাতে যোগ দিয়েছিলেন এই উপমহাদেশের চিরস্মরণীয় মল্লবীর গামা। মুসলিম কনফারেন্সের কর্মীদের মাথায় ছিল তুর্কি-টুপি, গায়ে বিশেষ রকমের ব্যাজ। সম্মেলনের পরপরই আরম্ভ হলো বিপ্লবীদের অভিযান। অভিযান শেষে বিপ্লবীদের পালাবার পথে দেখা গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুসলিম কনফারেন্স -কর্মীদের অনুরূপ তুর্কি টুপি ও বিশেষ ধরনের ব্যাজ। তাতে সহজেই মনে হতে পারে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি বেআইনী কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ঐ কনফারেন্স-কর্মীরা। সরকারের কাছেও তাই মনে হয়েছিল। .... কিন্তু যার কর্ম তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে যায় বিপ্লবীদের অনিষ্ঠকারী এই সাম্প্রদায়িক পরিকল্পনা, তিনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার খান বাহাদুর মোমিন সাহেব। তারই তদন্তে উৎঘাটিত হয় সত্যিকার ঘটনা। বেঁচে যায় মুসলিম কনফারেন্সের কর্মীবৃন্দ।" এই ঘটনা প্রমাণ করে মুসলমানরা ছিল সূর্যসেনের আন্দোলনের প্রতিপক্ষ।

গান্ধী তথা কংগেসের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে তখন মুসলিম লীগ তথা মুসলমানদের চরম প্রতিপক্ষ হিসেবেই তৎপর ছিল। সূর্যসেনের আন্দোলন কংগ্রেসেরই আন্দোলন, তাই ঐ ঘটনায় বিস্ময় বোধ করার কিছু নেই।

কিন্তু বিস্ময়বোধ হয় তখন, যখন আমরা দেখি বিচারপতি কামালুদ্দিন হোসেনের মত শিক্ষিত লোকরা সূর্যসেনকে এ দেশবাসীর বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের প্রতিভূ সাজান এবং বেগম সুফিয়া কামালের মত কবিরা সূর্যসেনকে "অসাম্প্রদায়িক' বলেন। এ দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হয়েছে, আমার মনে হয়, আমাদের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস পাঠের কমতি থেকে। আজ-কাল শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ ছাত্রকেই ইতিহাস পড়তে হয় না বা পড়ে না। সুতরাং ইতিহাস না জানা আজ আর কোন বড় ঘটনা নয়।

এ কথা স্বীকার করেও কিন্তু অনেকে বলছেন, শুধু ইতিহাস অজ্ঞতার কারণেই বিচার পতি কামালুদ্দিন হোসেন ও বেগম সুফিয়া কামাল সূর্যসেনকে হিরো সাজাবার চেষ্টা করেননি। হয় তারা অনুরোধে ঢেঁকি গিলেছেন, নয়তো উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সূর্যসেনকে তারা এভাবে হিরো সাজিয়েছেন। এই শেষ কথাটা একটা বড় অভিযোগের মত শোনা গেলেও একে বোধহয় উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিচারপতি কামালুদ্দিন হোসেন এবং বেগম সুফিয়া কামালদের সাম্প্রতিক চিন্তা-চেতনার সাথে এই অভিযোগ সংগতিশীল।

১১-০৩-১৯৯৪

www.icsbook.info

এ্যাসোসিয়েশন্স অব প্রেস কাউন্সিলের কাঠমন্ডু ডিক্লারেশন

নেপালের কাঠমন্ডুতে এশিয়া-প্যাসেফিক অঞ্চলে প্রেস কাউন্সিলের তিন দিনের একটা সম্মেলন হয়ে গেল। ওয়ার্ল্ড এ্যাসোসিয়েশনস অব প্রে কাউন্সিলের সহযোগিতায় সম্মেলনটির আয়োজন করে নেপাল প্রেস কাউন্সিল। সম্মেলনটি এশিয়া প্যাসেফিক অঞ্চলের হলেও এতে ফিনল্যান্ড ও নাইজেরিয়া প্রেস কাউন্সিলের প্রতিনিধিগণ যোগাদান করেছিলেন। ওয়ার্ল্ড এ্যাসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিল অর্থাৎ প্রেস কাউন্সিলগুলোর বিশ্ব সমিতির পক্ষ থেকে দাওয়াত পাওয়ার আগে এই সমিতির নাম পর্যন্ত আমার জানা ছিল না। ভেবেছিলাম সংস্থাটি নিশ্চয়ই নতুন। কিন্তু সম্মেলনে গিয়ে দেখলাম আমার ধারণা ভুল। ইতিমধ্যে সংস্থাটির দু'দুটি বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেছে। তার মধ্যে একটি দিল্লীতে ১৯৯২ সালে। বিস্মিতই হলাম, এ ধরনের একটা সংস্থার কথা বাংলাদেশকে অবহিতই করা হয়নি। বিষয়টি শোনার পর উপমহাদেশের বাইরের একজন প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান চোখ ছানাবাড় করেছিলেন বিস্ময়ে। তার কারণ বাংলাদেশের প্রেস কাউন্সিল উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরানো।

বিষয়টা আমার মনকে যতটা পীড়া দিয়েছিল, ততটাই আবার খুশী হয়েছিলা সম্মেলনের আলোচ্যসূচি দেখে। তিন দিনের সম্মেলন মোট ৮টি সেমিনার - সেশনে বিভক্ত ছিল। উদ্বোধনী সেশনে প্রথমে স্বাগত ভাষণ রাখলেন নেপাল প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নতুন থাপালিয়া। তার পরে পরেই প্রেস কাউন্সিগুলোর বিশ্ব সমিতির পরিচিতিমূলক বক্তব্য দিলেন বিশ্ব প্রেস কাউন্সিল সমিতির চেয়ারম্যান প্রফেসর ডেভিড ফ্লিন্ট। ইনি অস্ট্রেলিয়া প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও। আর সম্মেলন উদ্বোধন করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরীজা প্রসাদ কৈরারালা। উদ্বোধনী সেশনের একটি বিষয় আমার মনে দাগ কাটে। সেটা নেপালী প্রধানমন্ত্রীর একটা বক্তব্য। তিনি নেপালে সংবাদপত্রের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, দরিদ্র দেশগুলোতে সংবাদপত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালোভাবে টিকে থাকার কোন অবলম্বন পাচ্ছে না, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে সেমিনারের নজর দেয়া উচিত। মিঃ কৈরালা এভাবে অল্প কথায় উন্নয়নশীল বিশ্বের একটা বাস্তবতা তুলে ধরেছিলেন। এ বাস্তবাতার প্রতিফলন ঘটেছিল সেমিনারের পরবর্তী আলোচনায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সেমিনারের প্রথম বিজিনেস সেশন শুরু হলো ২টা ১৫ মিনিটে। এই অধিবেশনে ওয়ার্ল্ড প্রেস কাউন্সিল সমিতির চেয়ারম্যন ডেভিট ফ্লিন্ট সমিতির পক্ষ থেকে একটা সাধারণ রিপোর্ট পেশ করলেন। তারপরই শুরু হলো বিভিন্ন দেশের প্রেস কাউন্সিলের রিপোর্ট পেশ। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের রিপোর্ট

www.icsbook.info

পেশ করলেন এ সংস্থার চেয়ারম্যান বিচারপতি সুলতান হোসেন খান। সেমিনারে তৃতীয় অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ছিল ' ডেভলপমেন্ট অব প্রেস কাউন্সিলস'। অর্থাৎ দুই অধিবেশনেই আলোচনার বিষয় ছিল প্রেস কাউন্সিলস। দুই অধিবেশনের বিরাট সময় জুড়ে সংবাদপত্রের অভিভাবক প্রেস কাউন্সিলের বিকাশ, উন্নয়ন ও কর্মধরা নিয়ে হলো ব্যাপক আলোচনা। গুরুত্বপুর্ণ এ দু'টি সেশনের প্রথমটিতে সভাপতিত্ব করলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সুলতান হোসেন খান এবং দ্বিতীয়টিতে সভাপত্বি করেছিলেন ফিনল্যান্ড প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ক্রিস্টফার গ্রোনহাম। দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রধান বিষয় হিসেবে সামনে এল ঃ সাংবাদিক ও সংবাদপত্রগুলোকে আত্মশাসনে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে প্রেস কাউন্সিলগুলো সালিসী অথবা বিচার-সংস্থার আকারে শুধুমাত্র নৈতিক শাসকের ভূমিকা পালন করবে কি না। এই ক্ষেত্রে শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের মত ছিল অনেকটা কাছাকাছি। এদের মতে তিরস্কারের বাইরে প্রেস কাউন্সিলের আরও কিছু ক্ষমতা, যেমন তিনবার তিরস্কারের পরেও যদি অপরাধের পুনবরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে প্রকাশনা একদিন বা এক সপ্তাহের জন্যে স্থগিত করা, ইত্যাদি থাকা দরকার। এই মতের পক্ষে যুক্তি ছিল পিতা-মাতা সন্তানকে শুধু তিরস্কারই করে না, প্রয়োজনে কিছু শাস্তিও দেয়। পিতৃসুলভ শাসনের এ অধিকার প্রেস কাউন্সিলের থাকা উচিত। অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, ভারতসহ কিছু দেশের মত ছিল এ থেকে ভিন্ন । অধিবেশনের পরে নাইজেরিয়া প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আলাদে অদনু বিস্মিত কণ্ঠে আমাকে বাংলাদেশের এই মতের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহীনতা যেমন বিপদ, তেমনি আবার দায়িত্বহীন স্বাধীনতা আরেকটি বিপদ। এই বিপদ আরো বেড়ে যায় যদি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে জাতির স্বাধীনতা হরণের মত কোন শক্তি আশে পাশে থাকে। চতুর্থ অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'আঞ্চলিক সহযোগিতা'। এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে দু'টি দিককে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। এক. সার্ক ও প্যাসেফিক অঞ্চলের মধ্যে সহযোগিতা এবং ইউরোপীয়ে কম্যুনিটির সাথে সহযোগিতা। এই অধিবেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ভারতের জাস্টিস আর এস, সারকারি। অধিবেশনটি শুরু হলো তৃতীয় অধিবেশনের শেষে লাঞ্চের পর, ৮ই ফেব্রুয়ারি বেলা ২ টায় । জাস্টিস সারকারিয়া তার উদ্বোধনী বক্তব্যে আলোচ্য বিষয়ের অপ্রাসঙ্গিকতার কথা বলে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন', 'ডি ফেমেশন', 'প্রাইভাসি', ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। অবাক হলাম অনির্ধারিত এই আলোচনা শুরুতে। চারদিকে চেয়ে দেখলাম অনেকের চোখে মুখে অস্বস্তির ভাব। আমার পাশেই বসে ছিলেন ওয়ার্ল্ড প্রেস কাউন্সিল সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঃ গুনাসিংগে। তিনি মালয়েশিয়ার মানুষ। আমি তাকে কানে কানে বললাম, 'আপনারা কি আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করেছেন, না সিডিউল বদলেছেন?' এখানে উল্লেখ্য, আগের দিন 'ইনডিভিজুয়াল প্রাইভাসি' ও 'সাংবাদিকদের অধিকার' বিষয়ে প্রাসঙ্গিক

www.icsbook.info

একটা প্রশ্ন করেছিলাম ফিনল্যান্ডের ক্রিস্টোফার গ্রোন হামকে। এ বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং ঠিক হয় যে, তৃতীয় দিনের সকালের অধিবেশনে এ বিষয়ক নির্ধারিত আলোচনায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে। এ কারণে জাস্টিস সারকারিয়ার আলোচনা আরও বিব্রতকর হয়েছিল। আমার প্রশ্নের জবাবে গুনাসিংগে জানালেন প্রোগ্রামে কোন প্রকার পরির্তন করা হয়নি।" আমি বললাম তাহলে আপনি মি. সারকারিয়াকে এ কথা বলুন। মি. গুনাসিংগে কিছু পরে উঠে গিয়ে ওয়ার্ল্ড প্রেস কাউন্সিল সমিতির চেয়ারম্যান ডেভিড ফ্লিন্টকে কানে কানে কিছু বললেন। আরও কিছু পরে ফ্লিন্ট কথা বললেন সারকারিয়ার সাথে। সারকারিয়া বললেন, এ বিষয়ে কি আলোচনা হবে তিনি জানেন না, আলোচনারও কিছু দেখেন না, বিষয়টা অপ্রাসঙ্গিক। এরপর কথা বললেন, গুনাসিংগে এবং আমরা উপস্থিত সদস্যগণও বললাম। বলা হলো, আলোচনার জন্যে এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অনেক কথা রয়েছে, আলোচনা হতে হবে। কিন্তু সারকারিয়ার মত পরিবর্তন হলো না। অবশেষে ঠিক হলো, আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি পরদিন প্রথম সেশনেই সময় করে অলোচনা করা হবে।

এ সিদ্ধান্তের পর 'প্রেস ফ্রিডম, কালচারাল রিসপনসিবিলিটি বনাম রাষ্ট্র' বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করলেন ক্রিস্টোফার গ্রোনহাম। বিষয়টির উপর আলোচনা হলো। এই আলোচনার সাথে পরদিন যে আলোচনা হবার কথা তার গভীর মিল ছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি সকালে অধিবেশন অর্থাৎ সেমিনারের ৫ম অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'রিসপনসিবিলিটি এন্ড দি মিডিয়া'। এই আলোচনার দু'টি অংশ ছিল। এক, ব্যক্তির গোপনীয়তা এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার পরিসীমা। দুই, সাংবাদিক সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগের পদ্ধতি। সমগ্র বিষয় নিয়ে সকলের অংশগ্রহণে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমি দু'টি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি ঃ 'এক, উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকে এক নিক্তিতে বিচার করা হবে কি না, দুই; রেডিও ওভেড লেংথের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি এবং মোট সংবাদ ডিসিমিনেশনের ৮০ ভাগেরও বেশি পশ্চিমী দুনিয়ার বড় বড় মিডিয়ার দখলে এই অবস্থায় উন্নয়নশীল দুনিয়ার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীন বিকাশ শুধু নয়, তাদের খোদ অস্তিত্বই আজ হুমকির সম্মুখীন কি না। মি. ডেভিড ফ্লিন্টও এ বৈষম্যের দিকে আংগুলি সংকেত করেন। তাবে অনেকেই মত প্রকাশ করেন বিষয়টি পরবর্তী অধিবেশনের আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'ইনডিভিজুয়াল প্রাইভাসি' ও 'সাংবাদিকদের অধিকার' সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে, সেই আলোচনাই এ অধিবেশনের গোটা সময়কে দখল করে থাকে। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অধিবেশনে আমার একটি অভিমত ছিল ঃ 'ব্যক্তিগত গোপনীয়তা একজন মানুষের অবশ্যই একটি মৌলিক অধিকার। তবে এই গোপনীয়াতার সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজন। কারও গোপন কাজকর্ম যদি সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত করে তাহলে সেটা আর 'গোপনীয়তা'র অধিকার ভোগ করতে পারে না। জনপ্রতিনিধি, পাবলিক বা রাজনৈতিক 'ফিগার'দের ' গোপনীয়তা'র পরিধি

www.icsbook.info

খুবই সীমাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।' গোটা আলোচনায় এই দিকটিই বির্তকের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। অনেকেই এ ব্যাপারে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মত প্রকাশ করেন, ' কোন বিষয় জানার জন্যে টেলি-লেন্সের মাধ্যমে কারও বাড়িতে উঁকি দেয়া অবশ্যই সাংবাদিক অধিকারের বরখেলাফ, তবে কারও কোন বিষয়, যা ক্ষতিকর, সাংবাদিকরা যদি কোন গোপন সূত্রে জানতে পারে, তাহলে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো সাংবাদিকদের অধিকারের মধ্যে পড়ে।' শেষ আলোচনায় উপসংহার এইভাবে হয়, বিষয়টিকে সাংবাদিকদের নীতিবোধ ও মাত্রাজ্ঞানের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

৬ষ্ঠ অধিবেশনের আলোচনা ছিল যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'ট্রান্স ন্যাশনাল পাবলিশিং এন্ড ব্রডকাস্টিং' ছিল এ অধিবেশনে আলোচনার বিষয়। এ অধিবশেনের চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীলংকা প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মিঃ এ, এল, এম, ফারনানডো। তিনি আলোচনা উদ্বোধন করার পর প্রথমেই এ বিষয়ের বক্তব্য রাখলেন নেপালের একজন। তিনি ট্রান্স ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিংকে আগ্রাসন বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন, আমাদের ঘরগুলোকে তারা দখল করে নিচ্ছে। এ ব্যাপারে আরও অনেকেই বক্তব্য রাখলেন। একজন মহিলা সদস্যা হতাশা প্রকাশ করে বললেন, এই আগ্রাসনকে চীন প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। আমি আমার বক্তব্যে দুইটি দিকের কথা বলেছিলাম ঃ প্রতিরোধের নেতিবাচক দিক এবং প্রতিরোধের ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিকের মাধ্যমে প্রতিরোধ সম্ভব নয়। পশ্চিমী প্রচারণার বিরুদ্ধে এ ধরনের চেষ্টা করে কম্যুনিস্ট বিশ্ব ব্যর্থ হওয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। প্রতিরোধের ইতিবাচক দিকটাই বাস্তবসম্মত। ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমগুলোকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমি দুই যুগ আগে ম্যাকব্রাইড কমিশন প্রস্তাবিত 'নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন ও কম্যুনিকেশন অর্ডার' শীর্ষক রিপোর্ট বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সদস্য জনাব মহবুব আনাম এ ব্যাপারে বলেছিলেন, মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর কথা। ভালো-মন্দ সম্পর্কে মানুষের সঠিক জ্ঞান হলেই সে জানবে কোনটা গ্রহণ করতে হবে, কোনটা বর্জন করতে হবে।

সেমিনারের সর্বশেষ সেশন ছিল সুপারিশ গ্রহণের অধিবেশন। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন নাইজেরিয়া প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হাজী আলাদে অদনু। অধিবেশনে 'কাঠমণ্ডু ডিকলারেশন' আকারে সুপারিশ পেশ করলেন ওয়ার্ল্ডস প্রেস কাউন্সিল সমিতির চেয়ারম্যান ডেভিড ফ্লিন্ট। আট দফা বিশিষ্ট ঘোষণাটি ছিল সংক্ষেপে এই ঃ

(ক) সমিতি উন্নত দেশগুলোর সাংবাদিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল বিশ্বের সাংবাদিকদের জন্য অধিকতর প্রশিক্ষণ সুযোগ দানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে।

(খ) সমিতি জাতীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ ট্রান্স ন্যাশনাল পাবলিশিং এন্ড ব্রডকাস্টিং - এর সাথে জড়িত বিষয়াবলীর প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে।

www.icsbook.info

(গ) সমিতি আঞ্চলিক সম্মেলন, তথ্য বিনিময় ইত্যাদির মাধ্যমে প্রেস কাউন্সিলসমূহ, সংবাদ মাধ্যম এবং এ ধরনের সংস্থা-সংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে।

(ঘ) সমিতি বাক স্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতার উপর আরোপিত আইনানুগ বিধি-নিষেধ-এর মধ্যকার ভেদ রেখা, যেমন ডিফেমেনশন ল', সংসদ সদস্যদের অধিকার আইন ইত্যাদি নিরীক্ষার প্রতি গুরুত্ব দান করছে।

(ঙ) সমিতি দিল্লী ও কাঠমন্ডু সম্মেলনের রিপোর্ট গ্রহণ করছে।

(চ) সমিতি সময় বিশেষে সংস্থা ও অন্যান্য সদস্যদের তথ্যাবলী নিয়ে একটি নিউজ লেটার প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

(ছ) ১৯৯৫ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিতব্য কলম্বোর বিশ্ব সম্মেলনে এবং ঐ বছর এপ্রিলের হিলসেংকি সম্মেলনে যোগানের জন্যে সকলকে উৎসাহিত করছে।

(জ) সমিতি ব্যক্তি ও পাবলিক ফিগার'দের গোপণীয়তাসহ 'সংবাদপত্র' ও ' গোপনীয়তা' বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আরও নিরীক্ষা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে।

ঘোষণাটি অধিবেশনে পেশ করার পর কতিপয় শব্দের ব্যাপারে সংশোধনী উত্থাপিত হলো। ঘোষণাটি পড়ার পর উদ্বোধনী অধিবেশনে নেপালী প্রধানমন্ত্রী গিরীজা প্রসাদ কৈরালার কথাটি আমার মনে পড়ল। সেই সাথে মনে পড়ল একদিন আগে আলাপচারিতাকালে জনৈক সদস্যের একটি মন্তব্য ঃ সংবাপত্রকে শিল্প বলবেন, সেই সাথে আবার একে বিদেশী অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচাতে চাইবেন - এ দু'টি জিনিস এক সাথে চলতে পারে না। এই সংগে আমার মনে পড়ল সংবাদপত্রকে পাট বা লৌহ্ শিল্পের মত কোন শিল্প না বলা সম্পর্কে আমার নিজস্ব বিশ্বাসের কথা। এসব চিন্তা করে আমি অধিবেশনের চেয়ারম্যানের কাছে ৮টি ঘোষণার সাথে ৯ম একটি ঘোষণার সংযোজন প্রস্তাব করার অনুমতি চাইলাম। অনুমতি দান করলে আমি নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রস্তাব করলাম।

"সমিতি সংবাদপত্রকে একটি সামাজিক শিল্প মনে করে, নিছক লাভের উদ্দেশ্য স্থাপিত কোন শিল্প নয়। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশের সংবাদপত্র ট্যাক্স, ট্যারিফ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রেয়াতিসহ্ সরকারের বিশেষ সহায়তা ও সংরক্ষণ সহযোগিতা পাওয়া উচিত।"

প্রস্তাবটি সভাপতি আলোচনার জন্যে পেশ করলে ফিনল্যান্ডের ক্রিস্টফার গ্রোনহাম বললেন, ঘোষণাটি উন্নয়নশীল দেশের জন্যে নির্দিষ্ট হলে তার আপত্তি নেই। অন্যদের পক্ষ থেকে মাত্র একটিই সংশোধনী আসে। সেটা হলো ' যেসব পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং যাদের প্রচার সংখ্যা অডিট ব্যুরো কর্তৃক সত্যায়িত, সে সব' - কথাগুলো নতুন প্রস্তাবের উপযুক্ত স্থানে সংযোজিত হতে হবে। সংশোধনীটি গৃহীত হবার পর নতুন প্রস্তাবটি ৯ম আইটেম হিসেবে 'কাঠমণ্ডু ঘোষণা'র অংগীভূত হলো। এরপর আরেকটি নতুন প্রস্তাব আসে একজন মহিলা সদস্যার পক্ষ থেকে।

www.icsbook.info

তিনি সমিতিতে মহিলাদের সম অংশিদারিত্বের পদক্ষেপ হিসেবে মহিলাদের জন্যে কোটা নির্ধারণের দাবী করেন। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আমার বক্তব্য ছিল, বিষয়টি এ অধিবেশনের নয়, একে প্রেস কাউন্সিলগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। তবে কিছু কিছু সদস্যের বক্তব্য নতুন প্রস্তাবকে উৎসাহিত করে। এই সময় বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদক জনাব মহবুব আনাম এ বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, মহিলারা সব ক্ষেত্রেই আজ ভাল করছেন। এমনি অনেকে প্রধানমন্ত্রীও হচ্ছেন। সুতরাং যোগ্যতার ভিত্তিতেই তারা তাদের স্থান করে নেবেন এটাই সম্মানজনক। কোটা দাবী করা মর্যাদার নয়।' তার এ বক্তব্যের পর সভাপতি প্রস্তাবটি বাতিল করে দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আরেকজন মহিলা সদস্যা প্রস্তাবটির পুনরাবৃত্তি করলে এবারও জনাব মাহবুব আনাম এগিয়ে আসেন। তিনি আগের মতই যুক্তির অবতারণা করে বলেন, আমরা চাই মহিলারা আসুন, তাদের উপস্থিতিতে অধিবেশন 'কালারফুল' হয়। তবে তাদের আসা উচিত যোগ্যতার ভিত্তিতে, কোটার আশ্রয়ে নয়। প্রেস কাউন্সিলে সদস্য মনোনয়ন দেয়া হয় বিভিন্ন ক্যাটেগরীতে বিভিন্ন বিষয় বিচার করে।' তার বক্তব্যের পর অধিবেশনের সভাপতি আবারও প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন। এই সময় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব বিচারপতি সুলতান হোসেন খান সকলের ভবিষ্যৎ বিবেচনার জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, রেডিও-টেলিভিশনও আজ শক্তিশালী সংবাদ ও তথ্য মাধ্যম। অথচ আজ প্রেস কাউন্সিলের আওতায় রয়েছে শুধু সংবাদপত্র। সুতরাং রেডিও-টেলিভিশনসহ গোটা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে প্রেস কাউন্সিলের আওতায় এনে এর বর্তমান নাম পরিবর্তন করে 'মিডিয়া কাউন্সিল' রাখা উচিত।উপস্থিত সদস্যরা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় এবং বিষয়টিকে বিবেচনা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করে।

অবশেষে সংশোধনী ও সংযোজনীসহ 'কাঠমন্ডু ঘোষণা গ্রহণ এবং নেপাল সরকার ও নেপাল প্রেস কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ভারতীয় প্রেস কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যারন জাস্টিস গ্রোভারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে মোটা চারটি প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড প্রেস কাউন্সিল সমিতির এশিয়ার-প্যাসেফিক অঞ্চলের কাঠমন্ডু সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ওয়ার্ল্ড প্রেস কাউন্সিল সমিতির কাঠমন্ডু ডিকলারেশনের কার্যকরী মূল্য হয়তো খুব বেশি নেই। কিন্তু যে ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে, তার মূল্য অবশ্যই আছে। সাংবাদিকতা সম্পর্কে, সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কে বিশেষ করে ট্রান্স ন্যাশনাল পাবলিশিং এন্ড ব্রডকাস্টিং সম্পর্কে কাঠমণ্ডু ঘোষণায় যেটুকু পাওয়া গেল, তা এই ধরনের কোন আন্তর্জাতিক ঘোণায় পাওয়া যায়নি। ট্রান্স ন্যাশনাল ব্রডকস্টিং -এর ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার প্রতি, প্রতিটি দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

১৬-০২-১৯৯৪

www.icsbook.info

ইন্দোনেশিয়ায় সম্মেলন শেষে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্টমন্ত্রী সম্মেলনের সমন্বয় ব্যুরো উন্নয়ন সহায়তার সাথে মানাবাধিকার প্রসঙ্গ যুক্ত না করার জন্যে সাহায্যদাতা ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্ববান জানিয়েছে। তাদের এক ইশতিহারে বলা হয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কিৃছ কিছু সদস্য সাম্প্রতিককালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়তার সাথে মানবাধিকারের নাগরিক ও রাজনৈতিক দিককে যেভাবে জড়িত করার চেষ্টা করছে, তা নিন্দনীয়। ইশতিহারে আরও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, একটি দেশে মানবধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সে দেশের সরকারেরই, অন্য কোন দেশের সরকারের নয়। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কিংবা জোর করে অসঙ্গতিপূর্ণ মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের সমন্বয় ব্যুরোকে মোবারকবাদ। তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি নজর দিয়েছেন। আজকাল শিল্পোন্নত দেশগুলো সাহায্য দেয়ার সুবাদে তাদের রাজনীতি ও মতাদর্শ দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়ার কাজে তৎপর রয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে তারা মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সন্দেহ নেই, মানবাধিকার খুব ভালো জিনিস। যারা মানবিধিকারের পক্ষে কথা বলেন তারা সব সময় ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু মানবাধিকার শব্দটার তো যথেচ্ছা ব্যবহার চলে না। চোর বা খুনী যখন দণ্ডিত হয়, তখন তার কিছু মানবাধিকারকে খর্ব করতেই হয়। এখানে চোরের ঐসব মানবাধিকার নিয়ে চিৎকার করা ন্যায়সঙ্গত, বিধিসম্মত নয়। অনুরূপভাবে রাষ্ট্র ও সামাজের ক্ষেত্রেও সমাজ-শত্রু ও রাষ্ট্রদ্রোহী আছে যাদেরকে রাষ্ট্রের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে দমন করতে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের মানবাধিকার খর্ব করার প্রয়োজন হয়। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা সন্ত্রাসীদের কথাই ধরা যাক। তারা আজ প্রায় দেঢ় যুগ ধরে প্রতিবেশি একটা দেশের কুমন্ত্রণায় এবং তাদের সাহায্য - সহযোগিতায় আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। রাষ্ট্রের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে এবং অত্যচারিত - নিপীড়িত জনগণের স্বার্থে এদের কঠোর হাতে দমন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যদি কেউ অন্যায়ভাবে মানবাধিকারের প্রশ্ন তোলে; যা তোলা হয়ে থাকে, তাহলে তা হবে ন্যায়বিচারের খেলাফ। এই ধরনের মানবাধিকারের শ্লোগান নিঃসন্দেহেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত। সাধারণভাবে মনে হতে পারে, মানবতার দরদেই এ শ্লোগান তোলা হচ্ছে, কিন্তু গভীরভাবে পর্যন্তবেক্ষণ করলে দেখা যাবে সংশ্লিষ্ট দেশটিকে দুর্বল ও বিপদগ্রস্ত করাই এর লক্ষ্য। কারণ এর দ্বারা দেশটির উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার সহজ হয়। মানবাধিকারকে রাজনেতিক হাতিয়ার হিসেবে

www.icsbook.info

ব্যবহারের শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলোর এই প্রবণতা ইদানীং অত্যন্ত বেড়েছে। বহু দেশে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্রোহ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং পরে মানবাধিকার শ্লোগানকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাহায্য-সহযোগিতার পথ ধরে সেগুলোকে অস্থিতিশীল, এমনকি খণ্ড-বিখণ্ড করারও কাজ চলছে। জোটনিরপেক্ষ পররাষ্টমন্ত্রী সম্মেলনের সমন্বয় ব্যুরো এই প্রেক্ষাপটেই শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোর প্রতি ঐ আহ্বান জানিয়েছেন।

আমি মনে করি, জোটনিরপেক্ষ পররাষ্টমন্ত্রী সম্মেলনের এই আহ্বান উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনমতেরই প্রতিধ্বনি করছে। ইদানীং ধনী সাহায্যদাতা দেশগুলোর মানবাধিকার রাজনীতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, চারদিক থেকে প্রকাশ্য সমালোচনাও শুরু হয়েছে। শিল্পোন্নত কতিপয় দেশে গণতন্ত্রের জন্যে মায়াকান্না ও গণতন্ত্রের স্বঘোষিত মরুব্বী সাজার ব্যাপারটা মুক্তি ও নীতিরোধের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র বলতে তারা যা বুঝে তাকেই তারা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। এর অন্যথা কেউ করলে তারা হৈচৈ বাধাচ্ছে এবং এমনি সাহায্য -সহযোগিতা বন্ধ করার মত চাপও সৃষ্টি করছে। উন্নয়নশীল দুনিয়ার অনেকেই আজ সাহায্যদাতা ধনী দেশগুলোর এই অন্যায় প্রবণতার তীব্র সমালোচনায় এগিয়ে এসেছেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের সাম্প্রতিক একটি ভাষণ এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত তাঁরা ভাষণে (সেপ্টেম্ব, ১৯৯১) শিল্পোন্নত দেশসমূহের এই মনোভাবের কাঠোর সমালোচনা করেছেন। গণতন্ত্র কারো কোন এক বিশেষ পদ্ধতির নাম নয় কিংবা গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা কোন এক বিশেষ নেতার কাছে নিতে হবে তাও হতে পারে না। এ বিষয়ের উপর বলতে গিয়ে মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, "গণতন্ত্র, একমাত্র গণতন্ত্রই আজ বৈধ ও গ্রহণযোগ্য। প্রকৃতই এই ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করে না। কিন্তু গনতন্ত্রের পদ্ধতি কি একটাই কিংবা কোন এক স্বঘোষিত যাজকই কি হবেন শুধু এর ব্যাখ্যাতা? যারা বিশ্বময় গণতন্ত্র প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তাদের মধ্যেও গণতন্ত্রের ব্যবহারিক রূপ আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখি। তাহলে তারা যা ভাল মনে করেন সেভাবে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করার এবং তা অনুসরণ করার অধিকার কি শুধু গণতন্ত্রের ঐ প্রচারকদেরই, আর তাদের দেয়া ব্যাখ্যাই কি অন্যদের মাথা পেতে নিতে হবে? মৌলিক দিক নয়, গণতন্ত্রের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিক নিয়েও গণতন্ত্রের হতভাগ্য গ্রাহকরা কোন চিন্তা-ভাবনা করতে পারবেন না?"

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে পশ্চিমারা আজ অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জাতি-গোষ্ঠীর দাবী ও অধিকার নিয়ে এতটাই বাড়াবাড়ি করছে যে, সংখ্যাগুরুদের অধিকার তাতে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, দেশে বিভেদ-বিশৃংখলা বাড়ছে। তুরস্কে উসমানিয়া খেলাফতের আমলে সুখে-শান্তিতে ও জামাই-আদরে বসবাসকারী খৃস্টান সংখ্যালঘুদের কল্পিত সমস্যা নিয়ে পশ্চিমারা একদিন যে ধরনের হৈ চৈ করতো, আজ তারা তাই শুরু করেছে। হত্যা, সন্ত্রাস, যাই করুক, বিভেদ-বিদ্বেষ যাই ছাড়াক; ষড়যন্ত্র ও দেশ ধ্বংসের যে চেষ্টাই করে চলুক, গণতন্ত্রের স্বার্থে যেন সংখ্যালঘুদের এসব কিছুই মেনে

www.icsbook.info

চলতে হবে। পশ্চিমী এ মনোভাবের প্রবল প্রতিবাদ করে মাহাথির মোহাম্মদ অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেছেন, "গণতন্ত্রের অর্থ যদি হয় যে, বেআইনী অস্ত্র বহনে বাধা দেয়া যাবে না, ব্যভিচার, সমকামিতা যথেচ্ছ চলতে পারে, ব্যক্তি - অধিকারকে মর্যাদা দেয়ার জন্যে তাকে বিবাহ প্রথার প্রতি উপেক্ষা ও সমাজের সুস্থতা ধ্বংস করতে দিতে হবে, জাতির আদর্শ ও বিশ্বাস সে ধ্বংস করতে পারবে, কোন বিশেষ সুবিধাভোগী কোন সংস্থা দেশের সমাজ অর্থনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক ধ্বংস করার কাজে রত হলে বা এই কাজে প্ররোচনা দিয়ে চললেও কিছুই বলা যাবে না, বিদেশীরা জাতীয় আইন ও রীতিনীতি পদদলিত করতে পারবে, তাহলে গণতন্ত্রের নতুন গ্রহীতারা কি এ গণতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে না? গণতন্ত্র যদি জনগণকে ভালোটা বেছে নেবার অধিকার না দেয়, তাহলে সেটা গণতন্ত্র হয় কি করে?" এ প্রসঙ্গে মাহাথির মোহাম্মদ আরও বলেন, "গণতন্ত্রের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যালঘুরা অবশ্যই তাদের অধিকার পাবে, কিন্তু তাদের অধিকার কি সংখ্যাগুরুদের অধিকার অস্বীকার করতে পারে? স্বীকার্য যে, সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করতে পারবে না, কিন্তু সংখ্যালঘুরা যদি দায়িত্বহীনভাবে তাদের অধিকার ভোগ করতে চায়, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের যদি তারা এজেন্ট হয়ে দাঁড়ায়, নিজের দেশকে দুর্বল করে যদি একে কোন বিশেষ শক্তির লেজুড় বানাতে চায়, তাহলে কি গণতন্ত্রের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের এ ষড়যন্ত্রের কাছে সংখ্যাগুরুরা মাথা নত করবে?" গণতন্ত্রের বড় বড় প্রবক্তাদের স্ববিরোধিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, "একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেমন চাই গণতন্ত্র, তেমনি বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্কের মধ্যেও গণতন্ত্র থাকা দরকার নয় কি? জাতিসংঘে আমরা সকলেই সমান, কিন্তু বিশ্বের ১৬৫টি রাষ্ট্রের মধ্য থেকে ৫টি রাষ্ট্র উচ্চতর ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত।"

এই পাঁচটি রাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রগুলো শুধু জাতিসংঘেই গ্রুপ স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে রেখেছে তা নয়, গণতন্ত্রের ঐ বড় প্রবক্তারা তাদের নিজ দেশে মানবাধিকার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করে এসেছে। আমেরিকায় সেখানকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা তাদের নিজ ভূমিতে কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল, সেখানকার নিগ্রোরা কি অবস্থার মধ্যে দিন কটাচ্ছে তা কারও অজানা নয়। অষ্ট্রেলিয়া, বৃটেন, কানাডা কারও ইতিহাস এ থেকে ভিন্ন নয়। দুঃখের বিষয়, গনতন্ত্র যেখানে কোটিপতিদের হাতে কুক্ষিগত 'গণ'রা যেখানে হাত তোলা ছাড়া ক্ষমতার ছায়া মাড়াবার কল্পনাও কোনদিন করতে পারে না, সে সব দেশ যখন অন্যের ছিদ্রান্বেষণে রত হয়, তখন তা দেখতে বড় মর্মান্তিক লাগে।

সম্প্রতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহদ দেশের সরকার পরিচালনায় পরামর্শ পরিষদ গঠনের ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেছেন, "পশ্চিমী গণতন্ত্র পশ্চিমী দেশগুলোর জন্যে কল্যাণকর হতে পারে, পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে তা উপযুক্ত নয়। – আমাদের জনগণের প্রকৃতি ভিন্ন। আমাদের আদর্শ ও মূল্যবোধ যে শিক্ষা দেয় তার পরিপন্থী হবে না এমন ভাল জিনিস ঐ গণতন্ত্র থেকে আমাদের গ্রহণ করতে আপত্তি নেই।" গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সাথে এই আদর্শ ও মূল্যবোধের সম্পৃক্ততার কথা

www.icsbook.info

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পররাষ্টমন্ত্রী সম্মেলনের সমন্বয় কমিটির ইশতিহারেও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সব কিছুকেই সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্র এই আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্র এই আদর্শ ও মূল্যবোধের ধার ধারছে না। তারা গণতন্ত্রের শ্লোগান তুলে গণতন্ত্রের নামে 'গণ'দের আদর্শ ও মূল্যবোধকেই গলটিপে মারতে চাচ্ছে। এ কাজে তাদেরকে সাহায্য করছে পশ্চিমী শিক্ষা ও পশ্চিমী মূল্যবোধে দীক্ষিত একশ্রেণীর স্বদেশীরা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের আহমদ শরীফ, জাহানারা ইমাম, কেএম সোবহান, ফয়েজ আহমদ প্রমুখ গণআদালতী বলে পরিচিত ধর্মনিপেক্ষতাবাদীরা বাংলাদেশে এই ধরনের কুকাজই করছে। তবে এঁরা সংখ্যালঘু। মেজরিটির অর্থাৎ জনগণের এঁরা শত্রু। গণতন্ত্রের পোশাক পরে আধিপত্যবাদ এই সংখ্যালঘুদের কাঁধে চড়েই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনুপ্রবেশ করছে। 'গণতান্ত্রিক' এই আধিপত্যবাদ আজকের বিশ্বের জন্য একটা বিরাট বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাহথির মোহাম্মদের ভাষায় ঃ "Hegemony by the democratic power is no less oppressive than hegemony of the totalitarian states." অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শক্তির আধিপত্য স্বৈরতন্ত্রী কমিউনিস্ট একনয়কতন্ত্রের চেয়ে কম নিপীড়নমূলক নয়।

এই আধিপত্যবাদ থেকে অব্যহতি দানের জন্যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গণতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের কেন্দ্রবিন্দু শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এই আহবানকে আমি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছি। এই আহবান জানানোর মাধ্যমে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন যেমন উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি কণ্ঠে পরিণত হলো, তেমনি তার ঘাড়ে বিরাট এক দায়িত্বের বোঝাও গিয়ে বর্তেছে কমিউনিস্ট জোটের পতনের পর পশ্চিমী জোটের নেতৃত্বাধীন আজকের একমাত্রিক পৃথিবীতে দরিদ্র ও দুর্বল উন্নয়নশীল বিশ্ব আজ অসহায় এবং অপ্রতিরোধ্য এক গণতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের শিকার। এই 'গণতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ'- এর কবল থেকে আত্মরক্ষার মত কোন আশ্রয় তাদের নেই। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন সুসংগঠিত হলে ঐ দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর জন্যে তা একটি আশ্রয় হতে পারে।

তবে এই আশ্রয়স্থল হবার জন্যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে জনগণের আদর্শ, মূল্যবোধ ও আশা-আকাংখাকে শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করে নিজ মেরুদণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। একে মুক্ত হতে হবে জাহানারা ইমাম, আহমদ শরীফ, কেএম, সোবহান, রাশেদ খান মেনন, ফয়েজ আহমদ প্রমুখের মত জাতীয় আদর্শ ও বিশ্বাস পরিত্যাগী এবং পশ্চিমী মূল্যবোধ ও চিন্তার কাছে আত্মসমর্পিত লোকদের কবল থেকেও। এই ধরনের পরগাছাদের বদলে মাহাথির মোহাম্মদের মত জাতীয়তাবাদী এবং আদর্শবাদী নেতারা যদি এগিয়ে আসেন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের হাল ধরার জন্যে, তাহলে আজকের একমাত্রিক দুনিয়ায় নবশক্তির আরেক মাত্রা যোগ হতে পারে যা হবে উন্নয়নশীল দুনিয়ার জন্যে আশার, আনন্দের এবং সৌভাগ্যের।

২১-০২-১৯৯২

www.icsbook.info

পৃথিবীর এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ইসলামকে পশ্চিমী জনগণের কাছে 'সবুজ আতংক' হিসেবে তুলে ধরতে গলদঘর্ম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এরা বলতে চাচ্ছে কমিউনিস্টদের লাল সামাজ্যবাদের স্থান এসে দখল করছে ইসলামের 'সবুজ আতংকের সাম্রাজ্য'। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এসব সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের উৎস হলো ইহুদী অথবা ইহুদী নিয়ন্ত্রিত সংস্থা সংগঠন। আর এসব সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমকে উপকরণ যোগাচ্ছে এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ যারা নিজেরা ইহুদী অথবা ইহুদীদের দ্বারা প্রতিপালিত।

তথাকথিত এই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা পাতার পর পাতা প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে চলেছেন ইসলামের তথাকথিত জংগীবাদী উত্থান ও সবুজ সম্প্রসারণবাদের উপর। কিন্তু মুশকিল হলো এই পণ্ডিতরা ইসলামের জংগীবাদ কোথাও দেখাতে পারছে না। তারা যে সব ইস্যু সামনে এনে পশ্চিমী জনমতকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে ঃ নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলা, দক্ষিণ সুদানে সুদানের মুসলিম সরকারের সাথে খৃষ্টানদের সংঘাত, মিসরে কিছু সন্ত্রাসবাদী বোমা হামলার ঘটনা, আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ায় ইসলামী দলগুলোর সাথে সেখানকার সরকার পক্ষের সংঘাত, বসনীয় মুসলমানদের প্রতি মুসলিম জনগণের সোচ্চার সমর্থন, মধ্য এশিয়ার নতুন মুসলিম প্রজাতন্ত্রসমূহে মুসলমানদের তৎপরতা, লেবাননে শিয়া ও অন্যান্য মুসলিম গ্রুপের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা, প্যালেস্টাইনে ইনতেফাদা আন্দোলন ইত্যাদি।

ইসলামের জংগীবাদী উত্থানের এই যে দৃষ্টান্তগুলো তাঁরা তুলে ধরছেন তার একটিতেও ইসলামের জংগীবাদ আমরা দেখি না। নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কারা হামলা চালায়, কোন উদ্দেশে চালায়, নিরপেক্ষ কোন আদালতে তা এখনও প্রমাণ হয়নি। এই ধরনের হামলার সাথে যে বা যারাই জড়িত থাক, ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই । শান্তি ও মানবতার প্রতি কমিটমেন্টের কারণেই ইসলাম কোন জুলুমকে বরদাশত করে না, কিন্তু একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেবার বিধান ইসলামে নেই। পৃথিবীতে বোমা হামলার ঘটনা বহু ঘটেছে। সে সবের সাথে অবশ্যই কোন ব্যক্তি জড়িত ছিল এবং সে ব্যক্তির অবশ্যই কোন ধর্ম আছে। কিন্তু কোথাও তো বোমা হামলার সাথে তার ধর্মকে জড়ানো হয়নি? ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ক্ষেত্রে তা

www.icsbook.info

হচ্ছে কেন? এ ধরনের জঘন্য প্রচারণা দ্বারা এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও মানুষ চাচ্ছে পশ্চিমী জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ সুদানের গৃহযুদ্ধের সাথে প্রকৃত অর্থে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এমন গৃহযুদ্ধ চলছে বহুদিন ধরে বহু দেশে। যেমন শিখদের সাথে চলছে ভারত সরকারের লড়াই অথবা উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সাথে যেমন চলছে বৃটেনের সংঘাত। কিন্তু কই, পশ্চিমী ঐ সংবাদ মাধ্যম তো উত্তর আয়ারল্যান্ডে বৃটেনের তৎপরতাকে প্রটেস্ট্যান্ট আগ্রাসন বলছে না কিংবা পাঞ্জাবে শিখদের উপর দিল্লী সরকারের পদক্ষেপকে হিন্দু আগ্রাসন বলে অভিহিত করছে না। বৃটেন উত্তর আয়ারল্যান্ডে এবং ভারত পাঞ্জাবে যেমন দেশের অখণ্ডতার পক্ষে কাজ করছে, সুদানও তাই করছে দক্ষিণ সুদানে। তাহলে এক সুদানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ফল আসছে কেন? মিসরে যে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা মুলতই রাজনৈতিক। যে কোন মূল্যায়নে মিসর সরকারের রাজনৈতিক দমনমূলক পদক্ষেপেরই এটা প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ যারা ঘটিয়েছে তারা কোন ধর্মের, কোন মতের তার চেয়ে বড় কথা হলো তাদের প্রতিক্রিয়ার কারণ। প্রতিক্রিয়ার কারণ সৃষ্টি হলে প্রতিক্রিয়া ঘটবেই, ধর্মের পরিচয় এখানে বড় কথা নয়। এই কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা অবিচারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটে গেল যার বীভৎসতা মিসরে ঐসব বোমা হামলার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। সেখানে তো ইসলাম নামক কোন ধর্ম ছিল না। আমি মনে করি মিসরের ঐ সব ঘটনার সাথে ইসলামকে জড়িত করা পশ্চিমীদের এক চরম বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা। মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও এক ধরনের সরকার আছে যারা নির্যাতিত জনগণের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধকে ইসলামের জংগীবাদ আখ্যা দিয়ে নিজেদের কু-কীর্তি আড়াল করতে এবং পশ্চিমের সাহায্য-সহযোগিতা নিশ্চিত করতে চান। আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ায় সরকারের সাথে যাদের সংঘাত চলছে, তারা নিষ্ঠাবান মুসলমান, তারা ইসলামের প্রতিষ্ঠা চান দেশে। কিন্তু বিরোধের মূল কারণ ইসলাম নয়। সেখানে প্রকৃতপক্ষে সংঘাত চলছে স্বৈর সরকারের সাথে জনগণের পক্ষে দাঁড়ানো গণতান্ত্রিক শক্তির। এই গণতান্ত্রিক শক্তি বা জনগণ ইসলামের প্রতিষ্ঠা চায়। এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। এটা কোনক্রেমেই তাদের দোষ নয়, যেমন দোষ হয়নি বাইবেলে হাত রেখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিল ক্লিনটনের শপথ বাণী পাঠ, যেমন অপরাধ নয় বৃটেনের রাজা বা রানী কর্তৃক দেশের সর্বোচ্চ ধর্মগুরুর পদ গ্রহণ। অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি, মধ্য এশিয়া ও ফিলিস্তিনে ইসলাম কোন জংগীবাদী ভূমিকায় নেই। সেখানকার মুসলমানরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা চাচ্ছে মাত্র, আর সেখানে স্বৈরতন্ত্রীরা জংগীবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নস্যাৎ করে দিতে সচেষ্ট। এই জংগীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইসলাম

www.icsbook.info

জনগণের প্রেরণা ও শক্তি উৎস অবশ্যই। আর এটা ইসলামের মানবতাবাদী ও শান্তিবাদী রূপেরই একটা প্রমাণ।

সুতরাং পৃথিবীর এক শ্রেণীর সংবাদ মাধ্যম ইসলামের যে জংগীবাদীরূপ আঁকতে চাচ্ছে পশ্চিমী জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে, তা সত্য নয়। বিশ্বের ইহুদী সংবাদ মাধ্যম ও বিশেষজ্ঞরা বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়েই এই অপপ্রচারে মেতে উঠেছে। ইহুদীরা চাচ্ছে পাশ্চাত্যের খৃস্টান এবং প্রাচ্যের ইসলামের মধ্যে একটা সংঘাত অবস্থা বজায় রাখতে। এতে তাদের দুটো লাভ ঃ এক, পাশ্চাত্যে ইহুদীদের শোষণ ও ষড়যন্ত্র আড়াল করে রাখা, দুই, সংঘাতের সুযোগে পশ্চিমী সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে গ্রেটার ইসরাইল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা। পশ্চিমীদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে ইহুদীরা অনেক খেয়েছে, আরও খেতে চায় তারা।

পশ্চিমীরা যদি এই ইহুদী ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত হতে চায়, পশ্চিমী গণতন্ত্র সত্যিই যদি চায় মানবতাবাদী ও শন্তিবাদী হয়ে উঠতে, তাহলে পশ্চিমী জনগণের উচিত ইসলামের সহযোগী হওয়া। আজকের দুনিয়ায়, ইসলামই শান্তি ও মানবতার শিক্ষক হতে পারে, লিবারেল ডেমোক্রাসি নয়। আমেরিকার লিবারেল ডেমোক্রাসি সেখান থেকে বর্ণবাদ খতম করতে পারেনি। ইসলাম এ বর্ণবাদকে এক নিমিষেই উচ্ছেদ করেছে। ইসলাম পৃথিবীর মানব জাতিকে এক ঐশী পরিবার হিসেবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্মান ও সৌহার্দ্য কায়েম করেছে, তা সেক্যুলার লিবারেল ডেমোক্রাসি কিয়ামতকাল চেষ্টা করলেও পারবে না। ইসলামের এই মানবিক দিক সম্পর্কে পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা যে সাক্ষ্য দিয়েছেন সেখান থেকে পশ্চিমীরা সত্যটা জেনে নিতে পারে। যে শান্তি ও স্বাধীনতা অমুসলমানরা মুসলিম শাসনে ভোগ করেছে তার তুলনা ইতিহাসে নেই। ঐতিহাসিক আর্নল্ড তার Preaching of Islam বইতে দেখিয়েছেন কিভাবে খৃস্টানরা মুসলিম বিজেতাদের স্বাগত জানাত এবং মুসলিম শাসনে থাকতে ভালবাসত। ঐতিহাসিক মুয়ূর, বিফন্ট-এর মতো অগণ্য ঐতিহাসিক এই একই সাক্ষ্য দিয়েছেন। এমনটা শুধু ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ছিল তা নয়। কোন সময়ের কোন মুসলিম শাসনেই ধর্মীয় ও জাতিগত পার্থক্যের কারণে কোন নিপীড়ন হয়নি। এমনকি তুরস্কের ওসমানী শাসন আমলেও নয়। ইউরোপের খৃস্টান শাসকরা তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র করে গেছে, তুরস্কের খৃস্টানদেরকেও ব্যবহার করেছে বার বার। কিন্তু এরপরও খৃস্টান প্রজারা অত্যন্ত ভালো ব্যবহার পেয়েছে সেখানকার মুসলিম শাসকদের কাছে। ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য ঃ "তুরস্কে ওসমানীয় শাসনের দিনগুলোতে......খৃস্টান প্রজারা সমকালীন খ্রিস্টান শাসকদের অধীন খৃস্টানদের চাইতে অনেক বেশি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পদ ভোগের

www.icsbook.info

সুবিধা লাভ করতো। (Luke পৃঃ ৯৪) এই ঐতিহাসিকের আরও সাক্ষ্য এই যে, "সুলতানের খৃষ্টান প্রজারা সংখ্যা ও সম্পদ সমৃদ্ধিতে বেড়েই চলেছে। এসব ক্ষেত্রে তারা মুসলিম প্রজাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"(Luke, পৃঃ ৬৬-৬৭) বর্তমানেও মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতিগত সহনশীলতা তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশি। ভারতে অবিরাম মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুরা নিরপদ্রুপ ও শান্তিময় জীবন যাপন করছে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে, অনেক মসজিদ তারা দখল করেছে। কিন্তু এ ধরনের কোন দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে নেই। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশেও আমরা এ সহশীলতার দৃশ্যই দেখছি। আলজিরিয়ায় ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় যেতে দেয়া হলো না। কিন্তু তাদের ক্ষমতায় যেতে দেয়া হলে দেখা যেতো,ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা সেখানে তুলনামূলকভাবে বেশি সুখ-শান্তিতে রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যে দেশ যত ইসলামের কাছাকাছি সে দেশে তত জাতিগত নির্যাতন কম।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, মুসলমানরা ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন জাতির প্রতি এত সহনশীল, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে এত হানাহানি এবং মুসলিম দেশগুলোতে এ অস্থিতিশীলতা কেন? এককথায় এর উত্তর এটা দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল এবং বর্তমান বৃহৎ শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র। উপনিবেশীক শাসনের অশিক্ষা-কুশিক্ষা মুসলমানদের বিশেষ করে শিক্ষিতদের চিন্তা-চেতনায় যে বিকৃতি এনেছে তা একদিকে এখনও দূর হয়নি, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরতাও আমাদের আসেনি। এরই সুযোগ নিয়ে বৃহৎশক্তিগুলো মুসলিম দেশের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের পুতুল নাচ নাচাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর অশান্তি ও অস্থিতিশীলতার মূল কারণ এটাই। আরেকটা তিক্ত কথা হলো, মুসলিম দেশগুলোতে পুতুল নাচের এ মর্মান্তিক খেলা ভেঙে যাবে বলেই বৃহৎশক্তি অধ্যুষিত ও প্রভাবিত পাশ্চাত্য ইসলামের উত্থানকে ভয় করছে। এ ভয় তাদের ঠিক। কিন্তু তাদের এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, ঐ পুতুল খেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে বটে, কিন্তু ইসলামী শাসনের অধীন সমৃদ্ধ মুসলিম বিশ্ব থেকে পশ্চিমীরা আজকের চেয়েও বেশি উপকৃত হবে।

২৯-০৬-১৯৯৩

www.icsbook.info

চিত্তরঞ্জন দত্ত ওরফে সি, আর, দত্ত বাবু, অনেকে বলেন, পাগল হয়ে গেছেন। কিছুদিন আগে জনৈক মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলিছিলেন, 'আপনারা অর্থাৎ মুসলমানরা দেশ ত্যাগ করে চলে যান। আরেকবার তিনি বললেন, '৫০ লাখ সংখ্যালঘুকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। আবার তিনি বলেছিলেন, '৩ কোটি সংখ্যালঘু নিয়ে তিনি ভারত গিয়ে বাংলাদেশকে দেখে নেবেন।' এ সব কথা পাগলের প্রলাপের মত। কিন্তু তিনি পাগল নন। পাগল হলে এতদিন তার পাবনা হেমায়েতপুরে স্থান হতো। কিন্তু তা হয়নি। দত্ত বাবুর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজরাও তাকে হেমায়েতপুরে নেননি, সরকারও তাকে সেখানে পাঠাবার প্রয়োজন মনে করেননি। অর্থাৎ অ-পাগল সুস্থ মানুষ তিনি।

কিন্তু পাগলের মত প্রলাপ তিনি আবার বকেছেন। এবার তিনি বলেছেন, একজন সংখ্যালঘু ছেলেকেও যদি কারাগারে নেয়া হয়, যদি তাদের উপর জুলুম চালানো হয়, তাহলে বাংলাদেশের কবর খোড়া হবে। শ্রী দত্ত বাবুর এই উক্তি ছাপা হয়েছে ২৩শে জুলাই তারিখে। এর যে প্রতিবাদ হয়েছে তাতে মূল কথাকে অস্বীকার করা হয়নি। তারা নাকি কবর রচনা করতে চেয়েছেন গ্রেফতারকারী কর্তৃপক্ষের। কবর দেয়ার এ উক্তিকে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি বলা যাবে? এ দেশে আশি-নব্বই লাখ সংখ্যালঘু বাস করে। এরা সবাই সৎ? এদের মধ্যে কি চোর, ডাকাত, খুনী নেই? আছে। তাহলে সংখ্যালঘু চোর ডাকাতকে কি জেল দেয়া যাবে না, সংখ্যালঘু খুনীকে কি ফাঁসি দেয়া যাবে না? অবশ্যই যাবে, কারণ তারা এ দেশের নাগরিক, দেশের আইন যেমন সংখ্যাগুরুর উপর প্রযোজ্য, তেমনি সংখ্যালঘুর উপরও প্রযোজ্য। এ কথা না বোঝার মত পাগল দত্ত বাবু নন। এরপরও তিনি ঐ উক্তি করেছেন। বাস্তবতার দিক থেকে একে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হলেও পাগলের কোন প্রলাপ এটা নয়। রীতিমত তিন হুমকি দিয়েছেন। এ হুমকির সরলার্থ হলো, আইনের চোখে কোন অপরাধ করলেও কোন সংখ্যালঘুকে শাস্তি দেয়া যাবে না। শক্তি না থাকলে হুমকি দেয়া যায় না। তাদের শক্তির কথাও দত্ত বাবু উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, তাদের ঐক্য পরিষদ এখন শুধু বাংলাদেশে নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্বেও বিস্তৃতি পেয়েছে। অর্থাৎ দত্ত বাবুদের শিকড় বাইরে বিস্তৃত। এই শিকড়ের শক্তিতেই তাদের এই হুমকি।

দত্ত বাবু যে সভায় দাঁড়িয়ে উপরেক্ত হুমকি দিয়েছেন সেখানে তিনি এবং অন্যান্যের পক্ষ থেকে আরও অনেক হুমকি এসেছে। অভিযোগ ও হুমকিগুলোর

www.icsbook.info

সারাংশ এই ঃ

(ক) সি, আর, দত্ত ঃ সাহস থাকলে বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করুন, আমরা দেখবো।

(খ) মহন্ত মহাথেরো ঃ যে যাই হিসেব দিক না কেন, আমরা বাংলাদেশে চার কোটি সংখ্যালঘু রয়েছি, আমরা টিকে থাকতে পারছি না।

(গ) ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ঃ এ দেশে নিপীড়ন চলছে এটা সারাবিশ্ব জানে। ক্যাসেট চলে গেছে বাইরে। .... আজ মাত্র ৬০ হাজার চাকমার সমস্যা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন .... ওপারের ১৬ কোটিকে আশ্রয় দিতে পারবেন?

(ঘ) ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক ঃ পূর্ত মন্ত্রী পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে আমাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজাকে ষড়যন্ত্রের ফসল বলে অভিহিত করেছেন।

দত্ত বাবুদের যে অভিযোগ ও হুমকির তালিকা এখানে আনলাম তার সবগুলোর জবাব দেয়া আমার লক্ষ্য নয়। তাদের সাহস ও ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যাচার কোন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তাই শুধু আমি এখানে দেখাতে চেয়েছি। এই অভিযোগ ও হুমকিগুলোকে অতীত এবং চারপাশের ঘটনাবলীর সাথে মিলিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এগুলোর কোনটাই বিচ্ছিন্ন নয়, নানাভাবে এগুলো যুক্ত আছে সীমান্তের ওপারের ঘটনাবলীর সাথে।

সি. আর. দত্তদের এই সাহসের উৎস সন্ধানের জন্যে সামনে আনতে হবে কলকাতা কেন্দ্রিক বঙ্গভূমি আন্দোলন, কলাকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া ' সোনার বাংলা সরকার', বাংলাদেশ অভ্যন্তরের 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন' প্রভৃতির মত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বিরোধী সংস্থা সংগঠনের তৎপরতাকে। 'বঙ্গভূমি' আন্দোলন বাংলাদেশের অখণ্ডতা বিরোধী কলকাতা কেন্দ্রিক একটি তৎপরতা। এদের সম্পর্কে কলকাতার দৈনিক আজকাল পত্রিকা ১৯৮৯ সালের ১১ই মে সংখ্যা লিখে, "বাংলাদেশকে দু'টুকরা করে হিন্দুদের জন্যে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্যে জোর তৎপরতা চলছে। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ ২০ হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' গঠনের উদ্যোগ আয়োজন চলছে অনেকদিন ধরে। .... বঙ্গভূমি আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সংগঠক নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ। ১৯৭৭ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতায় এই সংগঠনটির জন্ম হয়।" এই সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন কালিদাস বৈদ্য এবং আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি চিত্ত সুতারের মত লোকরা। এরপর আসে কলকাতার ৫৯/বি, অখিল মিস্ত্রি লেন (প্রথম তলা) ঠিকানায় ১৯৮৯ সালের ২২শে নবেম্বর তারিখে 'গভর্নমেন্ট অব সোনার বাংলা' নামক

www.icsbook.info

সরকার গঠনের বিষয়টি। এ সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পত্রে দেখা যায়, খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর, বরিশাল ফরিদপুর ও পটুয়াখালী নিয়ে (২০ হাজার বর্গমাইল) ' সোনার বাংলা' রাষ্ট্র ঘোষণা করে কলকাতায় প্রবাসী সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয়টি হলো বাংলাদেশে গড়ে উঠা 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন'। এ আন্দোলনের লক্ষ্য সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে আবার একত্রিত করা। ১৯৯২ সালের ৩১শে জানুয়ারির বিচিন্তা মোতাবেক "এর সাংগঠনিক নেতৃত্বে রয়েছেন আপাতত জনাব আমান উল্লাহ, শফিউল আলম, ফরিদ নিরোদ, সুভাষ সাহা এবং নীতিশ হালদার। এরা সবাই প্রথম প্রজন্মে আওয়ামী লীগ করতেন।" এই উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন মুখ্যত বাংলাদেশেকে ভারতের সাথে যুক্ত করারই আন্দোলন।

কলকাতা কেন্দ্রিক এ আন্দোলনগুলো আজ দারুনভাবে সক্রিয় এবং এই আন্দোলনগুলোই সি, আর, দত্ত বাবুদের সাহসের উৎস। আরেকটা বড় উৎস হলো প্রতিবেশী ভারতের ক্ষমতাসীন মহলের ষড়যন্ত্র। বিস্ময়ের ব্যাপার, যারা বাংলাদেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে প্রায় দুই দশক ধরে, তারাই আজ উল্টো অভিযোগ করছে বাংলাদেশ নাকি ভারতের উত্তর - পূর্বাঞ্চলকে অস্থিতিশীল করার জন্যে ভীষণ তৎপর হয়ে উঠেছে। সেখানকার ক্ষমতাসীন মহল সম্প্রতি দুইটি অভিযোগ উত্থাপন করেছন। .... পূর্বাঞ্চলে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে ট্রেনিং নেবার জন্যে বাংলাদেশ শত শত লোককে চীনে পাঠিয়েছে এবং (২) বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন করা হচ্ছে এবং তাদের উচ্ছেদ করে ভারতে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এই রিপোর্ট করেছে ভারতের দায়িত্বশীল পত্রিকা স্টেটসম্যান গত ২৮শে জুন তারিখে। এমনকি স্টেটসম্যান এই রিপোর্টের উপর একটা উত্তেজনক সম্পাদকীয়ও লিখে ফেলেছ। যার উস্কানিমূলক শেষ বাক্যটি হলো : Is any one in Delhi listening? অর্থাৎ দিল্লীর কোন কেউ কি এ কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন? ভাবটা যেন এই যে, দিল্লী দেরী করছে কেন বাংলাদেশকে শায়েস্তা করতে!

এ সবই হলো সি, আর, দত্ত বাবুদের সাহসের উৎস। সীমান্তের ওপারে ভারতে বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশ বিরোধী এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা বিরোধী একটা মঞ্চ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের এ মঞ্চকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে তাদের প্রধান চাওয়া হলো, বাংলাদেশে বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘাত। একটা সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাধাতে পারলেই কলকাতা, আসাম, ত্রিপুরা বিপুলহারে সংখ্যালঘুদের টেনে নেবে, তারপর ব্যাপক হারে বাংলাদেশে ঠেলে দেবে ভারতীয় মুসলমানদের। এইভাবে বিরাট এক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ করে নেবে ভারত। এই গোপন পরিকল্পনার নানা দিক বিভিন্ন সময়

www.icsbook.info

দত্ত বাবুদের মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে। যেমন উপরে উদ্ধৃত অভিযোগে ডঃ দুর্গাদাস বাবু প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের ১৬ কোটিকে আশ্রয় দিতে পারবেন? ভারতীয় মুসলমানদের এভাবে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া ওপারের গোপন পরিকল্পনারই একটা অংশ। তাছাড়া দত্ত বাবুরা তিন কোটি বা চার কোটি সংখ্যালঘু বাংলাদেশে আছে বলে উল্লেখ করছেন, এটাও ওপারের ষড়যন্ত্রেরই একটা দিক। তাদের এই ষড়যন্ত্রের দুইটি অংশ ঃ (১) বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে তারা ব্যাপকহারে এ দেশে হিন্দু অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে বা ঘটাবে এবং (২) পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে বাংলাদেশের বলে চালাতে চায়। কিন্তু দত্ত বাবুদের মুশকিল হলো এবং ওপারের ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্যা হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক হানাহানি নেই এবং হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। এর কারণ মুসলিম দেশে বা মুসলিম শাসনে সংখ্যালঘুরা কোন সময়ই অত্যাচারিত হয়নি এবং হয় না। ভারতে হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মোকাবিলায় বাংলাদেশে শান্তি বিরাজ করছে। এ কারণেই দত্ত বাবুরা অবশেষে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বানোয়াট কাহিনী প্রচার শুরু করেছেন, বানোয়াট ভিডিও টেপও বাইরে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু নিহতের কোন নাম বা তালিকা প্রকাশ করতে পারছেন না। এখানে এসে দত্ত বাবুরা ঠেকে গেলেও তাদের অপপ্রচার কিন্তু ক্রমশ বাড়ছেই। এই কাজে তাদের সাহায্য করছে বাংলাদেশের ঘাদানিক চক্র এবং পনের দলীয় জোটবলয়ের একটা মহল। আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষভাবে এই ষড়যন্ত্রকে সাহায্য করছে তা বলবো না, কিন্তু ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাদের নীরবতা এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন চলছে বলে তাদের মাঝে মধ্যেকার কাণ্ডজ্ঞানহীন অভিযোগ দত্ত বাবুদের ষড়যন্ত্রকে সাহায্যই করে থাকে। আরেক রকমের সাহায্য আওয়ামী লীগ দত্ত বাবু ও সীমান্তপারের ষড়যন্ত্রকে দিয়ে থাকে, সেটা হলো দেশের ইসলামী শক্তি বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিযুক্ত করা। আওয়ামী লীগের এই অভিযোগ প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে ওপারের ষড়যন্ত্রকে। ঐ ষড়যন্ত্র অর্থাৎ বঙ্গভূমিওয়ালারা, সোনার বাংলা সরকারওয়ালারা, দত্ত বাবুরা, উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবনবাদীরা এবং ওপারের সরকারী মহল সকলেই এক বাক্যে এ দেশের ইসলামী শক্তিকে বিশেষভাবে জামায়াতে ইসলামীকে এক নম্বর শত্রু বলে মনে করে। এই মনে করার কারণ, ইসলামী শক্তি সক্রিয় থাকা পর্যন্ত মুসলমানদের ঘুম পাড়ানো এবং তাদের সর্বস্ব হরণ করা সম্ভব নয়। ওপারের ঐ ওরা এমনকি সরকারী মহলও বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিকে কি পরিমাণ ভয় করে তার একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে কলকাতার স্টেসম্যান-এ প্রকাশিত উপরে উল্লেখিত ষড়যন্ত্রমূলক ঐ রিপোর্টে। তাতে বলা হচ্ছে, "নর্থ ইস্টার্ন কংগ্রেস (আই) কো-অর্ডিনেশন কমিটি বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ক্রমবর্ধমান উত্থান মোকাবিলা করার

www.icsbook.info

আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করছে।" (The Statesman, 28 June, 1993) নর্থ ইস্টার্ন কংগ্রেস এই রিপোর্টটি পাঠিয়েছিল দিল্লীতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে।

ওপারের ষড়যন্ত্রের যেখানে এমন নগ্ন দৃষ্টিভঙ্গি, সেখানে যে দত্ত বাবুরা মৌলবাদ অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামীর হাড়ে হাড়ে বিরোধী হবেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ঠেকাবার জন্যে যে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই একই কারণে ঘাদানিকদেরও জামায়াতে ইসলামী ও অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরোধিতায় প্রাণপণ করে নামা ছাড়া কোন উপায় নেই। সাহেবদের চেয়ে পেয়াদারা একটু বেশিই সোচ্চার হয়ে থাকে। দুঃখজনক হলো আওয়ামী লীগের দুর্বোধ্য ভূমিকা। ঘাদানিকদের প্রতি, দত্ত বাবুদের প্রতি, ওপারের ষড়যন্ত্রের প্রতি আওয়ামী লীগের নীরবতা কেন?

আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের ভূমিকাও কম মজার নয়। একদিকে ওপারের ষড়যন্ত্র এবং ষড়যন্ত্রের সহযোগী দত্ত বাবু গং ও ঘাদানিকরা, অন্যদিকে ইসলামী শক্তি, প্রধানত জামায়াতে ইসলামী – এ দু'য়ের মাঝখানে গণতান্ত্রিক সরকার যেন রেফারীর ভূমিকা পালন করেছন। যেই গোল খাক বা যে পক্ষই পরাজিত হোক তাতে যেন সরকারের কিছু আসে যায় না। এ সংক্রান্ত কোন ক্ষেত্রেই সরকারকে আমরা মুখ খুলতে দেখছি না, সক্রিয় হতে দেখছি না। এটা যদি সরকারের নির্বুদ্ধিতা হয়ে থাকে, তাহলে সরকারকে জ্ঞানদান করা আমাদের কাজ নয়। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্যে 'খোদা ভরসা' বলা ছাড়া কিছু করার নেই। আর যদি সরকার মনে করে থাকেন তারা কাটা দিয়ে কাটা তুলবেন, তাহলে এ বিপজ্জনক খেলা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে বলতে পারি না। তবে আমরা বলব, ষড়যন্ত্র বনাম দেশ প্রেমের লড়াইয়ে রেফারিপনা কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আজকের লিখা শেষ করবার আগে দত্ত বাবু গ্রুপের ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক উত্থাপিত অভিযোগটির জবাব দিতে চাই। পূর্ত মন্ত্রী শারদীয়া দুর্গা পূজাকে পলাশী যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ষড়যন্ত্রের ফসল বলায় নিমচন্দ্র বাবু খুবই নাখোশ হয়েছেন। নিমচন্দ্র বাবু কোন বিষয়ে ডক্টরেট জানি না, তবে ইতিহাস বিষয়ে নয় অবশ্যই। ইতিহাস জানলে তিনি নাখোশ হওয়ার বদলে নীরব থাকতেন লজ্জার বিষয়টা গোপন রাখার জন্যে। আসলে শারদীয় দুর্গা পূজা হিন্দুদেরকে খুশি করার জন্যে রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক চালুকৃত একটি হিন্দু উৎসব। আমি নিজেও ইতিহাসবিদ নই। আমি এ কথা লিখছি কলকাতার বিখ্যাত পত্রিকা 'The Statesman' থেকে। ১৯৯০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তপতি বসু তার 'When Durga rode a Mlechcha' শীর্ষক নিবন্ধে বলেন, "Sarodotsav or Durga Puja in the autumn, was then quite unfamiliar to Bengalis. Durga rode her lion into Bengal once

www.icsbook.info

a year in the spring .... The battle of plassey had been won. Sirajud-daulah defeated. But the Hindus were still to be wooed. And Portraying the defeat of Siraj as the victory of Hindus over Muslim was not enough......out come. Robert Clive-obviously assisted by his treacherous aides, Raja Krishna Chandra Ray and Nabakrishna Dev-with the idea or celebrating the victory by holding a Hindu festival........ Durga Puja was decided upon. But there was a problem. Clive had won the battle at the wrong time of the year-June 23, 1757, to be precise. Pundits were consulted. And Nabakrishna Dev settled for an elaborate Akal Bodhon-an untimely awakening-Practised in Calcutta even today .... Clive had played he Hindu card only too well. He had a persoanl interest in making this Puja a success. And a Success it was. " তপতি বসুর অনেক বড় নিবন্ধের এই উদ্ধৃত অংশের সারাংশ হলো ঃ "শরৎকালে দুর্গা পূজা আগে হতো না। পলাশী যুদ্ধের পর এ বিজয়কে হিন্দুদের বিজয় হিসেবে দেখানো এবং তাদেরকে খুশী করার জন্যে ক্লাইভ একটা উৎসবের কথা চিন্তা করেন এবং এই উৎসবই দুর্গা পূজা হিসবে অনুষ্ঠিত হয়।" ধীরে ধীরে এই পূজাই সার্বজনীন দুর্গা পূজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সুতরাং ডঃ নিমচন্দ্র বাবু পূর্ত মন্ত্রীর উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে লাভ নেই। বিক্ষোভ দিয়ে তো ইতিহাস মুছে ফেলা যাবে না। এই সাথে আমরা দত্ত বাবুদেরকে অনুরোধ করি, বহিরাগত ষড়যন্ত্রে অন্ধ হয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতা মুছে না ফেলার জন্যে। বাংলাদেশে আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান সকলেই পাশাপাশি শান্তির সাথে বসবাস করছে। দরিদ্র এ দেশে সমস্যা আছে, কিন্তু ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে সকলেই এ সমস্যার শিকার। সন্ত্রাসী ও সমাজ বিরোধীদের হাত থেকে দেশ এখনও মুক্ত হয়নি, ফলে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে সকলেই কষ্ট ভোগ করছে এ জন্যে। দেশবাসী সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়েই এর মোকাবিলা করতে হবে। হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ শান্তির শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে উচিত দেশে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে সকলের সাথে শামিল হওয়া।

২৭-০৭-১৯৯৩

www.icsbook.info

এডওয়ার্ড জেরাজিয়ানের একটি সাক্ষ্য

মৌলবাদের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান চলেছে পশ্চিম দেশগুলোতে। পশ্চিমের চোখে পৃথিবীকে দেখেন, এশিয়া আফ্রিকার এমন কিছু অন্ধ বুদ্ধিজীবীও এ অভিযানে শরিক। চোখ খোলা মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এ অভিযোগের সমালোচনা করেছেন নানাভাবে। তারা বলেছেন, পশ্চিমের এ অভিযান ইসলামের বিরুদ্ধে। এর একটি জবাব সম্প্রতি পাওয়া গেছে পশ্চিমের রাজধানী আমেরিকা অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী অব স্টেট এডওয়ার্ড জেরাজিয়ান কংগ্রেস কমিটিতে প্রদত্ত তার এক সাক্ষ্যে বলেছেন, ইসলাম পৃথিবীর একটা মহান ধর্ম, আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে নই। কিসের তারা বিরোধিতা করেন, সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট কথা তিনি বলেছেন ঐ সাক্ষ্যে। তার কথা, আমরা যার বিরোধি সেটা হলো চরমপন্থা এবং গোঁড়ামি। এই চরমপন্থা ও গোঁড়ামি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দুই-ই হতে পারে। তিনি বলেছেন, যারা রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে অসহিষ্ণুতা ছড়ায়, মানবাধিকার লংঘন করে এবং সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়, আমরা তাদের বিরুদ্ধে।

এখানে এডওয়ার্ড জেরাজিয়ানের বক্তব্যের সার কথা হলো, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কোন কথা নেই, চরমপন্থার পরিণতি অসহিষ্ণু তৎপরতা ও সহিংস সন্ত্রাসী কার্যকলাপের তারা বিরোধী। এডওয়ার্ড জেরাজিয়ানের এ বক্তব্যের সাথে আমি মনে করি, মুসলমানদের মতের কোন বিরোধ নেই। ইসলামে নেই অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসের স্থান। মানুষের কাছে মানব জাতির কাছে ইসলামের যে আহবান, সেটা একান্তভাবেই মানবিক। মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তিই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম এই লক্ষ্য অর্জন করে মানুষের মধ্যে তার মানসিক পরিবর্তন সূচিত করে, মানুষের মনকে সংস্কৃত ও সুন্দর করে, গায়ের জোরে মানুষের মত পরিবর্তন করে নয়। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণকারী অমুসলিম অতিথির সেবা করছেন, এমনকি মলমূত্র পরিস্কার করেছেন, কিন্তু একবারও চাপ দিচ্ছেন না যে তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। বিজয়ী মহানবী (সা) যুদ্ধবন্দীদের বলছেন, তোমরা যারা লেখাপড়া জানো নির্দিষ্ট কয়েকজন মুসলমানকে অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দাও- ছাড়া পেয়ে যাবে। যারা লেখাপড়া জানে না, মুক্তিপণ দেবারও সাধ্য নেই, তাদেরকে তিনি কোন বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দিলেন, কিন্তু কাউকে তিনি একবারও চাপ দিচ্ছেন না যে, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। মক্কার কোরাইশদের সাথে চুক্তি হয়েছে, মক্কাবাসী কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলমানরা তাকে আশ্রয় দিবে না। চুক্তি স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু তখনও স্বাক্ষরিত হয়নি, এমন সময় ইসলাম গ্রহণকারী একজন

www.icsbook.info

মক্কাবাসী ছুটে এসে আশ্রয় চাইল মুসলমানদের কাছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত না হলেও স্বীকৃত হয়েছে বিধায়ও মহানবী (সাঃ) তাকে আশ্রয় দিলেন না। বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়া সেই মক্কাবাসী মুসলমানকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অশ্রুসজল চোখে বিদায় দিলেন, কিন্তু নীতি লংঘন করলেন না। যে কোন স্বার্থের চেয়ে এই নীতিবোধই ইসলামে বড়। পরবর্তী যুগে ইসলাম থেকে মুসলিম শাসকদের ব্যাপক ডেভিয়েশন হলেও অমুসলমানদের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী মারমুখো হয়নি। তুরস্ক সাম্রাজ্যের খৃস্টান প্রজাদের কথাই ধরা যাক। ঐতিহাসিক লুক বলছেন, "বিভিন্ন জাতি সমকালীন লেখকদের সাক্ষ্য হলো, তুর্কী -সুলতানের অধীনে খৃস্টান প্রজারা তাদের শ্রমের যে ফসল এবং যে স্বাধীনতা ভোগ করতো, পার্শ্ববর্তী খৃস্টান শাসকের অধীনে খৃস্টান প্রজাদের কপালে তা জুটতো না।" (লুক, পৃষ্ঠা ৯৪, তুরস্কের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৯৪) এটাই ইসলামের প্রকৃত রূপ। এডওয়ার্ড জেরাজিয়ান অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসের বিরোধিতার যে কথা এখন বলছেন, তা ইসলাম বলেছে ১৪শ' বছর আগে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী অব স্টেট এডওয়ার্ড জেরাজিয়ান তাদের যে নীতির কথা বলছেন, তা আমি বুঝেছি এবং এর জন্যে তাঁকে ধন্যবাদও জানাচ্ছি, কিন্তু তিনি তাঁর ঐ সাক্ষ্যে এই নীতির যে বাস্তবায়ন দেখিয়েছেন, তা শুধু আমাদের কাছে দুর্বোধ্য নয়, চরম নীতি বিরোধীও মনে হচ্ছে। আলজিরিয়ার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যের কথাই ধরা যাক।

এডওয়ার্ড জেরাজিয়ান তার সরকারের নীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যারা তাদের দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন ও উৎসাহ দান করবে, তাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দেবে। এই নীতিবোধকে সামনে রেখেই এডওয়ার্ড জেরাজিয়ান আলজিরিয়া সম্পর্কে বলেছেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৯২ সালের জানুয়ারীতে আলজিরিয়ার মুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও বাজার অর্থনীতির অগ্রগতিকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে এবং গণতন্ত্রে উত্তরণের এই উদ্যোগ অভ্যন্তরীণ অনৈক্য, বিশেষ করে সরকার ও ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্টের সংঘাত এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতার ফলেই রাহুগ্রস্থ হয়েছে।' মিঃ এডওয়ার্ড জেরাজিয়ান কংগ্রেস কমিটিতে দেয়া তাঁর এই বক্তব্যে ন্যায় ও অন্যায় অর্থাৎ গণতন্ত্রী এবং গণতন্ত্র বিরোধীকে এক করে দেখেছেন। ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট জনগণের ভোটেই প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে শতকরা ৯০টির মত আসনে বিজয়ী হয়েছিল, অন্যদিকে পরাজিত হয়েছিল ক্ষমতাসীন দল। এই ক্ষমতাসীনরাই দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন বাতিল ও ইসলামী সলভেশন ফ্রন্টকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। সুতরাং আজকের আলজিরিয়া সরকার গণতন্ত্র বিরোধী এবং ইসলামিক সলভেশন ফ্রন্টই গণতন্ত্রের শক্তি। নীতির দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব জোরের সাথে ইসলামিক সলভেশন ফ্রন্টের পক্ষ নেয়া উচিত ছিল এবং কঠোর নিন্দা করা উচিত ছিল আলজিরিয়া সরকরের। কিন্তু মার্কিন সরকার তা করছেন

www.icsbook.info

না, মিঃ এডওয়ার্ড জেরাজিয়ানও তা করেননি। বরং মিঃ জেরাজিয়ান আলজিরিয়া সরকারের প্রতি আস্থাই ব্যক্ত করেছেন। তিনি কংগ্রেস কমিটিকে বলেছেন, "আলজিরিয়া সরকার বলেছে যে, তারা গণতন্ত্রায়ণ, অর্থনীতির বেসরকারীকরণ এবং মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আলজিরিয়া সরকারকে আমরা কি সহযোগিতা করতে পারি, তা বিবেচনা করতে আমরা প্রস্তুত আছি।" সন্দেহ নেই, গণতন্ত্র হত্যাকারী আলজিরিয়া সরকারকে নিন্দা না করে তাকে পুরস্কৃত করার মনোভাবই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। আমি মনে করি, এই মনোভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত নীতিবোধের পরিপন্থী।

আলজিরীয় সরকারের প্রতি মার্কিন সমর্থন কি এ জন্যেই যে, ইসলামিক সলভেশন ফ্রন্ট বর্তমানে সন্ত্রাস ও সংঘাতের পথ অনুসরণ করছে। যদি তাই হয়, তাহলে আমার জিজ্ঞাস, ইসলামিক সলভেশন ফ্রন্ট কত দিনে এবং কেন এই পথে যেতে বাধ্য হলো–তা কি গণতন্ত্রবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিবেচনা করবে না গোটা পৃথিবী দেখছে, ইসলামিক সলভেশন ফ্রন্ট আত্মরক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের অবশিষ্ট একমাত্র পথ হিসেবেই স্বৈরশক্তিকে মোকাবিলা করার পথ বেছে নিয়েছে। কোন নীতিবোধের ভিত্তিতেই একে সন্ত্রাস বলা যাবে না। আজ আলজিরীয় সরকার জনগণকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিক, সঙ্গে সঙ্গেই আলজিরিয়ায় সকল সংঘাত বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের বিস্ময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দাবীটা করছে না কেন, যেমনটা তারা করছে সুকীর ক্ষেত্রে বার্মায়।

ইসলামিক সলভেশন ফ্রন্ট ইসলাম পন্থী বলেই কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ বৈষম্য দৃষ্টি? অল্প কিছু দিন আগে কানাডার মন্ট্রিলে এক সেমিনারে একজন ইসরাইলী বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "আলজিরিয়া, মিসর, লেবানন, জর্দান এমনকি অধিকৃত অঞ্চলেও ইসলাম দ্রুত শক্তিশালী অবস্থানে উন্নত হচ্ছে। মুসলিম সমাজে পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের এই উত্থানকে কোন অবস্থাতেই সামনে এগুতে দেয়া ঠিক হবে না।" (মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত)

Islam, Israil and the West শীর্ষক সেমিনার, মার্চ, (১৯৯১) ইসরাইলের এই ইহুদী বিশেষজ্ঞের মত মনোভাব কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পোষণ করে? 'মহান ধর্ম ইসলাম আমাদের শত্রু নয়- এটাই যদি মার্কিন নীতি হয়, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ ইহুদী বিশেষজ্ঞের ন্যায় মনোভাব পোষণ করতে পারে না। আমরা এটাই বিশ্বাস করতে চাই। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আলজিরিয়ার ইসলামিক সলভেশন ফ্রন্টের ব্যাপারে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা আমরা কি ভাবে করব?

২৫-০৫-৯৩

www.icsbook.info

ক্ষতির দিক দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক পতন অত্যন্ত ভয়াবহ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পতন চেষ্টা করলে, সুযোগ পেলে আজ না হয় কাল সামলে নেয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক পতন সামলে নিতে লাগে নাকি শতাব্দী। আশংকার কথা আমাদের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মারাত্মক অধঃপতন আমাদের ভয়াবহ ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক পতনের ইংগিত যেন স্পষ্ট করে তুলছে।

হায়াৎ মামুদের 'বাঙালীত্ব সাধনার যাত্রাবিন্দু' শীর্ষক নিবন্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক পতনের একটা মারাত্মক ধস আমরা অবলোকন করছি। নিবন্ধটি বেরিয়েছে দৈনিক ভোরের কাগজের পয়লা বৈশাখ সংখ্যায়।

হায়াৎ মামুদ বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। পরিচয়টা তাঁর যে কারণেই হোক, আমরা কিন্তু মনে করিনি তিনি এতটাই শূন্যগর্ভ। জনাব হায়াৎ মামুদ বাঙালীত্ব সাধনার যাত্রা বিন্দু খুঁজতে গিয়ে পথ হারিয়েছেন। অথবা পথভ্রষ্ট হয়ে বা বিভ্রান্ত হয়ে ভুল যাত্রা বিন্দু খুঁজে পেয়েছেন। বাঙালীত্ব সাধনার যাত্রা বিন্দু হিসেবে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন রাজা রামমোহন রায়কে।

জনাব হায়াত মামুদ রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক বাঙালীর স্বপ্নদ্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতির যে সামগ্রিক অবয়র ও অন্তর্লীন চরিত্র গুণ আজ আমরা সনাক্ত করে থাকি তার আদি পিতা তিনি। তাঁকে চিনতে পারলে তাই বাঙালী হিসেবে আমার অবস্থান ও গন্তব্য উভয়েরই পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা বলার কারণ হিসেবে জনাব হায়াৎ মামুদ রাজা রামমোহনের কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত এই গুণগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হলো, রাজা রামমোহন রায় সব ধর্মীয় বন্ধনের উর্ধে ওঠে তিনি সকল মানুষের হয়ে গিয়েছিলেন। হায়াৎ মামুদ সাহেব লিখছেন, "যে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের সম্বন্ধ সাধারণত নির্ণীত হয়ে থাকে এ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির ও কথিত বাণীর নিরিখে, সে ক্ষেত্রে ধর্মানুসারীবৃন্দের একমাত্র বিবেচ্য ও কর্তব্য হয় ধর্মীয় নির্দেশকে বিচারের উর্ধে রেখে তা নির্দ্বিধ চিত্তে মান্য করে যাওয়া। রামমোহন বিচারের উর্ধে রাখেননি, মান্যও সর্বদা করেননি -- He is neither a Christian, a Mohammedan or a Hindu,but freethinking man. কোন বিশেষ ধর্ম

www.icsbook.info

নয় সর্ব তত্ত্ব-সার তিনি ছেঁকে তুলে নিয়ে তাদের সংশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিবোধ প্রয়োগ করে"। অর্থাৎ রামমোহন রায় স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে এবং কোন ধর্ম গ্রহন না করে সব ধর্মের সার গ্রহণের মতো মুক্ত মানুষ হয়েছিলেন এবং এটাই ছিল, হায়াৎ মামুদের মতে, আধুনিক বাঙালী হওয়ার জন্যে যথার্থ কাজ-এ যথার্থ কাজটি করেই রাজা রামমোহন রায় আধুনিক বাঙালীর আদিপিতা।

রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা বানানোর এই হায়াৎ মামুদীয় সিদ্ধান্ত নতুন এবং মারাত্মক একটি বিষয়কে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। সেটা হলো আজকের আধুনিক বাঙালীরা কোন ধর্মের নয়, কোন ধর্ম তারা মানে না, কোন ধর্মের কোন নির্দিষ্ট আচার নিষ্ঠার গন্ডির মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ নয়, সব ধর্মের সারৎসার নিয়ে নতুন কিছু করতে চায় তারা। যেহেতু রাজা রামমোহন রায় এই চরিত্রের ছিলেন এবং তিনি যেহেতু এই চিন্তার জন্মদাতা তাই তিনি আজকের বাঙালীর আদি পিতা। অবশ্য হায়াৎ মামুদ সাহেব ইতিহাসের আরেকটু পেছনে গেলে তিনি যে রামমোহনের চিত্র এঁকেছেন এ রকম আরেকজন রামমোহনকে তিনি দেখতে পেতেন। তিনি হলেন শ্রী চৈতন্য দেব। রাজা রামমোহন রায় যেমন সব ধর্মের উর্ধে উঠে নতুন একটা কিছু করতে চেয়েছিলেন বলে হায়াৎ মামুদের মনে হয়েছে, তেমনটা করেছিলেন শ্রী চৈতন্য দেবও। সুতরাং হায়াৎ মামুদ একটু সচেতন হলে দুই পিতা পেয়ে যেতেন। অবশ্য 'দুই পিতা' শুনতে যেন কেমন লাগে। এই শ্রুতির অস্বস্তি দূর করার জন্যে তিনি শ্রী চৈতন্য দেবকে আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা এবং রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক বাঙালীর আধুনিক পিতা বলে অভিহিত করতে পারতেন।

যাক, দুই পিতার এই ব্যাপারটা একান্তভাবেই হায়াৎ মামুদের। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামানো সমীচীন মনে করি না। এখানে যা আমি বলতে চাই তা হলো, আধুনিক বাঙ্গালীর যে ছবি হায়াৎ মামুদ এঁকেছেন তা ভূয়া ও জঘন্য একটা মিথ্যাচার এবং রাজা রামমোহন রায়ের যে চরিত্র-চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাও একটা প্রতারণা। রাগ করবেন না হায়াৎ মামুদ সাহেব! আপনি প্রতারণা করেছেন তা বলছি না। আপনিই মারাত্মকভাবে প্রতারিত হয়েছেন। আপনি বুঝতে পারেননি রাজা রামমোহন রায়কে। উপরি কাঠামোর কিছু বাক্য নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছেন, রাজা রামমোহনের ভেতর প্রবেশ করেননি। রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টান ছিলেন না, মুসলমান ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন না-তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির মানুষ'-এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। যারা এটা বলেন তারা রামমোহনকে জানেনেই না। না জেনে হায়াৎ মামুদরা খোদ রামমোহন রায়ের উপরই জুলুম করেছেন। রামমোহন রায় হিন্দু ছিলেন এবং বেদানুসারী নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসেবেই তিনি সবকিছু করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সাক্ষ্য ঃ

www.icsbook.info

"এ কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত, রাজা রামমোহন কখনও নিজেকে হিন্দু ব্যতীত অন্য ভাবেননি এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে যারা তাঁকে নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলেছে। তাঁর আয়োজিত সাপ্তাহিক ব্রহ্মসভার অধিবেশনে গোঁড়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ পাঠ করানো হতো এবং কোনও অব্রাহ্মণের সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজা মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ করেছেন।" (An Advanced History of India, Dr. R. C. Mazumdar, Page 877) রাজা রামমোহন রায়ের বেদ ব্রাহ্মণের অনুসরণ ও উপাসনার সাক্ষ্য খোদ রামমোহনের লেখাতেই রয়েছে। বলা হয়েছে, "সকলের সম্মতিক্রমে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার্থে একটি বাড়ী ভাড়া করা স্থির হইল। তদনুসারে উক্ত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় সমাজের কার্য আরম্ভ হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইত। কার্য প্রণালী এইরূপ ছিল, প্রথমে দুইজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেন। তৎপরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করিলে সংগীতানন্তর সভা ভঙ্গ হইত।" (উপনিষদ ঃ রাজা রামমোহন রায়, পৃঃ ৩৭, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ) রামমোহনের ধর্মনিরপেক্ষ অথবা সকল ধর্মের গন্ডির উর্ধে উঠার দৃষ্টিকোণ বুঝাবার জন্যে জনাব হায়াৎ মামুদ রবীন্দ্রনাথের একটা বক্তব্যকে দলিল হিসেবে এনেছেন। এই দলিলে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "মানব সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলন। এই ঐক্য তত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করে।" এখানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খুব ছোট্ট একটা তত্ত্ব কথা বলেছেন, এর দ্বারা রামমোহনের পরিচয় ও দৃষ্টিভঙ্গি বিধৃত হয় না। হায়াৎ মামুদ সম্ভবত অজ্ঞতাবশতই রবীন্দ্রনাথের সেই সব উক্তিকে সামনে আনেনি যা রামমোহনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচয়কে তুলে ধরেছে। 'ভারত পথিক রামমোহন রায়'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয় ঘোষণা একদিন এই ভারতবর্ষে যেমন অসংশায়িত বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল এমন আর কোথাও পায়নি। সেই বাণীই ভারতবর্ষে যখন খন্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ, তখনই রামমোহন রায় তাকে পুনরায় নির্মল করে বহন করে আনলেন।-- রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্ম সাধনাকে নবীন যুগে উদঘাটিত করে দিলেন।" (রবীন্দ্র কাব্য ও উপনিষদ, ডঃ অরুণা মাধব, পৃঃ ২৩, ২৪) রবীন্দ্রনাথ এখানে রাজা রামমোহন রায়কে হিন্দু ধর্মের 'মহান সংস্কারক' হিসেবে উপস্থিত করেছেন 'মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়' ঘোষণাকারী 'বেদ'-এর বাণী নানা কুসংস্কারে 'খন্ডিত, আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ' হয়ে পড়লে রামমোহন রায় তার

www.icsbook.info

সংস্কারের মাধ্যমে 'খণ্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ' দশা থেকে 'বেদ'- এর শিক্ষাকে পুনরায় 'নির্মল' করে দেন। আরও স্পষ্ট ভাষায়'বেদ'-এর 'প্রাচীন ব্রহ্ম সাধনাকে' রামমোহন রায় 'নবীন যুগে উদঘাটিত' করলেন। রাজা রামমোহন রায়ের এই রূপকে হিন্দু ধর্মের 'মহান সংস্কারক' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই কথাটাই আরও স্পষ্ট করে বলেছেন অরবিন্দ পোদ্দার। তিনি লিখেছেন, "তাঁর (রামমোহনের) চিন্তা ও ধ্যান হিন্দু সমাজকে গতি দান করেছে। ইংরেজ শাসন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে যে নতুন বিকাশ পথে চালিত করেছিল, রামমোহন তার উপযোগী হিন্দু সমাজ-মানস সৃষ্টি করে সে বিকাশ ধারাকে সফল করতে চেয়েছিলেন" (উনবিংশ শতাব্দীর ভারত পথিক, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ২৮)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ পোদ্দার এখানে যে কথা বললেন, এটাই রাজা রামমোহন রায়ের সত্যিকার পরিচয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে রাজা রামমোহন রায় পুনরায় বেদ উপনিষদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং সে সময় এর উৎকট প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। "বর্ণাশ্রম, সতীদাহ, বিধবা বিবাহ সমস্যা, বহুর পূজা, মুর্তিপূজা প্রভৃতি বহু অভ্যাসকে যখন খ্রীস্টান পাদরীরা প্রতিদিনই ঘা দিতে লাগিলেন এবং বহু হিন্দুকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন- তখন হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইহাদেরই একজন রাজা রামমোহন রায়।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ নাজিরুল ইসলাম. পৃঃ ৩৫৪)

বস্তুত রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম কর্ম সমাজ বা ব্রাহ্ম ধর্মে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মেরই সংস্কৃত রূপ। হিন্দু ধর্মের যেসব দোষ পাদরীরা বড় করে দেখাতেন, সেই সমস্ত দোষ রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মে স্থান পায়নি। এইভাবে রাজা রামমোহন রায় হিন্দুদের খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ বন্ধ করে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন যেমন চেয়েছিলেন শ্রী চৈতন্য দেব হিন্দুদের মুসলমান হওয়া বন্ধ করতে, হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যবস্থা (বৈষ্ণব পন্থা) প্রবর্তনের মাধ্যমে। রাজা রামমোহন রায় যে বিশাল সাহিত্য ভান্ডার রচনা করেছেন, তা একান্তভাবেই হিন্দু ধর্মের সংস্কারের তা একান্তভাবেই হিন্দু ধর্মের সংস্কারের লক্ষ্যেই। রামমোহন রায়ই বেদের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন। তার রচিত 'বেদান্তসার', 'তলবকার উপনিষৎ', 'ঈশোপনিষৎ', 'কষ্ঠোপনিষৎ', 'মান্ডোক্যোপনিষৎ', 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ', 'গায়ত্রী অর্থ', 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ,' "ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসনারী সম্বাদ', 'চারি প্রশ্নের উত্তর', 'প্রার্থনা পত্র', ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ', 'গায়ত্র পরমোপাসনাবিধানং', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'ব্রহ্ম সংগীত' প্রভৃতি সব গ্রন্থই তার হিন্দু ধর্মের

www.icsbook.info

সংস্কার ও অগ্রগতিতে অমূল্য সহায়তা দান করেছে। সন্দেহ নেই, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মের "অন্ধ বিশ্বাসের রাজ্যে যে প্রটেস্টেন্টানিজমের বীজ তিনি রোপণ করিলেন তাহাই হইল ভবিষ্যতের সার্বজনীন মন গড়িবার প্রথম হাতুড়ির ঘা"। (বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, পৃঃ ৩৬০) সুতরাং রামমোহনের সকল তৎপরতা ও সাহিত্য কর্ম সামনে রেখে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রাজা রামমোহন রায় আজকের আধুনিক হিন্দু মানসের জন্মদাতা -আদিপিতা।

আজকের আধুনিক হিন্দু মানসের এই আদি পিতা রাজা রামমোহন রায়কেই আমাদের হায়াৎ মামুদ সাহেব আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা বলে অভিহিত করেছেন। হায়াৎ মামুদের এ ভুল ছোট ভুল নয়, নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বড় ভুল।

হায়াৎ মামুদ সম্ভত লেখার সময় ভুলে গিয়েছিলেন যে, মুসলিম 'বাঙালী'র বাইরে আরও বাঙালী আছে। এই দুই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মধ্যে তিনি রামমোহনকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। বিভ্রান্ত হায়াৎ মামুদ ব্রাহ্মণ বাঙালীর রামমোহন রায়কে মুসলিম বাঙালীর গলায়ও ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

এমন ভুল করার জন্যে হায়াৎ মামুদের লজ্জিত হওয়া উচিত। আর পন্ডিত মূর্খের মত লজ্জিত হবার ভয়ে তিনি যদি ভুল স্বীকার না করেন, তাহলে তিনি আরও বড় ভুল করবেন। মনুষ্যত্ব, মানবতা, উদারতা ইত্যাদি উদ্দেশ্যমূলক রামমোহনীয় ও রাবীন্দ্রিক শ্লোগানের আড়ালে লুকানো চরম বর্ণবাদী 'ব্রাহ্মণ বাঙালীর' ভাড়ায় খাটা সাংস্কৃতিক এজেন্টের কাতারে আমরা তাকে ফেলতে চাইনা।

জনাব হায়াৎ মামুদ তার ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করলেই তিনি মুক্ত, কিন্তু তার ভুলের মধ্য দিয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনার যে প্রকাশ ঘটল তা উদ্বেগজনক। এই দেউলিয়াপনা একটা ভুল মাত্র নয়, একটা মানসিকতার প্রকাশ।

এই মানসিকতা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের মহা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ-সুনিল-শিবনারায়ণদেরকে আমাদের সংস্কৃতির রূপকার মনে করছেন এবং আমাদের স্বাতন্ত্র-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ইসলামকে মৌলবাদ আখ্যা দিয়ে বিদায় করার প্রসাসে রত রয়েছেন।

এই আত্মবিনাশী মহাব্যাধি সাইক্লোনের কুন্ডলাকৃতি মেঘের মতো ধেয়ে আসতে চাইছে। হায়াৎ মামুদের নিবন্ধ ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক পতনের মহাব্যাধিকেই আরেকটু তীব্র করে তুলবে। হায়াৎ মামুদ যে ভুল করেছেন, এটাই তার মাসুল। প্রশ্ন হলো, ভুলের এমন মাসুল জাতি এভাবে আর কতদিন গুণে চলবে!

১৮-০৪-১৯৯২

www.icsbook.info

পলাশী -উত্তর রাজনীতির স্বরূপ

পলাশীতে মুসলমানদের যেদিন পতন, তাদের প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামের শুরু বলা যায় সেদিন থেকেই। ১৭৬৪ সালে বাংলার বিদ্রোহী নবাব মীর কাশেম স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন বক্সারের যুদ্ধে। কিন্তু তার আগেই জনতার কাতার থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। ১৭৬৩ সালে ফকির বিদ্রোহীরা বাকেরগঞ্জে ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি আক্রমণ করলো। সেই যুগে পীর, ফকির, আলেমরা ছিল সমাজ-নেতা। ফকির বিদ্রোহ নামের এই বিদ্রোহটি তাদের দ্বারাই সংগঠিত হয়। নবাবের পরাজিত বাহিনীর অংশ বিশেষ ফকিরদের সংগ্রামে শামিল থাকতে পারে। ফকির সন্ন্যাসীরাও বিদ্রোহী নবাব মীর কাশিমের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ফকির বিদ্রোহের নেতা ছিলেন মজনু শাহ। ১৮৮৭ সালে তার মৃত্যুর পর মুসা শাহ, চেরাগ আলী, সোবহান শাহ, মাদার বকশ, করিম শাহ, প্রমুখ ফকির নেতা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এদের সংগ্রাম ছিল ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে। কোম্পানীর অনুগত ও অত্যাচারী জমিদার, মহাজন, এমনকি একশ্রেণীর সুদখোর সন্ন্যাসী নেতার বিরুদ্ধেও এরা সংগ্রাম করেছেন। ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যের সাথে ফকির বিদ্রোহীদের বহু সংঘর্ষ হয়েছে। গোটা উত্তর বংগসহ বাংলা দেশের বিশাল অঞ্চল জুড়ে ইংরেজ শাসনকে তারা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের দিকে নানা কারণে ফকির বিদ্রোহ ঝিমিয়ে পড়ল, কিন্তু ১৮২৫ সালের দিকে পাগলাপন্থী নামে করিম শাহের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে দেখি, সেটাও আসলে ফকির বিদ্রোহেরই একটা অংশ।

ফকির বিদ্রোহ যখন ঝিমিয়ে পড়ছে, তখন আমাদের বাংলাদেশকে একটা মহা বিদ্রোহ, একটা মহা উত্থানের সাথে জড়িয়ে পড়তে দেখছি। এই মহা উত্থানের নায়ক ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ। তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী শিখরাজার বিরুদ্ধে মুসলমানদের এক মহা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। ইংরেজ অধিকৃত ভারত থেকে হিজরত করে আফগান সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মুক্তির সংগ্রাম শুরু করলেন তিনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ মিত্র শিখদের সাথে এক যুদ্ধের মাধ্যমে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি তিনি শুরু করেছিলেন এর প্রায় এক দশক আগে। বাংলাদেশসহ গোটা ভারত সফর করে মুসলিম জনপদকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন এক মহাবিদ্রোহের জন্যে।

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার এই মহাবিদ্রোহকে 'ইতিহাসের এক বৃহত্তম ধর্মীয় পুনরুত্থান' বলে অভিহিত করেছেন। হান্টার ছিলেন একজন বৃটিশ রাজকর্মচারী এবং সব ইংরেজের মতই তিনি এই 'পুনরুত্থান' বা বিদ্রোহের ছিলেন ঘোর বিরোধী। কদর্থ

www.icsbook.info

করতে গিয়ে এই বিদ্রোহের তারা নাম দিয়েছিল ওহাবী আন্দোলন। হান্টারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এই আন্দোলন সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্যে। এই রিপোর্ট করতে গিয়ে আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন তিনি। স্বীকার করেছেন তিনি এই আন্দোলনের বিস্ময়কর শক্তি ও বিস্তৃতির কথা। তিনি লিখেছেন, "সারা ভারতে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইতিহাসের এক বৃহত্তম ধর্মীয় পুনরুত্থান সাধিত করল তারা। তাঁদের অসংখ্য ছোট ছোট মিশনারী দল ছিল। দক্ষ সংগঠনের মাধ্যমে তারা মুরিদগণের তাকিদে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আস্তানা স্থাপন করতে পারত। -- প্রত্যক জেলাতেই একজন করে প্রচারক নিযুক্ত হয়। ভ্রাম্যমান মিশনারীরা মাঝে মাঝে এই সকল জেলা সফর করে সেখানকার স্থায়ী প্রচারকদের উদ্যমকে জাগ্রত রাখতে থাকে। --- এই সব প্রচারকদের অশুভ প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। --- এরা এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল যে স্ত্রীলোকেরা তাদের গহনাপত্র স্বেচ্ছায় ধর্মান্ধদের তহবিলে দান করছিল -- দলের পর দল সংগ্রহ করে ধর্মান্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। দেশের সর্বত্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তারা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। --- অজস্র রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য, পাটনায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্র এবং সারা বাংলার আনাচে কানাচে প্রচারকদের আনাগোনা ছাড়াও জনগণের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক কাজে উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে ওহাবীরা একটি চতুর্থ সংগঠন গড়ে তুলেছে।-- এই ভাবে পল্লী বাংলার বিভিন্ন স্থানে এক ধরনের বিদ্রোহী কলোনী গড়ে উঠেছে। -- অর্থ সংগ্রহ ব্যবস্থাটা সহজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামগুলোকে বিভিন্ন অর্থিক এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকার জন্যে একজন করে প্রধান ট্যাক্স আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। যে গ্রামের জনসংখ্যা খুব বেশি সেখানে একাধিক আদায়কারী নিয়োগ করা হয় এবং তার মধ্যে একজন মৌলবী থাকতেন যিনি সমাজে এমামতি করতেন--- একজন জেনারেল ম্যানেজার রাখা হয় যিনি মুসলমাদের দুনিয়াবী কাজের তদারক করতেন। এ ছাড়াও একজন অফিসার থাকতেন তার কাজ ছিল বিপদজনক চিঠিপত্র বিলি বন্টন ও রাজদ্রোহমূলক খবরাখবর আদান-প্রদান করা। ---"[১]

মহাবিদ্রোহের এই বিস্ময়কর সংগঠন ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করল। পশুশক্তি ইংরেজের হাতে এ সংগ্রাম বার বার মার খেয়েছে, কিন্তু সংগ্রাম তবু শেষ হয়নি। হান্টার সাহেব লিখছেন, "আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশেষ অভিযান পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করলাম। ওহাবীদের যুদ্ধাত্মক তৎপরতা ভারতের সর্বত্র যে বিস্তার লাভ করেছিল তার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এই গ্রন্থের কলেবর বিরাট আকার ধারণ করবে। -- ধর্মান্ধদের দ্বারা সীমান্তে বিরামহীন অশান্তি বিরাজমান রাখা ছাড়াও তিনবার বৃহদাকার ঐক্যজোট সংগঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই বৃটিশ ভারতকে একেকটি যুদ্ধের মাধ্যমে তার

www.icsbook.info

মোকাবিলা করতে হয়েছে। -- ধর্মান্ধদের ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত যে ভেঙ্গে পড়েছে তার নিদর্শন তাদের নিজেদের অবস্থা থেকেই বুঝা যাচ্ছে। তাদের প্রধান নেতারা ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে এবং অবশিষ্টরাও বুঝতে পেরেছেন যে সক্রিয় হলে তাদেরও একই পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সীমান্তের সশস্ত্র শিবিরগুলো এখনও টিকে আছে এবং সময়মত সেগুলো হয়তো বিরাট ধর্মীয় মহাসম্মিলনের রূপ গ্রহণ করবে। আজ সকালেই (১৪ জুন, ১৮৭১) আমি এই পরিচ্ছেদ রচনার কাজ শেষ করার সময় জানতে পারলাম যে, ব্লাক মাউন্টেনের উপর বিদ্রোহী শিবির থেকে আরেকটি আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে।"[২] বস্তুত এই মহাবিদ্রোহ এই উপমহাদেশের আজাদী পাগল মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের এক মহাকাহিনী। এই কাহিনীতে জড়িয়ে আছে শত ফাঁসির মঞ্চ, হাজারো নির্বাসন আর লাখো মানুষের অশ্রুর ইতিহাস।

এই মহা বিদ্রোহে বাংলার ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৮৩১ সালে এই বিদ্রোহের নায়ক সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী বালাকোটের রণাঙ্গনে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে তাঁর শীর্ষ সাথীগণসহ শাহাদাত বরণ করেন। এই বিপর্যয়কর রণাঙ্গনে যারা শহীদ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে নয়জন বাংলাদেশীর নাম পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে ছিলেন আরও চল্লিশজন।[৩]

অবশ্য এই সংখ্যা দিয়ে এই মহাবিদ্রোহে বাংলার মুসলমানদের ভূমিকার মূল্যায়ন করা যাবে না। উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়, "বাঙ্গালীদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ফলেই ধর্মান্ধদের আন্দোলন এরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।"[৪] কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে, এই মহাবিদ্রোহে বাংলার মুসলমানরা শুধু মাথাই খরচ করেছে, আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে গোটা বাংলা ছিল এই মহাবিদ্রোহের বারুদাগার। জীবন ও অর্থ দুই-ই অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষ এই মহাবিদ্রোহকে সফল করে তোলার জন্যে।

উইলিয়াম হান্টার তার গ্রন্থের শুরুতেই লিখেছেন, "বাংলার মুসলমানরা আবার এক বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। তারা একেক দল ধর্মান্ধকে পাঠিয়েছে, যারা শিবির আক্রমণ করেছে, গ্রাম পুড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের হত্যা করেছে এবং আমাদের সেনা বাহিনীকে তিন-তিনটি ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আমাদের সীমান্তের ওপারে মাসের পর মাস ধরে গড়ে উঠা শত্রু বসতির লোক নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রদেশসমূহের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল। পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত জনহীন পর্বতরাজির সঙ্গে উষ্ণ মন্ডলীর গঙ্গা অববাহিকার জলাভূমি অঞ্চলের (বাংলার) যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে রাজদ্রোহীদের নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে। সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা ব-দ্বীপ অঞ্চল (বাংলা) থেকে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয়। ---বাংলার এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানকার

www.icsbook.info

মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের সংস্কারের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা সীমান্তে গিয়ে জিহাদ করার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দার চোখ ফাঁকি দিয়ে একদিন তারা হঠাৎ করে সীমান্তের মুজাহিদ কাফেলায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ত। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতো না।"[৫]

ইংরেজী উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলা তের শতকের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি সময় বাংলার মুসলমানরা ইংরেজের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ তৎপরতায় ব্যাপৃত ছিল। বৃটিশ ভারতের পশ্চিম সীমান্ত ভিত্তিক এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে তারা তিনটি বড় বড় বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় শামিল হয়। একটি হাজী নিসার আলী ওরফে তিতুমীর পরিচালিত মুক্তি সংগ্রাম, দ্বিতীয়টি হাজী শরিয়তুল্লার মুক্তি আন্দোলন এবং তৃতীয়টি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

তিতুমীরের মুক্তি সংগ্রামের সময়কাল উনিশ শতকের তৃতীয় দশক। ১৮৩১ সালে নারকেলবাড়িয়ার রণাঙ্গনে তিতুমীরের পরাজয় ও শাহাদাত লাভ হলো। আর হাজি শরীয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলনের সময়কাল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত। এই দুইটি আন্দোলন প্রকৃতিগত দিক থেকে ইংরেজ কথিত ওহাবী আন্দোলন অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের পশ্চিম সীমান্ত ভিত্তিক মহাবিদ্রোহেরই অংশ। ওহাবী আন্দোলন বা সৈয়দ আহমদ শহীদ সৃষ্ট মহাবিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের আল-কুরআন ও হাদিসের শিক্ষায় পূর্ণভাবে ফিরে আসা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য ছিল তিতুমীর ও ফারায়েজী আন্দোলনেরও।

ইংরেজ আমলা মিঃ আই, আর কোলভিন নারকেলবাড়িয়ার ঘটনা ও যুদ্ধ সম্পর্কিত রিপোর্টে তিতুমীরের আন্দোলন সম্পর্কে লিখছেন, "ঐ লোকদের আদর্শ ছিল প্রায় সার্বিকভাবেই সারা ভারতব্যাপী প্রচারিত সৈয়দ আহমদের আদর্শেরই অনুরূপ। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এরা হিন্দুদের সাথে সহাবস্থানের কারণে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে মৌল ও নিখাদ মোহাম্মদী ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চায়।"[৬]

ফারায়েজীদের সম্পর্কেও একই ধরনের মন্তব্য করেছেন ডঃ মুইন-উদ-দিন আহমদ খান। তিনি লিখছেন, "সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ফারায়েজী, তরিকায়ে মহাম্মাদীয়া এবং ওহাবীদের তাওহীদ সম্পর্কিত তত্ত্বের উৎস একই।"[৭]

উইলিয়াম হান্টারও ফারায়েজীদের সম্পর্কে অনুরূপ কথাই লিখেছেন, সেই গ্রন্থে তিনি বলেছেন ফারায়েজী শক্তি ও বিস্তারের কথা। তার ভাষায়, "গাঙ্গেয় ব- দ্বীপ এলাকার ধর্মান্ধ মুসলমানরা নিজেদেরকে ওয়াহাবী না বলে ফারায়েজী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনাবশ্যকীয় আচারানুষ্ঠানদি বর্জনকারী হিসেবে পরিচিত করে। -- কলকাতার

www.icsbook.info

পূর্ব দিকের জেলা সমূহে এদের সংখ্যা বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৩ সালে এই সম্প্রদায়টি এতদূর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে, তাদের সম্পর্কে তদন্তের জন্যে সরকারকে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করতে হয়। বাংলার পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, মাত্র একজন প্রচারক প্রায় আশি হাজার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছে এবং তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে থাকে। --- পরবর্তী খলিফারা, বিশেষত ঃ ইয়াহিয়া আলী পূর্ববঙ্গের ফরায়েজীদের ওহাবীদের সাথে একত্রীভূত করে। গত তের বছর ধরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহতদের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মামলায় আটক বন্দীদের মধ্যেও উভয় সংস্থার লোকদেরকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা গেছে।"[৮]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ তৎপরতায় মুসলমানদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। কিন্তু এ সংগ্রাম বাংলাদেশে গণরূপ পাবার আগেই শেষ হয়ে যায়। তবু ঢাকার লালবাগ দুর্গে কমপক্ষে ৪০ জন বাঙালী বিদ্রোহী সৈনিক জীবন দেয়, ফাঁসিতে জীবন দেয় আরও বহু। এঁদেরই পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত আজকের বাহাদুর শাহ পার্ক।"[৯]

এইভাবে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীতে পরাজয়ের পর রাজ্যহারা মুললমানদের যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হলো, তা চললো, উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। একথা হয়তো ঠিক ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের পর সশস্ত্র সংঘাতে ভাটা পড়ে, কিন্তু মুসলমানদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব শেষ হয়ে যায়নি। এর প্রকাশ নানাভাবে ইংরেজের সাথে অসহযোগিতা ও ইংরেজের সব কিছু বর্জন করার মধ্যে দিয়ে ঘটেছে।

ইংরেজ বিরোধী এই অব্যাহত বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার কারণে মুসলমানদেরকে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। অনেকে ফাঁসিতে জীবন দিয়েছে, আন্দামানের নির্বাসনে গিয়ে হারিয়ে গেছে শত শত মানুষ, ইংরেজের জেলে ধুকে ধুকে মরেছে হাজার হাজার মুক্তি সংগ্রামী, আর ইংরেজের অত্যাচার-নিপীড়নে ধ্বংস হয়েছে অসহায় লাখো মুসলিম পরিবার। এছাড়া ইংরেজের বিদ্বেষ ও বৈষম্য নীতির শিকার হয়ে গোটা মুসলিম জাতি সব দিক থেকে ধ্বংস হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের মুসলমানদের করুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে স্বয়ং উইলিয়াম হান্টার একথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখছেন, "মহামান্য রানীর মুসলমান প্রজাদের প্রতি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। ভারতীয় জনসমষ্টির একটা বিরাট অংশ, যাদের সংখ্যা তিন কোটির মত হবে, বৃটিশ শাসনে নিজেদের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছে।-- মাত্র গতকালই যে দেশে তারা ছিল বিজেতা ও শাসক, আজ সেই দেশেই ভরণ পোষণের যাবতীয় সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। -- তাদের প্রতি আমাদের উপেক্ষা এবং আমাদের রাজনৈতিক অজ্ঞতাই এর কারণ। এ দেশে শাসন কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হবার আগে মুসলমানরা এখনকার মত একই ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেছে, একই খাদ্য খেয়েছে

www.icsbook.info

এবং মূলতঃ একই ভাবে জীবন যাপন করেছে। আজ অবধি কিছুদিন পরপরই তারা পুরানো জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। কিন্তু বৃটিশ শাসনে আর সব ব্যাপারেই তারা জাতি হিসেবে ধ্বংস হয়ে গেছে।"[১০]

উইলিয়াম হান্টারের এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে মুসলমানদের জাতীয় চেতনার শক্তি ছাড়া এই সময় মুসলিম জাতি রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষা, চাকরি-সব দিক থেকেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এই যখন মুসলমানদের অবস্থা, তখন মুসলমানদের প্রতিবেশি হিন্দু জনগণ ইংরেজ শাসকদের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধি ও জাতি গঠনের দিকে প্রচন্ডভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী কোন সংগ্রামকেই তারা সহযোগিতা দান করা দুরে থাক, সুনজরেই দেখেনি। বৃটিশ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ভিত্তিক মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা সুযোগ পেলেই বিদ্রুপ করেছে। কংগ্রেসে যোগদানে অনিচ্ছুক মুসলমানদের বিদ্রুপ করতে গিয়ে বঙ্কিম চন্দ্র 'প্রচারে' লিখেছিলেন, "এক্ষণে শুনিতেছি, চাচাদিগের কোন দোষ নাই। তাহারা পূর্ণ স্বাধীন নহেন। বালক কলের পুতুল লইয়া খেলা করে দেখিয়াছি। সেগুলির কল টিপিলেই দাড়ি নাড়ে শুনিয়াছি। পাহাড়ে বসিয়া বড় বড় লোকে নাকি কল টিপিতেছে, তাই ইহারা দাড়ি নাড়িতেছেন।"[১১] এখানে বঙ্কিম চন্দ্র পাহাড়ে বসা লোক বলতে সীমান্তের মুসলিম যুদ্ধ শিবিরের লোকদের বুঝিয়েছেন। বস্তুত হিন্দুরা ইংরেজ প্রেমে এতটাই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, বালাকোট ও নারকেলবাড়িয়ায় ভারতের মুসলমানরা যখন ইংরেজের হাতে জীবন দিচ্ছে, তখন তারা বলছে, "আমাদের যদি বলা হয় বৃটিশ কিংবা কার শাসন তোমরা চাও। উত্তরে আমরা একবাক্যেই বলিব-বৃটিশ শাসন। এমনকি হিন্দু শাসনও নয়।"[১২]

এমনকি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহী বা স্বাধীনতা সংগ্রামকেও বাংলার হিন্দুরা বিশেষ করে হিন্দুদের সচেতন শ্রেণী সমর্থন করেনি। তাই তো দেখি, ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজের কামানের গোলায় মানুষ যখন জীবন দিচ্ছিল, তখন হিন্দু পত্রিকা 'সংবাদ ভাস্কর' লিখছে, "আমরা পরমেশ্বরের সমীপে সর্বদা প্রার্থনা করি, পুরুষানুক্রমে যেন ইংরেজাধিকারে থাকিতে পারি, ভারত ভূমি কত পূণ্য করিয়াছিলেন এই কারণ ইংরেজ স্বামী পাইয়াছেন, মৃত্যকাল পর্যন্ত যেন ইংরেজ ভূপাল দিগের মুখের পান হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করে।"[১৩]

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তারা কি দৃষ্টিতে দেখেছে, বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কি নিষ্ঠুর মনোভাব প্রকাশ করেছে, তার কিঞ্চিত দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা যায়। ঐ 'সংবাদ ভাস্করই' লিখছে, "আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যা, লাহোর প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া

www.icsbook.info

বিদ্রোহীদের আড্ডার আড্ডায় ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, সিপাহীরা জানুক বৃটিশ গভর্নমেন্ট সিপাহী ধরা আরম্ভ করিয়াছেন, আর বিদ্রোহী সিপাহী সকল শোন শোন, তোদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল, যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও বৃটিশ পদানত হইয়া প্রার্থনা কর, ক্ষমা করুন। -- গত বুধবার বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টাকালে সৈন্য পরিপূর্ণ এক জাহাজ অতি সুদৃশ্য দৃষ্ট হইল, আসিয়া কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণাংশে লাগিল। সে সময় উক্ত জাহাজ অতি সুদৃশ্য দৃষ্ট হইল, গোরা সৈন্যরা পাঁচশ সিপাহীকে হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়া লইয়া আসিয়াছে, গভর্নমেন্ট সিপাহীদের যে ক্রোধ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে বলিদান দিবেন ইহাই জ্ঞানগ্রাহ্য হইতেছে। কালিঘাটে বহুকাল নরবলি হয় নাই। আমাদিগের রাজেশ্বর যদি হিন্দু হইতেন, তবে এই সকল নরবলি দ্বারা জগদম্বার তৃপ্তি করিতেন।"[১৪]

সাধারণভাবে হিন্দুদের এ মনোভাব বৃটিশ সরকারও জানতেন। তাই সিপাহী বিদ্রোহের সব দায় এসে মুসলমানদের ঘাড়েই বর্তেছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হবার পর যে প্রচন্ড হত্যালীলা শুরু হয় তার প্রাথমিক শিকার হন ওহাবী আন্দোলন চিহ্নিত আলেম সমাজ। তাই বিপ্লব পরবর্তীকালে শহীদ হলেন শত শত আলেম। সাত'শ আলেম ফাঁসিতেই জীবন দিলেন। আন্দামানে নির্বাসনে গেলেন মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী, মওলানা ইয়াহিয়া আলী, মওলানা আবু জাফর থানেশ্বরী. মওলানা মুফতি এনায়েত আলীর মত শত শত বরেণ্য আলেম। এক কথায় মুসলিম জাতীয় শক্তিকে একদম নির্মূল করার প্রয়াস চলে। সেদিনের দিল্লীর বিবরণ দিতে গিয়ে কবি গালিব লিখেছেন, "মুসলমানদের অবস্থা দেখে কাঁদবে এমন একজন মুসলমানও দিল্লীতে অবশিষ্ট ছিল না।" আর মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী তাঁর আত্মকথায় লিখেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে একথা প্রমাণ হলেই শুধু কোন হিন্দুকে ধরা হতো, কিন্তু পালাতে পারেনি এমন কোন মুসলমান সেদিন বাঁচেনি।[১৫] মওলানা ফজলে হক 'আসসাওরা তুল হিন্দিয়া' বা 'বাগী হিন্দুস্তান' শীর্ষক তাঁর আত্ম কাহিনীতে তাঁর দেখা অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর নায়ক ছিলেন আহমদুল্লাহ শাহ। আহমদুল্লাহ শা'র বাহিনী যখন সামনে দাঁড়ানো ইংরেজ বাহিনীকে মোকাবিলায় রত, তখন সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দানকারী দেশীয় হিন্দু রাজা বলদেও সিং বিশ্বাসঘাতকতা করে পেছন থেকে আহমদুল্লাহ শাহকে আক্রমণ করায় তিনি পরাজিত ও শহীদ হন।[১৬] ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে দিল্লী রক্ষার যে দীর্ঘ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী বর্ণিত তার একটা দৃশ্য এই রকম ঃ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মোজাহেদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করিয়াই নাসারা ইংরেজ বাহিনী পর্যুদস্ত হইবার উপক্রম হইল। তাহারা তখন পূর্ব দেশীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়া

www.icsbook.info

পাঠাইল। হিন্দুরা অতি দ্রুততার সহিত তাহাদিগকে উপর্যুপরি সৈন্য ও অস্ত্র সাহায্য পাঠাইতে লাগিলেন। এই নতুন সাহায্যে বলীয়ান হইয়া নাসারা বাহিনী পুনরায় তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিল। অল্প দিনের মধ্যে পর্বতোপরিস্থিত খ্রিস্টান শিবিরে প্রচুর অস্ত্র, রসদ এবং সৈন্য আসিয়া সমবেত হইল। তাহাদের মধ্যে লালমুখো ইংরেজ হইতে শুরু করিয়া নিকৃষ্ট ও নীচ শ্রেণীর হিন্দু ভাড়াটিয়া সৈন্য পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর মানুষই দৃষ্টিগোচর হইত।"[১৭]

বস্তুত দেশের হিন্দু অধিবাসীরা সাধারণভাবে সব সময় ইংরেজদের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, অন্তত বাংলা চৌদ্দ শতকের প্রথম দশক অর্থাৎ ইংরেজী বিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সহযোগিতাকালীন সময়ে ইংরেজের শিক্ষা, ইংরেজের চাকরি, ইংরেজের অধীন ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা গ্রহণ করে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রায় সব জমিদারি তারা পেয়ে যাওয়ায় শিক্ষা, অর্থ, রাজনীতি সব ক্ষেত্রে হিন্দুরা জাতি হিসেবে শক্তিশালী ও সচেতন হয়ে ওঠে। এই সচেতনতার একটা বড় কারণ ছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি। "প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী শহর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এ ভাবে উদ্রিক্ত হয়। প্রবলভাবেই হয় কলিকাতায়, সেখানে 'ইয়ং বেঙ্গলী গোষ্ঠি' হিন্দু ধর্মের সব কিছুই দোষণীয় ভাবতে থাকে এবং প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করা বীরত্ব ও গর্বের বিষয় বিবেচনা করতে থাকে----- তারা প্রকাশ্যে গৃহে, বাহিরে সর্বত্র দল বেঁধে গরুর গোশত ভক্ষণ ও মদ্যপান করতো। -- ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও নানা ভাবে ইংরেজের সাথে মেলা-মেশা, পাশ্চাত্য ভাবধারা বিশেষত মিল, বেন্থামের শিক্ষার প্রভাবে --- এ অবস্থার উদ্ভব ঘটে।"[১৮] উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে হিন্দু ধর্মের সংস্কার এবং হিন্দ জাতীয়তার উত্থান ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মে ভাঙ্গনের এ জোয়ার রোধ করতে এগিয়ে আসেন শীর্ষ হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা। রাজা রামমোহন রায় এঁদের পথ প্রদর্শক। তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করলেন। রাজা রামমোহন রায় 'হিন্দুধর্মের গন্ডির মধ্যেই আত্মরক্ষা করে ভাঙনের গতিরোধ করলেন ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তন করে। নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা করাই এ মতের সারমর্ম।'[১৯] ব্রাহ্মমতের এ বৈশিষ্টের কারণে অনেকে মনে করেন 'ব্রাহ্মসভা' বা 'ব্রাহ্মমত' হিন্দু ধর্ম থেকে পৃথক। একথা মোটেই ঠিক নয়। ব্রাহ্মমত পোষণের জন্যে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করতে হয় না। শুধু অমানবিক ও অসামাজিক প্রথা ও আচারগুলো (যেমন সতীদাহ) পরিত্যাগ করে সাধারণ মন্দিরে পরম ব্রহ্মের উপাসনা করতে হয় আদি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে। 'রাজা রামমোহন নিজে একজন ধার্মিক হিন্দু ছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিষ্ঠাবান' ব্রাহ্মণও।'[২০] ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার রামমোহন সম্পর্কে এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন। লিখছেন তিনি, "একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত, রামমোহন কখনও নিজেকে হিন্দু ব্যতীত অন্য ভাবেননি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে যারা

www.icsbook.info

তাঁকে নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলেছে। তার আয়োজিত সাপ্তাহিক ব্রাহ্মসভার অধিবেশনে গোঁড়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বেপপাঠ করানো হতো এবং কোন অব্রাহ্মণের সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার ছিলনা। রাজা রামমোহন মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মনের উপবীত ধারণ করেছেন।"[২১] বলা যায়, রামমোহনের এই সংস্কার আন্দোলন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখকে নিষ্ঠাবান হিন্দু হতে সাহায্য করেছিল। রামমোহন রায়ের পর হিন্দুধর্মের আরেক অকুতোভয় সংস্কারক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হিন্দু ধর্মের সংস্কার হিন্দুদের জাতীয় চেতনায় যে আঘাত হানে, তা বাংলা তের শতক বা ইংরেজী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং পরে বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা হংসরাজ, লালা লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, বিপিন চন্দ্রপাল, প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম 'বিরোধী আগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে। এ আন্দোলনের স্বরূপ আলোচনার আগে এ আগ্রাসী উত্থানের উৎস নিয়ে আরেকটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ইংরেজী উনিশ শতক অর্থাৎ বাংলা তের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঝড়ের বেগ নিয়ে হিন্দু জাতীয়তার যে রাজনৈতিক উত্থান আমরা লক্ষ্য করি, তার ভিত্তিভূমি রচনা করে তাদের উনিশ শতকের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক উত্থান। হিন্দুদের এই সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক উত্থান শুরু হলো ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালুর মধ্যে দিয়ে। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়াম কেরী। আর এ বিভাগে পন্ডিত হিসেবে নেয়া হলো মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দ চন্দ্র, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামনি ও রামরাম বসুকে।

এইপন্ডিতরা দু'টি কাজ করলেন। এক, মুসলিম আমলের বাংলা গদ্যের ধারা বাদ দিয়ে তারা সংস্কৃত শব্দ ভারাক্রান্ত নতুন বাংলা গদ্যের উদ্ভব ঘটালেন। দুই, বিভিন্ন গ্রন্থর মাধ্যমে হিন্দু ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সামনে আনলেন। রাম রাম বসু লিখলেন 'প্রতাপাদিত্য', মৃত্যুঞ্জয় লিখলেন 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'রাজাবলী', রাজীব লোচন লিখলেন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র'। এসব গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে প্রতাপাদিত্য, রূপ সনাতন ও বীরবল প্রভৃতি যে সব চরিত্র সামনে এল সেগুলো হিন্দু ইতিহাসের উপজীব্য চরিত্র। মৃত্যুঞ্জয়ের'রাজাবলী' হলো চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ-সন্তান বিচিত্রবীর্য থেকে বাংলাদেশে কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস।। এ ইতিহাসে মুসলিম শাসন আমলকে বিদ্বেষদুষ্ট ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই ভাবেই' ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পন্ডিতদের সাধনায় সংস্কৃত ও হিন্দুদের মাহাত্ম প্রতিষ্ঠায় ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হয়েছিল প্রশস্ত ক্ষেত্র।"[২২]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এ পন্ডিতগণ ছাড়াও ঈশ্বরগুপ্ত, রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার চন্দ্র, প্যারিচাদ মিত্র, রামনারায়ন তর্করত্ন প্রমুখ হিন্দু লেখকের গ্রন্থরাজী

www.icsbook.info

হিন্দুধর্মের উত্থান ও হিন্দুদের চেতনাবিকাশে সাহায্য করে এবং নতুন ভাবে সংস্কৃতি চর্চার এক বুনিয়াদ গড়ে তোলে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা চালু এবং ছাপাখানা বিস্তার লাভের পর হিন্দুদের দ্বারা একের পর এক পত্রিকা প্রকাশ পেতে শুরু করে। এসব পত্রিকার মধ্যে রয়েছে দিগদর্শন (এপ্রিল ১৯১৮), সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পন' (মে ১৯১৮), সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি' (জুন, ১৯১৮), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৯২১), সম্বাদ কৌমুদী (ডিসে,১৯২১), 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), ইত্যাদি। এসব পত্রিকার সবগুলোই হিন্দুদের। মুসলমানরা সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করে আরও প্রায় একশ' বছর পরে। হিন্দুদের এসব পত্রিকা হিন্দুধর্ম ও জাতিসত্তার বিকাশে অমূল্য ভূমিকা পালন করে। পত্রিকাগুলো অব্যাহত ধারায় তৈরী করে চলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যুগান্তকারী যে হিন্দু লেখকদের আমরা দেখি, তা এ পত্রিকাগুলোর হাতে গড়া। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ভূমিকা সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলছেন, "এই পত্রিকাটি বাংলায় সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঈশ্বর চন্দ্রের প্রতিভা গদ্য, পদ্য ও ব্যঙ্গাত্মক লেখার মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত ধারায় মানুষের তৃষ্ণা মোচন করেছে। বঙ্কিম চন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের মত বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভার বেশ কয়েকজন এ পত্রিকায় শিশু কলামে লিখার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য জীবন শুরু করেন। সাহিত্য প্রতিভার সন্ধানে এবং তরুণ লেখকদের উৎসাহ দানে ঈশ্বরগুপ্ত নিরলস ছিলেন।"[২৩] রাম রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য' (১৮০১) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'রাজাবলী (১৮০৮), ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দু জাতির যে ঐতিহ্য সন্ধান শুরু হয়, তা উনিশ শতকের চতুর্থ কোয়ার্টারে এসে বংঙ্কিম সাহিত্যে চরম অসহনশীল ও বিনাশী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। অবশ্য বঙ্কিমের আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর 'অঙ্গুরী বিনিময়' (১৮৫৭) উপন্যাসে মুসলিম ইতিহাসের বিকৃতি মুসলিম বিদ্বেষের নগ্ন প্রকাশ আমরা দেখি। তথাকথিত এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে শিবাজীর সাথে মোগল শাহজাদী রওশনারার প্রেম দেখানো হয়। এইভাবে সাহিত্যে শিবাজীকে প্রথমবারের মত হিন্দুদের জাতীয় বীর ও হিন্দু উত্থান ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়।

বঙ্কিম তার সাহিত্যে শিবাজীর এই রূপকে ষোল করায় পূর্ণ করলেন এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার নামে মুসলিম ইতিহাস-বিকৃতির বন্যা বইয়ে দিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়ানোর আকর হয়ে দাঁড়াল তার সাহিত্য।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দ মঠ'ই সবচেয়ে বিপজ্জনক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতে এ দু'টি উপন্যাস অনন্য। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। 'আনন্দ মঠ' ও প্রকাশ করা হয়েছে এই একই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮২ খৃস্টাব্দে।[২৪] 'রাজ সিংহ' রচিত হয় মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নিয়ে। এতে আওরঙ্গজেবকে বিকৃত চরিত্র, ইসলাম ও মুসলমানদের

www.icsbook.info

কদর্য রূপ এবং হিন্দু রাজপুতদের সাহসিকতা, সংগ্রাম ও ঔদার্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসের টার্গেট মুসলমানকে হীন ও ম্লেচ্ছ করে দেখানো এবং হিন্দুদের আদর্শ ও উত্থানকে আকাশস্পর্শী করে চিত্রিত করা। আনন্দ মঠের প্রতি ছত্রই যেন মুসলিম বিদ্বেষ উদগীরণ করে। যেমন 'আনন্দ মঠে' ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলছে, "সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই, পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণা-বেক্ষণের সম্বন্ধ আমাদের মুসলমান রাজ রক্ষা করে কই। ধর্ম গেল, এখন প্রাণ যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকে না।"[২৫] উল্লেখ্য, বাংলায় মুসলিম শাসন শেষ হবার প্রায় এক'শ ২৫ বছর পর বঙ্কিম এসব কথা লিখছেন। অথচ যে বৃটিশ শাসন ও শোষণের মধ্যে বসে তিনি লিখছেন, সেই বৃটিশের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। যেমন, 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসে ক্যাপ্টেন টমাসকে ভবানন্দ বলছেন, "কাপ্তান সাহেব, তোমায় মারিবনা, ইংরাজ আমাদের শত্রু নহে। কেন মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? -- ইংরাজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।"[২৬]

বঙ্কিম মুসলমানদের তাড়াতে চান, মুসলমানদের দেশ ছাড়া করতে চান। তাঁর লক্ষ্য কি? বিভিন্নভাবে ব্রাহ্মণরাই বঙ্কিম উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আনন্দ মঠ, উপন্যাসেও সর্বময় কর্তা একজন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে যিনি দেবী চৌধুরানীকে দীক্ষা দিলেন তিনিও ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী। 'মৃণালিনী' উপন্যাসেও তাই। এখানেও আনন্দ মঠের মতই ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য রূপে হেমচন্দ্রকে ডেকে বলছেন, "তুমি দেবকার্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবন নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যান হওয়া উচিত।"[২৭] এই ব্রাহ্মণদের "ব্রাহ্মণ্য শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠাই যে বঙ্কিমের আদর্শ, ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মণ বঙ্কিম চন্দ্রের রচনায় নিরপেক্ষ ভাবে সৎ। তাহার শাসনের প্রতিষ্ঠা হইলেই শ্রেষ্ঠ শাসনের প্রতিষ্ঠা হইবে। তাহার চরিত্র, বুদ্ধি ও নৈতিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কখনো উঠে নাই। দেবী চৌধুরাণী, ভবানন্দ, চন্দ্রশেখর, হেমচন্দ্র আর যত রাজা ও সামন্ত ইহারা সকলেই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের আজ্ঞাবহ-কর্মী। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের কোন পরামর্শ -সভা নেই, মানুষের কোন পরামর্শ তাহাকে চালিত করেনা। তিনি ধ্যানস্থ হইলে যোগের মহিমায় আপ্তবাক্য শুনিতে পান, তাহাই জীবানন্দ, ভবানন্দ ও হেমচন্দ্রের জন্য আইন।"[২৮]

ব্রাহ্মণ্যবাদী উত্থানের এই লক্ষ্যের কারণে বঙ্কিম "রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ-মনের প্রতিভূ হিসাবে এবং হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্‌গতা ঋষি হিসাবে বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হলেন। এবং এভাবে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবহ্নি তিনি ছড়িয়েছিলেন লেখনি মুখে, জগতের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজীর নেই। -- অস্ত্রের মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় কালের প্রলেপে সে ক্ষত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু লেখনির মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়,

www.icsbook.info

তার নিঃশেষ নেই, নিরাময় নেই -- যুগ থেকে যুগান্তরে সে ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। --- তিনি মুসলমান বিদ্বেষের যে বিষবহ্নির উদ্‌গীরণ করেছেন, সে বিষ জ্বালায় এই বিরাট উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল, তা নিঃশেষে শুষ্ক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।"[২৯]

হিন্দুদের "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতার যে কর্দম পংকিল ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হলো, অতঃপর তার পদাংক অনুসরণ করে পন্ডিত অপন্ডিত ও সাহিত্যিক অসাহিত্যিক বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় সে আবর্তে পরমানন্দে অবগাহন করে আসছেন লেখনি চালনা করে।"[৩০] সবচেয়ে দুঃখের বিষয় "মানবতাবাদী'র পোশাক পরা রবীন্দ্রনাথ এ হিন্দু মানসিক গন্ডির বাইরে যেতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে রূপ আমরা দেখি তার সাথে বঙ্কিমের চেহারার কোন পার্থক্য নেই। 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মত 'ধর্মরাজ্য'-এর স্বপ্ন দেখেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলছেনঃ

"সেদিন শুনিনি কথা,
আজি মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব,
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে
ভারতে মিলিবে সর্বশেষ ধ্যানমন্ত্র তব।
ধবজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দারিদ্রের বল।
এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে
এ মহাবচন
করিব সম্বল।"[৩১]

এই 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শিবাজীকে জাতীয় বীর, জাতীয় নেতা, জাতির পথিকৃৎ হিসেবে ধরে শিবাজীর স্বপ্ন ভারতে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে একমাত্র সম্বল বানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত কাজী আব্দুল ওদুদ সম্ভবত মুখ রক্ষার জন্যে বলেছিলেন যে, 'শিবাজী উৎসব' উপলক্ষে লিখিত এ কবিতা রবীন্দ্রনাথ পরে বর্জন করেছিলেন। কিন্তু এটা ডাহা মিথ্যা কথা। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই পশ্চিম বাংলার সরকারী ও শান্তি নিকেতনী সংস্করণে এ 'শিবাজী উৎসব' কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাতের 'দুরাশা' গল্পেও বঙ্কিম মানসিকতার সাক্ষাত মিলে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ যখন উগ্র, তীব্র হয়ে উঠছে সেই সময় ১৩০৫ সালে অর্থাৎ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এ গল্প লেখেন। এ গল্পে তিনি দেখান, বাদাউনের কুমারী নবাবজাদী ব্রাহ্মণ সেনাপতি কেশরলালের প্রেমে অন্ধ হয়ে পড়েন, কিন্তু তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা

www.icsbook.info

হন। অতপর নবাবজাদী সারাজীবন ব্যাপী সাধনা করেছেন ব্রাহ্মণ হবার জন্যে। এই গল্প পড়ে কাজী ইমদাদুল হক বেদনাহত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বঙ্গের প্রিয় কবির তো এই কীর্তি!'[৩২] বঙ্কিম সাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে, কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে যে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ'কে দেখি তার সাথে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের 'গোরা' চরিত্রের কি কোন মৌলিক পার্থক্য রয়েছে? নাই। স্বয়ং কাজী আব্দুল ওদুদ তার বাংলার জাগরণ গ্রন্থে লিখছেন, "বঙ্গভংগের একটা বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণে লিখিত 'গোরা' উপন্যাস (১৯০৯) খানিতে রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রীতি ও গভীর ভাবপ্রবণতার অঞ্জন চোখে মাখিয়া হিন্দু ধর্মের বিকার গুলিকেও রমণীয় করিয়া দেখিয়াছেন। -- তাহার সমস্ত কবি কল্পনা, সমস্ত গভীর সমবেদনা, সমস্ত পরিতাপ, তীব্র আবেগ হিন্দু ধর্ম নামে অভিহিত যে অতীত গৌরবে লুপ্ত প্রায় ভগ্নাবশেষ তাহার দিকে অনিবার্য ভাবে ধাবিত হইয়াছে।"[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ তার বিশাল সাহিত্যে মুসলিম জাতির জন্যে কিছু করেননি।[৩৪] কিন্তু সুযোগ পাওয়ার পর মুসলিম জাতিকে আঘাত দিতে তিনি ছাড়েননি। কথা কাব্যের 'বিচার' কবিতায় তিনি 'মৈশুর পতি হৈদারালীর' 'দর্প ধ্বংস' করেছেন এবং 'জোগাতে যমের খাদ্য' 'যবন নিপাত' করতে চলেছেন।[৩৫] রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খন্ডের 'মাসী', 'বন্দী বীর', 'হোলি খেলা', প্রভৃতি কবিতায়ও তার এই মানসিকতার সাক্ষাত মিলে। গল্পগুচ্ছর 'রীতিমত নভেল' গল্পে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সবচেয়ে নগ্নভাবে ধরা পড়েছেন। তিনি লিখছেন, "আল্লাহু আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জনমাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহনে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কর নিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রু সৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবন সৈন্য প্রচন্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল? কাহার বজ্রমন্দ্রিত "হর হর বোম বোম" শব্দে তিন লক্ষ ম্লেচ্ছ কণ্ঠের 'আল্লাহু আকবর" ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত হাসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষ যুথের ন্যায় শত্রু সৈন্য মুহূর্তের মধ্যে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইল? ইনি সেই ললিত সিংহ।"[৩৬] এখানে রবীন্দ্রনাথ বংকিমের মত শুধুই মুসলিম বিদ্বেষ নয়, মুসলিম বৈরিতায়ও অবতীর্ণ। বর্ণনা, শব্দচয়ন কোন ক্ষেত্রেই এখানে বঙ্কিমের সাথে রবীন্দ্রনাথের কোন পার্থক্য নেই।

সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি, সাহিত্য সমাজ- মনের রূপকার। এ কারণেই বঙ্কিম সাহিত্যে উনিশ শতকের চতুর্থ কোয়ার্টারে যে মুসলিম বিনাশী রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, তার প্রকাশ এ সময় রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও দেখা গেল। এই ক্ষেত্রে মুসলিম বিনাশী আন্দোলনের প্রথম ধবজা উড়ালেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৯৩)। তিনি ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'আর্য সমাজ'। এরপর 'গো-রক্ষা-সমিতি'। এইভাবে স্বামী দয়ানন্দ সনাতন হিন্দুত্বের মাহিমায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু কালচারের অন্ধ ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং উপমহাদেশে আরও দু'টি ধর্ম ইসলাম ও খৃষ্টান

www.icsbook.info

ধর্মকে অস্বীকার করে এক হিন্দু ভারতীয় কালচারের প্রচার করেন।"[৩৭] "হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলন তখন আর নির্দোষ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে নিবদ্ধ রহিলনা। এখন হইতে এই আন্দোলন খোলাখুলি মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হইল।"[৩৮] 'দয়ানন্দের আর্যসমাজ হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধটা যতো বিচ্ছিন্ন করেছে, যতো সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে এদেশে শান্তি শৃংখলা নষ্ট করেছে, আর কোনও হিন্দু 'ধর্ম-সমাজ' তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। আর্য সমাজের 'শুদ্ধি করণ' 'গোরক্ষিণী' এবং 'হিন্দুর ভারত হিন্দুর হবে' আন্দোলন যে তীব্র বিষক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, আজ তার গলিত পুঁজ-রক্তে হিন্দুমন বিষাক্ত হয়ে আছে।[৩৯] আর্য সমাজ ও তার উত্থানবাদী প্রচার সে সময় কি সমাজ-পরিবেশের সৃষ্টি করল, তার একটা সুন্দর বিবরণ পাওয়া গেছে সে সময়কার একজন অধ্যাপকের জবানীতেঃ 'সঠিক কাজ করতে কোনও দেরী সমীচীন নয়। হিন্দুদের কোনও প্রতিনিধিত্ব মূলক সংস্থা-যেমন হিন্দু মহাসভা কিংবা এ উদ্দেশ্যে আহুত সর্বভারতীয় হিন্দু সম্মেলন-অবিলম্বে একটি সুপ্রীম কাউন্সিল গঠন করুক এদেশে সব বিদেশী ধর্মকে 'হিন্দু' রূপদান করতে। এই কাউন্সিলের কাজ হবে, চারটি বিদেশাগত ধর্মকে 'হিন্দু' করতে সঠিক নামকরণ করার। আমাদের প্রস্তাব, ইসলামকে 'নিরাকার সমাজ', ও ইহুদি ধর্মকে 'পবিত্র সমাজ' নাম দেয়া যেতে পারে। -- হিন্দু নেতারা যদি এসব ধর্মকে এদেশে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'হিন্দু' করে ফেলতেন, তাহলে এসব ধর্মানুসারীরা হিন্দু আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করে হিন্দুতে বিলীন হয়ে যেতো এবং 'হিন্দু জাতির' অন্তর্গত হতো।"[৪০]

স্বামী দয়ানন্দ মারা গেলেন ১৮৮৩ সালে। কিন্তু তাঁর 'আর্য সমাজ' এর মিশন শেষ হয়ে গেলনা। 'দয়ানন্দের মতবাদ ও কার্যক্রম পরবর্তীযুগে কংগ্রেস কর্মী গঙ্গাধর তিলক, লালা হংসরাজ, লালা লাজপত রায় ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুরা আরও ব্যাপকভাবে চালইয়া যাইতে থাকে। বস্তুত, স্বামী দয়ানন্দের অপেক্ষাও তাহারা অধিক কার্যক্ষম ছিলেন। কেননা, কংগ্রেসের মত এক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের কুক্ষিগত ছিল।"[৪১]

ঠিক এই সময় আরেকটি হিন্দু চরমপন্থী সংস্থার উদ্ভব ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দ এ সময় রামকৃষ্ণ পরম হংস দেব (মৃত্যু ১৮৮৬)-এর নামানুসারে 'রাম কৃষ্ণ মিশন' গড়েছিলেন। তিনি এই মিশনকে এক চরমপন্থী হিন্দু সংস্কার সংস্থায় রূপান্তরিত করলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার ছিল, হিন্দু কৃষ্টি ও সভ্যতা দুনিয়ার সেরা এবং প্রাচ্য প্রতীচ্যের সকল ঐশ্বর্যের মূলে রয়েছে হিন্দু ধর্ম। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজ নামে কোন কিছু যে তার চার পাশে আছে, তাকে তিনি ভ্রুক্ষেপই করতেন না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মৃত্যুর এক বছর আগে ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় সংগ্রেস গঠিত হলো। লর্ড ডাফরিন এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের সাহায্যে ভারতে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নেন। এরই অংশ হিসেবে এদেশের

www.icsbook.info

মানুষের মন- মানসিকতা আঁচ করা এবং কি করে তাদের অভাব আভিযোগের প্রতিবিধান করা যায়, তারই পথ বাতলানোর জন্যে লর্ড ডাফরিন এ্যালেন অক্টিভিয়ান হিউমের মাধ্যমে ৫০ জন সদস্য নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' গঠন করলেন। বস্তুত এই কংগ্রেস ছিল অসন্তোষ নিরসনের একটা 'বক -চোষক' গদি।[৪২] ১৮৮৫ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনেই কংগ্রেসের মনোভাব সুস্পষ্ট করে তোলা হলো। অধিবেশনের সভাপতি বাংগালী খৃষ্টান উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী তার সভাপতির ভাষণের উপসংহারে বললেন, "কংগ্রেসের একান্ত কামনা। ভারতে বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী হোক এবং কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রশাসনিক বিষয়ে অংশীদারিত্ব।"[৪৩] আরেকজন বাঙালী হিন্দু, হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী পুনরুত্থানের নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের কোলকাতা সম্মেলনের সভাপতি দাদাভাই নওরেজী বললেন, "এমনকি কংগ্রেস সদস্যদের অস্থি মজ্জা পর্যন্ত বৃটিশের প্রতি অনুগত। হিন্দু রাজত্বের গৌরবময় যুগেও কি কেউ কল্পনা করতে পারতো যে, ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে কংগ্রেসের মত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব? এটা শুধু বৃটিশ ভারতে বৃটিশ শাসনেই সম্ভব হয়েছে।"[৪৪] ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুর্ণ সম্মেলনে বাংগালী নেতা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোধা বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সভাপতির ভাষণে বললেন, "ইংলন্ডের নিকট আমরা উৎসাহ ও সহানুভূতি কামনা করি। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংলন্ড আমাদের পথ প্রদর্শক। আদর্শের ক্ষেত্রে ইংলন্ড আমাদের গুরু।"[৪৫]

হিন্দুজাতির উত্থানবাদী শিক্ষিত হিন্দুরা এইভাবে ইংরেজদের সাথে আপোশ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে একক টার্গেটে পরিণত করল। সচেতন অনেক মুসলমান এটা সেই সময়েই বুঝতে পেরেছিল। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে যখন কংগ্রেস অধিবেশন চলছিল, সেই সময় বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতা এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ লাক্ষ্ণৌতে বললেন, "যদি কেউ ভবিষ্যতে হিন্দু শাসনের জোয়ালে আবদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন কংগ্রেসে যোগ দেয়।"[৪৬]

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় ছত্রছায়ায় বালগঙ্গাধর তিলকের মত কংগ্রেস কর্মীরা বাংলা তের শতকের শেষ লগ্ন ও চৌদ্দ শতকের সূচনা লগ্নে তাদের মুসলিম বিনাশী আন্দোলনকে আরও তীব্র ও স্পষ্টতর করে তুললো। "১৮৯৮ সালে কেশরী পত্রিকায় তিলক গো-হত্যা নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলমানদের খোলাখুলি এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহবান করেন এবং বৃটিশ সরকারকে মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধের আইন প্রত্যাহার করতে বললেন। তিনি গীতা হইতে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, মহাভারতের দৃষ্টিতে আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য বিশেষ। অতএব যে

www.icsbook.info

সব পরদেশী (মুসলমান) এই দেশে বাস করিতেছেন তাহাদের এই দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কিংবা হত্যা করা দোষের নয়।"[৪৭] এর আগে ১৮৯৫ সালে রায়গড়ের এক জনসভায় এর চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় বাল গঙ্গাধর তিলক বলেন, "আমাদিগকেও শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। ঢাল-তরোয়াল লইয়া অসংখ্য মুসলমান বহিরাগতকে হত্যা করিতে হইবে। যদিও এইরূপ যুদ্ধে আমাদেরও কিছু হইবে, তাহা হইলেও এইরূপ স্বার্থ-ত্যাগের প্রয়োজন আছে।"[৪৮]

আর এর এক বছর পর ১৮৯৬ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক আয়োজন করলেন 'শিবাজী উৎসবের'। মারাঠা নেতা শিবাজীর মৃত্যুর ২১৬ বছর পর এই শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ভারতে। সুতরাং ভারত ইতিহাসের শুধু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই এটা নয়, ইতিহাসের দিক-নির্দেশক একটি মাইল ফলকও। আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়, এই শিবাজী উৎসব আয়োজনে যিনি নেতৃত্ব দিলেন, সেই বাল গঙ্গাধর তিলক সামান্য কেউ নন। তিনি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আদর্শের উত্তরসূরী, তিনি একজন প্রভাবশালী কংগ্রেস-নেতা। ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃত', 'রাষ্ট্রগুরু' রূপে সম্মানিত এবং 'সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বাংগালী' বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর চোখে এই তিলক 'দাক্ষিনাত্যের একজন মুকুটহীন সম্রাট। মিঃ ব্যানার্জীর ভাষায়, 'পেশোয়া'-এর দায়িত্ব পালনের জন্যে তাঁর (তিলকের) আবির্ভাব।"[৪৯] কেউ কেউ তিলককে বলেছেন 'রাজাধিরাজ ছত্রপতি তিলক মহারাজ'। আর কেউ ঘোষণা করেছেন, 'তিলক লোকমান্যই আমাদের শিবাজী।' এহেন বাল গঙ্গাধর তিলকই নেতৃত্ব দেন শিবাজী উৎসবের। শিবাজী উৎসবের সাথে বাঙ্গালী হিন্দুদের মন ও মেধাও এক হয়ে যায়। যে মা 'কালী' বাংগালীদের ভাগ্য বিধাতা, তিনি ছিলেন শিবাজীরও রক্ষাকর্তা। ভবানী ব্যতীত শিবাজীকে কল্পনা করা যায় না।"[৫০] শিবাজী আপন খড়গকে আপনার অধিক সম্মান করিতেন, কারণ এই খড়গই তাঁহাকে ভবানীর নিকট প্রিয় করিয়া দিয়াছিল।"[৫১] এই মাতৃপ্রীতি ও মাতৃপ্রেমের দিক থেকে শিবাজী ও বঙ্কিম একাত্ম। তাই শিবাজী উৎসবে এসে বন্দেমাতরম ও শিবাজী অচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। রত্নগিরির শিবাজী মন্দিরে বন্দে মাতরম শব্দগুলো শিলাবক্ষে খোদিত হয়ে আছে। শিবাজী উৎসবে এসে একাত্ম হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও। শুধু একজন যোগদানকারী হিসেবে নয়, শিবাজী উৎসবকে তিনি তাৎপর্যমন্ডিত ও স্বরূপে রূপায়িত করেছিলেন 'শিবাজী উৎসব' কবিতা লিখে। যাতে তিনি বলেছিলেন 'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন করিব সম্বল'। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব উপলক্ষে 'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে'–এ মহাবচন স্মরণ করেছেন শুধু নয়, একে সম্বল করার অংগীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো ভারতে এক ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং শিবাজী-এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? এ বিষয়টি পরিস্কার হলে 'শিবাজী উৎসব'-এর তাৎপর্য এবং শিবাজীর মৃত্যুর ২১৬ বছর পর 'শিবাজী উৎসব' উদযাপনের অবস্থা ও সময়গত গুরুত্বের দিকটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনার প্রয়োজন।

www.icsbook.info

উনবিংশ শতকে মুসলিম রাজত্ব ও মুসলিম প্রভাব-প্রতিপত্তির শ্মশানভূমির উপর হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী জাগরণ ছিল সর্বাত্মকভাবে ধর্মীয়। এই জাগরণ অবশেষে হয়ে ওঠে শক্তিকামী সামরিক। তারা ভাবতে থাকে তাদের দুর্বলতার কারণেই তাদের ধর্ম-যুগের অবসান ঘটেছে, বিপর্যয় ঘটেছে তাদের জাতীয় জীবনে এবং পতন ঘটেছে তাদের। তাদের এ চিন্তার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে তাদের 'ধর্ম ও স্বাধীনতা' শীর্ষক এক নিবন্ধে। বলা হয়েছে ঃ

'যেদিন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভারতের ক্ষাত্রতেজ নির্বাপিত প্রায়, সেইদিনই এই দেশে কলির প্রথম প্রবেশ। পরীক্ষিতের কোষ মধ্যে অসির ঝংকার ধ্বনি শুনিয়া কলি আরও কিছুদিন চুপ করিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষিতের তক্ষক দংশনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের সুত্রপাত। -- ভাবপ্রবণ বৌদ্ধ ধর্ম আসিয়া বৈদিক ধর্মকে হীনশ্রী করিয়া দিল। কর্ম মার্গের হীনতা দেখাইয়া বৌদ্ধ আচার্যগণ সকলের জন্যেই ত্যাগ মার্গের ব্যবস্থা করিলেন। -- ফলে ভারতও নির্বীর্য হইয়া পড়িল। আত্মরক্ষায় অশক্ত হইয়া দাঁড়াইল। শক, হুন, প্রভৃতি বহুবিধ জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে রাজ্য পাতিয়া বসিল। --- পৌরাণিক যুগে আবার ক্ষত্রিয় জাতি জাগিয়া উঠিয়া। ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। 'গান্ধার অবধি সীমা' আবার নবজীবন সঞ্চারে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু হায়! সেই সৌভাগ্য গর্বের মধ্যেই আমাদের পতনের বীজ নিহিত ছিল। নতুন করিয়া সমাজ গঠন করিবার সময় আমরা যাহাদিগকে হীন জাতি ভাবিয়া সমাজের একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম তাহারা কেহ স্বদেশ প্রেমে সঞ্জীবিত হয় নাই। দেশ যেন কেবল ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের। অন্য জাতি যেন কেহই নহে। তাহারও ফল ফলিল। রাজপুতদিগের প্রতাপ যখন গৃহকলহে ব্যয়িত হইতে লাগিল, যুদ্ধ যে কেবল সমর কৌশল দেখাইবার জন্য নহে, স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য-এ কথা যখন রাজপুতেরা ভুলিয়া গেল, তখন পশ্চিম হইতে ঝঞ্ঝাবায়ুর মত আসিয়া তুর্কিরা দেশ অধিকার করিয়া ফেলিল। অনাদরে অব্যবহারে ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষাত্রবীর্য নিস্প্রভ হইতে লাগিল।"[৫২]

পতনের এই কারণ চিহ্নিত হবার পর উনবিংশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী জাগরণ আন্দোলনে ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষত্রিয়তেজ এই দুইয়েরই সংযোগ ঘটনোর চেষ্টা করা হোল। তারা অনুভব করল তাদের প্রয়োজন ধর্মরাজ্য। আর এ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্যে প্রয়োজন ক্ষাত্র-তেজ। যে ধর্মরাজ্য তারা প্রতিষ্ঠা করতে চাইল তার জন্যে তাদের প্রয়োজন ঐতিহ্যিক প্রেরণা। এই প্রেরণার সন্ধান করতে গিয়ে তারা যা পেল সংক্ষেপে তা এই ঃ

"প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুরানাদি আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, প্রাচীন আর্য সভ্যতায়, ধর্মরাজ্য স্থাপন রূপ একটি আদর্শ সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতে বর্ণিত প্রসঙ্গের চরম পরিণতি এই ধর্মরাজ্য স্থাপন রূপ আদর্শের প্রতিষ্ঠায় এবং সেই বিচিত্র ঘটনা চিত্রে কেন্দ্র স্থানীয় ঐশ্বর্যশালী বসুদেব

www.icsbook.info

তনয়ের সকল চেষ্টা ও প্রারোচনার মূলে এই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠারূপ উদ্দেশ্য যে নিহিত ছিল তাহাও বিবেচনার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। --- এই ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত চেষ্টার বিষয় মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মরাজ্য স্থাপন দ্বারা তিনি একদিকে যেমন ভারতে স্বধর্ম পালনের সুব্যবস্থা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, অপরদিকে মোক্ষতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি ধর্মকে মোক্ষের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বধর্ম পালনের জন্য যেমন একদিকে অর্জুনকে বলিতেছেন "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব," অপরদিকে মোক্ষের প্রতি অনুরাগী করিবার জন্যে তাহাকেই বলিতেছেন "নিস্ত্রৈগুন্যো ভবার্জুন।" আর্যসভ্যতা বা আর্য সভ্যতার দুইটা মূল তত্ত্ব স্বধর্ম ও মোক্ষ গীতাতে পরিকীর্তিত হইয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতে মুসলমান বিজয়ের পর একমাত্র শিবাজীকেই ভারতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের ব্রত গ্রহণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শিবাজী ধর্মরাজ্য সংস্থাপন কার্যে যখন প্রথম উদ্যোগী হন, তখন রামদাস স্বামী তাহাকে একখানি পত্রে লেখেনঃ 'আমাদের তীর্থ সকল বিধস্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের আবাস ভূমি সমূহ অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবী বিপ্লব পূর্ণা হইয়াছে, ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। এই কারণে আমাদের ধর্মের, দেবমূর্তি সমূহের ও গোব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য নারায়ণ আপনার হৃদয়াস্থ হইয়া প্রেরণ করিয়াছেন।' বাস্তবিকই ধর্ম বিলুপ্ত হইবার আশংকা হইতেই মহারাষ্ট্র দেশে সপ্তদশ শতাব্দীর অদ্ভুত বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল।"[৫৩]

ভাগ্যই বলতে হবে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের। ধর্মরাজ্য ও শিবাজী এক হয়ে তাদের সামনে এসেছে। মুসলিম বিজয়ের পর ভারতে একবারই মাত্র হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে এবং সে কাজে ব্রতী হয়েছিলেন শিবাজী। সুতরাং বাঞ্ছিত ক্ষাত্রতেজও শিবাজীর মধ্যে মূর্ত। মুসলিম শাসন-কালে অনেক হিন্দু নৃপতি ও নেতা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সেটা তারা করেছে রাজ্য রক্ষা বা রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে, ধর্মরাজ্যের জন্যে নয়। শিবাজীই একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি রাজ্য রাজত্বের ক্ষেত্রে শিবাজীর পূর্ণতা লাভেরই এটা প্রমাণ। এইভাবে বিস্ময়কর শিবাজী চরিত্রে ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষাত্রতেজ উভয়ই বিস্ময়কর ভাবে সমশক্তিতে বিদ্যমান। হিন্দু ইতিহাসের এই বিস্ময়কর শিবাজী চরিত্রের স্রষ্টা উপরে উল্লেখিত রামদাস শিবাজীকে দিয়েছিলেন তা না জানলে 'শিবাজীর সংগ্রাম'- এর মর্ম বুঝা এবং শিবাজীর মৃত্যুর ২১৬ বছর পর ১৮৯৬ সালে ইতিহাসের এক ক্রান্তি লগ্নে 'শিবাজী উৎসব'-এর তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা পূর্ণতা লাভ করবেনা। রামদাসের সে সৃষ্টি কাহিনীটি এইঃ

"--- শিবাজী মোক্ষ সাধনের নিমিত্ত সদ্‌গুরুর সন্ধান করিতে করিতে 'মহাসমর্থ' রামদাস স্বামীর বিষয় সম্যক অবগত হন। তারপর তার দর্শন লাভ করিবার জন্য তিনি প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে সহসা এক পর্বতে স্বামীর সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি সমর্থের চরণ বন্দনা করিয়া তাহার নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণের ও তাহার সেবার অধিকারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ

www.icsbook.info

করিলেন। স্বামী বলিলেন, 'তুমি প্রাসাদ বিহারী রাজপুত্র, আমরা অরণ্যচর সন্যাসী, ধর্মসাধনও সহজসাধ্য নহে। অতএব তুমি এ বিষদৃশ অভিলাষ পরিত্যগ কর। অকারণ 'ভেকধারণ' করিয়া জগৎকে প্রতারিত করায় ফল কি?' এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র বাষ্পাকুল লোচনে বলিলেন, 'রাজ্য-ধন সমস্তই আপনার চরণে সমপর্ণ করিয়াছি। এই দাসকে দীনহীন জানিয়া অনুগ্রহ প্রকাশে সনাথ করিবার আদেশ হউক।' শিবাজীর সংকল্প অটল দেখিয়া রামদাস তার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। শিবাজী স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপুত হৃদয়ে যথারীতি স্বামীর নিকট পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ঘটনা ১৫৭১ শকাব্দের বৈশাখ শুক্লা নবমী বৃহস্পতিবার দিবসে শিবাজীর দ্বাবিংশ বয়ঃক্রম কালে সংঘটিত। স্বামীর উপদেশে 'আত্মজ্ঞান' লাভ করিয়া সংকল্প বিকল্পাত্মক সংসারের প্রতি শিবাজীর বিরাগ জন্মিল। রামদাস তাহাকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে, তিনি বলিলেন, 'রাজ্য বৈভব ইতঃপূর্বেই শ্রীচরণে অপর্ণ করিয়াছি। আর এই 'দুনিয়ার মায়াবিভ্রমে' মুগ্ধ না হইয়া গুরুদেবের চরণ সেবায় জীবনপাতপূর্বক পরমার্থ সাধন করিব।' ইহা শুনিয়া রামদাস শিবাজীর সংশয় ভঞ্জনের জন্য তাহাকে গীতোক্ত কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক অনাসক্তভাবে ধর্ম পালন করিয়া জনক, হরিশচন্দ্র, অম্বরীশ প্রভৃতি ভাগবত ধর্মপরায়ণ রাজর্ষিগণ যেরূপ মোক্ষপদবী লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি শিবাজীর নিকট বিবৃত করিলেন। এই প্রসঙ্গে দেশের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া শিবাজীকে তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা 'শিব দিগ্বিজয়' নামক গ্রন্থ হইতে এস্থলে অবিকল অনুদিত হইলঃ

"যবনগণ বহুদিবস হইতে যথেচ্ছাচার করিতেছে, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এরূপ পরাক্রমশালী পুরুষ কেহ নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণদের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে, সমস্ত ধর্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে, নাম সংকীর্তন বিলুপ্ত হইয়াছে, পাপীগণের বল বৃদ্ধি হওয়ায় ধার্মিকগণ দুর্বল হইয়াছে, এই সংকটকালে সকলের সুখ সম্মান লোপ পাইয়াছে। বিপদাগমন হেতু এই পাপকালের আবির্ভাব হইয়াছে, দেবতাগণ (দেবমূর্তি সমূহ) অত্যাচার ভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুসারী হইয়াছে। --- রঘুপতি এই সকল সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া যবনদিগের বিরুদ্ধে তোমার যোজনা করিয়াছেন। তুমি ঈশ্বর সম্ভূত পুরুষ--- এক্ষণে সময়ের অনুরূপ ধর্ম স্থাপন করা তোমার কর্তব্য। ধর্মের জন্যে জীবন বিসর্জন কর; নিজের প্রাণ পণ করিয়াও শত্রুদিগের সকলকে বিনাশ কর। তাহাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে আপনার রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর। ধর্মনীতির উপর রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ধর্মনীতি পালন না করিলে সকলই মিথ্যা। --- আপনার মান রক্ষার জন্য অসি গ্রহণ করিয়া যিনি বৈরীকুল সংহার করেন, জগতে তাহার বাহুকীর্তি প্রচারিত হয়। --- শৌর্য সহকারে উপার্জন

www.icsbook.info

করিবে। -- এ সময়ে শৌর্য প্রকাশ করিয়া ভগবৎ কৃপা লাভ কর। বাহুবলে ধর্ম স্থাপন কর। এ বিষয়ে আলস্য করিওনা। কাপুরুষতা ও ভীরুতা পরিত্যাগ কর। বিপদকে যিনি ভয় করেন, সৌভাগ্য তাহাকে পরিত্যাগ করে।

রামদাস স্বামীর কর্মযোগমূলক এই উপদেশবাক্যে শিবাজীর হৃদয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপনের সংকল্প বিপুল উৎসাহ সহকারে আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি গুরুদেবের আদেশ মত আবার লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই দিন হইতে সুমহৎ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।"[৫৪]

'শিবাজী উৎসব'-এর মাধ্যমে ১৮৯৬ সালে শুধু এই শিবাজীকে স্মরণ করা নয়, শিবাজীর সংগ্রাম সাধনার উদ্বোধন করা হলো। এর মাধ্যমে উনবিংশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'ধর্মরাজ্য' রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করল। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও 'ক্ষাত্র তেজ'-এর প্রয়োজন তার 'মডেল' বা 'প্রেরণা' হিসেবে সামনে এনে বসানো হলো শিবাজীকে। এ 'শিবাজী-বিগ্রহ' সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর মত কবি, মানবতাবাদী কবি, আধুনিক কবিও করজোড়ে গাইলেনঃ "সেদিন শুনিনি কথা, আজ মোরা তোমার আদেশ শির পাতি লব, কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বশেষ ধ্যানমন্ত্র তব। -এক ধর্মরাজ্য হবে এক ভারতে এ মহাবচন করিব সম্বল"। শুধু তাই নয়, তিনি মারাঠি শিবাজীর সাথে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে একাত্ম করে শিবাজী উৎসব কবিতায় বললেন,

"মারাঠির সাথে আজি হে বাঙ্গালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, একসঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পুরব
দক্ষিণ ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

বস্তুত শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শিবাজীর 'ধ্যানমন্ত্র ধর্মরাজ্য'কে শির পেতে গ্রহণ করল আনুষ্ঠানিকভাবে এবং সেই সাথে হাত পেতে গ্রহণ করল শিবাজীর ক্ষাত্র-তেজ খড়্গকে, যে খড়্গকে শিবাজী প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন, যার কারণে 'মা ভবানী ভালবাসতেন শিবাজীকে'।

উনবিংশ শতাব্দী অর্থাৎ বাংলা তের শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শতাব্দী শেষে যে উপসংহারে পৌছল, সেই উপসংহার হলো শিবাজী উৎসব। এই উপসংহার অনুসারেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম মুসলিম বিনাশী রূপ পরিগ্রহ

www.icsbook.info

করল। হিন্দু সাপ্তাহিক যুগান্তরের পাতায় ২১৬ বছর আগের শিবাজী ও রামদাস যেন কথা বলে উঠল। যবন (মুসলমান) নিধনের জন্য রামদাস যা বলেছে, শিবাজী যা করেছে, 'যুগান্তর' তাই ঘোষণা করলঃ

"ধর্ম সাধনের জন্য আত্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্যে যে পশুবলেরও আবশ্যক একথা ভুলিয়া আমরা সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছি। --- যে দুর্বল, পরপদানত, সে কখনও আত্ম-শক্তির পূর্ণ বিকাশ না দেখিয়া মুক্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে না। সে পরাধীন, তাহার পক্ষে কখনও ধার্মিক হওয়া সম্ভবপর নহে। গুরুর আর এখন ইহা ভিন্ন অন্য কিছু শিখাইবার নাই, ছাত্রেরও আর শিখিবার অন্য কিছু নাই। ইহাই এখন যুগ ধর্ম।

নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, এই আকাঙ্খা জাগাইয়া দাও। এবং যখন ইহা প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন ম্লেচ্ছ-নিবহ নিধন করিবার জন্যে, সাধুগণের পরিত্রাণের জন্যে, ধর্ম রাজ্য সংস্থাপনের জন্য, যিনি অবতীর্ণ হইবেন এস আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তাহার পাদানুসরণের জন্য প্রস্তুত হই।"[৫৫]

আরও ঘোষণা, আরও আহ্বান এলঃ

"ভারতবাসী, তুমি কি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতে পার যে, 'বন্দেমাতরম' সেই ধর্মরাজ্য স্থাপনের আহুতিমন্ত্র? তুমি কি এই মহামন্ত্রের অপূর্ব মাহাত্ম আজও বুঝিয়াছ? তুমি কি বুঝিয়াছ এই মন্ত্রসহযোগে যশ, মান, ধন, গ্রাস ধর্মরাজ্য স্থাপন রূপ যজ্ঞে আহুতি দিতে পারিলে যজ্ঞ সুসিদ্ধ হইবেই হইবে? তুমি কি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছ যে আজ সেই মহাযজ্ঞে সফল আহুতি দান করিবার জন্য ভারতের প্রাচীন ধর্মরাজ সংস্থাপকগণ অন্তরীক্ষে উপস্থিত আছেন? তবে, এস ভাই, আজ এই নব্যকুরুক্ষেত্রে ভগবান বাসুদেবকে চিরসারথিত্বে বরণ করিয়া ভবানীপুত্র অমর শিবাজীকে অগ্রগামী জানিয়া 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ধর্মরাজ্য স্থাপন যজ্ঞে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অনন্তকালের জন্যে ধন্য হইয়া যাই।"[৫৬]

এই নব্য কুরুক্ষেত্রের ধর্মরাজ্য স্থাপন যজ্ঞে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে মুসলমানদের এনে দাঁড় করানো হলো। অথচ মুসলমানরা তখন ইংরেজদের প্রায় দেড় শতাব্দীর হত্যা-জেল-জুলুম নিপীড়ন-নির্যাতনে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, অসহায়, অরক্ষিত। এই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজের অনুগ্রহ ও সাহায্য পুষ্ট, অর্থ-বিত্তে বলীয়ান, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী হিন্দুদের এই চ্যালেঞ্জ মুসলমানদের জন্যে সেদিন অস্তিত্ববিনাশী এক মহাঅসম আহ্বান ছাড়া আর কিছু ছিল না। (১৯৯৩ সালে প্রকাশিত)

www.icsbook.info

তথ্য-সূত্র ঃ

১. 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, খোশরোজ কিতাব মহল, নতুন সংস্করণ, পৃষ্ঠাঃ ৩৮ ৬৫, ৬৬, ৬৮।

২. 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, খোশরোজ কিতাব মহল, নতুন সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯০, ৯১।

৩. 'জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা', মওলানা মুহিউদ্দিন খান, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠাঃ ১০৩।

৪. 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯।

৫। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, পৃষ্ঠা ঃ১?

৬। 'Titumir And His Followers in British Indian Record; by Muin - ud-din Ahmad Khan, Page 41.

৭। History of the Fara'idi Movement', by Dr. Muin-ud-din Ahmad Khan, Page 52.53.

৮. 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান', ডব্লিউ হান্টার, পৃষ্ঠা ৮৪, ৮৫।

৯. "বর্তমানে শহীদ বাহাদুর শাহ পার্ক" নামে পরিচিত ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে একযোগে ষাটজন মুসলমানকে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় এবং তাদের লাশ মাসের পর মাস বৃক্ষ শাখায় ঝুলিয়ে রাখ হয়েছিল। (History of Indian Mutiny by Kaye & Malleson -Quated by by Abul Hashim in integration of Pakistan.

১০। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান স,' উব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, পৃষ্ঠা ১৩১?

১১। 'দৈনিক বসুমতি', ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১।

১২। 'Daily Reference of the Hon'ble', Prosonno Kumar Tagor, July-1831.

১৩। 'সংবাদ ভাস্কর', ২০শে জুন, ১৮৫৭।

১৪। 'সংবাদ ভাস্কর', ১৮ ও ২০ শে জুন, ১৮৫৭।

১৫। 'আযাদী সংগ্রাম' ১৮৫৭, অনুবাদ ঃ মওলানা মুহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা ১৭।

১৬। 'আযাদী সংগ্রাম' ১৮৫৭, অনুবাদ ঃ মওলানা মুহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা ২৯।

১৫। আযাদী সংগ্রাম ১৮৫৭, অনুবাদ ঃ মওলানা মুহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা ৯।

১৮। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ১১৩।

১৯। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ১১৪।

২০। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৭।

২১। 'An Advanced history of India', by Dr. R. C. Mazumdar, Page, 877.

২২। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতিক রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ৩৩৪.

২৩। Dr. Dinesh chandra sen, 'Bengali Language & Literature', Page 762.

২৪। 'বঙ্কিম রচনাবলী ঃ উপন্যাস সমগ্র', ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৫। 'বঙ্কিম রচনাবলী ঃ উপন্যাস সমগ্র', ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৬। 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস', নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান পৃষ্ঠা ৪৯১।

২৭। 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস', নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান পৃষ্ঠা ২৯।

২৮। 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস', নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান পৃষ্ঠা ৪৯৫, ৪৯৬

২৯। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ৩৩৯

৩০। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ৩৪০

www.icsbook.info

৩১। 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটির একাংশ
৩২। কাজী ইমদাদুলহক গ্রন্থাবলী (বাঃ উঃ বোর্ড, সহ) ১ম খন্ড, ৪৪-এ, ৪৫।
৩৩। কাজী আব্দুল ওদুদ-এর 'বাংলার জাগরণ'
-এ উদ্ধৃত, প্রষ্ঠা ১৫৮ (রবীন্দ্র জীবনী দ্রষ্টব্য)।
৩৪। "মুসলমান বিদ্বেষ বলিয়া আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য বিসর্জন দিতে পারিনা। মুসলমানদের উচিত নিজেদের জাতীয় সাহিত্য নিজেদেরই সৃষ্টি করা।" (নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব একটি ভাষণে মুসলমান বিদ্বেষ পূর্ণ সাহিত্য বন্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 'ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেন)।
৩৫। 'রবীন্দ্র রচনাবলী', সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৩, ৮৪, ৮৫।
৩৬। 'গল্পগুচ্ছ', অখন্ড, পৃষ্ঠা ৯৯।
৩৭। 'Misra', পৃষ্ঠা ৩৮২, ৩৮৩ (আব্দুল মওদুদ কর্তৃক তার গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৮৭)।
৩৮। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', -মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১১৭।
৩৯। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ২৮৭
৪০। 'The Hindu Muslim Riots' By Ratish Mohan Agarwala, Page 85.
৪১। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১১৮।
৪২। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবর রহমান, পৃষ্ঠা ১৩৩,১৩৪।
৪৩। 'Moderates and Extremist in National congress', by Daniel Agrov.
৪৪। 'Moderates and Extremist in Indian National congress', by Daniel Agrov.
৪৫। 'Moderates and Extremist in Indian National congress', by Daniel Agrov.
৪৬। 'Indian National Congress and the Muslim since 1928', by Dr. Padma Shah.
৪৭। 'Satesman of India, 'by Robert Biron (উপমহাদেশের রাজনীতিতে সম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান,' ডঃ আব্দল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ৬০)।
৪৮। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ৬০।
৪৯। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৬২। শিবাজীর পরে মহারাষ্ট্রে তার পক্ষ থেকে ভারতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যারা চালাতেন তাঁরা পেশায়া, বলে অভিহিত হতেন।
৫০। শিবাজী উৎসবের দশম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিলক বাংলায় এলে (১৯০৬) যে সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, সে সভায় তিলক এই মন্তব্য করেন।
৫১। 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩০।
৫২। 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ,' উমা মখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রকাশক, ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ৬/১-এ বাঞ্ছারাম আক্রুর লেন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৬৮, ১৬৯।
৫৩। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ,' উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮২, ১৮৫, ১৮৬।
৫৪। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ, উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮৬,১৮৭, ১৮৮।
৫৫। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লব বাদ', উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬৮,১৭০,১৭১।
৫৬। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লব বা', উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩২।

www.icsbook.info

বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক "The Economist" তার "ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্ব" শীর্ষক প্রধান রচনার ছবিতে পাশাপাশি একজন মুসলিম ও একজন পশ্চিমা রমণীকে দেখায়। মুসলিম রমণীটি সম্পূর্ণরূপে একটি কালো বোরখায় আবৃত। আর অন্যজন মৃদুহাস্যে পশ্চিমাধাঁচে রমণীয় সাজে সজ্জিত। পশ্চাৎপটে একজন মানুষের ছবি রয়েছে যে এই দৃশ্য দেখছে। নিঃসন্দেহে এই ছবির বক্তব্য হল, ইসলাম মেয়েদের করেছে বন্দী আর পশ্চিমা বিশ্ব তাদের দিয়েছে মুক্তি। অন্যকথায় ইসলামে নেই কোন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা। এর মাধ্যমে পশ্চিমারা এটাই প্রমাণ করতে চায় যে তাদের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবিক অধিকার, সার্বজনীন সংস্কৃতি ও এক বিশ্ব অর্থনীতির মাধ্যমে মানুষকে মুক্ত করা। তাদের মতে বিষয়গুলো নতুন বিশ্বব্যবস্থা গঠনের অপরিহার্য উপাদান যা বিশ্ব-শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

পত্রিকাটি এই এই মলাট কাহিনীর অন্য একটি ছবিতে দুজন অশ্বারোহী সৈনিককে দেখায়। তাদের একজনের একটি ক্রস এবং অন্যজন বহন করছে অর্ধচন্দ্রের প্রতীক। মধ্যযুগীয় অস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধরত এই দুই সৈনিক একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত। এই ছবিটি স্মরণ করিয়ে দেয় সেই ক্রুসেডের দিনগুলির কথা। এর দ্বারা "ইকোনোমিস্ট" আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চায় নতুন বিশ্বব্যবস্থার মোড়কে ঢাকা আরেকটি নতুন ক্রুসেডের দিকে। নিঃসন্দেহে মুসলিম যুবসম্প্রদায়ের জন্য এটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক সংবাদ। বিশেষ করে সেইসব মুসলিম দেশের যুবসমাজের জন্য যারা মাত্র ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্য এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের জন্য এই নতুন বিশ্বব্যবস্থা একটি নতুন উপনিবেশবাদের এক রূপ মাত্র।

কমিউনিজমের পতন বিশ্বে একমাত্রিকতার পথ উন্মুক্ত করে। কিন্তু বিশ্ব এখনও আদর্শগতভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উদ্দেশ্যহীন গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং ইহজাগতিক মানবতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে। পশ্চিমা শক্তিগুলি এই আধিপত্যবাদী একমাত্রিকতাকে (unipolarity) ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব একটি বিশ্বের নকশা কল্পনা করছে যাকে তারা বলছে নতুন বিশ্বব্যবস্থা। ওহীভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার অধিকারী একমাত্র জাতি হিসাবে মুসলমানরা তাদের নিজস্ব বিশ্বের-স্বপ্ন নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে বিকল্প এক রাজনৈতিক ও আদর্শিক শক্তি হিসাবে। উম্মাহর সবচেয়ে সক্রিয় অংশ হিসাবে মুসলিম যুবগোষ্ঠীর ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখা তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম-প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবে।

www.icsbook.info

বিশ্বব্যবস্থা

আক্ষরিক অর্থে 'order' বলতে বুঝায় একটি বৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে কিছু মূল্যবোধের নিয়মতান্ত্রিক বিন্যাস। অন্যদিকে 'disorder' হল একটি রোগ যা শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করে। আমরা যে বিশাল বিশ্বের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ, সেই বিশ্বও সৃষ্টি হয়েছে ও রক্ষিত হচ্ছে সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। এই অনড় বিধানের মাধ্যমে আমাদের দেহ লাভ হয়েছে ও তার ধারণও চলছে স্রষ্টার অমোঘ নিয়মে। সেই সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা চেয়েছেন সামাজিক জীব হিসেবে তার জীবন-কর্মে মানুষ স্রষ্টার এই অমোঘ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাক। কিন্তু যেহেতু বিশৃঙ্খলা বা অনিয়ম মানবসমাজ ধ্বংসকারী এক ভয়াবহ রোগ, সেহেতু আল্লাহতায়ালা মানুষকে তাঁর খলিফা হিসেবে বেছে নিয়ে জীবন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা অনুসরণের দায়িত্ব তার ওপর দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত এবং তাঁর দূত-নবীগণ কর্তৃক প্রচারিত এই জীবন-শৃঙ্খলাই হল কল্যাণকর একমাত্র জীবন পদ্ধতি।

খোদায়ী এই জীবন পদ্ধতির পাশাপাশি এর পরিপন্থী মানব-সৃষ্ট অনেক পদ্ধতিও পৃথিবীতে রয়েছে। সত্য (হক) ও মিথ্যা (বাতিল) এ দুটি পথ প্রকৃতিগতভাবেই পরস্পর বিরোধী। এদের একটির প্রসারণ ঘটলে অপরটির সংকোচন ঘটে। পুরো মানব ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে আসছে এই পরস্পর বিরোধিতার। ইব্রাহীম (আ) এর সাথে নমরুদের, মুসা (আ) এর সাথে ফেরাউনের (Pharaon) সংঘাতসহ অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আজকে আবার "সভ্যতার সংঘাতের" প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে নতুন অবয়বে সেই একই সত্যকে উন্মোচিত করছেন স্যামুয়েল হ্যানটিংটন। শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মানব-সৃষ্ট ব্যবস্থাগুলোও উৎকর্ষতা লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নজিরবিহীন অগ্রগতি মানুষের সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা কিছু মানুষের মধ্যে ফেরাউনের মত অহংকারের জন্ম দিয়েছে। ফেরাউনী অহংকার-তাড়িত এই মানুষগুলো স্বপ্ন দেখছে এক নতুন একমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থার। তাদের কাঙ্ক্ষিত এই বিশ্বব্যবস্থা সেই ঐশী জীবন ব্যবস্থাকে শুধু অস্বীকারই করে না, রীতিমত চ্যালেঞ্জও করে।

নতুন বিশ্বব্যবস্থার অভ্যুদয়

নতুন বিশ্বব্যবস্থা হল চলমান অধগতি ও অব্যবস্থার মধ্যে পশ্চিমাদের সৃষ্ট এক উচ্চাভিলাষী অভিসন্ধি Kim R. Holmes তাঁর "New World Disorder" প্রবন্ধে লিখেছেন,"ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শান্তি এবং সম্প্রীতির জন্য পুরাতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান অপরিহার্য নয়।" এই যুক্তির পক্ষে তিনি মধ্যযুগীয় ও বর্তমান ইতিহাস থেকে অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। কমিউনিজমের পতন ও স্নায়ুযুদ্ধের অবসান পৃথিবীতে ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং পশ্চিমা পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিকভাবে একক শক্তিতে পরিণত করে দেয়। সোভিয়েত-শক্তির অনুপস্থিতিতে পশ্চিমারা যুক্তরাষ্ট্রের

www.icsbook.info

একক নিয়ন্ত্রণাধীন এমন এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখে যেখানে বিরাজ করবে কবরের শান্তি। কিন্তু ঘটনা সেরূপ এখনও ঘটেনি।

এ কথাকেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের Bruce Cuming এভাবে বলেন যে, "আশির দশকের সমাপ্তি নিয়ে আসে ভীতিকর অবস্থা এবং ১৯৯১ সাল কোন শান্তির যুগের বদলে নতুন এক সংকটের সূচনা করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের পতন ঘটে, কিন্তু চীন টিকে থাকে। ভারত ও পাকিস্তানের মত অনেক দেশ পারমাণবিক শক্তি হিসাবে সামনে আসে। প্রাচ্যের সাম্প্রতিক শিল্পায়ন, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, দ্বন্দ্বমান ধর্ম ও অর্থনৈতিক ব্লক এবং শিল্পোন্নত দেশগুলির ক্রমহ্রাসমান অর্থনীতি বাণিজ্য-যুদ্ধের আশংকা ত্বরান্বিত করছে।

জাতিগত কারণে সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়ার বিভক্তি এবং বিশ্বের অন্য কিছু অঞ্চলের জাতিগত বিরোধ বিপজ্জনক ভবিষ্যতের ইংগিত প্রদান করে Mr. Kim R. Holmes তাঁর 'New World Disorder' নিবন্ধে বলেন, "পশ্চিমাদের একমাত্রিকতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হল জোরালো রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ধর্মীয় মৌলবাদের পুনরুত্থান।" Samuel P. Huntington -এর মতে, "ধর্মের পুনর্জাগরণ এখন পৃথিবীব্যাপী অনুভূত।" তিনি এ ব্যাপারটি অন্যভাবেও উপস্থাপন করেন। তিনি ধর্ম, মতামত এবং ভাবাদর্শকে সংস্কৃতি অথবা সভ্যতা হিসাবে আখ্যা দেন এবং বলেন যে, জাতিরাষ্ট্র (Nation-state) এখন আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক কোন একক নয়। তিনি বলেন, তাই বলে মানুষের মধ্যে থেকে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হচ্ছে না। তার মতে এই প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা টিকে থাকবে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে যা সংস্কৃতি বা সভ্যতা নামে পরিচিত।

সংক্ষেপে এগুলোই হল পশ্চিমাদের পরিকল্পিত নিরাপদ একমাত্রিকরণের প্রতি হুমকিস্বরূপ। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বুশ, যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিজমের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার নেতৃত্বে পশ্চিমাদের এই একমাত্রিকরণের অভিলাষ নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপ নেয়।

World Policy Institute -এর Walter Russell Meed বলেন, "উপসাগরে একটি আন্তর্জাতিক শক্তির সমন্বয় ও এতে অর্থ জোগানোর ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে রাজনৈতিক সাফল্যে উল্লসিত ওয়াশিংটন আরও একবার নিজেকে সারা বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মনে করে। ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের আদলে বিশ্ব গড়ার ও একটি সফল বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় সুযোগ হয়ে দাঁড়ায় স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ও উপসাগরীয় যুদ্ধে তাদের বিজয়।"

বুশ (বর্তমান বুশের পিতা) প্রশাসনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে Walter Meed আরও বলেন, "ইরাকের কুয়েত আক্রমণের মধ্য দিয়ে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটে গেল। এই ঘটনার পর বুশ প্রশাসন নিজের প্রভুত্বকে নতুন করে বিস্তৃত করার জন্য তার সামরিক শক্তিকে ট্রাম্প কার্ড হিসাবে ব্যবহার করার এক সুযোগ খুঁজে

www.icsbook.info

পায়। জার্মান ও জাপানকে দোকানদার জাত বলে দূরে ঠেলে দেয়া হয়, যে নামে এক সময় ইংরেজদের অভিহিত করা হতো। আর বাণিজ্যের জন্য যে স্থিতিশীল বিশ্ব প্রয়োজন তা কেবল যুক্তরাষ্ট্রই নিশ্চিত করতে পারে। স্নায়ুযুদ্ধকালের বিশ্বের পরেই আসবে সেই বিশ্ব Charles Krauthamer যাকে বলেন একমাত্রিক বিশ্ব। একমাত্রিক এই বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র স্নায়ুযুদ্ধকালের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা চর্চা করবে।

Walter Meed বুশ প্রশাসনের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বুশকে হিব্রুরাজ্যের বীর 'সল' এর (Saul) সঙ্গে তুলনা করে বলেন, "প্রেসিডেন্ট বুশ 'সল' -এর চেয়েও বেশি শান্ত মস্কিষ্কের, কিন্তু তাঁকেও ভাববাদীদের সারিতে দেখা যায় এবং তিনিও রাত্রিকালীন ভীতিতাড়িত" Walter Meed এখানে বুশকে আঘাত করতে চেয়েছেন, কারণ তিনি যা করেছেন, আমেরিকানদের জন্য তা যেন সম্পূর্ণ নতুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধুই তার কিছু কীর্তিমান পূর্বসুরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

Walter Meed -এর এই মন্তব্যের পক্ষে প্রমাণ মিলে যখন তিনি বলেন, "নতুন বিশ্বব্যবস্থার অভিলাষ আমেরিকার ইতিহাসে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে গেছে। এমনকি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হওয়ার আগেও আমরা (আমেরিকানরা) বিশ্বাস করতাম যে, আমাদের কাজ ও মূল্যবোধ একটি নতুন ধারার বিশ্ব সৃষ্টি করবে। Pan Britannica -র পতন ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকার নীতিতে একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছিল 'পবিত্র গ্রেইলের' (শেষ নৈশভোজে যিশু যে পাত্রে আহার করেছিল ও যাতে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর রক্তধারণ করা হয়েছিল) মত কাঙ্ক্ষিত। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকালে Woodrow Wilson এবং Franklin Roosevelt উভয়েই এই পবিত্র 'গ্রেইলকে' তাদের 'হস্তগত' বলে মনে করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত উভয় সময়ই তা ফস্কে যায়।"

শতাব্দীর তৃতীয় মহাদ্বন্দ্ব স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পর আমেরিকার আরেক প্রেসিডেন্ট বুশ দুরাশার ঘোড়ায় চেপে ফস্কে যাওয়া সেই দুর্লভ বস্তুর পিছুধাওয়া শুরু করেছেন। এই আমেরিকান উচ্চাভিলাষ নির্ধারিত কিছু সময়ের নির্দিষ্ট কিছু আমেরিকানদের বিচ্ছিন্ন কোন অভিপ্রায় নয়। Walter Meed -এর মতে, "আমেরিকান নীতিতে এই বিশ্বব্যবস্থার ধারণা পরিবর্তনশীল কোন বিশ্বাস নয়। আমাদের জাতীয় নীতিতে এটিই হল চিরস্থির ধ্রুবতারা যাকে কেন্দ্র করে অন্য সবকিছু আবর্তিত হয়।"

নিঃসন্দেহে এই জাতীয় নীতিই এখনও তাদের সকল কাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এবং ক্লিনটনও এই নীতি অনুসরণ করেছেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঘোষণা করেন, "আমেরিকানদের একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে তোলার জন্য আমরা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করব বিশ্ব পরিবর্তনের শক্তিকে এবং অনির্ধারিত অনাগত সময়ের জন্য আমেরিকান নেতৃত্বকে শক্তিশালী ও নিশ্চিত করব।" তার এই ঘোষণা Woodrow

www.icsbook.info

Wilson, Franklin Roosevelt, Bushসহ অন্যান্য অতীত নেতৃবৃন্দের কথার একেবারে হুবহু পুনরাবৃত্তি। আর বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশ এই আধিপত্যবাদী ধারণাকে এগিয়ে নেবার জন্যে প্রায় হিটলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সকল বিবেচনা থেকে একটি উচ্চাভিলাষী নতুন বিশ্বব্যবস্থা আবির্ভূত হচ্ছে। ১৯৯৫ সাল ছিল স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী যুগের সমাপ্তিকাল। এরপর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো কূটনীতি ও জাতীয় কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন যুগের সূচনা করে।

১৯১৫ সালে ভিয়েনার কংগ্রেসে যে বিশ্বব্যবস্থা শুরু হয় তা মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর বছর ১৯১৪ সালেই সূচিত হয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধ ও স্নায়ুযুদ্ধ-সংকটের সাত দশক পেরিয়ে গেছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব-এশিয়ান ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের অধ্যাপক Bruce Cuming বলেন, "আমাদের অনুধাবনের জন্যে নতুন বিশ্বব্যবস্থা বা শান্তি-সহযোগিতার এক বড় সময় আমাদের সামনে।" এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার অগ্রগতি ও কার্যক্রমের ব্যাপারে পশ্চিমাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারে সবাই একমত। এছাড়া এই ব্যবস্থার নেতৃত্বের প্রশ্নও রয়েছে। এ ব্যাপারে আমেরিকান চিন্তাবিদরা পর্যন্ত বিভক্ত। তাদের কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের একক নেতৃত্বের পক্ষে, কেউ কেউ আবার পশ্চিমাদের সামষ্টিক নেতৃত্বের পক্ষে কথা বলছে। কিন্তু পশ্চিমাদের একমাত্রিক নীতির প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোনরকম মতানৈক্য নেই।

এমন অনেকে রয়েছেন যারা মনে করেন এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক আলী রিয়াজ বলেন, "আমি দ্বান্দ্বিক উপাদানের একটি ভবিষ্যৎ দৃশ্যপট আঁকতে চাই যা একটি পুরো মাত্রার যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। এবং এই যুদ্ধের স্নায়ুযুদ্ধে রূপ নেয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে ৪৫ বছরের বেশি সময় ধরে চলা স্নায়ুযুদ্ধের মত এ স্নায়ুযুদ্ধও সমগ্র বিশ্বকে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর এই স্নায়ুযুদ্ধ আগের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে হবে না। এই যুদ্ধের প্রতিপক্ষদ্বয় হবে সম্পূর্ণ নতুন। আদর্শ ও অর্থনীতি উভয়ই আসন্ন এই যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।" একদিকে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে যোগসাজশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে, অন্যদিকে প্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের ধারা এমনদিকে ধাবিত হচ্ছে যা পরিণামে আদর্শগতভাবে পশ্চিমা জাতিসমূহের সাথে সংঘর্ষে রূপ নেবে। আলী রিয়াজ আখ্যায়িত নতুন স্নায়ুযুদ্ধ আগের ৪৫ বছরের স্নায়ুযুদ্ধের মত হবে না। প্রকৃতপক্ষে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে স্নায়ুযুদ্ধ হতে নতুন যুদ্ধ হবে সম্পূর্ণ আলাদা। সুসম দুই শক্তির মধ্যেকার স্নায়ুযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল "ভীতির ভারসাম্য রক্ষা।" কিন্তু দুই অসম শক্তির মধ্যেকার এই ভবিষ্যৎ যুদ্ধে শক্তিশালী পক্ষ হবে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণাত্মক। আর দুর্বল পক্ষ কোনরকমে করবে আত্মরক্ষা। আক্রমণাত্মক এই ধারাই হল নিষ্ঠুর 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা' যা একমাত্রিকতার

www.icsbook.info

স্বার্থে সকল প্রতিপক্ষকে নিধন করার চেষ্টা করবে। নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্য অনুযায়ী এটাই হল মানুষের শেষ ও একমাত্র জীবন পদ্ধতি।

বিখ্যাত বিশ্লেষক ও যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাবেক একজন নীতি নির্ধারক Francis Fukuyama বলেন, "সামনে আমরা যা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি তা শুধু স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি অথবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের অতিক্রমা নয়। বরং এটি হবে ইতিহাসের সমাপ্তি অর্থাৎ মানুষের আদর্শিক বিবর্তনের সমাপ্তি-বিন্দু এবং মানবশাসন কাঠামোর চূড়ান্ত রূপ হিসাবে পশ্চিমা উদার গণতন্ত্রের সার্বজনীনীকরণ।"

Fukuyama -তাঁর এই সমাপ্তিবাদের জন্য সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু একথা সত্য যে নতুন বিশ্বব্যবস্থা যেসব আদর্শিক লক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হল গণতন্ত্র, ইহজাগতিক মানবতাবাদ এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি। বিংশ শতাব্দীর এ সংক্রান্ত বিরোধ আজ এমন জটিল পর্যায়ে পৌঁছেছে ও বিশ্বব্যাপী এতটা বিস্তার লাভ করেছে যে মানবিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যথাযথ পদক্ষেপ ও প্যান-হিউম্যান আদর্শই কেবল মানবজাতির অস্তিত্বের প্রতি এই হুমকি ঠেকাতে পারে। এবং আমি গভীরভাবে অনুভব করি যে আমাদের আজ দরকার এমন একটি বিশ্ব যেখানে থাকবে সত্যিকারের আন্তর্জাতিকবাদ অর্থাৎ মানব সম্পর্কের আদি রূপ। নিছক জাগতিক বিচারবোধ থেকে এই চিন্তার কোন বিকল্প নেই।

নতুন বিশ্বব্যবস্থার উপাদানসমূহ

স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার পথ উন্মুক্ত করে গেছে। কমিউনিজমের পতনের কারণসমূহই এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে। গরবাচেভের যে Perestroika এবং Glasnost কমিউনিজমের কবর রচনা করে, তা নিতান্তই ছিল পশ্চিমা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট। ১৯৮৭ সালে গরবাচেভের সংস্কার-যুগের মাঝামাঝি সময়ে Igvestia -এর এক সাক্ষাৎকারে ইউরোপিয়ান বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্য একাডেমীর পূর্ণসদস্য ও লেলিন পুরস্কার বিজয়ী Chenghis Aitamov বলেন, "ইউ. এস. পররাষ্ট্রমন্ত্রী George Shultz মস্কো সফরে আসলে কিছু লেখক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ সময় সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন Glasnost -এর ব্যাপারে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন তিনি Glasnost ও Perestroika -এর ব্যাপারে এত বেশি উৎসাহী ছিলেন।"

Aitamov নিজেই এর উত্তরে বলেন, "আমার মনে হয় আমাদের অন্য সবকিছুর মধ্যে এই Glasnost বিশ্বকে টিকে যেতে সহায়তা করবে অর্থাৎ যদি আমাদের Perestroika সফল হয় তাহলে জনাব পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনি বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য এটাকে আমাদের বিশেষ ভূমিকা বলে বিবেচনা করতে পারেন। অন্যকথায় বেঁচে ওঠার জন্য আমরা আরও সাধারণ উপায় ও চমৎকার সুযোগ পাব।"

www.icsbook.info

Aitamov-এর শেষ সাক্ষাৎকারের মন্তব্যটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি বলেন, "বিশ্ব দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর ও রুক্ষ থেকে রুক্ষতর স্থানে পরিণত হচ্ছে।"

এখানে সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী ও লেখক Aitamov নিতান্তই পশ্চিমাদের কথার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর উচ্চারিত সাধারণ অবস্থান (Common ground), যুক্তি (reason), মানবিক অভিজ্ঞতা (human experience), মানবজাতি (human race), (pan human ideals) কথাগুলো পশ্চিমাদের ব্যবহৃত। এবং Aitamov -এর কল্পিত নতুন বিশ্ব নতুন বিশ্বব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং সাম্যবাদের পরাজয় মানে পশ্চিমা নীতির জয়। এবং বর্তমানে পরাজিত কম্যুনিস্ট বিশ্ব ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-রূপ নিয়ে নতুন বিশ্বধারার অগ্রভাগে যুক্ত হয়েছে। পশ্চিমাদের জন্য এটিই সবচেয়ে বড় সুযোগ হিসাবে আবির্ভূত হয় যা এই নতুন ও একমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করেছে।

পশ্চিমাদের দ্বিতীয় অস্ত্র হল গণতন্ত্র যা তাদেরকে বর্তমান অবস্থায় আসতে সহায়তা করেছে। শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ক্রটি-বিচ্যুতির পর ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্তমানে গণতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার পদ্ধতি। গণতন্ত্র আজ তাদের মূলধনে পরিণত হয়েছে এবং তারা মনে করে এটা বিনিয়োগ করা তাদের দায়িত্ব। গণতন্ত্রের অনুকূলে দ্রুত এবং ব্যাপক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৮৯ সাল ছিল ঐ দশকের সবচেয়ে নাটকীয় বছর। এ বছর তাইওয়ান, নিকারাগুয়া, এবং নামিবিয়ার মত বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের অনুকূলে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

ইউরোপের বাইরে ল্যাটিন আমেরিকায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন একটি নাটকীয় রূপ লাভ করে। এখানে বিভিন্ন দেশে একের পর এক জনগণ একনায়কতন্ত্রকে উৎখাত করে নির্বাচিত নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই দশকে এশিয়ার কোরিয়া, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনে গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক সাফল্য সাধিত হয়। এমনকি আফ্রিকাতেও একনায়কতন্ত্র ও একদলীয় নীতি বাস্তবতার নীরিখে পরিত্যক্ত হয়। ইতিহাসকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই পরিবর্তন হল সত্তর দশকের মাঝামাঝি আইবেরিয়ান পেনিনসুলায় শুরু হওয়া ঘটনা প্রবাহের অংশবিশেষ। আর আইবেরিয়ান পেনিনসুলায় এই ঘটনা ঘটে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পর্তুগাল ও স্পেন থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসকগোষ্ঠী উৎখাত হওয়ার পর।

গণতন্ত্রের অনুকূলে এই রাজনৈতিক পরিবর্তন আজ পশ্চিমাদের বিজয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। কম্যুনিস্ট বিশ্বের হঠাৎ পরিবর্তন এ বিজয়কে অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত করে তোলেছে। পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের শ্লোগান আরও জোরালো হয়। এই ব্যবস্থা নতুন বিশ্বব্যবস্থার আবির্ভাবকে সহায়তা করে, যেখানে গণতন্ত্রকে সার্বজনীন সরকার পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

www.icsbook.info

Brad Roberts বলেন, "সত্তরের দশকের পূর্ব পর্যন্ত যখন গণতন্ত্র শিল্পায়িত রাষ্ট্রগুলোতে একটি বিচ্ছিন্ন ধারণা ছিল, তখন খুব সামান্যই অনুমিত হয়েছিল যে সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের এমন একটি আবেদন রয়েছে। গণতন্ত্র আজ শুধু একটি সরকার পদ্ধতিই নয়, নতুন বিশ্বব্যবস্থার একটি কার্যকর হাতিয়ার বটে।"

নতুন বিশ্বব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে তৃতীয় কারণ হল যোগাযোগ বিপ্লব। ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ট্রান্স ন্যাশনাল বেতার বার্তা জাতীয় সীমারেখার গুরুত্বকে গৌণ করে তোলে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে একজন মানুষের সরাসরি সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ায় তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়। টেলিভিশন, টেলিফোন, ফটোকপি মেশিন, ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও বর্তমানে ফ্যাক্স মেশিন ও ডাটা লিংকস ব্যক্তির ওপর তার জাতীয় প্রভাব দুর্বল করছে। এভাবে এটা সামষ্টিক জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। যোগাযোগ বিপ্লবের কারণে সাধারণ লোকজন ভোগ ও বিতরণের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ক্ষমতা লাভ করে। এর ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে উৎসাহিত হয়। এই ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যবিচ্যুতি নতুন বিশ্বব্যবস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে পশ্চিমাদের নিরাপত্তার ছাতা হিসেবে জাতিসংঘের ব্যবহার নতুন বিশ্বব্যবস্থার ক্ষেত্রে চতুর্থ কারণ হিসাবে কাজ করছে। জাতিসংঘ ১৫০টিরও বেশি দেশের সংঘ হলেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন ও রাশিয়ার মত হাতেগোনা কয়েকটি দেশ তা নিয়ন্ত্রণ করে। জাতিসংঘের সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে মূলত এইসব দেশের বিশেষ করে আজকের একক সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যাপারে জাতিসংঘের স্বপ্নদ্রষ্টা ও সমর্থকদের যে আহ্বান ছিল বর্তমান অবস্থায় তা থেকে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যাপারে জাতিসংঘের স্বপ্নদ্রষ্টা ও সমর্থকদের যে আহ্বান ছিল বর্তমান অবস্থায় তা থেকে জাতিসংঘ অনেক দূরে অবস্থান করছে। এর কার্যক্রম এখন ধনী ও শক্তিশালী দেশগুলোর জাতীয় পররাষ্ট্রনীতির নকশা অনুসরণ করে চলে। জাতিসংঘ ব্যবস্থার মোট খরচের সিংহভাগও তারাই বহন করে।

জাতিসংঘ কখনই তাদের স্বার্থপরিপন্থী কিছু করতে পারে না। সত্যিই এটা একটা স্ববিরোধী সত্য যে গণতন্ত্রের রক্ষা করা তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিশ্বে গণতন্ত্রের শিকড় মজবুত করার পরিবর্তে একে একটি স্বৈরতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এ জন্যই দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধকালে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি ছিল তখন জাতিসংঘ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অকার্যকর। শুধুমাত্র গরবাচেভের আমলে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের উন্নতি হয় ও জাতিসংঘ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

www.icsbook.info

Leon Gordenker বলেন, "আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব নিরসনে জাতিসংঘের ভূমিকা সম্ভবত এর পুনর্জাগরণের সবচেয়ে বড় নাটকীয় নির্দশন। জাতিসংঘ নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তিতে উভয় পরাশক্তিই জাতিসংঘের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে। সেই সময় দুই পরাশক্তির কেউই সাইপ্রাস ও লেবাননে জাতিসংঘ শান্তি-রক্ষা শক্তির বিরুদ্ধে কোন অবস্থান নেয়নি। বৈরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের শান্তিপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষক প্রেরণের পদক্ষেপকেও উভয়ে মেনে নেয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় একসঙ্গে তারা জাহাজে সন্ত্রাসী হামলা দমনের জন্য কাজ করে এবং জাতিসংঘের ব্যাপক ভূমিকার সাথে তারা একমত হয়। অন্যদিকে সে সময় আফগানিস্তানের পুনঃনির্মাণে জাতিসংঘের অগ্রণী ভূমিকাকে তারা সমর্থন করে। এছাড়া অন্যান্য বিবাদ নিরসনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারেও তারা কোন বাধা সৃষ্টি করেনি, মাত্র কয়েক বছর আগেও তারা যা করেছে।

কম্যুনিজম ও গরবাচেভের পতনের পর আন্তর্জাতিক অবস্থা আবারও পশ্চিমাদের অনুকূলে চলে যায় ও তাদের একমাত্রিকতা আরও উৎসাহিত হয়। ফলে জাতিসংঘ এখন সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এশিয়ান সদস্য চীন কখনও কখনও কিছু বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখানোর চেষ্টা করে, মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদের মত কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ধারায় কথা বলার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু এ জাতীয় বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল বিরোধিতা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য পশ্চিমা মৈত্রির নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘের কাজের গতিতে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে দ্রুত করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বরং সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবে কম্যুনিস্ট আদর্শের বিদায়ের পর পশ্চিমাদের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বি আদর্শিক কোন শক্তি নেই। আর এই শূন্যতাই নতুন বিশ্বব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে সহায়তা করছে। এমনকি পশ্চিমা জনগণের অনেকেই এ ব্যাপারে ভাবতে শুরু করেছে যে, 'আদর্শ-শক্তি'র প্রভাব মানুষের জীবন ও কর্ম নিয়ন্ত্রণের যোগত্যা আর রাখে না। এর সপক্ষে তারা যুক্তি দেখায় যে, দুনিয়ার আদর্শিক সম্প্রদায়গুলো আজ বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের দাবির সাথেই সংগতি বিধানের জন্যে সংগ্রাম করছে এবং তাদের অনেকেই তাদের বাস্তব চাহিদা পূরণে গণতন্ত্রকেই সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র বলে মনে করছে। রাষ্ট্রক্ষমতা হিসেবে ইসলামের অনুপস্থিতি পশ্চিমাদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার স্বপ্নের বাস্তবায়নকে আরও সহজ করে তুলছে।

নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্যসমূহ

নতুন বিশ্বব্যবস্থা হল বিশ্বের জন্যে একমাত্রিক একটি বিশ্বব্যবস্থা। এর ঘোষিত লক্ষ্য হল একটি যুদ্ধমুক্ত, বিশ্ব যেখানে থাকবে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা। এই লক্ষ্যের যথার্থতা প্রতিপন্নের জন্যে পশ্চিমারা স্নায়ুযুদ্ধ-

www.icsbook.info

পরবর্তী বিশ্বের এক ভয়াবহ প্রতিচ্ছায়া অংকন করেছে। Stanford ইউনিভার্সিটির হুভার ইনস্টিটিউটের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো Larry Diamond বলেন, "মানুষকে যুদ্ধার্থে সমবেত করতে মার্কসবাদ ও কম্যুনিস্ট শাসন পদ্ধতির অবসান এবং বিশ্বব্যাপী আদর্শিক আন্দোলন হিসাবে লেলিনবাদের ধ্বংস পরিবর্তনশীল, বিপজ্জনক ও কোন কোন ক্ষেত্রে কুৎসিত ও দুর্ভাগ্যজনক এক বিশ্বের জন্ম দিয়েছে যেখানে সরকার পদ্ধতি, রাষ্ট্রসীমানা ও স্বকীয়তা নিয়ে হবে প্রচণ্ড যুদ্ধ। কখনও কখনও এই যুদ্ধ হবে রক্তক্ষয়ী। প্রাচ্য ও প্রতিচ্য এবং কম্যুনিজম ও গণতন্ত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট লড়াইয়ের সমাপ্তি আমাদের ঠেলে দিয়েছে অন্য এক অস্থির, খণ্ডিত ও বহুমাত্রিক এক বিশ্বের দিকে। আর এই বিশ্বে নিরন্তর যুদ্ধ হচ্ছে সমরবাদ, সম্প্রসারণবাদ, অতিজাতীয়তাবাদ, অন্ধ সংস্কৃতিপ্রেম, ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং নৈরাজ্যের মত সভ্যতার আদিম শত্রুর মধ্যে। যুদ্ধরত দুই পক্ষের এতে তাৎক্ষণিক ধ্বংস না হলেও কিছু কারণে এই বিশ্ব আরও বেশি বিপজ্জনক। কারণ বর্তমান বিশ্ব এমন অনেক হুমকির মুখে যা যে কোন সময় রূপ নিতে পারে সাংঘাতিক সংঘাতে।"

এই হুমকির প্রতিকার হিসেবে পশ্চিমারা নতুন বিশ্বব্যবস্থার পরিকল্পনা করে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় পশ্চিমাদের নীতি ছিল কমিউনিজমের সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ছক আঁকা হয় আক্রমণাত্মক। স্নায়ুযুদ্ধকালের "নিয়ন্ত্রণ নীতি" বর্তমানে "আগ্রাসন" নীতির রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ক্লিনটন প্রশাসন তার প্রথম বছরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সুস্পষ্ট একটি বিশ্বীয় কৌশল প্রতিষ্ঠিত করতে। তাদের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা Anthony Lake এর বাজার-কেন্দ্রিক বিশ্ব সম্প্রদায়ের পরিবর্ধন নীতির ক্ষেত্রে আরও জোর দেয়া হয়। আজ বুশ প্রশাসন আগ্রাসী বিশ্বায়ন নীতির বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে হাত দিয়েছে।

এ ব্যাপারে Larry Diamond -এর মতবাদ হল, "সম্প্রসারণ নীতি হল নিয়ন্ত্রণনীতির এক যৌক্তিক ও আকর্ষণীয় উত্তরসূরি।" পশ্চিমাদের কাছে এটা অত্যন্ত যৌক্তিক ও আকর্ষণীয় এই অর্থে যে "নিয়ন্ত্রণ নীতির" লক্ষ্য ছিল মুক্ত বিশ্বকে (শিল্পোন্নত পশ্চিমাবিশ্ব) রক্ষা করা, কিন্তু বর্তমানের "সম্প্রসারণ নীতি" নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার নামে 'মুক্তবিশ্ব'কে সমগ্র বিশ্ব দখলে সমর্থ করে তুলছে।

স্নায়ুযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে। এখন এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্বের দায়িত্বও আমেরিকার হাতে চলে যাচ্ছে, ঠিক যেমন ১৯৪৫ সালে সংগঠন ও নেতৃত্বদানে একমাত্র সক্ষম দেশ ছিল আমেরিকা। তবে একথাও নিঃসন্দেহে ঠিক যে এখানে যৌথ নেতৃত্বেরও জোরালো দাবি রয়েছে। এ ব্যাপারে Bruce Cuming বলেনঃ "এই মুহূর্তে প্রথম বিশ্বের (পশ্চিমাদের) উচিত একপেশে নীতি ছেড়ে শক্তিশালী দেশগুলোর সমন্বয়ে বহুমাত্রিক সহযোগিতার দিকে ধাবিত হওয়া। যদি যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে তার প্রভুত্বের সূর্যাস্তে না গিয়ে পড়ন্ত বিকেলেও যদি উপনীত হয়ে থাকে, তবু তার উচিত হবে উদীয়মান ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সাথে মৈত্রী স্থাপন করা

www.icsbook.info

যা শতবর্ষ আগে করেছিল ব্রিটিশরা তাদের অধগতির প্রেক্ষাপটে। বর্তমানে যুক্তির দাবি ওয়াশিংটন, বার্লিন ও টোকিওর ত্রি-পাক্ষিক অংশীদারিত্ব, যাকে বলা ত্রিপক্ষবাদ। বহুপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় নীতির যৌক্তিকতা থাকলেও আমেরিকা স্নায়ুযুদ্ধকালের মত এখানেও নেতৃত্বের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছে। এবং যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই মনে করে এটি হল তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব যা একই সাথে আমেরিকা, পশ্চিমাদের ও মানবতার স্বার্থকে নিশ্চিত করে। সুতরাং এই দায়িত্ব হস্তগত করে আমেরিকানরা শুধু সুখী ও গর্বিতই নয়, এটা নিজেদের হাতে নিতে তারা সবসময় বদ্ধ পরিকর। সম্প্রতি কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের দেয়া এক ভাষণ তাদের অভিপ্রায়কে আবার নবায়িত করে। আমেরিকার ইতিহাস বিচার করে নিম্নোক্ত ভাষায় তিনি একটি ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রদান করেন, প্রায় ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম শীতে এক প্রজাতান্ত্রিক কংগ্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান দেশবাসীদের তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, যদি আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি তবে নিশ্চিতভাবেই আমাদের জাতীয় কল্যাণ বিপন্ন হবে এবং সেইসাথে সমগ্র বিশ্বের শান্তি বিপন্ন হতে পারে। সিনেটর Arthus Vanberg -এর মত 'রিপাবলিকান' সিনেটর -এর কর্তৃত্বে পরিচালিত সেই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আহবানে সাড়া দিয়েছিল। পঞ্চাশ বছর আগের সেই দূরদর্শী আমেরিকা স্নায়ুযুদ্ধে জয়লাভ করে ও একটি ক্রমবর্ধমান বিশ্ব-অর্থনীতি সৃষ্টি করে। ফলে অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় বেশি সংখ্যক লোক আজ আমাদের নীতির অংশিদার। যেসব বাধা ও ব্লক আমাদের পূর্বসূরিদের বিভক্ত করেছিল ইতিমধ্যে তার অধিকাংশই আমরা টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। এই প্রথমবারের মত একনায়কতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্রের ছায়াতলে বেশিসংখ্যক মানুষ সমবেত হয়েছে। আমাদের গোলার্ধেরও একটি জাতি ব্যতীত বাকি সবাই এই ছায়াতলে আজ সমবেত। একদিন সেটিরও এখানে সমবেত হওয়ার সময় আসবে। এখন পরিবর্তন ও পছন্দের একটি বিশেষ মুহূর্তে আমরা উপনীত। এখন সময় আমাদের দূরদর্শী হওয়ার ও আরও পঞ্চাশ বছরের জন্য আমেরিকার সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রথম কাজ হবে একটি অবিভক্ত গণতান্ত্রিক ইউরোপ প্রতিষ্ঠিত করা। শান্ত, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ইউরোপের মধ্যেই আমেরিকার অধিকতর নিরাপত্তা নিহিত। গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকার দূরদর্শীতা যেভাবে বিশ্বকে শান্তির দিকে ধাবিত করেছে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের জন্য আমেরিকার শক্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।"

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের যথার্থতা নিরূপণের চেষ্টা করেন। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মৌলবাদ, অতিজাতীয়তাবাদ ও জাতিগত কারণে সৃষ্ট সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সফলভাবে মুকাবেলার জন্য আমেরিকার প্রয়োজন শক্তি ও নিরাপত্তা। এবং এর জন্য দরকার একটি সংগঠিত ও

www.icsbook.info

সমৃদ্ধ ইউরোপ। এর অর্থ এই যে, আমেরিকার নেতৃত্বে ইউরোপ ও আমেরিকার সহযোগিতা ইউরোপকে পুনর্গঠিত করবে যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতিগত কারণে সৃষ্ট সকল নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, অস্থিতিশীলতার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিশ্ব-শাসনের জন্য তাদের প্রয়োজন একটি একমাত্রিক ব্যবস্থা। এটাই হল তাদের অভিহিত নতুন বিশ্বব্যবস্থা। পশ্চিমাদের একমাত্রিকীকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া যা সুদীর্ঘ কৌশল হিসেবে নিম্নোক্তভাবে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে ঃ

ক. পশ্চিমাদের প্রস্তাবিত ও প্ররোচিত মুক্তবাজার অর্থনীতি দেশসমূহের 'জাতীয় অর্থনীতি' উচ্ছেদ করে বিশ্বে একটি একক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে। পশ্চিমারা ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থতহবিলের মাধ্যমে আফ্রো-এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির ওপর একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৬০ -এর দশকের শেষের দিক থেকে বিশ্বব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠান ২০ ডলার ঋণদান ছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং তাদের উপদেশ ও প্রযুক্তিগত সহায়তাদানে সমর্থ। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক প্রশ্নেও এই ব্যাংক নিজেকে জড়িত করার কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

এর সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিল ও ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক নীতির নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ঋণগ্রস্ত অনেক দেশের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের উপদেশ অত্যন্ত বিতর্কিত। এই উপদেশ ঋণ-গ্রহণকারী দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেয়ে তাদের ঋণব্যবস্থাপনার সাথেই বেশি সম্পর্কিত। এককথায় এসব ক্ষেত্রে বিশ্ব-ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিলের ভূমিকাকে সরকারের ভেতরে সরকার না বলে বলা যায় সরকারের ওপরে সরকার। ঋণজর্জরিত উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থতহবিলের কথা ও নির্দেশের বাইরে এক ইঞ্চিও নড়তে পারে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দেখাশুনার জন্যে জাতিসংঘের একটি সংস্থা এবং পশ্চিমাবিশ্বের অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বর্তমানে একদম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, এই প্রতিষ্ঠান ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে যা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে করে আসছে। ইতিমধ্যে WTO -এর প্রথম বাণিজ্য অধিবেশনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে "তথ্য প্রযুক্তি চুক্তি" (ITA) যার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের শুল্ক ৫০০,০০০ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পাবে। এছাড়া আরও একটি আলোচনা সম্পন্ন হয় যাতে ৬৮টি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের "Communication Service Market চালু করতে সম্মত হয়।

এ সিদ্ধান্ত যোগাযোগ পণ্যের জন্য একটি বিশ্ব-বাজার সৃষ্টি করবে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোকে এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করবে যা

www.icsbook.info

উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদেরকে স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রদান করবে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্টও OECD ভুক্ত দেশসমূহ বিদেশী লগ্নিকারীদের নতুন সুযোগ ও অধিক নিরাপত্তাদানের নামে WTO- কে প্ররোচিত করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বহুমাত্রিক চুক্তি (MAT) অনুমোদনের জন্য এক জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে। সিঙ্গাপুর অধিবেশনে এ ব্যাপারে দ্রুত সাফল্য লাভের কোন প্রতিশ্রুতি লাভে অবশ্য তারা ব্যর্থ হয়। এভাবে পশ্চিমারা একক এক ব্যবস্থার অধীনে অর্থনীতির বিশ্বায়নের চেষ্টা করছে, যা নতুন ব্যবস্থার নামে পশ্চিমারা নিয়ন্ত্রণ করবে। আগামীর দুনিয়ায় অর্থনৈতিক শক্তি রাজনৈতিক প্রভাব ও সামরিক শক্তি উভয়েরই নিয়ামক হতে যাচ্ছে। এ কারণেই Walter Russel Meed লিখছেন, "পশ্চিমা কূটনীতি একথা নগ্নভাবেই স্বীকার করছে যে, অর্থনৈতিক সুবিধা তাদের কূটনীতির বড় বিষয়, তাদের সামরিক পাওয়ার ও প্রেস্টিজ এবং লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার মাত্র।" তাদের বৈদেশিক নীতির এ বৈশিষ্ট্যের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সময়ের অর্থনীতি ও ব্যবসায় বিষয়ক এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল অ্যালান পি. লারসেন আরও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেন, "আজ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিনির্মাণে অর্থনীতি যে ভূমিকা পালন করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস আর কোনও সময়েই তেমনটা ঘটেনি। উনিশ শতক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ বিষয়ই অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। কিন্তু আজ বিশ্ব-অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্ন সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে এসেছে।"

সন্দেহ নেই আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অগ্যানাইজেশন (WHO) সংস্থাগুলোই পশ্চিমের লক্ষ্য অর্জনে অর্থনৈতিক নীতি ও প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

খ. নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অধিকার, সামাজিক অধিকার, মানবিক অধিকার, নারী অধিকার প্রভৃতি নামের খোলসের নিচে গঠন করা হচ্ছে সেকুলার মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি একমাত্রিক সংস্কৃতি। কায়রোর জনসংখ্যা ও উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন, কোপেনহেগেনের সামাজিক শীর্ষসম্মেলন, বেইজিং এ নারী সম্মেলন এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং মাধ্যমগুলোর উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা বিশ্বকে এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শাখায় কর্মরত কিছু জাতিসংঘ এজেন্সি এসব সম্মেলন ও অসংখ্য সুপরিকল্পিত দলিল ও প্রস্তাবের আবরণের আড়ালে শক্তিশালী করছে সেকুলার মানবতাবাদকে। এই মানবতাবাদ এমনভাবে পরিকল্পিত যেন তা ধর্ম ও জাতীয় সংস্কৃতিক প্রভাবের মূলোচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়। এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার সংস্কৃতিবোধ অনুসারে সেকুলার মানবতাবাদই হল মানবিক অধিকারের মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য চাহিদাসমূহ পূরণের একমাত্র উপায়। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমারা জাতিসংঘের ছত্রছায়া নিয়ে সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি একমাত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এমন একটি আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ রচনা করছে যা নিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্বর জাতিসমূহের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ধর্মকে। কায়রো, কোপেনহেগেন ও

www.icsbook.info

বেইজিং সম্মেলনে সিদ্ধান্ত ও ঘোষণার মধ্যে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে এই অভিপ্রায়। কোপেনহেগেন শীর্ষসম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ একটি দশদফা ঘোষণার ব্যাপারে একমত হন যাতে তারা সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ও আইনসম্মত একটি পরিবেশ সৃষ্টির অঙ্গীকার করেন। এখানে সামাজিক উন্নয়ন বলতে সেকুলার সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে বুঝানো হয়েছে যা জাতীয় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করে। কারণ তারা বলে, "অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কাছে শিথিল পরিবর্তনশীল ধর্মীয় বিশ্বাস ও সম্পর্কের কোন পরিমাপযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা নেই।" De Gregori ও Pisunyer আরও দাবি করেন যে, সাংস্কৃতিক জড়তা প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে এক প্রতিবন্ধকতা, উন্নয়নের জন্য যা অবশ্যই দূর করতে হবে।

সুতরাং কোপেনহেগেন দলিলে সামাজিক উন্নয়নকে স্থান দেওয়া হয়েছে সবার উর্ধ্বে। আর জাতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আচরণ নির্ভর করবে এই সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের মর্জির ওপর। কোপেনহেগেন ঘোষণা পরিষ্কারভাবে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে যা সেকুলার মানবতাবাদ অর্থাৎ ধর্মীয় মূল্যবোধমুক্ত মানবাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত উন্নয়নের সহায়ক।

কোপেনহেগেন দলিলে মুসলমান দেশগুলোও স্বাক্ষর করেছে। শুধু সৌদি আরব, পাকিস্তান, জর্ডান, মিশর ও ইরান এই শর্তে স্বাক্ষর করে যে ঘোষণার যে অংশ ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থি নয় তারা শুধু সেই অংশ মেনে চলবে। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাদের এই মৃদু ও রক্ষণাত্মক প্রতিবাদ একমাত্রিক সংস্কৃতির অগ্রগতিকে কখনও ব্যাহত করবে না। আর নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে সহজসাধ্য করার অন্যতম প্রধান উপাদান হল এই সাংস্কৃতিক এক-মেরুকরণ।

গ. নতুন বিশ্বব্যবস্থার আরেক উপাদান হল রাজনীতির একমাত্রিকরণ। পশ্চিমারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে গণতন্ত্রকে একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে। ক্রমবর্ধমান প্রাইভেটাইজেশন, সরকারের উন্নয়ন ও সেবা খাতের বাজেট বিভিন্ন এন. জি. ও-র কাছে হস্তান্তর, শর্তসাপেক্ষ অর্থনৈতিক সাহায্যসহ জাতিসংঘের সামরিক ভূমিকা ইত্যাদি জাতীয় সরকারকে দুর্বল করে জোরপূর্বক নতুন বিশ্বব্যবস্থার পথ উন্মোচনের বিশেষ কার্যকর হাতিয়ার।

স্নায়ুযুদ্ধকালেও পশ্চিমারা গণতন্ত্রের কথা বলত। মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও কমিউনিজম ইত্যাদি নামে তারা বিভিন্ন একনায়ককে সাহায্য ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করত। কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিমারাই হয়ে দাঁড়ায় গণতন্ত্রের রক্ষক। অর্থাৎ গণতন্ত্র তাদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার। লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম। তাদের এখনকার লক্ষ্য হলো বিশ্বের একনায়ক সাজা। এখন তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গণতন্ত্রকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। এটা সবারই

www.icsbook.info

খুব ভাল করে জানা যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো বর্তমানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বিপজ্জনক সময় কাটাচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় গণতন্ত্র সুস্থির অবস্থানে আসতে সময় লাগে প্রায় তিনশ বছর। কিন্তু এশিয়া আফ্রিকার উপনিবেশমুক্ত দেশগুলো তার একাংশ সময়ও পায়নি, উপরন্তু দেশগুলোকে এখনও অসংখ্য সংকট মুকাবেলা করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় বাইরে থেকে গণতন্ত্র আরোপ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিমারা এটা করতে বদ্ধকর তাদের স্বার্থের কারণেই। তারা মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক সাহায্যকে গণতন্ত্রের সাথে যুক্ত করেছে। তাদের মতে তাদের নির্দেশিত গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি মানেই মানবাধিকার লংঘন। তাদের উচ্চারিত মানবাধিকারের কথা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক।

সুতরাং মানবাধিকার হল পশ্চিমাদের একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার। এবং এই হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় গণতন্ত্রের জন্য। আর গণতন্ত্র হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের এক অস্ত্র। Brad Roberts যথার্থই বলেন, "উন্নয়নশীল বিশ্বের দুর্বল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রথা অতিক্রম করতে অনেক সময় লাগবে এবং তারা এই অবস্থায় বাইরের শক্তি দ্বারা শোষিত হতে পারে। সমাজের অসমাপ্ত গণতন্ত্রায়ন, গণনীতি, জাতীয়তাবাদ ও তাড়াহুড়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান সমস্যাকে আরও উত্তেজনাকর করে তুলতে পারে। অনেক নতুন গণতান্ত্রিক দেশ উত্তরাধিকারজাত সংকটে ভুগে থাকে, যার উপেক্ষা শুধু অর্থনৈতিক ধ্বংসেরই নয়, সামাজিক নৈরাজ্যেরও নিয়ামক হতে পারে।"

উপরন্তু পরাশক্তির কর্তৃত্বের মুখে দুর্বল ও আরোপিত গণতন্ত্রের দেশগুলো তাদের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে না। জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল বুট্রোস ঘালি বলছেন, "যখন রাষ্ট্রসমূহ ধীরে ধীরে গণতন্ত্র লাভ করছে, বিশ্বায়ন তখন তাকে অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ বিশ্বায়ন এমন এক নতুন শক্তির উত্থান ঘটাচ্ছে যা রাষ্ট্রকাঠামোর বিলোপ সাধন করছে।"

নির্বিচার প্রাইভেটাইজেশন হল জাতীয় সরকারকে শূন্যের কোঠায় ঠেলে দেয়ার জন্য নতুন বিশ্বব্যবস্থার একটি প্রকল্প। এই প্রাইভেটাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয় আজ থেকে পনের বছর আগে। ইতিমধ্যেই একশটি দেশে ৪৪৫ হাজার মিলিয়ন ডলার মূল্যের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তিমালিকানাধীন করা হয়েছে। প্রাইভেটাইজেশন হলো সরকারি অনেক দায়িত্বকে বেসরকারী হাতে তুলে দেয়ার একটি প্রক্রিয়ামাত্র। Government Executive (USA) পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক Tom Shoop তার একটি প্রবন্ধের শিরোনাম দেন 'Shrinking government : going, going, gone এর অর্থ হল, বেসরকারীখাতের বৃদ্ধি মানেই সরকারের সংকোচন। সরকারী কার্যক্রম এখন বিভিন্ন ব্যক্তি এবং জাতীয় ও বহুজাতিক N. G. O-গুলোর হাতে চলে যাচ্ছে। ধীরেধীরে এটা জাতিরাষ্ট্রের সবকিছুকেই বিশ্বায়নের অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এই বেসরকারীকরণ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সকল শর্ত

www.icsbook.info

পূরণ করছে। মজার ব্যাপার হল সমগ্র বিশ্বে আমেরিকা হল তার ব্যবস্থাপনা ও বাজেটনীতির ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণে সর্বশেষ দেশ। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে Tom Shoop বলেন, "এটা আমার কাছে সত্যিই একটি রহস্য যে, এমন একটি দেশ যে বিশ্বের যে কোন দেশের চেয়ে বেশি মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তা, সেদেশের এই অবস্থা কেন?"

মানবাধিকারের মত অর্থনৈতিক সাহায্যকেও পশ্চিমারা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের কাজে। 'Washington Quarterly' পত্রিকার সম্পাদক ও Strategic Studies কেন্দ্রের গবেষক Brad Roberts বলেন, 'At a basic political level, American aid is important as a siginal of the US intent to be a player in the world affairs and to promote those values that animate its domestic political life. Imlementing aid strategy for democracy, the most decisive steps are probably those at the micro-economic level. At the bilateral level, US aid can play a role in nurturing pluralistic institutions, encouraging economic empowerment and providing a safety net during periods of transition. Sometimes Western and US aid may be critical in a society's movement to democracy. Aid that has focused on building institutions of pluralism-political parties, independent media, legalised opposition, human rights organizations, legal training programmes, and SOS forth has been important where economic aid is employed, it must work not to prop up the old way, but to facilitate the transformation sructures and to address the rising political and economic aspirations of the electorate. Western aid can be used to encourage bureaucratic simplification and accountability, transparency, predictability and the rule of law in the Government."

পশ্চিমা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সাথে কতটা জড়িত তা এখানে যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিমা অর্থনৈতিক সাহায্যের পুরো শক্তি পরিচালিত করা হয়েছে একমাত্রিক বিশ্বায়নের দিকে যাকে বলা হয় নতুন বিশ্বব্যবস্থা।

সবশেষে বলা যায়, নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্যে পরিচালিত বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব জনাব বুট্রোস ঘালি নিম্নোক্ত ভাষায় চমৎকারভাবে এই বিশ্বায়নের রূপ বর্ণনা করেন,

"খুব স্পষ্টতই আমার প্রবেশ করেছি একটি বিশ্বসমাজে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ব্যবস্থানা পদ্ধতির জাতীয়করণ ও উৎপাদনশীলতার অনুক্যৃলীকরণের কারণে প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বায়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে

www.icsbook.info

এবং একটির সাথে আরেকটির আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। আর্থিক ক্ষেত্রে মুক্ত ব্যবস্থা, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমাপ্তি, অর্থনৈতিক নতুন ধারা এবং টেলিযোগাযোগের অগ্রগতির কারণে অর্থনৈতিক বিশ্ব খুব কার্যকরীভাবে বিশ্বায়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তথ্য ক্ষেত্রে, খবর ও উপাত্ত তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরিত হতে পারে সমগ্র বিশ্বজুড়ে।"

বিশ্বায়নের এই দৃশ্য অংকন করে জনাব ঘালি বলেন, "সামষ্টিক জীবনযাপনের নতুনধারা বিবেচনার জন্য এই অবস্থা আমাদের ওপর এক জোরালো বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।" এরপর জনাব ঘালি বর্ণনা করেন কিভাবে জাতিসংঘ নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্য বিশ্বায়ন সংগঠিত করছে। তিনি বলেন, 'This change of perspective faces the United Nations, with new imperative: that of incorporating the democratic idea into globalization of international life by engendering new forms of solidarity. It is this phase of democratization that the United Nations has already sought to expouse by eliciting a collective mobilization with respect to the new planet-wide issues and promoting the participation of private agents in the advent of a global democratic society. The United Nations is even now engaging in a vast collective analysis in the economic and social spheres, by organizing a series of international conferences (Cairo, Copenhagen, Beijing, etc.) devoted to major transnational problems that are shaping the future, indeed the destiny of mankind."

জাতিসংঘ এভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে বাস্তবায়ন করছে পশ্চিমাদের পরিচালিত নতুন বিশ্বব্যবস্থা নামের প্রকল্প।

Kim R. Holms বলেন, "স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এটা একটা সুদূরপ্রসারী বিশ্বাস যে বিশ্ব এখন প্রবেশ করেছে এক নতুন যুগে যেখানে জাতিসংঘ তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে।"

এই উচ্চাশা ব্যক্ত করে পরের অনুচ্ছেদেই হতাশাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "পৃথিবীর দৃশ্যপটে জাতিসংঘ কখনই একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হতে পারেনি। শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তির অনুমোদনের বাইরে কিছু করে সাফল্য লাভ জাতিসংঘের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।"

তাই জাতিসংঘ এখন যে বিশ্ব ব্যবস্থার কথা বলছে তা মূলত পশ্চিমাদের একটা বিশেষ শক্তির নির্দেশিত একটি প্রকল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী সৈন্যদলের সাহায্যে শান্তি ও নির্বতনমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার একটি কৌশলের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। এই কৌশল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের জোরালো সমর্থন লাভ

www.icsbook.info

করে। যতদূর সম্ভব জাতিসংঘে কেউ কেউ এই সংস্থাকে একটি পুলিশী শক্তি হিসাবে দেখে থাকে। যা শান্তির পরিবেশকে রক্ষা করবে, মানবাধিকারের অপব্যবহারের প্রতিকার করবে, মানবাধিকারমূলক কাজের ক্ষেত্রে দুঃখজনক ঘটনা বন্ধ করতে পারবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভুল ত্রুটি সংশোধন করবে। জাতিসংঘের তৎকালীন সহকারী মহাসচিব Sir Brain Urequhart পরিষ্কারভাবে বলেন, "তথাকথিত জাতীয় সার্বভৌমত্বের মোহ উৎপাটন স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির সাথে সাথে সার্বভৌম রাষ্ট্রতত্ত্ব অথবা এ সম্পর্কিত প্রথাগত ধারণা ধীরে ক্ষয়ে আসছে।"

আশ্চর্যজনকভাবে এখানে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি অসম্মান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জাতিসংঘের দায়িত্বশীলদের বক্তব্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবাধিকার এবং বাস্তুসংস্থানগত ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতার বেসামরিক উৎসসমূহকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন হুমকি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং নিঃসংকোচে একথা বলা যায় যে জাতিসংঘ বাধ্য হয়েই অস্থিতিশীলতার ঐ উৎসসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে পশ্চিমাদের হাতিয়ার হিসেবে জাতীয় সার্বভৌমত্ব মুছে ফেলার চেষ্টা ও পুলিশী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে একটি একমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করছে। আর পশ্চিমাদের সাথে সুর মিলিয়ে জাতিসংঘও একে বলেছে নতুন বিশ্বব্যবস্থা।

ধর্মের সক্রিয় রাজনৈতিক অবস্থানের অনুপস্থিতিতে পশ্চিমারা সুখী, কিন্তু একই সময়ে ধর্মীয় উত্থান দেখে তারা শংকিত। ইতিমধ্যেই তারা ধর্মকে নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রতিপক্ষ হিসাবে অভিহিত করেছে। এমন কি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও বলেছেন, "From beyond nation, economical and technical forces all over the globe are complelling the world towards the integration. The forces are infuelling a welcome explosion of entreprenecurship and political liberalization... At the same time, from within nations, the resurgent aspirations of ethnic and religious groups challenge governments on terms that traditional nation-states cannot easily accommodate... These twin forces lie at the hearts of the challenges not only to our national government, but also to all our national international institutions." আজ বুশ যা করছেন তা ক্লিনটনের এই চিন্তার ফলোআপ মাত্র।

উদারীকরণ এবং আধুনিকতার নামে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পুণর্জাগরণ মানুষকে দুনিয়ামুখী সেকুলার করার চেষ্টা করেছে। এমনকি ঈমানদার লোকেরাও চিন্তা করা শুরু করেছিলেন যে ধর্মের দিন শেষ। কিন্তু ধর্মীয় উত্থান বা পুনর্জাগরণ এখন একটা দুনিয়া-জোড়া ঘটনা। জন নেইসবিথ এবং পেট্রিসিয়া অ্যাবার্ডান তাদের সর্বাধিক বিক্রিত বই "ম্যাগাট্রেনডস ২০০০" এ তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তারা

www.icsbook.info

লিখেছেন, "তৃতীয় সহস্রাব্দের উষালগ্নে দুনিয়াব্যাপী ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত। আমেরিকান যেসব শিশুর জনকরা ১৯৭০ সালের দিকে ধর্মকে পরিত্যাগ করেছিল, তারা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন গীর্জামুখী, উপসনালয়মুখী। পুনর্গঠিত ইহুদীরা যারা ৪০ বছর আগে ধর্মীয় বই থেকে আধ্যাত্মিক শক্তি নামে কিছু সংকলন করেছিলেন তারা সেসব তথ্য যীশুতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব এবং বৌদ্ধতত্ত্ব থেকে পুনরুদ্ধার করেছেন। সনাতন প্রতিবেশীত্ব অনুষ্ঠান জাপানে জীবনতত্ত্ব, ধর্মীয় প্রথার পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং আঞ্চলিক বৌদ্ধ মন্দির চালু হয়েছে। গত দশকে দুনিয়াব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সদস্য তিনগুণ হয়েছে যার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ রোমান ক্যাথলিকসহ ৩০০ মিলিয়নের মতো। "ইয়থ ফর খ্রিস্ট" ইউরোপ জুড়ে অসংখ্য কেন্দ্রে কাজ করেছে যারা সাইত্রিশটি দেশ থেকে যুবকদের ১৯৮৮টি সম্মেলনে হাজির করেছে এবং আফ্রিকার বারকিনা ফাঁসোর র‍্যালীতে ১২,০০০ লোক সমবেত করেছে।

চীনা এবং সোভিয়েত যুবকরা ধর্ম দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে এবং আতঙ্কজনক কমিউনিস্ট স্কুলের চেয়ে গীর্জায় গিয়ে তারা আনন্দ পাচ্ছে। ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ হার্ভে কক্স যিনি "যিশু এবং নৈতিক জীবন" বিষয়ে সহস্রাধিক ছাত্রদেরকে পড়াতেন, তিনি ইসলাম, বৌদ্ধ, ইহুদী ধর্মের উত্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন ২৫ বছর আগে এই গতিধারা অদৃশ্য ছিল।" ধর্মসমূহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম পশ্চিমাদের কাছে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। লিখেছেন "ইসলামই একমাত্র উত্তম বিশ্ব ব্যবস্থার টেকসই দর্শন হিসেবে স্বতঃসিদ্ধ। ভাষাগত এবং অন্তর্নিহিত বিষয়ের দিক থেকে ইসলামী সাহিত্য আধুনিক যা কিনা বিংশ শতাব্দীতে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। যারা পুনরুজ্জীবনবাদীদের কলঙ্কিত করেন এবং যারা তাদেরকে মধ্যযুগ অথবা সপ্তম যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট করেন, তারা আধুনিক জীবনের সাথে ধর্মের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতাকে অনুধাবনে ব্যর্থ হন অথবা ইসলামী নীতিমালার তাৎপর্য ও বিষয়গত সাম্প্রতিক প্রকাশকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপেক্ষা করেন।'

অন্য কোন ধর্মের মধ্যে মানুষের সার্বিক জীবন বিধানের কোন ব্যবস্থা নেই এবং অন্য কোন ধর্মের সাথে মানবরচিত মতাদর্শের কোন সংঘাত নেই। Godfrey Gansen তার "Muslim and the Modern World" নামক প্রবন্ধের International Islam কলামে বলেন Today Islam and the modern weastern world confront and challenge each other. No other religion posesses such a challenge to the west. Not Christianity, which is the part of the western world and which has been eaten up from within by the acids of the modernity. Not Hinduism and Buddhiusm, because their radiation to the West and been and is on high, ethereal plane. And not Judasim, which is on small and tribal a faith. No guru, no sawmi, no lama, no rabbi, has have any impact on

www.icsbook.info

the West comparable to that exerted by the Caliph, the Mahadi, and Ayatullah."

একইভাবে তবে আরো পরিষ্কার ও শক্ত ভাষায়- Robin Wright বলেন, "Although the Islamic resurgence is still in an early stage, after two decades it is in increasingly potent force in the Middle East. Indeed, Muslim activism in politics is only one aspect of what is a worldwide phenomenon. But because of its inherent mixture of religion and polities. Islam could well become one of the world's strongest ideological forces in the late twentieth Century."

এই মন্তব্যের সাড়ে পাঁচ বছর পর Samual P. Huntington, যিনি হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং John M. Olin Institute of Strategic -এর পরিচালক, ইসলামকে সরাসরি পশ্চিমা সভ্যতার বিপরীতে, অন্য কথায় নতুন বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে দাঁড় করান। Huntington তাঁর বহুল পঠিত প্রবন্ধ "Clash of Civilization" -এ, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে, ৮টি মুখোমুখি সভ্যতাকে চিহ্নিত করেন। এই ৮টি সভ্যতার মধ্যে তিনি ৫টিকে নাকচ করে দেন। কারণ তারা বিশ্ব সভ্যতার নাট্যমঞ্চে কোন দিন অভিনেতা হতে পারবে না। বাকি তিনটির মধ্যে একটি হলো কনফুসিয়ান সভ্যতা যা কোনভাবে ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার পথে সমান্তরাল নয়। সুতরাং Huntington -এর মতে একমাত্র ইসলামই পশ্চিমা সভ্যতার মুখোমুখি অবস্থান করছে। The Economist পত্রিকা Huntington -এর বক্তব্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে লেখে- "There is a good reason why the culture of the muslim world is regarded by many people as the West's only real ideological competitor at the end of the 20 century. Unlike the Confucians and even more unlike Latin Americans, Slaves and Japanies, Islam claims to be an idea based upon a transcendental certainly. The certainly is the world of God, revealed syllable by syllable to Muhammad in a dusty corner of Arabia 1400 years ago and copied down by him into the Quran. As a means of binding a civilization together, there is no substitute for such a certainly. Moreover and this not happening anywhere else, new recruits are flocking to join this claim to certainly. Whether it is because of the repeated defeats inflicted upon Muslims by the outside world, or because of the currupt incompetence of most of their own governments, the past 25 years have a huge growth in what outsiders call Islamic fundamentalism. Muslim themselves hate the phrase, but it is not inaccurate. A large number of people, who feel ashamed of the past few centuries, want to show they can do better. To do that, they need to rediscover a sense of identity. And to do

www.icsbook.info

that, they turn back to the Quran. You can call it a revival, or a resurgence ; but it is also a return to the foundations. This is what has set scalps tingling in other parts of the world, especially among the Europeans. They see the last ideology on the march. A Muslim crescent curls threatening around the southern and eastern edges of Europe. A new Cold War could be on the way. And it may not stop at being a Cold War." Huntington -এর মতো Francis Fukuyama তাঁর "The End of History" প্রবন্ধে ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন নিম্নোক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে "In the contemporary world only Islam has offered a theocratic state as a political alternative to both liberalism and communism."

ইসলামের এই শক্তিশালী উত্থান পশ্চিমাদের মধ্যে একটি ভীতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে ইসলাম হয়েছে পশ্চিমাদের জঘন্য অপপ্রচারের শিকার। ওয়াশিংটনের 'Cato' ইনস্টিটিউটের Leon T. Hadar -নামক একজন পশ্চিমী বুদ্ধিজীবী মন্তব্য করেন যে, "From home and abroad voices have begun to conusel the Clinton administration that with communism's death. America must prepare for a new global threat, radical Islam.... In the search for new doctrines for a new world, this image of a worldwide threat from militant Islam could filter deep into the policymaking processess of the new administration.. the fear of Islam could embroil Washington in second Cold war..... like the Red Menace of the Cold war era, the green peril, green being the color of Islam is described as cancer spreading around the globe, undermining the legitimacy of western values and threatening the national security of the United States."

Leon T. Hadar -এর মন্তব্য একেবারেই কল্পনাদোষে দুষ্ট। কিন্তু কে এটা শোনে? অপপ্রচার অব্যাহত রয়েছে। তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের Moshe Dayan Centre -এর সহযোগী পরিচালক Martine Kramer -এর আরেকটি কল্পনাদুষ্ট মন্তব্য হলো, "Militant Islamic groups by nature can't be democratic, pluralistic and egalitarian." একই অভিযোগ করেন Bernard Lewis। তিনি বলেন "The nature and history of Islam and the relationship between Islam and temporal power do not make liberal democracy and Islam natural bedfellows."

www.icsbook.info

যা হোক পশ্চিমাবিশ্ব নয় বরং পশ্চিমাবিশ্বের বিশ্বব্যবস্থা চিন্তা করতে পারে যে ইসলাম তাদের প্রকৃতিগত বিপরীত পক্ষ। কারণ নতুন বিশ্বব্যবস্থার নামে বিশ্বকে একমাত্রিক করা হচ্ছে যা মূলত ধর্ম এবং ক্ষুদ্র, দুর্বল ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের জাতীয় সার্বভৌমত্বের স্বার্থবিরোধী, যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা এ কারণেই ইসলামের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে।

মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম যুবক

নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে মুসলিম যুবকরা এখন এক অসহায় অবস্থায়। তাদের জাতি-রাষ্ট্রসমূহ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার হোতা পশ্চিমাদের হাতের পুতুল। কেউ যদি ফিরে তাকায় তবে সে দেখতে পাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ ছিল। তারা ঔপনিবেশিকতার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছিল। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম যুবকরা প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু তাদের সংগ্রাম রাষ্ট্রের পত্তন করলেও ইসলাম ও মুসলমানরা সত্যিকার স্বাধীনতা পায়নি। রাষ্ট্র তার নিজস্ব সরকার গঠনের স্বাধীনতা পেলেও রাষ্ট্রের সকল পরিকল্পনা, নীতি-প্রণয়ন এবং জীবন-যাপন ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলেই বাঁধা রয়ে যায়। সুতরাং স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায় স্বাধীনতার পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন, "সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের বিজয়ের প্রভাব তীব্রতর হয়েছে তাদের চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাছে আমাদের শোচনীয় আত্মসমর্পণের পর। তাদের জীবন-দর্শন তাদের অস্ত্রের চেয়ে জোরালো হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের অদৃশ্য রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আমাদেরকে শিকলবন্দী করেছে। সংস্কৃতি এবং আদর্শের প্রলোভন আমাদের হৃদয়-আত্মাকে দখল করে নিয়েছে। যার ফলে মুসলমানেরা ঐ ধরণের ধারণা দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, যার সাথে তারা আগে পরিচিতও ছিল না।"

স্বাধীনতার পরবর্তী এই মহাদুর্যোগ ছিল অধিকাংশ মুসলিম দেশের শাসক শ্রেণীর বেদনাদায়ক ভূমিকার ফল। শাসকরা ছিল ঔপনিবেশিক চিন্তা-ধারা এবং সংস্কৃতির ফসল এবং প্রভুরা তাদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তরেই খুশী ছিল। তাদের কাছে এখনকার পশ্চিমাদের নতুন বিশ্বব্যবস্থা কোন উদ্বেগের বিষয় নয়। তারা বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের দেখিয়ে দেওয়া মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে গলধকরণ করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে জাতিসংঘ এবং পশ্চিমা সাহায্য সংস্থার হুকুম তামিল করছে। তারা সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের চিন্তা-চেতনা বাদ দিয়ে প্রাণঘাতী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন কায়রোতে, কোপেনহেগেনে এবং বেইজিং-এ।

কিন্তু মুসলিম যুবকদের ব্যাপারটা তাদের শাসকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকের যুবকরা তাদেরই উত্তরাধিকারী যারা নিঃস্বার্থভাবে স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে। তারা সর্বোচ্চ উৎসর্গের উত্তরাধিকারী, পশ্চিমাদের মগজ ধোলাই করা পুতুল

www.icsbook.info

তারা নয়। তারা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে, যা তাদের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতিকে স্বাধীন করবে এবং সর্বোপরি তারা ইসলামকে দেখতে চায় বিজয়ী আর্দশ হিসেবে। তারা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার চাপিয়ে দেয়া বিপদ সম্বন্ধে বেশি সচেতন।

মুসলিম যুবকের পুনর্জাগরণ

বিশ্বজুড়ে ইসলামী পুনর্জাগরণ এখন এক শক্তিশালী প্রবাহ। পশ্চিমের অনেক বিশ্লেষক ইসলামী পুনর্জাগরণকে ইরানের বিপ্লবের সাথে সংযোগ করতে চায়। তারা ইতিহাস বিকৃত করে। মোতামার আল-আলম আল-ইসলামী ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত প্যান ইসলামী প্রতিষ্ঠান। যা বিশ শতকে মুসলিম জাগরণের বিশ্বভিত্তিক প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। যার সম্পর্কে এইচ. এ. আর. গিবন লিখেছেন ঃ "মুসলিম সমাজের অবকাঠামোতে একটা নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এটা যার সাথে এই প্রথম নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলিমরা একটি লক্ষ্য নিয়ে শামিল হয়েছে। তারাই মুসলিম দেশগুলোর জনসাধারণের প্রকৃত মতামত উপস্থাপন করেছে এবং তাদের অভিমতকে আরও বেশি মাত্রায় প্রভাবিত করতে সামর্থ্য হয়েছে।"

আরও একটি ইসলামী বেসরকারী সংগঠন, রাবেতা আল-আলম আল ইসলামী ১৯৬২ সালে মক্কায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে আরব ও মুসলিম বিশ্বে কমিউনিজম ও সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দাঁড় করানোর উপায় বা পন্থা বের করার জন্য। আবার ১৯৬৯ সালে ইরান বিপ্লবের দশ বছর আগে ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয় যা ছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মুসলমানদের ঐতিহাসিক পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার শক্তিমান প্রতীক। আবার ১৯৭২ সালে শক্তিশালী যুব-প্রতিষ্ঠান হিসেবে রিয়াদে ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলী অফ মুসলিম ইয়ুথ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ১৯৬২ থেকে ১৯৭২ এই দশ বছর জাগরণমূলক অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক সময়। এসব প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রেও পুনর্জাগরণ বিরাট আকার ধারণ করে। "পশ্চিমা রাষ্ট্র-দর্শনের ব্যর্থতা এবং ইসলামকে কমিউনিস্ট এবং পশ্চিমা ধাঁচে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা এই পুনর্জাগরণকে রাজনৈতিকভাবে আরও উচ্চকিত করে," বলেছেন ইসলাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মার্কিন অধ্যাপক জন এস. পোসিটো। তিনি আরও লিখেছেন, "ইসলামের পুনর্জাগরণে এই উত্থান অবশ্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্নরূপ নিয়েছে। ব্যক্তিপর্যায় এবং সামাজিক ক্ষেত্রের এই জাগরণ রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় সরকারকে মারাত্মাকভাবে প্রভাবিত করেছে যা রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্বকে ইসলামের জন্য কিছু করাতে বাধ্য করছে যা কিনা পুনর্জাগরণকে আরও শক্তিশালী করছে।" এর ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে জন এসপসিটো আরও লিখেছেন "রাজনীতিতে ইসলামের স্বীকৃতির জন্য ইসলামী এই পুনর্জাগরণ ভূমিকা রেখেছে। নীতি এবং কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বৈধতা এবং জনসমর্থন লাভের জন্য সরকার-প্রার্থীরা ইসলামের প্রতি অনুরক্ত থাকছে। প্রতিষ্ঠিত সরকারের সমালোচনার জন্য বিরোধীরা ইসলামের ভাষা

www.icsbook.info

এবং প্রতীক ব্যবহার করছে এবং সামাজিক রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবল বৈপ্লবিক কার্য সম্পাদনের পক্ষে কথা বলছে। এই পুনর্জাগরণ ছিল সেসব যুবকদের বিস্ময়কর কাজ যারা নিজেদের পরিচয়ের সংকটে ভুগছিল। যেসব ছাত্ররা পশ্চিমা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত, ইউরোপীয় জীবনযাত্রাকে গ্রহণ করতে পছন্দ করত, তার মানসিক সংঘাতের শিকার হয়েছিল। কারণ তারা তাদের বর্ণ এবং ঐতিহ্য পরিবর্তন করতে পারেনি এবং সম্ভবত মুসলিম পরিচয়কে পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি।"

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ইসলামী জাগরণ এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৭২ সময়ের রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী, ওআইসি এবং ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অফ মুসলিম ইয়ুথ -এর প্রতিষ্ঠা মুসলিম যুবকদের জাগিয়েছে, তাদের পরিচিতির সংকটকে দূর করেছে এবং বহুজনকে ইসলামে ফিরিয়ে এনেছে। মুসলিম যুবকদের মধ্যে সংঘটিত এই বিপ্লব ইসলামের শত্রুদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছে।

'জাফে সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ, তেলআবিব' -এর অধ্যাপক হেইম সেকেড মন্তব্য করেছেন- "এই ঘটনা মুসলমানদেরকে বিশেষ করে যুবকদেরকে তাদের সমস্যার সমাধান ইসলাম থেকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে। ২০ বছর আগেও মসজিদগুলো শুক্রবারের নামাজের জন্য ব্যবহার হতো। এখন মসজিদগুলো পরিপূর্ণ বিশেষ করে যুবকদের দ্বারা। জাতীয়তাবাদ এবং আরবব্যবাদীর বইসমূহের বিক্রি কমে যাচ্ছে এবং সেখানে ইসলাম সম্পর্কিত বইয়ের বিক্রি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মুসলমানরা শক্ত ভিত্তি পেয়ে যাচ্ছে। .... ইসলাম এবং মুসলিম সৈনিকদের পরাজয়ের পর পরিস্থিতি এখন চরম নাজুক। এই পরাজয় এবং পরাজয়ের দীর্ঘ তালিকার নিকট অতীত থেকে মুসলমানেরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা তাদেরকে বিকল্প খোঁজার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে।"

মুসলিম যুবকদের পুনর্জাগরণে ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অফ মুসলিম ইয়ুথের ভূমিকা এক মূল্যবান সংযোজন হিসেবে কাজ করছে। "সঠিক পথ থেকে যুবকদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য শত্রুদের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আন্তরিকতা আর অনঢ় মনোভাবাসম্পন্ন মুসলিম উম্মাহর তরুণরা ইসলামী রেনেসাঁর ভিত্তি, শক্তির উৎস, চিন্তা-চেতনার ধারক এবং মহান আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহক হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারেন"-এই ধারণা নিয়ে এবং বাস্তবে তাকে রূপ দেওয়ার জন্য ওয়ামী নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহের আলোকে তার কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্যে সচেষ্ট রয়েছে ঃ

পাঁচটি উপমহাদেশের যুবক, ছাত্রসংগঠনের কার্যক্রমকে নির্দেশনা ও পরিচালনা করা।

ইসলামী সংগঠনসমূহের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সাহায্যের যোগান দেওয়া।

www.icsbook.info

ইসলামী সংগঠনসমূহের মধ্যে অন্তত ন্যূনতম হৃদ্যতা এবং সহযোগিতা অর্জনের জন্য অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করা।

কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ রূপরেখা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা।

মুসলিম উম্মাহের মধ্যে লক্ষ্যের ভারসাম্য এবং প্রজ্ঞার উন্নয়ন ঘটানো।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ সামনে রেখে ওয়ামী এক তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে এবং একশ'র মতো ইসলামী যুব সংগঠনকে তার সদস্য হিসেবে সক্রিয় করতে পেরেছে। যুবকদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সঙ্গে দাওয়াতী এবং ইসলামী কার্যক্রমে ইসলামী নেতৃত্বের যোগান এবং যথাযথ সমন্বয় করা। ওয়ামী সব সময়ই নেতৃত্ব তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে এবং এ ধরনের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঈমানের পরিশুদ্ধির জন্য, ভ্রাতৃত্ববোধ গভীর করার জন্য, ইসলামী জাগরণকে পরিচালনার জন্য এবং যুবকদের সমস্যা এবং সংকটকে মুকাবিলা করার জন্য ওয়ামী স্থায়ী এবং অস্থায়ী, আন্তর্জাতিকভাবে, আঞ্চলিক এবং স্থানীয়ভাবে যুব ও ছাত্রদের জন্য ক্যাম্পের ব্যবস্থা করছে। এখন পর্যন্ত ওয়ামী ৮ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন করেছে। এছাড়াও ওয়ামী মুদ্রণ, বিতরণ, সুপারিশকরণ এবং ইসলামী পুস্তক অনুবাদের ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিচ্ছে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের ঐতিহাসিক মুসলিম জাগরণ অসংখ্য দাওয়াতী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে যা মুসলিম যুব সমাজকে শতাব্দীর গভীর তন্দ্রা থেকে জাগ্রত করেছে। এখন এই অভিন্ন সচেতন মুসলিম যুবসমাজ ইসলামের ভিত্তিতে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সামনে অগ্রসরমান এবং তাই এখন চলমান দুই ব্যবস্থার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে গেছে। একটি পশ্চিমাদের নতুন বিশ্বব্যবস্থা, আরেকটি পুনঃউদ্বুদ্ধ ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা।

মুসলিম যুব সমাজ ও তাদের কার্যক্রম

আজকের মুসলিম যুবকরা মুসলিম উম্মাহর আগামীদিনের নেতা। এরা তারাই যাদেরকে মুসলিম উম্মাহর প্রতি পশ্চিমাদের ছুঁড়ে দেওয়া নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রচণ্ড আক্রমণকে মুকাবিলা করতে হবে।

অধিকাংশ মুসলিম যুবককে আসন্ন এই বিপদে মুকাবিলার ক্ষেত্রে অসেচতন দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমাদের সাথে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জনসচেতনতা সব দিক থেকে মুসলিম যুবসমাজের পুনর্জাগরণটা রয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে। কিন্তু পরিস্থিতি তাদের এই অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদেরকে এক অসময়োচিত এবং অসম সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই দুর্যোগ অতিক্রম করে জয়ী হওয়ার জন্য মুসলমানদের উচিত প্রত্যেকে নিজেদের তৈরি করা।

www.icsbook.info

নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে ঃ

মুসলিম যুবকদেরকে জাতীয় ও ধর্মীয় ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মুসলিম যুবকদের দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাসর তার পরামর্শ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলিম যুবকদেরকে বিশেষভাবে কুরআন, হাদিস, সুন্নাহ এবং রাসূল (স) সীরাত জানতে হবে এবং এরপর ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ঐতিহ্য এবং ইসলামী সভ্যতার প্রকৃতরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার আলোকে যুবকদেরকে তাদের চারপাশের সকল সংকটপূর্ণ অবস্থাকে মুকাবিলা করার জন্য যোগ্য হতে হবে সময়ের প্রয়োজন মেটানোর মত করে।"

অধ্যাপক নাসরের দেওয়া উপরোক্ত পরামর্শ মুসলিম যুব সমাজের জাতিগত প্রতিরক্ষার জন্য। এই প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম যুবকদের তথ্য ও তত্ত্ব-জ্ঞানের জগত স্বাধীন ও সম্প্রসারণশীল ভূমিকা প্রয়োজন, সফল প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার জন্য। "জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি" এই সত্য বর্তমান যুগে ইতিহাসের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি প্রযোজ্য। গত স্নায়ুযুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ভূমিকা ছিল, কিন্তু অবশেষে বুদ্ধি ও কৌশলের জোরেই আমেরিকার জয় হয়েছিল।

আজকের বিশ্বব্যবস্থার যুদ্ধ পরিষ্কারভাবেই একটি বুদ্ধিভিত্তিক যুদ্ধ এবং জ্ঞানের শক্তিই হবে এ যুদ্ধে বিজয়ী নির্ণয়ের প্রধান উপাদান। যুদ্ধজয়ের হার্ড পাওয়ার (সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি) ও সফট পাওয়ার (তথ্য ও প্রচারণা) দুইয়ের প্রয়োজন। কিন্তু আজকের সচেতন বিশ্বে সফট পাওয়ার ছাড়া হার্ড পাওয়ার অচল। সুতরাং মুসলিম যুবকদেরকে সকল শাখার জ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান যুগ প্রত্যাশা করে মুসলিম যুবকদের মাঝ থেকে তৈরি হবে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, মুসলিম বিশ্লেষক, মুসলিম ঐতিহাসিক, মুসলিম শল্যচিকিৎসক এবং একজন মুসলিম শিল্পী।

পশ্চিমাদের নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার মুকাবিলার জন্য মুসলিম যুবকদের চারটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথম: আদর্শ, দ্বিতীয়: ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন, তৃতীয়: আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগের ব্যাপারে যুবকদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ, এবং সর্বশেষ হচ্ছে জ্ঞানের শক্তি। চারটির মধ্যে মুসলিম যুবকদের হাতে যে আদর্শ আছে তা দুনিয়াতে অনন্য।

আজ সারা দুনিয়া জুড়ে ইসলামী পুনর্জাগরণের কাজ করার জন্য সংগঠন আছে যা গত শতাব্দীর আগে ছিল অকল্পনীয়। ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলনে মুসলিম যুবকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের ত্যাগ ও কুরবানীও ক্রমবর্ধমান।

এসবের সাথে জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া বাকি আছে মুসলিম যুবকদের। হার্ড পাওয়ার ও সফট পাওয়ার দুইয়ের জন্যই জ্ঞানের শক্তি প্রয়োজন। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে সফট পাওয়ার (তথ্য ও প্রচারের শক্তি) এই সময়ের জন্য প্রধান অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। প্রচার শক্তির অভাবে আমরা সত্যকেই সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে

www.icsbook.info

পারছিনা। অথচ অন্যরা মিথ্যাকে প্রচারের শক্তিতে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করছে। প্রচার যেটুকু আমাদের আছে, তা জাতীয় লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ না হওয়া ও বিশ্বমানের না হওয়ার কারণে কোন কাজে লাগছে না।

বার্ষিক ১ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় প্রকাশিত হাজারো বার্ষিকী, পত্র-পত্রিকা, এবং শত শত টেলিভিশন এবং রেডিও স্টেশনের অধিপতি মুসলমানেরা ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এবং এমন কি যুক্তরাষ্ট্রেও মুসলমানরা প্রায় ৪ মিলিয়ন বার্ষিক ব্যয়ে ২৫০টির বেশি বার্ষিকী এবং সংবাদপত্র বের করে এবং ১৫টিরও বেশি টেলিভিশন এবং রেডিও শো চালায়।" কিন্তু মুসলিম এবং অমুসলিম সমাজে কি ভূমিকা আর কি প্রভাব এগুলো রাখতে পেরেছে? উত্তরটা বেদনাদায়ক। সংখ্যার দিক থেকে গুণগত, মানগত এবং জনগণের কাছে পৌঁছানোর দিক থেকে পশ্চিমাদের চেয়ে মুসলমানদের উদ্যোগ হাজারো গুণ পেছনে এবং আন্তরিকতা ও 'ইসলামের কারণেই প্রচার' এই অর্থের থেকেও মুসলমানদের অধিকাংশ উদ্যোগই মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অভাব পূরণ করতে পারেনি।

মুসলিম যুবকদের যাদের ওপর মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরকে এই অভাব পূরণে এগিয়ে আসতে হবে। মুসলিম উম্মাহর প্রত্যাশা যে, বর্তমান প্রজন্মের মুসলিম যুবকদের মধ্য থেকে পৃথিবী বিখ্যাত লেখক, সাংবাদিক, কলাম-লেখক, বিশ্লেষক এবং রেডিও টিভি পারফরমার বের হয়ে আসবে। এটা আমাদের যুবকদের জন্য কর্মসূচি। তাদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থারও কর্মসূচি।

MWLJ, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ১৯৯৯, সখ্যায় প্রকাশিত।

তথ্যসূত্র :

1. U. S. President Bill Clinton's Speech to United Nations, September 27, 1993.
2. Naisbitt, John & Aburden, Patricia, *'Religious Revival of the Third Millennium, Megatrend 2000'*. Avon Book, New York Page 290, 29.
3. Haddad, Yvonne H., '*Islamic Awakening in Egypt*,ASQ Vol 9, Number 3, Page 255.
4. Gansen, Godfrey, '*Moslem and the Modern World.*' The Economist, January 3, 1981.
5. Wright, Rabin, '*The Islamic Resurgence: A New Phase"?*. Current History, February, 1988, Page 86.
6. 'Islam and the West', *The Economist*, August 6, 1994, Cover Story Section, Page 4, 5.

www.icsbook.info

7. Fukuyama, Francis.'The End of History', *The National Interest, Summer, 1989,* Page 14.
8. Hadar, Leon T., 'What Green Peril, Foreign Affairs, Spring 1993.
9. Miller, Judith, 'The Challenge of Radical Islam' , *Foreign Affairs*, Spring 1993.
10. *Ibid.*
11. Maududi, Abul A'la, 'The Movement for the Unity of the Muslim States', *Muslim News* International (A Monthly Journal from Karachi), January, 1967.
12. Gibb, H. A. R. '*Islamic Congress'*, Page 101.
13. Esposito, John L., 'Islamic Revivalism', *The Muslim World Today*, Occasional Paper No. 3, American Institute for Islamic Affairs.
14. *Ibid.*
15. Ahsan, Abdullahil, 'Muslim Society in Crisis: A Case Study of the Organization of Islamic Conference (A Doctoral Thesis, The University of Michigan, 1985), Page 42.
16. Professor Haim Shaked's address to a Seminar on Islam, Israel and the West', held in Montreal, Canada, on March, 1991 (Published in '*The Crescent*', Canada).
17. Seyyed Hossein Nasr, Professor of Islamic Studies, George Washington University, quoted in '*Islamic Future*', (A Monthly publication of WAMY) Vol. X1 1, No. 60. September, 1996.
18. Bagdikian, Ben H. 'The Lords of the Global Village', *The Nation, June 12, 1987.*
19. Abdullah, Aslam, 'Muslim Media: Chalenges and Responsibilities', Islam : A Contemporary Perspective, Page 93.
20. Diamond, Larry, 'The Global Imperative: Building a Democratic World Order', *Current History, January* 1994.
21. Cuming, Burce, 'Trilateralism and the New World Order', *World Policy Journal, Spring* 1991.
22. President Clinton's annual State of the Union Addres to a joint session of Congress on Feb. 4 1997 (USIA *Electronic Journal*, Vol. 2, Number-1, March 1997)

www.icsbook.info

23. Gordenker, Leon 'International Organizations in the New World Order', *The Fletcher Forum*, 1991.
24. Mead, Walter Russel, 'The Bush Administration and the New World Order', *World Policy Journal*, Summer, 1991.
25. Larsen, P. Alan, 'U. S. Commercial Diplomacy: The Challenge of the 21st Century', *USIS Official Text*, February 23, 1997.
26. Winkler, Mary Packard, 'Putting the Culture Back in Development', *The Fletcher Forum*, Summer 1989.
27. Thomas F. De Gregori and Oriol Pisunyer, '*Economic Development: The Cultural Context*', John Willy & Sons, New York. 1969.
28. O'Manique, John, 'Universal and Inalienabe Right : A Search for Foundation', *Human Rights Quarterly*,No. 12, 1990.
29. Roberts, Brad, 'Democracy And World Order', *The Fletcher Forum*, Summer, 1991.
30. Ghali, Boutros Boutros, 'Global Prospects for United Nations', Assen Politik, *German Foreign Affairs Review*, Hambur, Second Quarter, 95.
31. Shoop, Tom 'Shrinking Government: Going Going Gone', *Government Executive* ,June 1995, Page 6.
32. Raberts Brad, 'Democracy and World Order', *The Fletcher Forum*, Summer, 1991, page 22, 23.
33. Holmes, Kim R., 'New World Disorder', Journal of International Affairs, Winter 1993.
34. Gerlach, Jeffrey R., 'A UN army for the New World Order' ORBIS, Vol, 37, No. 2. Sping 1993 page 323, 324, 325.
35. U. N. Security Council Annual Summit Declaration, 31 January, 1993, page 15.

www.icsbook.info

বলা হয় কবি কালিদাস নাকি যে ডালে বসেছিলেন সেই ডালের গোড়া কাটার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় এক সময় দিয়েছিলেন। কথাটা কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা তা জানি না, কিন্তু শুনে আসছি সেই ছোট বেলা থেকেই। সম্ভবত বিষয়টা শিক্ষামূলক বলেই। যে ডালে বসা সেই ডালের গোড়া কাটা যে উচিত নয়, এই কথাই এর মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। এ শিক্ষাটা আমাদের জাতীয় জাদুঘরের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব ডঃ এনামুল হক সম্ভবত পাননি। পাননি যে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল দরিরামপুরে নজরুলের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তার দেয়া বক্তৃতা থেকে। তিনি তাঁর এ বক্তৃতায় অত্যন্ত গর্ব ভরে ঘোষণা করেছেন 'নজরুল দ্বিজাতিতত্ত্ব স্বীকার করেননি তা যেন ভুলে না যাই।' এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন তিনিও দ্বিজাতিতত্ত্ব অস্বীকারকারীদের মহৎ মিছিলে শামিল যদি তাঁর কথা আমার বুঝতে ভুল না হয়ে থাকে। মনে হয় তিনি তাঁর এ মহৎ মিছিলে নজরুল ইসলামকে শামিল করতে পেরে ভীষণ খুশী হয়েছেন বলেই নজরুল জয়ন্তীতে তা অমন করে ঘোষণা করেছেন।

নজরুল দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না- এ কথা নজরুল কবে ঘোষণা করলেন, জাদুঘরের বিজ্ঞ মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হকের কাছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য আছে কিনা তা আমরা জানি না। তিনি তা প্রকাশ করেননি। কিন্তু নজরুল সম্পর্কে যা প্রকাশিত আছে তা ডঃ এনামুল হক সাহেব যা বলেছেন তার বিপরীত নিঃসন্দেহে। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এক সময় হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত বলা হতো। কিন্তু সেই অগ্রদূতই পরবর্তীকালে ভারতের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের জনকে পরিণত হলেন। নজরুলও তাঁর সাহিত্যে অনেক সময় হিন্দু-মুসলিম মিলনের গান গেয়েছেন, কিন্তু তাই বলে কি তার জাতিত্ব বা মুসলমানিত্ব তিনি ত্যাগ করেছিলেন? ত্যাগ করেছিলেন এমন কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায়নি, কেউ তেমন প্রমাণ কখনও দেননি। বরং উল্টো প্রমাণই পাওয়া গেছে এবং সে প্রমাণ দিয়েছেন স্বয়ং নজরুল ইসলামই। তিনি তাঁর আত্মপরিচয় সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"আল্লাহ আমার প্রভু, রসুলের আমি উম্মত, আল-কুরআন আমার পথ-প্রদর্শক। এছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই, শাফায়াতদাতা নাই, মুর্শিদ নাই। আমার আল্লাহ 'আল ফাজলিল আজিম' -পরম দাতা। তিনিই আমাকে জাতির কাছ থেকে, কৌমের কাছ থেকে, কোন দান নিতে দেননি। যে দক্ষিণ হাত তুলে কেবল তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেছি তার দাক্ষিণ্য ছাড়া কারুর দানে সে হাত কলংকিত হয়নি। আজ তিনিই এই পথভ্রষ্ট,

www.icsbook.info

অন্ধ, আশ্রয়-ভিক্ষুককে হাত ধরে একমাত্র তাঁর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার ক্ষমা সুন্দর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমা পেয়েছি, সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি, তাঁর বান্দা হবার অধিকার পেয়েছি। আমার আজ আর কোন অভাব নাই, চাওয়া নাই, পাওয়া নাই। আমার কবিতা আমার শক্তি নয়, আল্লাহর দেওয়া শক্তি-আমি উপলক্ষ মাত্র। বাঁশীর বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে গুণী সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আমার কবিতা যারা পড়েছেন, তারাই সাক্ষীঃ আমি মুসলিমকে সংঘবদ্ধ করার জন্য তাদের জড়ত্ব, আলস্য, কর্ম-বিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাংলার মুসলমানকে শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য -যে শির এক আল্লাহ ছাড়া কোন সম্রাটের কাছেও নত হয়নি-আল্লাহ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন- তাই দিয়ে বলেছি, লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা করেছি। আমার কাব্য শক্তিকে তথাকথিত 'খর্ব' করেও গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামী গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের ঈমান অটুট রাখারই চেষ্টা করেছি। আমি এর প্রতিদানে সমাজের কাছে, জাতির কাছে কিছু চাইনি। এ আমার আল্লাহর হুকুম, আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র। আজও আমি একমাত্র তাঁরই হুকুমবর্দ্দার রূপে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছি- আমার দীর্ঘদিনের গোপন তীর্থ যাত্রার পর।"

কবি নজরুলের আত্মপরিচয়ের এ ঘোষণা ছেপেছিল সেই সময়ের তুখোড় সমালোচক পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি' তার ১৯৩৭ সালের মার্চ সংখ্যায়। নজরুলের আত্মপরিচয় সম্পর্কে নজরুলের এ বলিষ্ঠ ঘোষণা দেখে হিন্দু পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি' আঁৎকে উঠে মন্তব্য করেছিল, "জ্ঞান হইল যে তিনি আসলে ৫৬% (অর্থাৎ মুসলমান দলে)। এতখানি ভাবিতে পারি নাই। বড় আঘাত পাইয়াছি।" 'শনিবারের চিঠি'র মত হিন্দু সমাজ সকলেই হয়তো আঘাত পেয়েছিলেন নজরুলের সুস্পষ্ট আত্ম-বিবৃতিতে। কিন্তু নির্ভীক নজরুল কারও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করেননি।

জিজ্ঞাসা করি জাতীয় জাদুঘরের সম্মানিত মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হক সাহেবকে, নজরুলের এই আত্মপরিচয় পাঠ করে এখনও কি তাঁর কাছে অস্পষ্ট আছে যে, নজরুল কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত? 'শনিবারের চিঠি'র দাদা বাবুদের মত নজরুলের এই পরিচয় পেয়ে তিনি হয়তো 'বড় আঘাত পাইয়াছি' বলবেন, কিন্তু কি করা যাবে নজরুলের ঐ কথাগুলো মুছে ফেলে তো আমরা লিখে দিতে পারি না নজরুল জাতি-পরিচয় গোপনকারী কোন কাপুরুষ ছিলেন কিংবা তিনি ছিলেন হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত।

নজরুলের এ আত্ম-পরিচয় এ পাবার পর আর বলার অবকাশ থাকে না যে, তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। হয়তো বলা হতে পারে মওলানা আযাদ বিশ্বাসে একজন মুসলমান হয়েও অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন, অতএব নজরুল মনে -প্রাণে মুসলমান হয়েও দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। এনামুল হক সাহেবের দুর্ভাগ্য যে,

www.icsbook.info

এ যুক্তিও ধোপে টিকছে না। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ নিবন্ধে নজরুল এ বিষয়েও মনের কথা সাফ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"আমি আজ জিজ্ঞাসা করি, আমি লীগের মেম্বার নই বলে কি কোন লীগ কর্মীর নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি? মুসলমানের জন্য আমার দান কোন নেতার চেয়ে কম নয়, যে সব মুসলমান যুবক আজ নব জীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের সাহায্য করছে- তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা ঝুলি থেকে। লীগের আন্দোলন যেরূপ 'গদাই-লস্করী' চালে চলছিল, তাতে আমি আমার অন্তরে কোন বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি। হঠাৎ লীগ নেতা কায়েদে আযম যেদিন 'পাকিস্তানে'র কথা তুলে হুংকার দিয়ে উঠলেন 'আমরা বৃটিশ ও হিন্দু দুই ফ্রন্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব' -সেদিন আমি উল্লাসে চিৎকার করে বলেছিলাম হাঁ, এতদিনে একজন 'সিপাহসালার' -সেনাপতি এলেন। আমার তেজের তলোয়ার তখন ঝলমল করে উঠল।"

জাতির স্বাধীনতার জন্যে নজরুলের তেজের তলোয়ার ১৯৩৭ সালে ঝলমলিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু ১৯৪৭ সালে জাতির স্বরাজের শুভ সময় যখন এল, তখন ভয়ানকভাবে অসুস্থ নজরুল নীরব-নির্বাক-কর্মের জগৎ থেকে তিনি তখন অনেক দূরে। কিন্তু তাই বলে কি কবির উপর এ অভিযোগ আনা যাবে যে তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধী ছিলেন একথা তা বলা যায় না। বললে সেটা হবে কবির প্রতি অবিচার, তাঁর জাতিসত্তার প্রতি অমর্যাদা। জাতীয় জাদুঘরের পরিচালক ডঃ এনামুল হক কবির প্রতি এ অবিচার ও অমর্যাদাই করেছেন। এর দ্বারা তিনি শুধু নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানকেই কলংকিত করেননি, তিনি যে সরকারী পদে অবস্থান করছেন, সে পদকেও কলংকিত করেছেন। আমি সরকারের কাছে দাবী করছি, কবি নজরুল দ্বিজাতিতত্ত্ব অর্থাৎ মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন বলে ডঃ এনামুল হক যে কথা বলেছেন, তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণের জন্যে তার কাছ থেকে চাওয়া হোক যে, ১৯৩৭ সালের মার্চের পর কখন কোথায় নজরুল এমন কথা বলেছেন এবং তা জনসাধারণের অবগতির জন্যে প্রকাশ করা হোক। সুস্পষ্ট প্রমাণ হাযির করতে না পারলে মিথ্যাচারের জন্যে তাকে অভিযুক্ত ও সরকারী দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হোক।

এরপর জনাব ডঃ এনামুল হকের দৃষ্টিভংগি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলব। শুরুতেই বলেছি, নজরুলকে দ্বিজাতিতত্ত্ব বিরোধী বলে প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর যে উৎসাহ তাতে প্রমাণ হয়েছে তিনি দ্বিজাতিতত্ত্ব বিরোধী। বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে এ দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে এ দেশের মুসলিম জাতীয় জীবনের জন্যে 'ডালে বসে সেই ডালের গোড়া কাটা' অর্থাৎ জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ করার শামিল। আমরা কে না জানি, স্বাধীন বাংলাদেশের যে সীমান্ত তা দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর

www.icsbook.info

দাঁড়িয়ে আছে। সীমান্তের ওপারের ভারত-অংশের সাথে এপারের বাংলাদেশের এমন ভূখণ্ডগত কোন পার্থক্য নেই কিংবা ভাষাগতও এমন পৃথক বৈশিষ্ট্য নেই যার কারণে সীমান্ত টিকে থাকা এবং বাংলাদেশ স্বতন্ত্র স্বাধীন একটা রাষ্ট্র হবার যুক্তি আছে। যুক্তি একটাই সেটা হলো মুসলিম জাতিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে গঠিত বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ। যতদিন এ যুক্তির উপর আমরা দাঁড়িয়ে থাকব, ততদিন এ স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত থাকবে। সরকারী একজন দায়িত্বশীল ডঃ এনামুল হক সোল্লাসে দ্বিজাতিতত্ত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতার এ ভিত্তিতেই আঘাত হেনেছেন।

দুঃখের সাথেই আমাদের বলতে হচ্ছে, জনাব ডঃ এনামুল হকের এ বিশ্বাস, এ উক্তি, এ ঘোষণা দিল্লীর আগ্রাসী মানসিকতার প্রতিধ্বনি দিল্লী দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করছে শুরু থেকেই। ভারতের হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি এবং ভারতের সাহিত্য-ইতিহাসে এ কথা হাজারোভাবে বিধৃত। ভারতীয় হিন্দুরা দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধী কারণ তারা এক জাতি তত্ত্বের ফাঁদে ফেলে গোটা ভারতকে কুক্ষিগত করতে চায়। তারা দ্রাবিড়, শক, হুন, বৌদ্ধদেরকে যেভাবে গ্রাস করেছে, সেভাবে মুসলমানদেরকেও গ্রাস করতে চায়। দিল্লীর দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতার এ মর্মকথা আমরা বুঝি, তাদের এ স্বরূপ আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের একজন সরকারী ব্যক্তির কণ্ঠে দিল্লীর আগ্রাসী চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনছি কেন? তাহলে দিল্লীর মত ডঃ এনামুল হকও কি চান আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সীমান্ত উঠে যাক, আমাদের স্বাধীনতার অবলুপ্তি ঘটুক এবং মুসলমানরা দিল্লীর আগ্রাসী থাবার শিকারে পরিণত হয়ে শেষ হয়ে যাক? এ না চাইলে কি করে একজন শিক্ষিত, সজ্ঞান মানুষ আমাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের বুনিয়াদের ওপর এমন আঘাত হানতে পারেন?

প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবার দায়িত্ব সরকারের। ভাবার দায়িত্ব সরকারের আরও এই কারণে বেশী যে, জনাব এনামুল হক শুধু জাদুঘরের পরিচালক নন, তিনি আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিবও। দেশের জনগণ কেউই চাইবে না সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে কোন দুষ্কৃতি আড্ডা গেড়ে বসার সুযোগ পাক।

আমরা সম্মানিত জনাব ডঃ এনামুল হককেও ভাবার জন্যে অনুরোধ করি। নিজের ভাবনা, নিজের জানাটাই সব কথা নয়, বিশেষ করে দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে। এখানে দেশ ও জাতির স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ চিন্তাই অগ্রাধিকার পাবে। যে ডালে বসা সে ডালের গোড়া কাটার কাজ অন্তত জাতির ক্ষেত্রে চলে না, কেউ চলতে দেয় না।

২৯-০৫-১৯৯০

www.icsbook.info

বিভিন্ন প্রশ্নে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দলে দলে মতবিরোধ, মতভেদ এবং সংঘাত সংঘর্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তর্কাতীত জাতীয় প্রশ্নে এক ঐতিহ্যবাহী জাতির বিভক্ত মত, যা দেশের জনগণকেও বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করে, মোটেই স্বাভাবিক ছিলো না। স্বাধীনতার পর আজ এ মৌল প্রশ্নে আবার জাতি এক ও অখণ্ড। কিন্তু সে সময়ের বিভক্তি, পরস্পরের বৈরিতা ইতিহাসের এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি সেদিন সৃষ্টি হলো কেন? কে কিংবা কারা ছিলো এ বিভক্তির জন্যে দায়ী? অথবা কি সেই ঘটনাবলি যা সৃষ্টি করেছিলো এ জাতীয় দুর্ঘটনার? উভয় পক্ষের সেদিনের কাজ ও মানসিকতার মধ্যেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে নিসন্দেহে।

প্রথমে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিচালনা পক্ষের কথাই ধরা যাক। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের গোটা সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বিরাজ করেছে। তারপর স্বাধীনতা যুদ্ধকালেও তারই একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু যা জাতীয় মত বিভক্তি রোধ করতে পারতো, পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সে ধরনের সুস্পষ্টতা আওয়ামী লীগের ছিলো না এবং দল মত নির্বিশেষে সবাইকে কাছে টানার ও জাতীয় সমঝোতা সৃষ্টির সে ধরণের উদ্যোগ আওয়ামী লীগের তরফ থেকে নেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগের এ ব্যর্থতাকে নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরা যায় ঃ

(ক) ১৯৭১-এর ১লা মার্চের পর আন্দোলন নতুন মোড় নিলো। এর আগে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো। কিন্তু ১লা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করলে আওয়ামী লীগ তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠলো। প্রবল চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে এর মুকাবিলার জন্যে আওয়ামী লীগ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলো। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলন স্বাধীনতার শ্লোগান তুললো। অসহযোগ আন্দোলন ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠলো। প্রেসিডেন্ট হাউজ এবং ক্যান্টনমেন্টগুলো ছাড়া গোটা দেশ আওয়ামী লীগের হাতে এলো। এভাবেই এলো পঁচিশে মার্চ। গোটা অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আন্দোলনের নেতা আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অনেকেই দেখা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে তাঁর আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছেন, কিন্তু শেখ মুজিব সব দলকে ডেকে কোন আলোচনা করেননি।[১] বরং দেখা গেছে শেখ মুজিব সবদিক থেকে

www.icsbook.info

বেতোয়াক্কা হয়ে ক্ষমতার যে পিরামিড, তার শীর্ষে উঠে গেছেন। ছাত্র ফ্রন্টের আন্দোলনে প্রথমে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' বাতিল করে দিয়ে শুধুমাত্র ছাত্র লীগ কর্মীদের নিয়ে গঠিত 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের মাধ্যমে ছাত্র লীগ আন্দোলনকে এককভাবে হস্তগত করলো।[২]

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের ফল একা কুক্ষিগত করে সবকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ যেমন একাই এগিয়ে গিয়েছিলো, ঠিক তেমনিভাবে অসহযোগ আন্দোলনের ফল ভোগে সে কাউকেই শরিক করতে চাইলো না। যেন সে নিশ্চিত ছিলো ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাচ্ছে। এ না হয়ে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের চিন্তা যদি তাদের মাথায় থাকতো, তাহলে আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে আওয়ামী লীগের এ মানসিকতা ছিলো অযৌক্তিক, অনুপযুক্ত এবং ক্ষতিকর। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় সকলের। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের উচিত ছিলো সব দলকে কাছে ডাকা এবং তাদের আস্থায় নেয়া ও তাদের আস্থা অর্জন করা যাতে করে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কোনো ভুল বুঝাবুঝি থাকলে তা দূর হয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদেরকে পাওয়া যায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ এটা করেনি। আন্দোলনের নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগের এটা একটা বড় ব্যর্থতা। যার ফলে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, মুসলিম লীগ, প্রভৃতি ইসলামপন্থী ও ইসলাম মনা দলগুলোর সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনা ও আরও জানাজানির মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝি ও দূরত্ব দূর করার কোনো পথ হয়নি। এভাবে আওয়ামী লীগ বলয়ের বাইরের ঐ দলগুলো সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকা অবস্থায় এবং শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে হঠাৎ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো তাকে এ দলগুলো আওয়ামী লীগের সাথে ভারতের যোগসাজশপূর্ণ ষড়যন্ত্র বলে মনে করলো। সে সময়ের তাদের বক্তৃতা, বিবৃতি, শ্লোগানের মুখ্য কথাই ছিলো এটা। শান্তি কমিটির মিছিলগুলোর প্রধান শ্লোগান ছিলো ঃ "পাকিস্তানের উৎস কি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হাতে লও মেশিনগান -দখল করো হিন্দুস্তান, বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধরো- আসাম বাংলা দখল করো, ভারতের দালালদের-খতম করো খতম করো, ভারতের দালালী-চলবে না চলবে না, ইত্যাদি।"[৩] আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স-এর মালিক জনাব হামিদুল হক চৌধুরী বলেন, "ভারতীয় প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তার দ্বারা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এ দেশের অস্তিত্ব বিলোপ করে নিজস্ব সম্প্রসারণবাদী মনোভাব চরিতার্থ করা। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এবং বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তারা তাদের সকল প্রচার মাধ্যমের দ্বারা বিশ্ববাসীর নিকট হাজার হাজার নর হত্যা ও বোমা বর্ষণের ফলে শহর ধ্বংসের ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রচার করেছে।"[৪] পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি

www.icsbook.info

মাওলানা আবদুল মান্নান ২৭ এপ্রিল (১৯৭১) এক বিবৃতিতে বলেন, "সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ আজ 'জেহাদের জোশে' আগাইয়া আসিয়াছে।"[৫] শাহ আজিজুর রহমান বলেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রবল উৎকণ্ঠার সাথে রাজনৈতিক দলসমূহকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান পূর্বক দেশে পূর্ণ ও বাধাবিহীন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ এ সুযোগের ভুল অর্থ করে বলপ্রয়োগের --- মাধ্যমে নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করে নিজেদের খেয়াল খুশীতে দেশ শাসন করার দাবী করে এবং এভাবেই অহমিকা, অধৈর্য এবং ঔদ্ধত্যের ফলে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। -- আমি সাম্রাজ্যবাদী ভারতের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।"[৬] পূর্ব পাক জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ৮ এপ্রিল (১৯৭১) এক বিবৃতিতে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না। -- ভারতীয় পার্লামেন্ট সম্প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। -- পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ভারতের তথাকথিত সহানুভূতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের দূরভিসন্ধির গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। --- পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের শত্রুর কাছ থেকে সহানুভূতি কামনা করে না। জনগণ তাদের অধিকার চায় এবং কিভাবে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে সেটা হলো সম্পূর্ণরূপে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। --- অসৎ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দুরভিসন্ধি বর্তমানে ফাঁস হয়ে গেছে।--- -পুর্ব পাকিস্তানীরা কখনো হিন্দু ভারতের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। ভারতীয়রা কি মনে করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এতদূর অধঃপতন হয়েছে, তারা ভারতকে তাঁদের বন্ধু ভাববে?"[৭] পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা জনাব নুরুল আমীন বলেন, "পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি এবং সে সংগ্রামে জয়ী হয়েছি। --- আজও পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমাদের বিরুদ্ধ- শক্তির মুকাবিলা করতে হবে।"[৮] জনাব মৌলবী ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা এবং মুসলমানদের হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ফ্যাসিবাদীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার ভারতীয় চক্রান্ত বর্তমানে নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। --- দেশদ্রোহী ও পাকিস্তানীদের মধ্য থেকে হিন্দু ভারতের সংগৃহীত ক্রীড়নকদের রক্ষা করার জন্যে হিন্দুস্তান পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অত্যাচারের মনগড়া ও ভিত্তিহীন কাহিনী প্রচার করছে। হিন্দু ভারতের সাথে যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা ষড়যন্ত্র করছে, তারাই আগ্রহভরে এ মিথ্যা সংবাদ গোপন সূত্র থেকে প্রাপ্ত

www.icsbook.info

বলে প্রচার করছে। --- একমাত্র ইসলামের নামেই এ দেশের সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ভারতীয় এজেন্টরা তথাকথিত সাংস্কৃতিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের নামে এমন জঘন্য কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়েছে যা করতে হিটলারের ঘাকতদের বর্বরতাও লজ্জা পাবে।"[৯] কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "জাতি আজ তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সবচেয়ে 'মারাত্মক সংকটের' মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। --- পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজের ভুলের জন্যে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। --- পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৯৬ জন লোক পাকিস্তানের জন্যে ভোট দিয়েছিলো। কিন্তু গত ২৩ বছর ধরে তরুণদের অপরিপক্ক মনে যে কারণেই হোক বঞ্চনার ধারণা বদ্ধ মূল হয়েছে এবং এ বঞ্চনা ও অবহেলা মুকাবিলার জন্য সংগ্রামের মাত্রা তাদের জানা ছিলো না। -- ভারতীয় এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত বাংলাদেশ বেতার থেকে দিন রাত তাঁর ও অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতার মৃত্যুদণ্ডের কথা তার স্বরে ঘোষণা করা হচ্ছে। -- পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করে যাব। কারণ যদি পাকিস্তানই না থাকে, তাহলে অধিকারের জন্যে সংগ্রামের অবকাশ কোথায়।"[১০] অনুরূপভাবে খান এ সবুর সহ মুসলিম লীগ নেতাগণ এবং নেজামে ইসলাম পার্টিসহ ইসলাম মনা বিভিন্ন দল ও গ্রুপের নেতাগণ ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের বিরোধিতা করে ১৬ ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত বক্তৃতা, বিবৃতি ও তৎপরতা অব্যাহত রাখেন।"[১১]

আওয়ামী লীগ সম্পর্কে উপরোক্ত দল ও ব্যক্তিসমূহের পূর্ব অভিজ্ঞতাই তাদের এ ভূমিকার জন্যে প্রধানত দায়ী। নির্বাচন বিজয়ী বৃহত্তর দল হিসেবে তাদের এ বিভেদের দেয়াল উপড়ে ফেলার দায়িত্ব ছিলো আওয়ামী লীগের এবং এর উৎকৃষ্ট সময় ছিলো নির্বাচনোত্তর কাল, বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনের সবচেয়ে অনুকূল সময়টি। কিন্তু আওয়ামী লীগের একক ক্ষমতা দখলের পুরানো মনোভাবই তার ব্যর্থতার জন্যে দায়ী। দুঃখের বিষয়, যে স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিলো সকলের, সেই স্বাধীনতা যুদ্ধকে আওয়ামী লীগ তার দলীয় যুদ্ধে পরিণত করেছিলো। রাশিয়ার চাপ সত্ত্বেও এবং মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টি তার সহযোগী হওয়ার পরেও তাদেরকেই যেখানে সে সাথে নেয়নি, পিকিংপন্থীদের যেখানে ভারতের মাটিতে তিষ্ঠাতে দেয়া হয়নি, সেখানে সে মুসলিম লীগ ও ও জামায়াতের মতো ইসলাম পন্থী দল ও ব্যক্তিত্বকে তারা পাশে স্বাগত জানাবে কেমন করে এবং এরাই বা তার উপর আস্থা স্থাপন করবে কি করে? আন্দোলনের নেতা হিসবে আওয়ামী লীগের ও দুর্ভাগ্যজনক আচরণই স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ে সেদিন জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির পথ তৈরির কোনো সুযোগ দেয়নি। যার ফলে জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধ মুসলিম লীগ, জামায়াতসহ ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তিত্বের চোখে হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ভারতের যোগ-সাজশে পরিচালিত এবং বাম ষড়যন্ত্রের শিকার আওয়ামী লীগের একটি চরমপন্থী মহলের স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্বাধীনতা

www.icsbook.info

যুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের উপরে উল্লিখিত বিবৃতিগুলো এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

(খ) জনগণের করণীয় সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের কিছু না বলা বা অস্পষ্টতা রাখা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে জাতির মত-বিভক্তির সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ অসহযোগ আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বেই করেছে। গোটা দেশ ছিলো তাঁর হাতের মুঠোয়। জনগণ তাঁর কথায় উঠেছে বসেছে।[১২] এ অবস্থায় ২৫ মার্চ রাতে তিনি গ্রেফতার বরণ করলেন জাতিকে কোনো কথা না বলেই। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন একথা যেমন যুক্তি ও নিরপেক্ষ বিচারে টেকে না, তেমনি শেখ মুজিব কোনো ঘোষণা দেয়ার সুযোগ করে উঠতে পারেননি, একথাও ঠিক নয়। শেখ মুজিবের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব রেহমান সোবহান ২৫ তারিখ সন্ধা ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন। সে সময় শেখ মুজিব তাঁকে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, সেনাবাহিনী সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১৩] বিষয়টা তিনি সুনির্দিষ্টভাবে জানার পরও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তিনি শেষ পর্যন্তও আপোসেরই অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন, জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রধান আলোচক জেনারেল পীরজাদা অবশেষে টেলিফোনে একটা আপোস করার কথা জানাবেন। শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডঃ কামাল হোসেন লিখছেন," I Waited for a telephone call throughout the fateful 25th. This telephone call never came, Indeed, when I finally took leave of Shaikh Mujib at about 10.30 P. M. on 25 March, Shaikh Mujib asked me whether I had received such a telephone call. I confirmed to him that I had not."[১৪] আসলে শেখ মুজিব সেই কালো রাত্রির সন্ধ্যাতেও স্বাধীনতার কথা ভাবেননি। ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় শেখ মুজিব সাংবাদিকদের কাছে পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে ২৭ মার্চ হরতালের কথা বলেছিলেন।[১৫] ঢাকা ও চট্টগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী আঘাত করার জন্যে যখন পজিশন নিচ্ছিলো, এ সময় আওয়ামী লীগের সংবাদবাহক সাংবাদিকদের নিকট শেখ মুজিবের স্বাক্ষরিত এ ইশতিহার বিলি করছিলো ঃ প্রেসিডেন্টের সাথে আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি। আশা করি, প্রেসিডেন্ট এবার তাঁর ঘোষণা করবেন।[১৬] শেখ মুজিবের স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণকেও স্বাধীনতা ঘোষণার চিন্তার সাথে সাংঘাতিক মনে করা হয়। বলা হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ তিনি চাননি।[১৭] এ কারণেই "২৫ মার্চ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যখন বাংলাদেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং গোটা অসহযোগ সংগ্রাম ছত্রখান হয়ে যায়, তখন অপ্রস্তুত জাতিকে প্লাবণে ডুবিয়ে শেখ মুজিব 'মধ্য যুগীয় নাইটের মতো বীরত্ব সহকারে' আত্মসমর্পণ করলেন। --- এর চেয়ে ব্যতিক্রমী কোনো ভূমিকা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। যে মানুষটি অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ যুদ্ধের কথা জানেন,

www.icsbook.info

কিন্তু গোটা জাতিকে সে জন্যে প্রস্তুত করেননি এবং সেই ভয়াবহ লড়াইয়ের ভবিষ্যত কেবল আপন শ্রেণী স্বার্থের বিপরীতকেই দেখতে পান। তিনি কি করে সেই যুদ্ধে অংশ নেবেন।"[১৮] শেখ মুজিবের গ্রেফতার বরণ নিয়ে খোদ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। খন্দকার মোশতাক বলেন, "ইন্দিরা গান্ধী আমাদের যখন জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের যুদ্ধের স্টাটিজিটা আমাকে বুঝিয়ে বলুন-যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি ধরা দিয়েছেন আর আপনাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন, এটা কোন্ ধরনের রণকৌশল!' আমরা এ কথার কোনো জবাব দিতে পারিনি। ২৫ তারিখ রাতে শেখ সাহেবের পাক সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের সমর্থনে আমরা কোনো যুক্তিই দেখাতে পারিনি। ইন্দিরা গান্ধি যখন বারে বারে বলছিলেন, ভু-ভারতে কে কোথায় শুনেছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি শত্রু পক্ষের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়? আপনারা প্রথম প্রথম বলেছিলেন তিনি ২৫ মার্চ রাতেই গৃহত্যাগ করেছেন এবং সহসাই আপনাদের সাথে মিলিত হবেন। পরে দেখা গেল, আপনাদের সে কথা ঠিক নয়। তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন, এটা যুদ্ধের কোন্ ধরনের কৌশল আমাকে বুঝিয়ে বলুন।"[১৯] খন্দকার মোশতাক ও তাজউদ্দীন সাহেবরা ইন্দিরা গান্ধীর এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সময়ের আওয়ামী লীগ এম. পি জনাব মোহাইমেন তার 'ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর' গ্রন্থে ইন্দিরা গান্ধির এ বক্তব্য উদ্ধৃত করে নিজেই এর জবাবটা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "শেখ সাহেবের এভাবে সেদিন রাতে ধরা দেয়াকে আমি কোনো দিন মনের সাথে যুক্তি দিয়ে খাপ খাওয়াতে পারিনি। অন্যেরা যে যাই বলুক আমার নিজের ধারণা, আওয়ামী লীগের নেতারা তাজউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করে এভাবে দেশ স্বাধীন করবে এটা তিনি ভাবতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিলো, পাকবাহিনী অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে। বেশ কিছু নেতা ও উপনেতাকে হত্যা করবে। দশ-বিশ হাজার কর্মীকেও হত্যা করে সাময়িকভাবে দেশের আলোন্দলন স্তব্ধ করে দিলেও শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে না। আগরতলা কেসের সময় তাঁকে যেভাবে দেশের মানুষ আন্দোলন করে জেল থেকে বের করে এনেছিলো, সেভাবে দেশের মানুষ আন্দোলন করে জেল থেকে বের করে এনেছিলো, সেভাবে দু তিন বছর পরে তুমুল আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমতা তার হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হবে।[২০] অর্থাৎ শেখ মুজিব ২৫ মার্চের রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত জেনারেল পীরজাদার টেলিফোনের অপেক্ষা করেছেন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এ আশায়। আবার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করলেন জনগণকে অসহায় রেখে তাও একদিন তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এ দৃঢ় আশাতেই। সুতরাং তাঁর মাথায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কোনো চিন্তা ছিলো না। ছিলো না বলেই তিনি কোনো প্রস্তুতি[২১]

www.icsbook.info

নেননি। ভারতের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়েও করেননি[২২] এবং নেতৃবৃন্দকে ঢাকার আশেপাশেই আত্মগোপন করতে করতে বলেছেন,[২৩] ভারত যাবার নির্দেশ কাউকেই তিনি দেননি। হতে পারে ভারতের প্রতি এটা তাঁর আস্থার অভাব।[২৪] অতএব যে স্বাধীনতার চিন্তা শেখ মুজিব করেননি, সে স্বাধীনতার ডাক তিনি দেবেন কেমন করে? তাই স্বাধীনতার ডাক শেখ মুজিব তরফ থেকে আসেনি। তাঁর তরফ থেকে ডাক না আসা জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে, বিভক্ত করেছে। পাকিস্তান সরকার এর সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং ভারত সরকার দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকেছে। শেখ মুজিব পাকিস্তান সরকারের হাতে থাকায় সম্ভবত শেখ মুজিবের মনোভাব দেশের জনগণ জানার ফলে পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভারতের ষড়যন্ত্র বলে চালোনার সুযোগ পেয়েছে বেশী যা ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত করেছে দেশের মানুষকে। শেখ মুজিব স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিলে, সবাইকে আস্থায় আনার চেষ্টা করলে এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ ভিন্নতর হতো। স্বাধীনতা যুদ্ধের তখন দলীয় রূপ থাকতো না, সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হতে কম পারতো এবং জাতীয় মত-বিভক্তি এভাবে ঘটতো না।

(গ) স্বাধীনতা ঘোষণায় কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা ইসলামপন্থী মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করে।

এ অসহযোগ আন্দোলনের টার্গেট ছিলো নিঃশর্তভাবে নির্বাচন বিজয়ী সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর যাতে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে দেশ শাসন করতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগ যখন অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করছিলো, তখন কিছু দল ও গ্রুপ স্বাধীনতার ডাক দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিলো। কয়েকটা দৃষ্টান্ত ঃ

১৯৭১ সালের ২ মার্চ 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ' শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে একটা খোলা চিঠি প্রচার করে। তাতে বলা হয় ঃ "পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন --- পূর্ব বাংলায় কৃষক শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন গণতান্ত্রিক শান্তি পূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন। প্রয়োজন বোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তর করুন। --- পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানান।" তাদের শ্লোগান ছিলো ঃ "পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা-জিন্দাবাদ, পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ও তার দালালদের খতম করুন, গ্রাম শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন।"[২৫] ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ তার পল্টনের জনসভায়

www.icsbook.info

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ প্রস্তাবে বলা হয় ঃ "এ সভা পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।"[২৬] এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' এর যে ঘোষণা ও কর্মসূচী প্রচার করে তার অংশ বিশেষ এই ঃ

"৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাঙলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

"(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) বাঙলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ক) বাঙলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

(খ) স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি---' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।"[২৭]

ইশতিহারটি প্রচারিত হয় 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর নামে।

স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জাগ্রত লেখক শিল্পীদের মুখপত্র বলে কথিত ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ প্রকাশিত 'প্রতিরোধ' (দ্বিতীয় সংখ্যা) এ বলা হয় ঃ "আমরা বাংলাদেশের জাগ্রত শিল্পী-সাহিত্যিকদের জাগ্রত বিবেক থেকে আজ এ ঘোষণাই করছি, বাঙালী আর মোহাচ্ছন্ন থাকবেন না। শোষণহীন, রোদনহীন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করে বাঙালী আজ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেই করবে। সাথে সাথে আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি এ হুশিয়ারী উচ্চারণ করছি যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমরা আপনাদের রূপ দেখতে চাইনে। বাংলার স্বাধীনতার বিপক্ষে যে কোনরূপ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে জনগণের হাত থেকে আপনাদের নিস্তার থাকবে না। -- স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।---- পরিষদ বৈঠক বর্জন করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।"[২৮]

www.icsbook.info

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে তাদের ইশতিহারে বলা হয় ঃ "পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। পূর্ব বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উন্নাদ হইয়া-উঠিয়াছে। --- আমরা পূর্বেই বার বার বলিয়াছি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আপোসে বাংলার স্বাধীনতা আসিবে না-আসিবে না পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার মুক্তি। মুক্তির একমাত্র পথ সশস্ত্র বিল্পব। --- তাই আজ এক মুহূর্তও দেরী করার সময় নাই। পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। তাই পূর্ব বাংলার কৃষক গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করো। শাসক গোষ্ঠীর হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লও। গ্রামে বাংলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দাও। মুক্ত এলাকা গঠন করো। --- আস, আমরা ঘোষণা করি, হুশিয়ার! পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে যাহারা বাধা প্রদান করিবে কিংবা যাহারা তাকে মাঝ পথে থামাইয়া দিতে চাহিবে তাহাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিব না বরদাশত করিব না।"[২৯]

ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে ৮ মার্চ (১৯৭১) তাদের এক প্রচার পত্রে বলে ঃ "সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে-ঘরে ঘরে আজ উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। ---- বাংলার সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত স্বাধীনতাকামী ভাইবোনদের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে মাতৃভূমি বাংলাকে স্বাধীন করার যে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা গর্জে উঠেছে তাকে যে কোনো মূল্যে বাঁচিয়ে রেখে 'স্বাধীন সমাজ তান্ত্রিক বাংলাদেশ' গঠন করতে হবেই। এরই প্রেক্ষিতে সর্বস্তরে 'বাংলা মুক্তিফ্রন্ট' (Bengal Liberation Front) গঠন করুন, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মুক্তিফৌজ গড়ে তুলুন আর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলুন।"[৩০]

পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। তাদের প্রচারপত্রে বলা হয় ঃ "বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এখানে পৃথক ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে পদ্ধপরিকর হইয়াছেন ---

পূর্ব বাংলার কম্যুনিস্টরা দীর্ঘকাল হইতেই বাঙালীসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে। --- ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণ দুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবী মতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে। --- এজন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে, কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি নিয়া গড়িয়া তুলুন স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। ---"[৩১]

www.icsbook.info

ছাত্র ইউনিয়ন স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহ্বান জানায় ১৯৭১ সালের ১১ মার্চ। ছাত্র ইউনিয়ন প্রচারিত 'শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করিয়া তুলুন' শীর্ষক প্রচারপত্রে বলা হয় ঃ "অনেক ঘটনার ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাত কোটি জনতা আজ পূর্ব বাংলায় তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কায়েম করিতে চাহিতেছেন, চাহিতেছেন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করিতে। এই জন্য জনগণ আজ অকুতোভয় জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন। --- আমাদের দেশ মাতৃকার উপর হইতে বৃটিশ, আমেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের যে কোনো শোষণ ও প্রভাব লুপ্ত হইবে, কৃষকদের উপর হইতে জোতদার মহাজনদের সামন্তবাদী শোষণ উচ্ছেদ হইবে, দেশের জনগণকে পুনরায় পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইতে হইবে না। সকল প্রকার শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলা কায়েমের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া বর্তমান সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লইবার আহ্বান আমরা জানাইতেছি। ---"৩২

উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহের গ্রুপ ও দলগুলো যারা আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনের সমান্তরালে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলো, তারা কম্যুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, বামপন্থী বলে পরিচিত ছিলো। এদের মধ্যে ছাত্র লীগই একমাত্র গ্রুপ যার বামপন্থী পরিচয় ছিলো না। কিন্তু তারাও তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার ইশতিহারে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ডাক দেয়। সুতরাং অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী সকলেই ছিলো বাম শিবিরের। এরা ছিলো দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনতার চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী শক্তি। আর ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপগুলোর সাথে ছিলো এদের চরম বৈরিতা। ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপগুলোর কাছে এরা ছিলো বিজাতীয় আদর্শ ও বিদেশী শক্তির এজেন্ট। সুতরাং এদের উদ্দেশ্যকে সন্দেহের চোখে দেখা এবং তার বিপরীত অবস্থানে গিয়ে দাঁড়ানো ইসলামপন্থী দল ও জনতার জন্যে ছিলো স্বাভাবিক। তার উপর আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে বামপন্থীদের আন্দোলনের ছিলো সুস্পষ্ট পার্থক্য। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ চাচ্ছিল তাদের হাতে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতার হস্তান্তর যাতে ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা ও দেশ শাসন করা যায়। আর ওরা চাচ্ছিলো স্বাধীনতা যার আদর্শিক ভিত্তি ওরা দাবী করছিলো সমাজতন্ত্র হবে। এমনকি স্বাধীনতা ঘোষণা প্রশ্নে "ছাত্র লীগের সমাজতন্ত্র প্রভাবিত ছাত্র-তরুণদের আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয় ৩রা মার্চ থেকে। জনাব কামরুদ্দীন আহমদ এ দৃশ্যটি তার গ্রন্থে সুন্দর করে ধরে রেখেছেন। তিনি লিখছেন ঃ

"শেখ সাহেবের ৩ মার্চের বক্তৃতার পর ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁকে তাদের মিছিলে শরিক হবার জন্যে অনুরোধ করলো। শেখ সাহেব সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, ৭

www.icsbook.info

মার্চ তারিখ তিনি রেসকোর্স ময়দানে জনসভা ডেকেছেন। ঐ জনসভায় তিনি তাঁর পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। তার আগে তাঁর পক্ষে ৩ মার্চের মিছিলে যোগ দেয়া সম্ভব হবে না। চরম পন্থী ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ তাঁর এ সিদ্ধান্তকে দুর্বলতা বলে মনে করলো। ছাত্ররা তখন ছাত্র সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করলো। ফলে ঐ তারিখ থেকেই আন্দোলন দুটো ধারায় বইতে শুরু হলো। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কার্যালয় স্বাধীনতার জন্যে সর্বাত্মক লড়াই এর প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। অন্যদিকে শেখ সাহেবের নিজের বাড়িতে অহিংসা ও অসহযোগ নীতির ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দেয়া হতো শেখ সাহেবের ধানমণ্ডির বাড়ী থেকে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজের নির্দেশ পেতো জহুরুল হক হল থেকে। শেখ মুজিবকে যদিও ছাত্ররা বিপ্লবের প্রতীক বলে মনে করতো, কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতিই অনুসরণ করতো।"[৩৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সেই সময়ের আন্দোলন বামপন্থী ও চরমপন্থীদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এ দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ দুই ধারার মধ্যে দল-মত নির্বিশেষে সকলে অসহযোগ আন্দোলনের সাথেই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো। তারা শেখ মুজিবকেই চিনতো, শেখ মুজিবকেই মানতো এবং নির্দেশের জন্যে তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। বিশেষ করে বামপন্থীদের বৈরী ইসলামপন্থী দল, গ্রুপ ও জনতার জন্যে একথা ছিল আরও বেশী সত্য। নিঃশর্ত ক্ষমতা হস্তান্তর ভিত্তিক অসহযোগ আন্দোলনের মোকাবিলায় বাম ও চরমপন্থীদের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণাকে তারা বিদেশ ও বিজাতীয় ষড়যন্ত্র বলেই ধরে নিয়েছিলো।[৩৪] আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব এ ধারণা ভাঙার কোনো চেষ্টা করেননি এবং পৃথক দুই ধারাকে এক করে গেলেন না তিনি শেষ পর্যন্তও। স্বাধীনতা ঘোষণা না করে এবং অবশেষে ক্ষমতা তাঁর হাতে হস্তান্তর হবেই-এ আশা নিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করলেন। সেই সময়ের জন্যে নেতৃত্বের এটা ছিলো সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।[৩৫] এ ব্যর্থতাই বিভ্রান্তির কুয়াশাকে ঘনীভূত করে। দেখা গেলো শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার পর যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো তাকে ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপরা বিদেশ ও বিজাতীয় আদর্শের ষড়যন্ত্র হিসেবেই চিহ্নিত করছে।[৩৬] ২৫ মার্চ পর্যন্ত একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি এভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লো জাতির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক ইস্যুতে।

যারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদেরও এ সিদ্ধান্তের মূলে আওয়ামী লীগের আচরণ সম্পর্কে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, বামপন্থীদের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ ও ভয়, শেখ মুজিব কিছু না বলা ও তার অনুপস্থিতিসহ শুরু হওয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং অন্যদের মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে

www.icsbook.info

অংশগ্রহণের জন্যে ভারত গমনে তাদের অসুবিধা প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে যার ফলে জাতির ঐতিহাসিক এবং বেদনাদায়ক বিভক্তি আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কারণগুলোর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্ন বিষয়সমূহ সামনে আসতে পারে ঃ

(ক) প্রথমেই তাদের আওয়ামী লীগ ও ভারতভীতি এবং পাকিস্তান প্রীতির কথা ধরা যাক। মুসলিম লীগ থেকে শুরু করে সবগুলো ইসলাম পন্থী দল, গ্রুপ এবং উল্লেখযোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক ও আদর্শিক মতপার্থক্যের কারণে আওয়ামী লীগকে সবসময় ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখে আসছে। জন্মের সময় থেকেই আওয়ামী লীগের সাথে মুসলিম লীগের বিরোধ। এ বিরোধের কারণ কিছুটা রাজনৈতিক, কিছুটা আদর্শিকও। আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বি হওয়া ছাড়াও কিছুটা বামঘেষা, স্বায়ত্ব শাসনের পক্ষপাতি ধর্মনিরপেক্ষ এবং কিছুটা ভারতমুখী। অন্যদিকে মুসলিম লীগ শক্ত কেন্দ্রের নামে স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পক্ষপাতী। আর জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি প্রভৃতি ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ আওয়ামী লীগের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। তাদের বিরোধ ছিলো মূলতই আদর্শিক। পঞ্চাশের দশকে জামায়াতে ইসলামী যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। আর আওয়ামী লীগ করেছে যুক্ত নির্বাচনকে সমর্থন। এখানে জামায়াতে ইসলামীর বিবেচ্য ছিলো মুসলিম স্বার্থ, আর আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক স্বার্থের দিকটাই বিবেচনা করেছে। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি প্রভৃতি ইসলামী দল পঞ্চাশের দশকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন করেছে। আর আওয়ামী লীগ তার উপর বাম প্রভাব এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগির কারণে এ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছে। এভাবে ষাটের দশকে আওয়ামী লীগ ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে কথা না বলা, ছয় দফা দাবী উত্থাপন এবং সর্বশেষে '৬৯ সালের সর্বদলীয় আন্দোলনের ফলকে একা কুক্ষিগত এবং অন্যদল বিশেষ করে ইসলামপন্থী দলসমূহকে মাঠ থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা আওয়ামী লীগ সম্পর্কে ইসলামপন্থী দলসমূহের সন্দেহ ও ভয়কে সর্বোচ্চে পৌছায়। তারা মনে করতে থাকে, ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের অদৃশ্য যোগসাজশ রয়েছে। আর তাদের কাছে ভারতের রাজনীতি মানেই হলো ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের গলা টিপে মারা। একদিকে আওয়ামী লীগ তাদেরকে বাঙালীর শত্রু মনে করার ফলে এ দুই শক্তির পক্ষে মনের দিক দিয়ে কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়নি। এ কারণেই ইসলামপন্থী দলগুলো অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করলেও ২৫ মার্চের পর আওয়ামী লীগ এবং অরাজনৈতিক অন্যদের মতো করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। তারা একে জাতির বা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধই মনে করেনি, পশ্চিমবংগ ও ভারতের মুসলমানরাও সাধারণভাবে এ আন্দোলনকে মুসলিম স্বার্থ বিরোধী পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলন বলে মনে করেছে।[৩৭] অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও অন্যরা স্বাধীনতা যুদ্ধকে বাঙালী স্বার্থের

www.icsbook.info

জন্যে অপরিহার্য মনে করেছে। বস্তুত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও অর্বাচিনতা থেকে সৃষ্ট মুসলিম স্বার্থ ও বাঙালী স্বার্থের এ দ্বন্দ্বই সেদিন ১৯৭১ সালে জাতিকে বিভক্ত করে। অথচ দুই স্বার্থ যে একই স্বার্থ-একথা সেদিন দুই পক্ষের কেউ কাউকে বুঝাতে পারেনি। পারলে সব ইসলামপন্থী দল, গ্রুপ ও ব্যক্তিত্ব এক দিকে এবং সব বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ দল ও গ্রুপ অন্যদিকে - এভাবে জাতি বিভক্ত হয়ে পড়তে পারতো না।

ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের পাকিস্তান প্রীতিও তাদের উপরোক্ত মানসিকতার একটি কারণ। বৃটিশ আমলে পাকিস্তান দাবী ছিলো মুসলিম স্বার্থ সুরক্ষার প্রতীক। তখন হিন্দু কংগ্রেস পাকিস্তান দাবীর বিরোধিতা করেছে, কারণ তারা মুসলিম স্বার্থের সুরক্ষা চায়নি। তাদের বিরোধিতার মধ্য দিয়েই ভারত বিভক্ত হয়েছিলো ১৯৪৭ সালে, সৃষ্টি হয়েছিলো পাকিস্তান মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে। মুসলমানদের এ স্বতন্ত্র আবাস ভূমিটিকে হিন্দু কংগ্রেস সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছিলো এ আশাতেই যে, পাকিস্তান টিকবে না। --- আবার জোড়া লাগবে বিভক্ত ভারত। হিন্দু কংগ্রেসের এ উচ্চাশার বিজয়ের মধ্যে ইসলামপন্থী দল, গ্রুপ ও জনতা অবলোকন করছিলো তাদের আদর্শের পরাজয় এবং মুসলিম স্বার্থের বিপন্ন অস্তিত্ব। এ কারণেই তারা পাকিস্তানের সাথে অস্তিত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করছিলো এবং পাকিস্তানের অস্তিত্বের সাথে ইসলামকে এক করে ফেলেছিলো তারা। অথচ ইসলাম ও পাকিস্তান এক জিনিস ছিলো না। ভূখণ্ডের নাম ও তার বিভাগ- বিভক্তির সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। যাই হোক, তাদের মনোভাব তাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা দূরদর্শিতাকে অনেকখানিই আচ্ছন্ন করেছিলো। যার ফলে তারা পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা বা পাকিস্তান বিভক্তির কথা চিন্তাই করতে পারেনি- পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর অধীনেই তাঁরা বিরাজিত সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। আওয়ামী লীগের কিছু বাহ্যিক আচরণও তাঁদের এ মনোভাবকে আরও পাকাপোক্ত করে দেয়। আওয়ামী লীগের ভারত-প্রীতির সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে এক সময় এসে যুক্ত হয় 'জিন্দাবাদ' এর স্থলে তাঁদের কণ্ঠে 'জয় বাংলা' শ্লোগান, যা ছিলো 'জয় হিন্দু' এর অনুকরণ। তাছাড়া ২৫ মার্চের আগে এবং পরে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের পক্ষে এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রচার মাধ্যমের 'নগ্ন ও আপত্তিকর' তৎপরতা আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামপন্থীদের ভুল বুঝাবুঝির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আওয়ামী লীগ ভীতি, ভারত ভীতি এবং পাকিস্তান প্রীতি তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। এসব মিলিয়েই জাতি-বিভক্তির অবাঞ্ছিত ও বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হবার পথ প্রসারিত হয়।

(খ) ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের প্রতি ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ক্ষমতাসীন হিন্দু সংগ্রেসের ঐতিহাসিক বৈরিতার কারণে ইসলাম পন্থীদের ভারত গমন সম্ভব ছিলো না।

www.icsbook.info

এ কারণের শিকার হয়ে তাঁদের অনেককে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের অভ্যন্তরে উভয় সংকটের মোকাবিলায় এক বিদঘুটে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।[৩৮] ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের জন্যে তখন ভারতের মাটি কেমন বিপজ্জনক ছিলো তা আওয়ামী লীগের মিত্র রাজনীতিকদের অবস্থা থেকেই পরিষ্কার। ছয় দফার আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত মস্কোপন্থী ন্যাপ ও সিপিবি ছিলো আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ মিত্র। এরপরও তারা ভারতে গিয়ে আওয়ামী লীগের কাছে বিমাতাসুলভ আচরণ পায় এবং মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের মধ্যে ছয় মাসই তারা যুদ্ধে অংশ নিতে ব্যর্থ হয়। সে সময়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে এক আলোচনায় বলা হয়েছে ঃ

"পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে 'মস্কোপন্থী' নেতারা প্রথম সুযোগেই কোলকাতা মুজিব নগরে সমবেত হয়েছিলেন। ১৭ এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থন ঘোষণার মধ্য দিয়ে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের দলীয় সংকীর্ণতার কারণে মস্কোপন্থীদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়, তারা 'বিস্তর দেন-দরবার' চালাতে থাকেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিষ্ফল দেন-দরবার অব্যাহত থাকে। পরে সে পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণ ঘটিয়েছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। পরিস্থিতির চাপে ভারত শেষ পর্যন্ত ' ৭১ সালের ৯ আগস্ট ২৫ বছর মেয়াদী 'ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি' স্বাক্ষর করার পর ক্রেমলিনের নায়করা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পরিস্থিতির মধ্যে 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের উপাদান' খুঁজে পান এবং ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে ব্রেজনেভ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। সোভিয়েত মনোভাবের এ পরিবর্তন সার্বিকভাবে ভারত সরকারের অভ্যন্তরেও তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলেছিলো। ক্ষমতায় থাকা ডানপন্থীরা এর ফলে কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেন এবং মস্কোপন্থী কুটনীতিক ডিপি ধর বাংলাদেশ সরকারের উপর 'মস্কোপনন্থী'দের সুযোগ দানের জন্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন এবং সে কারণেই মূলত ন্যাপ, কম্যুনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অক্টোবর থেকে অস্ত্র এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলো। (এ সময়ই সিপিবি 'পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি' নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি নাম গ্রহণ করে।"[৩৯]

মস্কোপন্থী ন্যাপ, কম্যুনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের মুরব্বী মস্কো ছিলো বলেই তারা ভারত যেতে পেরেছে এবং অবেশেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পেরেছে, কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলের ভাগ্যে তা ঘটেনি। পিকিংপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টির দু একটি গ্রুপের দু একজন নেতাকে ভারত গিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়েছে। কাজী জাফর আহমদ তাঁর এক সাক্ষাতকারে বলেছেন,

"সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণার কপি সহ আমি, রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর

www.icsbook.info

খান রনো কোলকাতার অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে সাক্ষাত করে স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য ও সহনুভূতির সাথে বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তি বাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। আমরা বলি যে, ---আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন, দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এজন্যেই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কেউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসংগে জনাব তাজউদ্দীন জানান যে, তাকে সিদ্ধান্তের আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এর আমাদের সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর। --- আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি।

দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলং এর এক ডাক বাংলায়। যেখানে আমাকে সাত দিন রাখা হয়। -- সাত দিন ব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করা হয়।"[৪০]

পিকিংপন্থী ন্যাপেরই যখন এ অবস্থা, মস্কোপন্থীদের যখন ঐ হেনস্থা এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা যেখানে মুক্তিযোদ্ধা বাছাই-এর অধিকারপ্রাপ্ত, সেখানে ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের লোকরা ভারত গেলে তারা কি করতে পারতো, তাদের কি অবস্থা দাঁড়াতো, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর এ ধরনের রাজনৈতিক পরিচয়ের লোকদের জন্যে ভারত সীমান্ত অতিক্রমটাই কঠিন ছিলো। মাওলানা ভাসানীর সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা থেকে এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। মাওলানা ভাসানী আসাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত প্রবেশের আগে তাঁর কয়েকজন সাথী সীমান্ত পার হলেন অবস্থা যাচাইয়ের জন্যে। মাওলানার মুরিদ একজন অসমীয় মুসলমান তাদেরকে একজন পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে নিয়ে গেলো। তার পরের ঘটনা এ রকম ঃ

"বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে পঞ্চায়েত প্রধান বললেন, আপনারা কি আওয়ামী লীগের লোক?

– না

– আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া বর্ডার পার হবার অর্ডার নাই।

– যারা রাজনীতি করেন না, তাদেরও?

– তারা বর্ডার পেরুবেন কেন?

– জান বাঁচানোর দায়ে।

পঞ্চায়েত প্রধান কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, ভোট দিয়েছেন কোন্ দলকে?

www.icsbook.info

– আমরা 'ন্যাপের' লোক।

আবার কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে তিনি বললেন, আপনারা বরং ফিরে যান। জানাজানি হলে অসুবিধা হতে পারে।

অবস্থা আঁচ করে মাওলানা সাহেবের কথা পঞ্চায়েত প্রধানের কানে তুললাম না। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই সামাদ সাহেবের (মাওলানার অসমীয় মুরিদ) বাড়ীতে বসলাম। মন জুড়ে একটা প্রশ্ন চেপে বসলো, পাকিস্তান দল মত নির্বিশেষে সব বাঙ্গালীকে মারছে। এমনকি সেমসাইড করে দু চারজন পাকিস্তানপন্থীও মেরেছে। অথচ ভারত কেবল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগপন্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাহলে বাকি বাঙ্গালীরা যাবে কোথায়?"[৪১]

অবশেষে মাওলানা ভাসানী ভারতে প্রবেশ করতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রবেশের আগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। মাওলানা ভাসানীর শিষ্য ভারতের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঈনুল ইসলামের সুপারিশ ও বিশেষ অনুরোধেই ইন্দিরা গান্ধী ভাসানীর ব্যাপারে রাজী হন।[৪২] এরপরও মাওলানা ভাসানীকে স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা সময়টা ভারতে বন্দী দশায় কাটাতে হয়। মাওলানা ভাসানী ভারত প্রবেশের যে বিশেষ সুযোগটা পেয়েছিলেন, ভাসানী ন্যাপের আর কোনো নেতা কিন্তু তা পাননি। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও প্রখ্যাত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের অভিজ্ঞতাও এখানে তুলে ধরা যায়। তিনি তার 'মধ্যরাতের অশ্বারোহীর ট্রিলজী-তারপর' কলামে ' শেষতক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে' শিরোনামে লিখেন, "মে মাসে (১৯৭১) আগরতলায় যাওয়ার পরও আমি জানতাম না কোথায় যাব, কোথায় প্রকৃত আশ্রয় পাব আর কোথায় খাব। ১১মে দুপুরে একটা ২১ জনের জীপ থেকে আমাকে কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসে নামিয়ে দেয়া হয়। --- পার্টি আমার শহরের উপকণ্ঠে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো। এক্সরে ওখানেই। আমি ২৫ শে (মার্চ) রাতে প্রেস ক্লাবে ট্যাংকের গোলায় আহত হয়েছিলাম। --- আগরতলা থেকে ভারতীয় বিমানে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় পৌঁছাই। মিথিক্যাল মুজিব নগর শহর কলকাতা যেন আমার জন্যে ছিল না। আগরতলায় যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তারা আমাকে (মুক্তি) বাহিনীতে নিতে অনিচ্ছুক। -- আগরতলায় অনেক অভিযোগ পেয়ে এলাম, সেখানে সবাইকে মুক্তি বাহিনীতে নেয়া হচ্ছে না। ক'জন যুবক হতাশ ও আশ্চর্য হয়ে বলছিল, তারা দেশের জন্যে জীবন দিতে এসেছে। কিন্তু কোনো অভ্যন্তরীণ কারণে অনেককে বাহিনীতে নেয়া হচ্ছে না। কেন? ব্যাপারটা রাজনৈতিক বিধায় সহজেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। --- একদিন সকালের দিকে আগরতলার বন্ধুরা একদল বন্ধুকে বললো, যারা সবাই যুবক ও শিক্ষার্থী চলো, তোমাদের মুক্তিবাহিনীতে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা স্থানীয় অস্থায়ী ক্যাম্পে থাকে এরা, সবাই প্রগতিশীল ও কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্ন। সেই যে তারা গাড়িতে গেল

www.icsbook.info

আর ফিরেনি। একটা গভীর জংগলে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।--- এমন গুপ্ত হত্যার বিচার করার কোনো পন্থা নেই। একটা দলকেই কেবল অস্ত্র দেয়া হবে, তারাই ট্রেনিং পাবে। --- গোড়াতেই ষড়যন্ত্র ও বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা হয়।--- মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের উপায় কি? -- প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের কাছে একটা স্মারকলিপি প্রদানের সিদ্ধান্ত হলো। সেই স্মারকলিপিতে --- প্রগতিশীল ও কম্যুনিস্টদের মুক্তিযুদ্ধে অবাধে যোগদানের সুযোগদানের দাবী জানানো হয়। কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ এ স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীকে দেন। কিন্তু-- তিনি প্রতিনিধিদের নানা কথার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এভাবে তিনি কোনো নির্দেশ দিতে সক্ষম নন। --- মুজিবনগর সরকারের প্রপাগাণ্ডা দফতরের সন্ধান করি। --- জনাব আবদুল মান্নান ছিলেন মেম্বার ইনচার্জ প্রচার দফতরের। --- পার্ক সার্কাসের এক গলিতে এঁদের তখন অফিস, বালু হককক লেনে, অনেক খুঁজে বের করলাম সেই গলিটা। ২৪শে মে আমি ও বাড়িতে উপস্থিত হই। --- সবাই আমাকে চিন্‌ল, কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে যেন সাহস পেল না। ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হচ্ছিল। মিনিট পাঁচেক পরে মান্নান সাহেব সবাইকে বললেন, চলুন যাই সময় হয়েছে। বন্ধু মুকুলসহ আরও অনেকে সেখানে ছিল, যারা আমাকে ফয়েজ ভাই বলে। কিন্তু সবাই আমাকে ত্যাগ করে বংশীবাদকের পেছনে কোথায় যেন ছুটল। ----- আমি আমার সামান্য আস্তানায় গিয়ে ভাবলাম, মুক্তিযুদ্ধে যেতে হলে আওয়ামী লীগার হতে হবে। --- পরের দিন মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়ে গিয়ে বন্ধুদের খুঁজলাম। সে সময় চারজন সেক্রেটারীর সবাই আমার পরিচিত। তাদের একজন বন্ধু নূরুল কাদেরকে বললাম সব কথা।--- ক'দিন পর আমি নূরুল কাদেরের অফিসে পুনরায় গেলাম। ---- আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, জে. ওসমানীর সাথে দেখা করবো, আমি তাঁকে চিনি। তিনি হেসে বললেন, তিনি তো নেই। তবে বসো, একজন তার অফিসার আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলো। এই বলে তিনি অন্য কক্ষে গেলেন। একটু পরে একজন এলেন কাদেরের কক্ষে সামরিক ড্রেস পরা। কাদের বললেন, এর সাথে কথা বলো যুদ্ধে কিভাবে যাবে সে সম্পর্কে। সামান্য পরিচয়ে আমাদের হাসিমুখে কথা শুরু হলো। আমি বললাম, পথগুলো বন্ধ মনে হচ্ছে। তবু আমি অস্ত্র হাতেই মুক্তিযুদ্ধে যেতে চাই।

ঃ 'আপনার বয়স বাধা নয়তো?'

ঃ 'মুক্তিযুদ্ধে কোনো বয়সের বাধা নেই।'

ঃ 'আপনি কোন্ পার্টি করেন?'

ঃ ' কোনো পার্টি আমি করি না। পার্টির কথা উঠছে কেন? এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয় কি?'

ঃ 'আপনি আওয়ামী লীগ করেন না কেন?'

www.icsbook.info

ঃ 'আমি কোনোদিন বুর্জোয়া-বর্ণবাদী পার্টির সদস্য হইনি।'

ঃ 'ছাত্রলীগে ছিলেন না কোনো দিন?'

ঃ 'তাও ছিলাম না।'

ঃ আপনি আপনার পথে যান। আমরা বিশেষ কারণে আপনাকে রিকমেন্ড করতে পারবো না।"[৪৩]

আমার মত অনুরূপ কারণেই ন্যাপ-সেক্রেটারী জেনারেল মশিয়ুর রহমান (যাদু মিয়া) কেও ভারত গিয়ে ওয়ারেন্ট-এর তাড়া খেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয়।[৪৪]

পিকিংপন্থীরা ভারতের কাছে ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের চেয়ে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ছিলো। পিকিংপন্থীদের সাথে ভারত সরকারের বিরোধটা ছিলো রাজনৈতিক, কিন্তু ইসলাম পন্থীদের সাথে তাদের বিরোধ ছিলো রাজনৈতিক ও আদর্শিক দুই-ই। এ বিরোধের জন্ম ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগে এবং দেশ বিভাগের পরে এ বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায় ইসলামপন্থীদের আওয়ামী লীগ বিরোধিতা ও ভারত বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। সুতরাং বর্ডার পার হওয়া কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ক্লিয়ারেন্স ইসলামপন্থীদের ভাগ্যে কিছুতেই জুটতো না। যার ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিদের জন্যে করেনি। দু'চারজন ইসলামপন্থী যারা এভাবে কিংবা সেভাবে ওপারে গিয়েছিলো তারা সেখানে শুধু তেষ্ঠাতে পারেনি নয়, জীবন তাদের বিপন্ন হয়েছে।[৪৫]

(গ) আগেই বলেছি, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বরূপ ইসলামপন্থীদের বিভ্রান্ত করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে তারা ধরে নিয়েছিলো, ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ ভারতের যোগসাজসে তারাই শুরু করেছে। এ ধারণা তাদের ঠিক ছিলো না। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তা ছিলো আমাদের দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী বাঙালী সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসাদের প্রতিরোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, এর পেছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিলো না। মূলত নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর আকস্মিক হামলা ও নির্বিচার হত্যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্বাধীনতার দাবী রাতারাতি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।'[৪৬] এ অবস্থায় একটি নিরুপায় পরিস্থিতি এবং স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্বানুভূতি থেকেই স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। '২৭ মার্চ সন্ধ্যায় ৮-ইবি'র বিদ্রোহী নেতা মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া তাঁর প্রথম বেতার বক্তৃতায় নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসাবে ঘোষণা করলেও পরদিন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ

www.icsbook.info

মুজিবের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রকাশ করেন। এসব ঘোষণা বিদ্যুতের মতো লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে শেখ মুজিবের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালীরা স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই শুরু করেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বেতারের এসব ঘোষণার পিছনে না ছিলো রাজনৈতিক অনুমোদন, না ছিলো কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি।'[৪৭]

এ পরিকল্পনাহীন অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের বাঙালী সৈনিক পুলিশ, ইপিআর ও আনসাররা স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে। এছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্পই ছিলো না। কি নিরুপায় পরিস্থিতিতে এঁদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়, তা 'মূলধারা '৭১'-এ এভাবে বলা হয়েছে ঃ

"সামরিক আক্রমণের অবর্ণনীয় ভয়াবহতার ফলে সাধারণ মানুষের চোখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত অস্তিত্বের অবশিষ্ট যুক্তি রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। --- যারা আক্রান্ত অথবা বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তারা অচিরে জড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধ লড়াইয়ে। --- মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এ স্থানীয় ও খণ্ড-বিখণ্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হবার বিষয়টি এদের জন্যে মূলত ছিলো অপরিকল্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং উপস্থিত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। --- বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানী বাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে এদের তাড়া করে নিয়ে যায় যে, এদের জন্যে পাকিস্তানে ফিরে আসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়। হয় 'কোর্ট মার্শাল' নতুবা স্বাধীনতা-এ দুটি ছাড়া অপর সকল পথই তাদের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে।"[৪৮]

এভাবেই এক নিরুপায় পরিস্থিতিতে আমাদের অরাজনৈতিক ও দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। এঁদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো না, এঁদের সাথে ভারতের সাথে কোনো যোগসাজশও ছিলো না। এছাড়া দেশের হাজার হাজার অরাজনৈতিক নিরুপায় তরুণ ও যুবক নানাভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। এদেরও কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো না,[৪৯] ছিলো না ভারতের সাথে কোনো যোগসাজশও। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা এবং এ যুবকরাই ছিলো স্বাধীনতা যুদ্ধের মৌলশক্তি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট যারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বড় বড় বুলি কপচিয়েছিলো, ইকবাল হলকে কেন্দ্র করে যারা ৩রা মার্চ থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলো, যারা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে[৫০] স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলছিলো, স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৃতই তাদের কোনো ভূমিকা ছিলো না। ইকবাল হল-গ্রুপের মুজিব বাহিনী তৈরি হয়ে মাঠে নামার আগেই মুক্তিযুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের এ রূপ তখন ইসলামপন্থী দলগুলোর সামনে আসেনি, আসা সম্ভবও ছিল না। তাদের নজর ছিলো

www.icsbook.info

স্বাধীনতা যুদ্ধকে রাজনৈতিক নেতৃত্বদানকারী ভারতপন্থী আওয়ামী লীগের 'বাংলাদেশ সরকার' এবং ভারতের প্রতি। ভারতভিত্তিক বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় আচারণের মানদণ্ডেই তারা গোটা স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিচার করে। এভাবে তাদের দৃষ্টি মুজিব নগরস্থ বাংলাদেশ সরকার ও ভারতের প্রতি নিবদ্ধ থাকার কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ যুবকের (যাদের সামনে দেশের মুক্তি বিধান ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো না) ত্যাগ ও কুরবানী এবং অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম তাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। এ পরিস্থিতিতেই তারা হয় সবচেয়ে বড় ভুলের শিকার। যার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধকে তারা বাম ও আওয়ামী লীগের চরমপন্থীদের সাথে ভারতের এক যোগ সাজশপূর্ণ ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি।

সব কারণ মিলিয়ে স্বাধীনতা প্রশ্নে সেদিন যে বেদনাদায়ক মতবিভক্তি ঘটলো, তার জন্যে আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগই মূলত দায়ী। দলীয় স্বার্থেই তারা জাতীয় ঐক্য চাননি, কিংবা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো উদ্যোগ তারা নেননি। মার্চের পয়লা তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত জামায়াত, মুসলিম লীগসহ সব দলই শেখ মুজিবের পাশে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু শেখ মুজিব পাশে ডাকেননি কাউকে। এক থেকে পঁচিশ তারিখ সংকটকালীন এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কোনো নেতাকে 'হ্যালো' পর্যন্ত বলেননি। তিনি কি করছেন, কি করবেন তা কাউকে না জানিয়েই পাকিস্তানীদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। অন্যদিকে ভারত ও ভারতে যাওয়া আওয়ামী লীগ ছিল ইসলামপন্থী দলগুলোর জন্যে যমদূত সমতুল্য। যার ফলে ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তিত্ব মুক্তিযুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ বলে মনে করার সুযোগ পায়নি এবং আওয়ামী লীগ এ মতপার্থক্য দূর করার বদলে মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণ করে ও নন আওয়ামী লীগারদের জন্যে ভারত গমনকে বিপজ্জনক করে তুলে সন্দেহ সংশয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে। এ অবস্থায় জাতীয় মত-বিভক্তি ছিল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জাতির মত-বিভক্তি একটা যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা এবং এর কড়া মাসুল জাতিকে দিতে হয়েছে। সব ভুল ও অন্যায়ের দুর্বহ বোঝা জাতিকেই বহন করতে হয়েছে তার সহস্র, লাখো সোনালী সন্তানকে কুরবানী দেয়ার মাধ্যমে, তাদের বুকের তাজা-তপ্ত রক্ত মাটিতে ঢেলে।

(১৯৯০ সালে লিখিত।)

www.icsbook.info

তথ্য-সূত্র ঃ

১. ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি হবার পর হোটেল পূর্বাণীতে তাড়াহুড়া করে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে "এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি মাওলানা ভাসানী, জনাব নূরুল আমীন, জনাব আতাউর রহমান সহ প্রদেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।"- (দৈনিক সংগ্রাম, ২রা মার্চ, ১৯৭১) কিন্তু জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এ মহৎ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত করেছেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২. 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫', অলি আহাদ, পৃষ্ঠা - ৪৭৩ - ৪৭৪, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র , ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭০৮

৩. 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়,' পৃষ্ঠা-৪৬

৪. 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়,' পৃষ্ঠা-৪৮ (বিবৃতিটি ৬ এপ্রিলে দেয়া)

৫. 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়,' পৃষ্ঠা-৮৮

৬. 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়', পৃষ্ঠা-৯১ (৪ঠা মে, ১৯৭১ তারিখের বিবৃতি)

৭. দৈনিক সংগ্রাম, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১

৮. দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ আগস্ট, ১৯৭১ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র , ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১৮ -৭১৯

৯. দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৭১ - ৬৭২

১০. দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ জুলাই, '৭১ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিল পত্র, পৃষ্ঠা- ৬৮২ -৬৮৩)

১১. বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের মানসিকতা সম্পর্কে তাদের এসব অভিযোগ যে অমুলক ছিলো না, স্বাধীনতা উত্তরকালে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে। The Tide এক সংবাদ নিবন্ধে বলছে ঃ " Almost all the beneficiaries of the 1975 massacres are always very vocal about the India Bangladesh Friendship Treaty signed by the Awami league government, but no one ever talks about the october, 1971, agreement the implement of which would have great by compromised the irdprendence and sovereignty of Bangladesh. According to usually infromed quarter important clauses of that agreement, signed of behalf of the Provisional government by its Acting President, included, (1) replacing the Bangladesh Army with a para military force under Supervision of Indian Army, (2) allowing Senior Indian civil servants to run the administration in Bangladesh, (3) Stationing Indian troops indefinitely on the soil of Bangladesh, (4) declaring a three -mile area all along the border as a free trade area -- But everything changed after shaikh Mujib's return--- one must accapt honestly that towards the

www.icsbook.info

end of 1971, after India had committed its troops, it did look that if Bangladesh at all emerged victorious she would wind up as an Indian protectorate only the international prestige of shaih mujib stoped that from becoming thw reality," (The Tide, January, 28,1990)

১২. সেই সময় এমন কোনো দল ছিলো না, যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মেনে নেয়নি।

১৩. রেহমান সোবহানের সাক্ষাতকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯০ ডঃ কামাল হোসেনের সাক্ষাতকার (১৯৭৪), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৮

১৫. "Shaikh Mujibur Rahman today (25, March) gave a call for a general stike throughout 'Bangladesh' on March 27th as a mark of protest against `heavy firing upon the civilian population in Saidpur, Rangpur and joydevpur.--- He said all this had happend while the president is at Dacca for the declared purpose of resolving politically the grave crisis facing the country --- " Pakistan Times, 26th March, 1472. (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিল পত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৭৮৭) ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার আরেকটা নির্দেশ ও শেখ মুজিব ২৫ মার্চ রাতে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচার করেন। এ সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরে বলা হয় ঃ "Sheikh MujiburRahman, the Awami Leageue Chief, directed tonigth (25th March) that export of jute and jute goods from Bangladesh should be resumed forth with, -- He also announced tele communication links with with foreign countries will function via Manila and London-- " The Dawn, 26th March, 1971(বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৭৮৬)

১৬. বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত, মাহবুবুল আলম, পৃষ্ঠা -৪০

১৭. "সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁর (শেখ মুজিবের) তেমন বিশ্বাস ছিলো না। তাঁর বাসায় গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হলে তাঁকে কখনো খুব উৎসাহিত হতে দেখিনি। তাঁর গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন।"-(ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর, এম এ মোহাইমেন, পৃষ্ঠা -৬৭)

১৮. শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসংগ, আলী রীযাজ, পৃষ্ঠা-২৬

১৯. 'ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর, এম এ মোহাইমেন, পৃষ্ঠা -৬৪)

২০. ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর, এম এ মোহাইমেন, পৃষ্ঠা-৬৫

২১. "আওয়ামী লীগের আই অমান্য অভিযান দর্শনীয় হলেও ওতে সাফল্যের অপরিহার্য উপাদানের অভাব ছিলো। সর্বাধিক চাপ সৃষ্টি, কিন্তু সর্বনিম্ন প্রস্তুতি এমন একটা ভুল ছিলো যার মাশুল অনেক।" -(বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম, পৃষ্ঠা-৪০)

২২. 'মূলধারা '৭১,- মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-১০

২৩. তাজউদ্দীন আহমদের একান্ত সাক্ষাতকার, সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ এবং মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা -৮-৯) Bangladesh. Constitutional quest for Autonomy Moudud Ahmed, Page-248

www.icsbook.info

২৪. লক্ষণীয়, স্বাধীনতার পর দেশে ফিরেও শেখ মুজিব ভারতকে আমার দেননি, ভারতের বড় ভাই গিরীকে বরদাশত করতে চাননি। মুজিবনগর সরকার ভারতের সাথে যে গোপন অপমানকর চুক্তি করে, মুজিবই দেশে ফিরে তা অগ্রাহ্য করেন। এজন্যে কেউ কেউ ১৬ ডিসেম্বরের দবলে শেখ মুজিবের দেশে ফেরার দিন ১০ জানুয়ারিকে বিজয় দিবস বলতে চান। সাংবাদিক (বর্তমানে 'মানব জমীন' সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী লিখছেনঃ

"ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন ১৬ ডিসেম্বরকে ইস্টার্ণ কমাণ্ড দিবস হিসেবে পালন করে, তখনই বুঝতে কষ্ট হয় না তারা কি চেয়েছিলো? আমরা ১৬ ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস হিসেবেই পালন করে আসছি। আমরা মনে করি এ দিনই আমরা হানাদারমুক্ত করে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম। বাস্তব অবস্থাও তাই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় আসরেই কি আমরা পুরোপুরি মুক্ত হয়েছিলাম? -- ইতিহাস নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখা যায় ভারতের সাথে সাত দফা ভিত্তিক যে চুক্তি হয়েছিলো তাতে বাংলাদেশকে স্বাধীন ভাবা দুষ্কর হতো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফিরে না এলে কি হতো তারই আলোকপাত করছি এ প্রতিবেদনে। .... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবকিছু উড়িয়ে 'দিলেন। বললেন, এ চুক্তি আমি মানি না। কার্যত অগ্রাহ্য করলেন চুক্তিটি। একে একে সব সিদ্ধান্ত বাতিল করতে লাগলেন। ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চলে যেতে বললেন। ভারত তাদের অফিসারদের প্রত্যাহার করে নিলো। তিন মাইলের। তবে এক পক্ষ বলেছিলেন অতীত অভিজ্ঞতার কারণে সেনাবাহিনী রাখার দরকার নেই। শেখ সাহেব এ যুক্তি খন্ডন করে বললেন, তোমরা কি বলতে চাও বুঝি না। একটি স্বাধীন দেশে লেফট-রাইট শুনবো না তা হয় না। সেনাবাহিনী থাকবে। পাকিস্তান থেকে আমি আমাদের অফিসারদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছি। তাজউদ্দীন আহমদসহ আরও কয়েকজন বিরক্ত হলেন। দিল্লী নাখোশ হলো। ভারতীয় জেনারেলরা অনেকটা প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার নিয়ে শেখ সাহেব মিসেস গান্ধীকে এক বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন কলকাতার গবর্নর হাউসে। মিসেস গান্ধীর সাথে কথা হচ্ছে নানা বিষয়ে। পাশে ভারতের সমরনায়করা উপস্থিত। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনটিতে শেখ সাহেব হঠাৎ বললেন, আমি একটি কথা বলতে চাই,--- আপনি কবে আপনার সৈন্য আমার দেশ থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। আমাকে অনেক কথা শুনতে হচ্ছে এজন্যে। মিসেস গান্ধী জেনারেল মানেকশ'র দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, আপনি যেদিন বলেন সেদিনই। --- ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট জৈল সিং সম্প্রতি বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা ঠিক হয়নি। মিসেস গান্ধী শেখ সাহেবের অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তার কারণে চটজলদি সম্মতি দিয়েছিলেন। -- পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও শেখ সাহেব ভারতের চাপিয়ে দেয়া নীতি মেনে নেননি। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার লাহোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। ভারত চায়নি শেখ সাহেব লাহোর যান। মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে ভিন্নমতও ছিলো। শেখ বলেছিলেন, আমি লাহোর যাব এবং ও আই সি'র সদস্য পদ লাভ করবো। কে কি বললো তাতে কিছু যায়-আসে না। (দিল্লীর) সাউথ ব্লকের একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করেছিলেন, শেখ মুজিব বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। শেখ সাহেবকে যখন এ মন্তব্য অবহিত করা হলো তখন শেখ বলেছিলেন, সবে তো শুরু, ওরা কি পেয়েছে?

www.icsbook.info

১০ জানুয়ারি থেকেই ভারত বিরক্ত হতে থাকে। শেখ সাহেব যেদিন নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকা এলেন সেদিন পাকিস্তান থেকে শেখ সাহেব প্রথমে গেলেন লণ্ডন। তারপর দিল্লী হয়ে ঢাকা। দিল্লী যখন এলেন, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী খবর পাঠালেন, শেখ সাহেব যেন বৃটিশ এয়ার ফোর্সের বিমানে ঢাকা না যান। তিনি যেন ভারতীয় বিমানে যান এই ছিলো অনুরোধ। ভারত বললো, বৃটিশ সরকার যেখানে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, সেখানে শেখ সাহেব কি করে তাদের বিমানে ঢাকা যান। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ শেখ সাহেবকে ভারতের এ ইচ্ছার কথা যখন জানালেন, তখন শেখ সাহেব কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই বললেন, আমি বৃটিশ বিমানেই যাব। ওদের বলে দিন আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এতে কোনো হেরফের হবে না।

১০ জানুয়ারি প্রতি বছরই আসে। আওয়ামী লীগ দিবসটি পালন করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে জনসভা করে, নেতারা নরম-গরম বক্তৃতা দেন। কিন্তু একবারও বলেন না বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না হলে কি হতো বাংলাদেশের অবস্থা। আমার মতে ১০ জানুয়ারি হওয়া উচিত বিজয় দিবস। -- ২৫ বছরের চুক্তি নিয়ে কথা হয় যখন- তখন। আসলে এ চুক্তিতে তেমন কিছু নেই। চুক্তি ছিলো ১৯৭১ সালের অক্টোবরে। যা কার্যকর হলে বাংলাদেশ হতো আরেক সিকিম। এ চেষ্টাও যে হয়নি তা বলা যায় না। ১৯৭১ সনের ২৮ ডিসেম্বর তিনজন সংখ্যালঘু নেতা মিসেস গান্ধীর সাথে দেখা করে বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনজন হলেন মনোরঞ্জন ধর, প্রয়াত ফনিভুষন মজুমদার ও বর্তমান ভারত প্রবাসী চিত্তরঞ্জন সুতার।"
-(শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন'- মতিউর রহমান চৌধুরীঃ নঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত, বাড়ী ৫০ সড়ক ২ এ ধানমণ্ডি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কাগজ' ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১১ জানুয়ারী, ১৯৯০)

২৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬৬৩-৬৬৫
২৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬৬৬
২৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৬৬৭-৬৬৮
২৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৬৯৩-৬৯৪
২৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৯৬
৩০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭০৫-৭০৬
৩১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭০৯-৭১১
৩২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৩৩-৭৩৪
৩৩. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, কামরুদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা -১০৮
৩৪. তাদের ঐ সময়ের এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের বিবৃতি-বক্তব্য দ্রষ্টব্য, যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিদেশী ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
৩৫. "জাতির জন্যে স্বাধীনতা অর্জনই যদি শেখ মুজিবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে ৭ মার্চের অমন জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদানের পরে তিনি কি করে শত্রু পক্ষের সাথে বৈঠকের আশা পোষণ করেছিলেন? পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল সামরিক সরকার প্রধান ইয়াইয়া খানের সাথে স্বাধীনতা ঘোষণার পরে পুনরায় শেখ মুজিব কেন বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন? স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণাকারী শেখ মুজিবের কি ধরনের প্রত্যাশা ছিলো জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে? 'যার যা আছে তাই নিয়ে জাতিকে

www.icsbook.info

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করার পরে কোন্ ভরসায় জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে আপোস রফার আলোচনার টেবিলে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন? তাহলে কি শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাননি? তিনি কি চেয়েছিলেন পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে পৌঁছতে? জাতিকে চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য নির্দেশ দিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ত্যাগের প্রস্তুতি না নিয়ে ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত কেনইবা শত্রু পক্ষের সাথে বৈঠকের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এখানেই খুঁজতে হবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণ। --- স্বাধীনতার সংগ্রাম' 'মুক্তির সংগ্রাম এ ধরনের মন্তব্য করতে যেমন তাঁর বাধেনি, তেমনি বাধেনি মুক্তির সংগ্রাম ঘোষণা করার পরেও শত্রু পক্ষের সাথে আলোচনার টেবিলে সবার জন্যে অপেক্ষা করতে। -- তখনকার ছাত্র নেতৃত্বের চাপেই শেখ মুজিব ৭ ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, 'এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এ ধরনের ঘোষণা দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে এক বৈঠকে তিনি প্রকাশ্যে বলেও ফেলেছিলেন, 'আমি যদি আপনার কথামতো কাজ করি, তাহলে ছাত্র নেতারা আমাকে গুলী করবে, আর যদি আমি ছাত্র নেতাদের কথামতো চলি, তাহলে আপনি আমাকে গুলী করবেন, বলুন তো এখন আমি কি করি'। শেখ মুজিব তাঁর নেতৃত্বের অসহায় ও করুণ অবস্থায়ই ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে --- শেখ মুজিব একদিকে ছাত্র নেতৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করে স্বাধীনতার পক্ষে যেমন কাজ করেছেন, ঠিক তেমনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে।" –(অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর (অব) এম এ জলিল, ১১-১২)

৩৬. "১৯৭০-এর নির্বাচনের দীর্ঘ অভিযানে শেখ মুজিব প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় জনগণকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 'আমরা ইসলাম বিরোধী নই' এবং 'আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাই না।' জনগণ তাকে ভোট দিয়েছিলেন তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোনো ম্যাণ্ডেট তিনি নেননি। নির্বাচনের পরও এ জাতীয় সুস্পষ্ট কোনো ঘোষণা তিনি দেননি। তাই ১৯৭১ এ যারা বাংলাদেশে আন্দোলনে শরিক হয়নি তারা দেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলো না। ভারতের অধীন হবার ভয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের খপ্পরে পড়ার আশংকাই তাদেরকে ঐ আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিলো। --- নিজ দেশের কল্যাণ চিন্তাই তাদেরকে এ ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিলো।" পলাশী থেকে বাংলাদেশ, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা -২৬।

"ভারতের সাহায্যে দেশ স্বাধীন হোক এটা এদেশের অনেকেরই কাম্য ছিলো না। --- এদেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিলো যে, ভারত মনে-প্রাণে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মঙ্গল কোনো দিন চায়নি। শুধু পাকিস্তানকে ভাঙ্গার লক্ষ্যেই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এতো সাহায্য করেছিলো, এ দেশের লোকের সত্যিকার মুক্তির জন্যে সাহায্য করেনি। -- যখন বাংলাদেশ হয়, তখন দেশের অধিকাংশ লোকের মনোভাবই এরূপ ছিলো।" স্বাধীনতা উত্তর জাতীয় সংসদের আওয়ামী লীগ সদস্য জনাব মো আবদুল মোহাইমেন লিখিত 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ', পৃষ্ঠা -২৭।

৩৭. যে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা কোলকাতায় ছিলাম, বরাবরই আমরা লক্ষ্য করেছি কোলকাতার বাঙালী মুসলমানরাও আমাদের এ আন্দোলনকে খুব প্রীতির চোখে

www.icsbook.info

দেখেনি। এ আন্দোলনকে পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলন বলেই তারা মনে করতো। তাদের ধারণা ছিলো কোলকাতায় বা পশ্চিম বংগে সাম্প্রদায়িক দাংগা আরম্ভ হলে কিছু দিনের জন্যে হলেও তারা হয়তো পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে গেলে তারা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে---। কোলকাতার অবাঙ্গালী মুসলমানরাও মনে প্রাণে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ছিলো। আমাদের তারা রীতিমতো শত্রু স্থানীয় মনে করতো, বাড়ী ভাড়া করতে গিয়ে দেখেছি, যে মুহূর্তে তারা জানতে পারতো আমরা পূর্ব পাকিস্তানের লোক, তখনি তারা বাড়ী ভাড়া দিতে অস্বীকার করতো। --- আমরা যারা সীমান্তের অপর পারে গিয়ে বাড়ী ভাড়া করে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেসব বাড়ী হিন্দুদেরই ছিলো।"-(ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর', এম এ মোহাইমেন, পৃষ্ঠা-৫৭)

৩৮. "ভারত বিরোধী ও ইসলাম পন্থীরা উভয় সংকটে পড়ে গেলো। যদিও তারা ইয়াহিয়া সরকারের সন্ত্রাসবাদী দমন নীতিকে দেশের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেন, তবু এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কোনো সাধ্য তাদের ছিলো না। বিরোধিতা করতে হলে তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকেও অন্যদের মতো ভারতে চলে যেতে হতো যা তাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিলো। -- তারা একদিকে দেখতে পেল যে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে ইয়াহিয়া সরকারকে বিব্রত করার জন্যে কোনো গ্রামে রাতে আশ্রয় নিয়ে কোনো পুল বা থানায় বোমা ফেলেছে, আর সকালে পাক বাহিনী যেয়ে ঐ গ্রামটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা রাতে কোনো বাড়িতে উঠলে পরদিন ঐ বাড়িতেই সেনাবাহিনীর হামলা হয়ে যায়। এভাবে জনগণ এক চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে গেলো। --- ভারত বিরোধী ও ইসলামপন্থীরা শান্তি কমিটি কায়েম করে সামরিক সরকার ও অসহায় জনগণের মধ্যে যোগসূত্র কায়েম করার চেষ্টা করলেন যাতে জনগণকে রক্ষা করা যায় এবং সামরিক সরকারকে যুলুম করা থেকে যথাসাধ্য ফিরিয়ে রাখা যায়। --- একথা ঠিক যে, শান্তি কমিটিতে যারা ছিলেন, তাদের সবার চারিত্রিক মান এক ছিলো না। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলো যারা সুযোগ মতো অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্বার্থ আদায় করেছে। (পলাশী থেকে বাংলাদেশ, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা-১৮

৩৯. 'ন্যাপের ৩০ বছর', বিচিত্রা।

৪০. কাজী জাফর আহমদের সাক্ষাতকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড,

৪১. 'স্বাধীনতা ভাসানী ভারত', সাইফুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৮

৪২. 'স্বাধীনতা ভাসানী ভারত', সাইফুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-১০-১১

৪৩. জনকণ্ঠ, ১৯ ডিসেম্বর, ২০০৩।

৪৪. 'মাওলানা ভাসানী ঃ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম.' সম্পাদনা শাহরিয়ার কবির, পৃষ্ঠা - ২৪, ২৫ অলি আহাদের মত আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ নেতারাও নিরাপত্তাহীনতার কারণে ভারত থেকে দেশে পালিয়ে আসেন। দ্রষ্টব্য ঃ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৫০৭

৪৫. "আগরতলার বাস ধরার জন্য মোস্তফাসহ বেরিয়ে পড়লাম। বাসে উঠে খানিকটা আসতেই হঠাৎ রাস্তার পাশে এক জায়গায় বেশ কিছু লোকের একটা জটলা চোখে পড়লো, দেখলাম কিছু লোক লম্বা একটি দাড়িওয়ালা লোককে মারধর করছে এবং লোকটি দু হাতে মার ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করছে। লোকটিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম, এ যে শেখ নূরুল্লাহ একজন মুসলিম লীগ নেতা। একে আমি বহুদিন

www.icsbook.info

ধরে চিনতাম।--- ঘটনাটি দেখে আমি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম বাস থেকে নেমে গিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু কি করবো ভাবতে ভাবতে বাস অনেকটা পথ এসে গিয়েছে, বাস থেকে নেমে পিছন দিকে ঘটনার স্থান পর্যন্ত যেতে যেতেই যা হবার তা হয়ে গেছে ভেবে ভারাক্রান্ত মনে গাড়ীতে চুপ করে বসে রইলাম। --- এ প্রভাবশালী লোকটি ফেনী কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবি এডভোকেট শেখ অহিদুল্লাহর বড় ভাই অর্থাৎ বর্তমান এরশাদ সরকরের মন্ত্রী কর্নেল জাফর ইমামের জ্যেঠা।"- (ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর,' এম. এ. মোহাইমেন, পৃষ্ঠা-৪২)

৪৬. "মূলধারা '৭১,' মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-২৫

৪৭. 'মূলধারা '৭১,' মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-৫

৪৮. "মূলধারা, '৭১', মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-৬-৭

৪৯. "এর (ছাত্র লীগের ক্ষুদ্র অংশ ও কম্যুনিস্টদের) বাইরে যে ছাত্র সমাজ বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিলো তাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিলো গতানুগতিক দেশ প্রেমিকদের দায়িত্ব স্বরূপ, ... নির্দিষ্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, অন্যান্য চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি মহলের ক্ষেত্রেও একথাই প্রযোজ্য। এদের মধ্যে আবার অনেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে নিতান্তই বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে, কেউ কেউ করেছে সুবিধা অর্জনের লোভলালসায়, কেউ করেছে পদ-যশ অর্জনের সুযোগ হিসেবে, কেউ করেছে তারুণ্যের অন্ধ আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে এবং কতিপয় লোক অংশগ্রহণ করেছে 'এডভ্যানচারইজম'-এর বশে। এ সকল ক্ষেত্রে দেশ প্রেম, নিষ্ঠা এবং সততারও তীব্র তারতম্য ছিলো।" -(অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর (অব) এম এ জলিল, পৃষ্ঠা-১৫)

৫০. "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নির্দিষ্ট রূপ যে ছিলো না তা নয়, তবে সে চেতনা সীমাবদ্ধ ছিলো একটা মহল বিশেষের মধ্যে এবং তারা হচ্ছে তৎকালীন ছাত্র সমাজের সর্বাধিক সচেতন মহলেরও একটা ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ-বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সেই অংশটি যার নেত্রত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরিফ প্রমুখ। এ অংশটির চিন্তা-চেতনার সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানী চক্র থেকে মুক্ত করে এ অঞ্চলকে বাঙালীর জন্য একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলাই ছিলো তাদের লক্ষ্য। এর বাইরে যারা এ অঞ্চলকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত করে স্বাধীন, সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তারা হচ্ছেন 'কম্যুনিস্ট পার্টি (মণি সিং), ন্যাপ (মোজাফফর) ন্যাপ ভাসানীর একটা অংশ, মরহুম সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।"- (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর (অব) এম এ জলিল, পৃষ্ঠা-১৫)

www.icsbook.info

অপ্রতিরোধ্য ইসলামী শক্তির কেন্দ্র হিসেবে তুরস্ক একদিন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেটা উসমানিয়া খিলাফত আমলের কথা। এরপর মোস্তফা কামালের আমলে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষকরণের দুর্বার গতিবেগও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইসলামের এই শক্তি কেন্দ্রে উল্টো স্রোতের এই প্রাবল্য পশ্চিমী শক্তিকে আহ্লাদে আটখানা করে দেয়। এই আহ্লাদ তাদের এখনও শেষ হয়নি। মাঝে মাঝেই নতুন উপকরণ তাদের এই আহ্লাদ বৃদ্ধি করে। সম্প্রতি এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে। গত ডিসেম্বরে তুর্কি পার্লামেন্ট ছাত্রীদেরকে মাথায় ওড়না ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে আইন পাস করে। কিন্তু বিলটি যখন অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্ট কেনান এভরানের কাছে যায়, তিনি অনুমোদন না করে বিলটি পার্লামেন্টে পুনর্বিবেচনার জন্যে ফেরত পাঠান। কিন্তু পার্লামেন্ট বিলটি আবারও ঐ ভাবেই পাস করে এবং শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুসারে তা আইনে পরিণত হয়। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট কেনান এভরান বিলটি শাসনতান্ত্রিক আদালতে প্রেরণ করেন এবং বলেন যে, বিলটি নতুন তুর্কি প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি ও শাসনতন্ত্রের খেলাফ। কারণ নতুন তুর্কি প্রজাতন্ত্র শুরুতেই পোশাকের ব্যাপারটি নির্ধারণ করে দিয়েছে। শাসনতান্ত্রিক আদালত বিলটিকে বাতিল বলে রায় দিয়েছে। এই ঘটনার একটি পর্যায়ের এখানেই ইতি।

তুরস্কের এই ঘটনাকে আমরা বিস্ময়কর বলতে পারি না। কামাল আতাতুর্কের তুরস্কে এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। তবে বেদনায় আমরা অশ্রু বিসর্জন করতে পারি। আমরা বলতে পারি, তুরস্কের এই পাশ্চাত্য তোষণ নীতি তার আসলেই কোন উপকার করেনি, করছে না এবং করতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষী, তুরস্কের উসমানীয় খলীফারা ইউরোপের খৃস্টান শক্তিসমূহের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার জন্যে তাদের মন জয়ের কম চেষ্টা করেনি। রাজস্ব, বিচার, সামাজিক প্রথা, আর্থিক সামাজিক, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে খৃস্টান প্রজাদের বিশেষ সুযোগ -সুবিধার ব্যবস্থা করা হতো। এমনকি বৈধ, কি অবৈধ তারও তোয়াক্কা করা হতো না। ইতিহাস বলছে, 'তুর্কি সরকার বহুবার বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন ও খৃষ্টানদিগকে নানা প্রকার সুবিধাদানে বাধ্য হইয়াছেন। মুসলমানেরা প্রতিবারই ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আর্তনাদ করিয়াছে, কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হইয়াছে।' অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও এ কথারই সাক্ষ্য দিয়েছেন। লিখছেন, 'সুলতানের খৃস্টান প্রজারা সংখ্যায় বাড়ছে এবং ধন ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

www.icsbook.info

—এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনেক পেছনে ফেলেছে।" (Luke, 66-67) "প্রকৃত পক্ষে রায়াহ (খৃষ্টান) প্রজাদের উপর কর খুবই কম। নিশ্চিতভাবে দুনিয়ার কোন কৃষককেই এমন সুবিধাজনক পজিশনে রাখা হয়নি।" (Clair and Brophy, 115 -116) "খ্রিস্টানরা যাহাতে খাজনায় ইজারা লইয়া ধনী হইতে পারে তজ্জন্য সরকার তাহার (তুর্কি মুসলমানদের) ওয়াকফগুলি বিনষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু রায়াহর (খৃস্টানদের) ওয়াকফে হাত দেওয়ার সাহস তাহাদের হয় নাই। -- বস্তুত রায়ার সুখ বর্ধনের জন্যে নানা জুলুমের চাপে তুর্ক জাতি যেভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে, মুসলমান জাতি ও জগতের সৌভাগ্যবশত সে রায়া অপেক্ষা অধিকতরও কঠোরতর পরিশ্রম না করিলে ইউরোপের মানচিত্র হইতে বহু পূর্বে তাহার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইত। ---জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার উন্নতিবিধান না করিয়া কেবল খৃস্টানদিগকে একচেটিয়া সুবিধা দেওয়ার ফলে হতভাগ্য তুর্ক জাতির সর্বনাশ হইয়াছে।" (তুরস্কের ইতিহাস, ডঃ আব্দুল কাদের, পৃঃ ২২০ ও ২২২) তুর্কি খলীফারা এসব করেছেন পশ্চিমী খৃস্টান রাষ্ট্রশক্তির চাপে এবং তাদের মনোরঞ্জনের জন্যেই। কিন্তু তুর্কি সুলতানরা কি তাদের মন পেয়েছিলেন? পাননি। এত সুখে থাকার পরেও তুর্কি খৃস্টান প্রজাদের কল্পিত দুঃখের মর্মন্তুদ কাহিনী ইউরোপে প্রচার হয়েছে। এ সম্পর্কিত বই লিখিত হয়ে পানির মত বিক্রি হয়েছে ইউরোপের বাজারে। ফল হিসাবে তুর্কি সুলতানরা পেয়েছে খৃষ্টান প্রজাদের ষড়যন্ত্রমূলক বিদ্রোহ এবং সেই উপলক্ষে ইউরোপীয় খৃস্টান রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ। আজকের তুর্কি সরকারের ইসলামী বিশ্বাসের কণ্ঠরোধকারী ধর্মনিরপেক্ষ পদক্ষেপে ইউরোপ আমেরিকায় যারা আনন্দ -আহলাদে গদগদ হচ্ছে তাদেরই অতীত ইতিহাস এটা। সুতরাং তাদের কাছে আজকের তুরস্কের পাবার কিছু নেই। বরং তুর্কি সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ আচরণে সেখানকার মুসলিম জাতিসত্তা যতখানি নিঃস্ব হবে পশ্চিমের ওরা ততখানিই ঐশ্বর্যশালী হবে। কামাল আতাতুর্ককে দিয়ে ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে কিন্তু পোপীয় ব্যবস্থাকে পশ্চিমীরা ধ্বংস করেনি। খৃস্টান বিশ্বের মুরব্বী হিসেবে 'পোপ'-কে এখন তারা শক্তিশালীই করে তুলছে। এটাই পশ্চিমীদের আসল চেহারা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নেশায় মুসলমানদের মাতাল করে রেখে ওরা বিশ্বব্যাপী খৃস্টরাজ্য কায়েম করার দিকে এগুচ্ছে। একদিন আফ্রিকাকে বলা হতো মুসলিম মহাদেশ। সেই আফ্রিকায় আজ খৃস্টানদের সংখ্যা ২৮ কোটি, আর মুসলমানদের সংখ্যা ২৪ কোটি। (ব্রিটানিকার সর্বশেষ ইয়ারবুক দ্রষ্টব্য)

তবে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কেনান এভরেন যাই করুন, সেখানকার সব মানুষ কিন্তু আজ আর চোখ বন্ধ করে নেই। প্রেসিডেন্ট এভরেন বিলটি ফেরত পাঠাবার পরও তুর্কি পার্লামেন্ট ইসলামী নৈতিকতার পক্ষে তাদের রায়ে যে অটল থেকেছে, এটা

www.icsbook.info

একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। খোদ তুর্কি প্রধানমন্ত্রীও প্রেসিডেন্টের মতের সাথে একমত হননি। শাসনতান্ত্রিক আদালতের রায় প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী তুরগুত ওজাল বলেছেন, তারা এই রায় পর্যালোচনা করে দেখবেন এবং ছাত্রীদেরকে তাদের মাথায় গুড়না পরার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন।' তিনি সুস্পষ্টই বলেছেন, 'আমরা এমন একটা সমাজ চাই যেখানে ধর্মীয় অধিকার পালনের জন্যে কাউকে নিন্দিত হতে হবে না।

আর তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং তুরস্কের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা সোলেমান ডেমিরেল প্রকাশ্যেই এই পদক্ষেপের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের উপর নতুন তুর্কি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলে প্রেসিডেন্ট কেনান এভরান যে মন্তব্য করছেন তার তীব্র বিরোধিতা করে সোলেমান ডেমিরেল বলেছেন, ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নতুন তুর্কি প্রজাতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। প্রতিষ্ঠিত হবার পর দীর্ঘ তের বছর এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ছিল ইসলাম। ১৯৩৭ সালে কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে শাসনতান্ত্রিক নীতি হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাটা পরবর্তীকালের উড়ে আসা একটি বিষয়, নতুন প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি কিছুতেই তা ছিলনা।' সোলেমান ডেমিরেল আরও বলেন, 'তুরস্কের জনমত ইসলামের পক্ষে পরিবর্তিত হয়েছে, মনে হয় কোন কালেই তারা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ছিল না। মুলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতই ধর্মনিরপেক্ষতা এখানে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং গায়ের জোরেই তা টিকে আছে।' সোলেমান ডেমিরেলের True Path Party থেকে প্রকাশিত একট পুস্তিকায় বলা হয়, 'বছরের পর বছর ধরে ধর্ম এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে এখানে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। শতকরা ৯৯ জন মুসলিমের এই দেশে ধর্মশিক্ষা একটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু বলা হয় ধর্ম শিক্ষা Uniform Education Law এর পরিপন্থী। ..দি তাই হয়ে থাকে তাহলে এই Law পরিবর্তন করতে হবে।' ছাত্রীদের ওড়না পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে—এই অভিমত প্রকাশ করে সোলেমান ডেমিরেল বলেন, তরুণরাই আজ তাদের ধর্মকে সমর্থন করছে - তুরস্কে এর চেয়ে সাধারণ দৃশ্য আর কিছু নেই।'

এমনকি তুরস্কের আধা বামপন্থীরাও এখন বলতে বাধ্য হচ্ছে, মোস্তফা কামাল ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, ইসলাম বিরোধী ছিলেন না। কোন রাজনীতিক এখন তুরস্কে নিজেকে নিরীশ্বরবাদী প্রমাণিত করতে চান না। এছাড়া অন্যান্য সকল রাজনীতিকই গোটা বিষয়ই এখন পুণর্মূল্যায়নের পক্ষপাতী। এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বুলন্দ জাভিদের মত কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত আজ মনে করেন, কামালবাদের আজ পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।

www.icsbook.info

আর জনগণের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠার মনোভাব অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠছে। সোলেমান ডেমিরেল যে কথা বলেছেন, প্রকৃত চিত্র সেটাই। মেয়েদের মাথায় ওড়না পরিধানের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক আদালতের রায় যেদিন বের হয়, তার দু'দিন পর ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এদিন তুরস্কের রাজপথে বেপর্দা মহিলাদের যে মিছিল বের হয় তার চেয়ে অনেক গুণ বড় ছিল পর্দানশীল মহিলাদের মিছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল ছাত্রী ক্লাস বর্জন করে এ মিছিলে যোগ দেয়। শান্ত, সুশৃংখল এই মিছিলের 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি তুরস্কের রাজপথ কাঁপিয়ে তুলে। এই বিক্ষোভ তাদের কিসের জন্যে' এ প্রশ্ন করায় তারা বলেছিল প্রশ্নটি মিঃ এভরানকেই জিজ্ঞেস করুন।

আঙ্কারা ছাড়াও তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে আদালতের ঐ রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

তুরস্কের এই জাগরণের ইতি কোথায়, পরিণতি কি আমরা জানি না। ১৯৮০ সালের অভ্যুত্থান তুরস্ককে ইসলাম থেকে রক্ষার জন্যেই নাকি হয়েছিল। বলা হচ্ছে, ইসলামকে ঠেকানোর জন্যে সে ধরনেরই আরেকটা অভ্যুত্থান নাকি আবার আসতে পারে। সে যাই হোক, পশ্চিমীদের এই তোষণ -নীতি অতীতে তুরস্কের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে, কোন সময়ই উপকার করেনি, কখনই উপকার করবে না পশ্চিমী তোষণ নীতি ছিল উসমানীয় তুর্কি সুলতানদের পতন যুগের চরিত্র। এ চরিত্র অধঃ পতনকেই শুধু ত্বরান্বিত করে।

৩-৫-১৯৮৯

www.icsbook.info

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর কুমন্ত্রণা ঋনগ্রস্ত অনেক দেশেরই আজ অশান্তি ও অস্বস্তির কারণ। আইএমএফ -এর হুকুম মানতে গিয়ে আর্জেন্টিনার মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে দু'শ ভাগ। হুকুমমত ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে, ভর্তুকি প্রত্যাহার হয়েছে, রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্প বিক্রি করা হয়েছে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। গ্যাসোলিনের ছ'শ ভাগ মূল্য বৃদ্ধি সেখানে আতংকের সৃষ্টি করেছে। সব দেখে -শুনে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেনেম নাকি আইএমএফ এর প্রোগ্রাম -পরামর্শ পাশে ছুঁড়ে ফেলে কিছুটা আপন গতিতে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মেক্সিকোর অবস্থা আর্জেন্টিনার চেয়েও খারাপ। তার বৈদেশিক ঋণের ভার ১শ' বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে। আইএমএফ -এর খুবই বাধ্যানুগত বলে মেক্সিকোর সুনাম আছে। তাকে ঋণগ্রহণকারী দেশের মডেলও বলা হয়। কিন্তু ফল মেক্সিকো কিছুই পায়নি। ১৯৮২ সাল থেকে সে আইএমএফ-এর পায়ে পা ফেলে চলছে, ঋণও পাচ্ছে, কিন্তু অর্থনীতির উন্নতি কিছু হয়নি। বরং কৃষি উৎপাদনের মারাত্মক হ্রাস সেখানে অনাহার -দারিদ্র্যকে উদ্বেগজনক করে তুলেছে। মানুষ এমনকি দেশ ত্যাগ করছে। এসব থেকে সৃষ্ট গণঅসন্তোষ সরকারকেও দুর্বল করে ফেলছে। সেখানকার একজন অর্থনীতিবিদ আক্ষেপ করে বলেছেন, আইএমএফ- এর কথা মানতে গিয়েই সরকারের ভিত্তি এইভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। এমন অবস্থা আইএমএফ প্রভাবিত অনেক দেশের সরকারেরই। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভেনিজুয়েলা আইএমএফ -এর কাছে ঋণ চাইল। ঋণের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ল, কিন্তু তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী বাড়ল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য। ক্ষেপে উঠল দরিদ্র জনসাধারণ। ক্ষিপ্ত জনসাধারণকে ঠাণ্ডা করার জন্য গুলী করতে হলো। গুলীতে মারা গেল কমপক্ষে ২৯৭ জন। এ বছর জর্দানও এ রকম বিপদে পড়েছে। আইএমএফ থেকে সাহায্য লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে জর্দান সরকার জ্বালানি এবং সেচ -পানির উপর থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নিল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বাড়তে দিল। ফল ভেনিজুলেয়ার মতই হল। দ্রব্যমূল্য পীড়িত মানুষ ক্ষেপে গেল। তারা এমনকি সরকারী ভবন এবং ব্যাংকেও আগুন দিল। হঠাৎ করে এমন অবস্থা কেন হলো, এ সম্পর্কে জর্দানের বাদশাহকে কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বাদশাহর একজন উপদেষ্টা আইএমএফ সম্পর্কে একটা মজার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'জাহাঁপনা, যখনই মানুষ শুনল আইএমএফ রাজধানীতে আসছে, মানুষ উদ্বিগ্ন হলো, আতংকিত হয়ে উঠল এই ভাবনায় যে, ওরা কি নিয়ে.আসছে।'

জর্দানী জনগণের এই ধারণার মধ্য আইএমএফ সম্পর্কে উন্নয়নশীল দুনিয়ার মানুষের সত্যিকার মনোভঙ্গিই ধরা পড়েছে। টাইম' ম্যাগাজিনের নিবন্ধকার হাওয়ার্ড

www.icsbook.info

বলছেন, আইএমএফ - এর তেরশ' কোটি ডলার ঋণ উন্নয়নশীল দুনিয়ার আজ দুঃখের কারণ এবং এমন কোন সংস্থা নেই যা আইএমএফ-এর মত তাদের বেদনার উৎস।

আইএমএফ সম্পর্কে উন্নয়নশীল দুনিয়ার মানুষের এই মনোভাবের কারণ হলো, আইএমএফ- এর পুলিশী ছড়ি এই অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকেই আঘাত করছে বেশী। আইএমএফ তার ঋণের সাথে যে সব নোসখা নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যাচ্ছে, তার একটা দিক হলো: 'ভর্তুকি হটাও, মূল্য বাড়াও, মজুরি বাড়াও।' এই নোসখার প্রথম দু'টি প্রত্যক্ষভাবে দরিদ্র জনগণকে আঘাত করে। আর তৃতীয় নোসখাটি, যাকে প্রতিকারমূলক বলা যেতে পারে, তা কার্যত মানুষের কোনই উপকার করে না। এর প্রথম কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনসংখ্যার মাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশই মজুরির আওতায়। দ্বিতীয় কারণ, যারা মজুরির আওতায় পড়ে তারাও মজুরির চেয়ে মূল্যবৃদ্ধি বেশী হওয়ার ফলে বিপদে পড়ে যায়। সুতরাং 'ভর্তুকি হটাও' ও 'মূল্য বাড়াও'-এর শ্লোগান উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র মানুষের মাথায় দুঃখের বোঝা আরও বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক।

বাংলাদেশ আইএমএফ -এর পরামর্শে কৃষি খাতের সার, কীটনাশক, সেচ যন্ত্রপাতিতে সরকার যে ভর্তুকি দিত, তা প্রত্যাহার করেছে। এমনকি সেচ যন্ত্রপাতি ভাড়ায় দেয়া হতো, তাও বন্ধ করা হচ্ছে। সরকারের এসব পদক্ষেপের ফলে সার, কীটনাশক ওষুধ ও সেচ যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে দুইটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। এক, কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচা বাড়ছে এবং সেই হেতু তার মূল্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুই, ছোট কৃষকদের ক্ষেত্রে কৃষি সরঞ্জামের ব্যবহার কমে যাচ্ছে এবং তারা পানি জমিদারদের (যারা সেচকল বসিয়ে পানি বিক্রি করে) শোষণ -নির্যাতনের শিকারে পরিণত হচ্ছে। এ দুটি কারণের দ্বিতীয়টি দরিদ্র ও ছোট কৃষকদের উৎপাদন হ্রাস করে তাদের আরও দরিদ্রতর করবে এবং প্রথম কারণটি অর্থাৎ কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য বিশেষ করে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি দরিদ্র জনগণের অনাহার- অপুষ্টির কারণ ঘটাবে। আর এর অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে দরিদ্র ও ছোট কৃষকদের জমি-জিরাত অভাবজনিত বিক্রয় হওয়ার মাধ্যমে ধনীদের ঘরে গিয়ে জমা হবে। অন্যদিকে আইএমএফ- এর পরামর্শে কর্মচারীদের বেতন -মজুরিও বাড়ানো হচ্ছে। দৃশ্যত এটা অত্যন্ত ভাল সিদ্ধান্ত। কর্মচারী-শ্রমিকদের মহার্ঘ ভাতার আকারে এই যে বেতন-মজুরি বাড়ল, তাতে তাদের লাভ হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে এর প্রতিক্রিয়া কি? ভাল অবশ্যই নয়। বেতন-মজুরি বৃদ্ধির আকারে মার্কেটে বাড়তি মুদ্রার আগমন জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের যে উপকার হবে মনে করা হয়েছিল তা ধুয়েমুছে নিয়ে যাবে। এর ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের অবস্থান কমপক্ষে যা ছিল তাই থাকবে, কিন্তু বাড়তি দুর্ভোগের শিকার হবে দরিদ্র কৃষক জনসাধারণ যাদের কোন বেতন-মজুরি নেই বলে তা বাড়ার প্রশ্নও উঠেনি। কিন্তু সরকার বেতন-মজুরি বৃদ্ধির আকারে যে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছেন, তা যদি কৃষি সরঞ্জামে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ট্যাক্স-রিবেটের ক্ষেত্রে দেয়া হতো, তাহলে দ্রব্যমূল্য কমে যেত এবং কর্মচারী-অকর্মচারী কৃষক-অকৃষক সকলেই সমভাবে উপকৃত হতো। কিন্তু

www.icsbook.info

আইএমএফ-এর চোখ এ ভালোর দিকে যাবে না। তারা চায় বেতন-মজুরি, দ্রব্যমূল্য বাড় ক। তাতে টাকার অংকে জিএনপি বাড়বে, মাথা প্রতি আয় বাড়বে। দরিদ্র জনগণের দুর্ভোগ বাড় ক, ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে যাক, তাতে তাদের কি? সাহায্যদাতা আইএমএফ-এর এই গণবিরোধী রূপই উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে তাকে ভয়ংকর করে তুলেছে।

আইএমএফ প্রচণ্ড রকম ভর্তুকি বিরোধী। তাদের কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, ভর্তুকি অর্থনীতির জন্যে একেবারেই এক না জায়েয জিনিস, ঘৃণ্য একটা পন্থা। কোনকালেই কেউ বোধহয় এটা করেনি, করে না। উন্নত দেশগুলোতে বোধ হয় এই কাল জিনিসটার কোন অস্তিত্বই নেই। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আইএমএফ -এর হেড কোয়ার্টার যে দেশে অবস্থিত, যেখানে দাঁড়িয়ে আইএমএফ ভর্তুকির বিরুদ্ধে নসিহত করে, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সম্ভবত বিশ্বের মধ্যে কৃষিখাতে সবচেয়ে বড় ভর্তুকিদাতা দেশ। কৃষিখাতে সে প্রতি বছর ৭৮ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে থাকে। এই বিপুল ভর্তুকিও সেখানকার কৃষকদের দেউলিয়া হওয়া রোধ করতে পারছে না। খৃষ্টিয়ান সায়েন্স মনিটর এর Kathleen Agena লিখছেন, "Government subsidies to agriculture now amount to approximately $ 26 billion annually and are expected to rise in the future. Yet despite this enormous allocation of federal funds farms continue to full into bankruptcy."

বাংলাদেশে কৃষিঋণের একটা অংশ অনাদায়ী থাকাকেও আইএমএফ মহা অপরাধ হিসেবে দেখে যেন এমনটি আর কোন দেশে হয় না। যার জন্যে সে দরিদ্র কৃষকের কাছ থেকে জুলুম করে বকেয়া ঋণ আদায়েরও পরামর্শ দেয়। কিন্তু ঋণ অনাদায়ী থাকার এ ধরনের অবস্থা সব দেশেই আছে, উন্নত দেশেও আছে। সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঋণ অনাদায়ীর দৃশ্যটা আরও ভয়াবহ। ঐ Kathleen Agena -এর ভাষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'Farmers could not pay their debts and widespread bankruptcies occured' ঋণ পরিশোধের ভয়ে সেখানে কৃষক বাড়ী-ঘর, জমি-জিরাত ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ দৃশ্য সেখানে অনেকটা নিয়মিত। কিন্তু আইএমএফ-এর পুলিশী ছড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে না। এখানে তার অস্ত্র ভোঁতা। সেখানকার এসব কিছুই আইএমএফ-এর কাছে বৈধ।

আইএমএফ-এর এই ধরনের 'ডবল স্ট্যান্ডার্ড' নীতিই উন্নয়নশীল দেশের জনগণের দুঃখের কারণ। তার অসহযোগিতার কারণেই আমাদের কৃষি অর্থনীতি গোড়া থেকে মজবুত হয়ে উঠতে পারছে না। তার ফলে দেশের শিল্প কাঠামোও নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে না। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে কল্যাণ এবং উন্নয়ন দু'টোই এক সাথে প্রয়োজন। অন্ধ পুঁজিগঠন বা উন্নয়ন প্রবণতা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দুর্দশা বাড়াবে, যেমন বাড়াচ্ছে। কিন্তু আইএমএফ-এর দ্বিমুখী মূল্যবোধ আচ্ছন্ন চোখে ও জিনিসটি ধরাই পড়ছে না।

১২-০৯-১৯৮৯

www.icsbook.info

সোভিয়েত নেতা গর্বাচভের উদারনীতি যা 'পেরেসস্ট্রয়কা' নামে পরিচিত, অসম্ভব রকমের জনপ্রিয় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অন্ধকারের রাজ্যে আলোর মূল্য খুব বেশী। সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্যাতনমূলক শাসনের জমাট অন্ধকারে মানুষ এই আলো হিসেবেই যেন ধরে নিয়েছে গর্বাচভের 'পেরেস স্ট্রয়কা'কে। সুতরাং চার দিকের এই সোৎসাহ আলোচনার খুবই যুক্তি আছে। আরো উৎসাহের ব্যাপার হলো, পেরেসস্ট্রয়কার আলোতে ইতোমধ্যে কিছু ভালো জিনিস দৃষ্টিগোচর হয়েছে। স্ট্যালিন আমলের নির্যাতন কাহিনী নিয়ে তৈরি 'রেপেট্যান্স' নামক ছবি নিষিদ্ধ তালিকায় পড়ে কোল্ডস্টোরেজে গিয়ে ছিল, গর্বাচভের নতুন চলচ্চিত্র নীতির ফলে রেপেন্ট্যান্স ছাড়া পেয়েছে। নতুন নীতির ফলেই পত্র পত্রিকায় স্বাধীনচেতা সৃজনশীল সম্পাদক নিয়োগ লাভ করেছে, নির্বাসিত লেখক জোসেক ব্রডস্কি ও ভিলাদিমির ন্যাবোকোভকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে, বিপ্লবের শত্রু, বুখারিনরা পুনঃজীবিত হয়েছেন, কালজয়ী লেখক বরিস পস্তনায়কের সাহিত্য এখন দিনের আলোর মুখ দেখছে এবং বহুদিনের নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলী আবার প্রকাশ হতে শুরু করেছে। এ সব লক্ষণ সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন নতুন দিনের পূর্বাভাস কিনা, গর্বাচেভ কোন নতুন রাশিয়ার নির্মাতা হতে যাচ্ছেন কিনা, ইত্যাদি বিষয় মানুষকে এক বড় আশায় উজ্জীবিত করছে। কিন্তু বড় আশা করার আসলেই কি কিছু আছে?

গর্বাচভের 'পেরেসস্ট্রয়কা' কি সেটাই প্রথমে দেখা যাক। কিন্তু তার আগে পেরেসস্ট্রয়কার পটভূমির দিকে নজর দেয়া দরকার। সোভিয়েত ইউনিয়ন মানুষের বাক স্বাধীনতাকে গলা টিপে মারতে গিয়ে মানুষের কাজ এবং উৎপাদনের আগ্রহকে শেষ করে দিয়েছে। সোভিয়েত শ্রমিকরা মজাক করে বলে, "তুমি আমাকে বেতন দেবার ভান কর, আমি তোমাকে কাজ দেবার ভান করি।" মজাকটি সোভিয়েত ইউনিয়নে পুরনো এবং বহুল প্রচলিত। এর মধ্য দিয়ে গোটা ব্যবস্থার উপর সোভিয়েত শ্রমিকদের প্রবল বিতৃষ্ণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আরেকটা কথা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রচলিত আছে। সেটা হলো, 'তুমি সোভিয়েত ইউনিয়নে যথেষ্ট আয় না করতে পার কিন্তু সেখানে তুমি খুব কাজ কর সে কথাও বলতে পার না।' অর্থাৎ সোভিয়েত শ্রমিকরা তাদের অবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট বলে কাজও করে কম। সোভিয়েত ইউনিয়নের গোটা উৎপাদন ক্ষেত্রেই এই অবস্থা চলছে বলে সেখানে উৎপাদন হার খুব কম। তার

www.icsbook.info

উপর রয়েছে উৎপাদিত দ্রব্যের মানের প্রশ্ন, সোভিয়েত ফার্মগুলো প্রতি বছর যে শিল্পদ্রব্য তৈরি করে তার একটা বিরাট অংশ বিক্রয়ের যোগ্য হয় না, এমনকি সাধারণভাবেও সেগুলো অব্যবহারযোগ্য। হিসেব কষে দেখানো হয়েছে, এই খাতে প্রতিবছর ৭০ বিলিয়ন রুবল গচ্চা দিতে হচ্ছে সোভিয়েত সরকারকে। গর্বাচভের মতে অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রের এই রোগগুলো ব্রেজনেভ এবং স্ট্যালিন যুগের সৃষ্টি। এই রোগের কারণ গুলোকেও গর্বাচভ চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এর বিরুদ্ধে। তাঁর যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হল : এক উৎপাদন বন্ধ্যাত্ব, দুই, পার্টি অভ্যন্তরের জড়-প্রবণতা এবং তিন, সমাজতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা। গর্বাচভের এই ত্রিমুখী সংগ্রামই তার 'পেরেসস্ত্রয়কা।'

'পেরেসস্ত্রয়কা'র যে অর্থনৈতিক রূপ আমরা দেখছি, তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে অনেকটা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। তাদের অর্থনৈতিক ববস্থাপনা পরিচালনাসহ উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, শ্রমিকদের বেতন, ইত্যাদি তারাই নির্ধারণ করবে। উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ এবং বিক্রির জন্যে তারাই দায়ী থাকবে। কোয়ানটিটির চাইতে কোয়ালিটির দিকেই তাদের নজর বেশী দিতে হবে। নিজের শক্তিতেই তাদের চলতে হবে, না পারলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। গর্বাচভের এ অর্থনৈতিক পেরেসস্ত্রয়কা ইতিমধ্যেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। কর্মচারী ট্রান্সফার, পেশা পরিবর্তন, কর্মচারী ছাঁটাই, মিল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বন্ধের কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েত সংবাদপত্রের খবর অনুসারে গত জুন থেকে দুটি কারিগরী মন্ত্রণালয়ের ৬৮০ জনকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঘটনার একটি হল, পাঁচটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ৩২শ' কর্মচারী সরে গিয়ে অন্যত্র কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। খোদ মস্কোর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট থেকে ৬০ হাজার লোককে সরানোর পরিকল্পনা গর্বাচভ সরকার করছেন। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন স্থগিত অথবা বন্ধ ঘোষণার ব্যাপারটা ক্রমেই সাধারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই রিজকভ সম্প্রতি সুপ্রিম সোভিয়েতে বলেছেন, দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মোট ১৩ ভাগ বন্ধ করে দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সরকারী হিসেব অনুসারেই আগামী দু বছরের মধ্যে ইস্পাত শিল্পের ১০ হাজার কর্মী তাদের চাকরি হারাচ্ছে। আর ১৯৯০ সালের মধ্যে সমগ্র শিল্প খাত থেকে ৯০ হাজার কর্মচারীর পদ বিলোপ ঘটছে। এছাড়া পৌনে তিন লাখ লোককে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য করা হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারত্ব নেই বলে দাবী করা হয়। কিন্তু এখনই সেখানে তিন ধরনের ছদ্মবেশী বেকারত্ব রয়ে গেছে। গর্বাচভের নতুন নীতি অবশেষে 'ফুল এমপ্লয়মেন্ট'-এর দায়িত্ব না নিয়ে বেকারত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে।

www.icsbook.info

গর্বাচভের এসব সংস্কার পরিবর্তন দেখে অনেকেই মনে করছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসছে। গর্বাচভের সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চয় এবার মুক্ত সমাজ এবং পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতামূলক ও স্বাধীন অর্থনীতির দিকে যাচ্ছে। অনেকেই ভাবছেন 'সমাজতান্ত্রিক রক্ষণশীলতার' বিরুদ্ধে গর্বাচভের জিহাদ ঘোষণা অন্য অর্থে সমাজতন্ত্রের কবর রচনার দিকেই যাচ্ছে। গর্বাচভ মস্কোর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটে যুগ সঞ্চিত কেন্দ্রীয়করণ প্রবণতার যে জমাট পাহাড় ভাংতে চাচ্ছেন, তা দেখে অনেকেই মনে করছেন মস্কো হয়তো তার অঞ্চলগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণের হাত শিথিল করবে পা সোজা করে মাথা তুলে দাঁড়াবার কিছু সুযোগ তাদের দেবে। এ সবই আসলে সুখ স্বপ্ন। গর্বাচেভ এমন কিছুই করছেন না যা দেখে সোভিয়েত মানুষদের নতুন জীবনের আশা করা যেতে পারে, আশা করা যেতে পারে সমাজতন্ত্রের নিগড় থেকে তাদের মুক্তির। গর্বাচেভ একথা পরিস্কার করে দিয়েছেন 'সোভিয়েত পলিটিক্যাল সিস্টেম' অর্থাৎ 'সোভিয়েত রাষ্ট্রের মৌল কাঠামো' এবং ডেমোক্রাটিক সেন্ট্রালিজম অর্থাৎ পার্টির শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নীচের সকল পর্যায়ে আনত মস্তকে মেনে নেয়ার প্রসেস অপরিবর্তনযোগ্য। এ দুই অপরিবর্তনযোগ্যতাকে মেনে নিলে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন মৌল পরিবর্তনই সম্ভব নয়। গর্বাচভ বলেছেন, 'তার সংস্কার নীতির মধ্যে কেউ পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে পারেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রের পথ ছেড়ে তার দেশ কোন উদারনৈতিকতার দিক যাচ্ছে তা ভাবলে বোকামিই হবে। পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলো সফরকালে তাদেরকে গর্বাচভ তাঁর সংস্কারনীতি অনুসরণ করে চলার পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু সেই সাথে তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ' সমাজতান্ত্রিক সমাজের অনড় মৌলনীতি হিসেবে তার ভূমিকা পালন করেই যাবে। তাঁর একথার অর্থ পরিস্কার ১৯৫৩ সালে, ১৯৫৬ সালে, ১৯৬৮ সালে এবং ১৯৮০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের দোহাই পেড়ে হাংগেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলান্ড ও আফগানিস্তানে যে রক্তাক্ত হস্তক্ষেপ ও হামলা পরিচালনা করেছিল তা অব্যাহত থাকবে। এই সেদিন গর্বাচভ রুশ বিপ্লবের ৭০ তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ঐতিহাসিকদের এক সম্মেলনে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবদান নিয়ে তিনি কত গর্বিত তা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে স্ট্যালিন থেকে গর্বাচভকে পৃথক করার কিছুই নেই। আসলে গর্বাচভ স্ট্যালিনের মাত্র কিছু অপকর্মের নিন্দা করেন যা পার্টি সেনাবাহিনী এবং গোটা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্ষতিসাধন করেছে।

গর্বাচভের এই দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পশ্চিম জার্মানীর স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক তার এক সমীক্ষায় সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, "He (Gorbachev) in no way condemns the socialist

www.icsbook.info

system on which the era of stalin and his successors was based' অর্থাৎ গর্বাচভ কোনভাবেই সমাজতান্ত্রিক সিস্টেমের নিন্দা করেন না, যার উপর স্ট্যালিন ও তার উত্তরসুরীদের শাসনকাল দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং সেই আগের কথায় আবার আসতে হয়, গর্বাচভকে তাঁর পূর্বসুরীদের থেকে পৃথক করে দেখার কোনই অবকাশ নেই। পার্থক্য যেটুকু তা হল অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য। ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় এসে স্ট্যালিন টাইপ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও সুযোগের দ্বারটা একটু বেশী খুলতে চেয়ে ছিলেন। ব্রেজনেভ ক্ষমতায় আরোহণের পর ক্রুশ্চেভ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং স্বাভাবিকভাবেই স্ট্যালিন তার কাছে পুনরুজ্জীবিত হয়। এখন গর্বাচভ সোভিয়েত শাসনদণ্ড হাতে নেবার পর ক্রুশ্চেভের ফেলে যাওয়া পতাকাই হাতে তুলে নিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও সুযোগের দ্বারটা আবার খুলতে চাচ্ছেন তিনি। এর দ্বারা তিনি চাচ্ছেন শিল্প-সাহিত্য অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে। ভেঙে ফেলতে চাচ্ছেন তিনি উৎপাদন বন্ধ্যাত্ব পার্টির জড় প্রবণতা এবং সমাজতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা নামের মস্কো কেন্দ্রিক অস্বাভাবিক শাসন-সেন্ট্রালিজমকে।

কিন্তু গর্বাচভ যতটুকুই চাচ্ছেন, পারবেন কি তা করতে? মস্কোতে কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের যে পর্বতপ্রমাণ জমাটবদ্ধতা তা-ই হল সমাজতান্ত্রিক রক্ষণশীলতার কেন্দ্র বিন্দু যা গর্বাচভকে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাঙতে হবে। ক্রুশ্চেভও এ চেষ্টা করেছিলেন। কাজও কিছু করেছিলেন তিনি। দেশকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোনে ভাগ করে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সবকিছুর মস্কো কেন্দ্রিকতাকে কমিয়ে এনে ছিলেন এবং এই নীতি অনুসারে মস্কোর জাঁদরেল আমলাদের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল যাতে তারা উৎপাদনের কাছাকাছি থেকে সব দেখতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপই অবশেষে ক্রুশ্চেভের পতন ডেকে আনে। তার পতনের সাথে সাথে তার সব সংস্কার বাতিল হয়ে যায় এবং মস্কোর আমলাতন্ত্র তার জায়গায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক বছর পর গর্বাচভ ক্রুশ্চেভের পুরাতন পথে নতুন যাত্রা শুরু করেছেন। তিনি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন তো? সুবিধার জন্যে পলিটব্যুরো,

সেন্ট্রাল কমিটি প্রভৃতি 'কি পয়েন্টে' তিনি তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করে নিয়েছেন, কিন্তু এটুকু তার শেষ রক্ষার জন্যে যথেষ্ট হবে? দেখা যাক ভবিষ্যৎ কি বলে।

২৩-০২-১৯৮৮

www.icsbook.info

॥ দুই ॥

বহুদিন আগে পড়া কম্যুনিস্ট বিপ্লবের উপর লিখিত একটা উপন্যাসের কয়েকটা ডায়ালগের কথা মনে পড়ছে। ডায়ালগটিতে উপন্যাসের নায়ক তার কম্যুনিস্ট গুরুর স্মৃতিচারণ করেছেন। বলছেন ঃ

"আমার আজও স্মরণ আছে, একদিন মাঝ রাতে উঠে পেন্সিল দিয়ে হঠাৎ তুমি দেওয়ালের গায়ে অংক কষতে বসলে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি করছ? তুমি জবাব দিলে, তামাম দুনিয়ার আয়তন হিসেব করে দেখলুম।"

' কেন?

' দেখলুম কত জমি আর কত মানুষ। জমির উৎপাদনকে মানুষের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলুম।'

' কি পেলে'

'মানব সভ্যতার ক্রাইসিস কাটল। খাদ্য উদ্বৃত্ত হচ্ছে। সমস্যা মিটে গেল।–

আজ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পর নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ক্রাইসিস কাটেনি। সব মানুষের সবটুকু ক্ষিধে তবু মিটল না। ক্ষিধে কেবল পেটের নয়, মনেরও। তোমার রাতের অংক দিনের আলোয় ভুল প্রমাণিত হয়েছে।...

রুশ বিপ্লবের পঁয়ত্রিশ বছর পরের এক চিত্রানুভূতি এটা। কম্যুনিস্টদের 'সর্বশক্তিমান' স্ট্যালিনের তখন শেষ কাল। রাশিয়ার লাঙ্গলের ফলায় নাকি তখন সোনা বেরুত। সে সোনায় নাকি দেশটা সোনাময় ছিল। অভাব অনটন ও দুঃখ -বেদনার নাম গন্ধও নাকি তখন কোথাও ছিল না। উপন্যাসটির নায়ক রাশিয়ার সে সময়কার আহত বিবেক এবং লাঞ্ছিত মানবতার দিকটাই এখানে তুলে ধরেছেন। তারপর গত হয়েছে আরও ৩৫টি বছর। বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষ যা আছে তার চেয়ে মাটি অনেক বেশী। মানুষের সংখ্যা দিয়ে মাটিকে ভাগ করলে সেখানে অভাব থাকার কথা নয়, বরং উন্নতি সমৃদ্ধি আকাশ স্পর্শ হবার কথা। কিন্তু হয়েছে উল্টো। সেখানে মানুষ দিয়ে মাটিকে ভাগ করে ক্রাইসিস মেটেনি। অন্ততঃ পেটটা ভরার কথা ছিল, তাও ভরাতে পারেনি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী দেশের কাছে প্রতি বছর কোটি কোটি টন খাদ্যের জন্যে তাকে হাত পাততে হয়। তার উপর তাদের সমৃদ্ধির রামধনু অত্যন্ত দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে ১৯৭১-৭৫ সালের ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সোভিয়েতের প্রবৃদ্ধির হার আমরা দেখি ৫ দশমিক ১ ভাগ। ১০ম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৬-৮০) পরিকল্পনার সময়কালে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩ দশমিক ৯ ভাগ। আর একাদশ পঞ্চবার্ষিক (১৯৮১-৮৫) পরিকল্পনায় এই প্রবৃদ্ধি নেমে আসে ৩ দশমিক ২ ভাগে। সোভিয়েতদের চলতি অর্থাৎ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবস্থা যে মোটেই ভাল নয়,

www.icsbook.info

গর্বাচেভের কম্যুনিস্ট ঐতিহ্য বিরোধী সংস্কার পরিকল্পনাই তার প্রমাণ। গরবাচেভ সোভিয়েতের কম্যুনিস্ট অর্থনীতি নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন তাঁর 'Perestroika and the New Thinking' গ্রন্থের বক্তব্যই তার সাক্ষী। এ গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে বলেছেন, 'এ অবস্থা চলতে থাকলে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা বড় শক্তি হিসেবেও তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না। (Beijing Review Aug. 15-21. 88) বস্তুতঃ গরবাচেভ বড় শক্তি হিসেবে সোভিয়েতের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেই সব রাখডাকের জাল ছিন্ন করে নগ্নভাবেই অর্থনীতির সংস্কার কাজ শুরু করেছেন।

এই সংস্কার কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে আর যাই হোক কম্যুনিস্ট অর্থনীতির শূন্য গর্ভতার বিষয় বিশ্ববাসীর কাছে ধরা পড়েছে। এই শূন্য গর্ভতা এতটাই যে সোভিয়েত অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্যে কম্যুনিস্ট আদর্শকে সামনে থেকে পেছনে সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়েছে। আমাদের দেশের মূর্খ মার্কসবাদীদের মত কেউ আমার এ কথাকে ঠিক নয় বলতে পারেন। যুক্তি দেখাতে পারেন, গরবাচেভের পেরেসন্ত্রয়কা কম্যুনিজমের অধীনই একটা সংস্কার প্রয়াস। আমি এ কম্যুনিষ্ট মূর্খদের দৃষ্টি সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। সেখানে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থানকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ৭০ বছর বয়সের কথা ভুলে গিয়ে অবলীলাক্রমে বলে দেয়া হয়েছে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের বর্তমান সময়টা এখনও অন্তবর্তীকালীন পর্যায়ে অবস্থান করছে। অন্তর্বর্তীকালের যে সংজ্ঞা অতীতে ছিল তাও নাকি পাল্টে ফেলতে হবে। বলা হয়েছে পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের বিজয় যেমন সহজ নয়, তেমনি তা সংক্ষিপ্ত সময়েরও কোন ব্যাপার নয়। কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ৭০ বছর পরের এ কথাগুলোকে কম্যুনিষ্ট আদর্শকে পাশ কাটানো এবং তা থেকে বিপরিতমুখী যাত্রা বলেই অভিহিত করতে হয়। ৭০ বছরেও যে অবাস্তব কম্যুনিস্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, তার জন্যে আরও নেয়ারই কৌশল এটা। এই কৌশল মুখ রক্ষা এবং কম্যুনিস্ট আদর্শের বাইরে স্বাধীন অর্থনীতি অনুসরণের একটা পথ খোলার জন্যেই।

দেখা যাচ্ছে, মার্কসবাদ বিপ্লবের ৭০ বছরের চেষ্টায় মানুষের পেট ভরাতে শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, মানুষকে অভুক্ত রেখেও সব সম্পদ এনে রাষ্ট্রের হাতে জমা করেও এবং লাখো শ্রমিককে বিনে মাইনায় পশুর মত খাটিয়েও অর্থনীতিকে বাঁচাতে পারছে না। তাই তো সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার সময়টা আরও বাড়িয়ে নিয়ে কম্যুনিজমের হাত থেকে বাঁচতে চাচ্ছে। বড়ই ল্যাজে গোবরে দশা তাদের। মাটিকে মানুষের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই ক্রাইসিস কাটবে বলে সোজা অংক কষে রেখে ছিল মার্কসবাদীরা। কিন্তু মূর্খ মার্কসবাদীরা বুঝেনি, মাটি ও মানুষের যিনি স্রষ্টা তার স্বাভাবিক আইনের অধীন না হলে মাটি ও মানুষও যথারীতি কাজ করে না, কাজ করতে পারে না। তাই অংক তাদের মেলেনি। উপন্যাসের এ নায়কটির ভাষায় 'তাদের রাতের অঙ্ক দিনের আলোয় ভুল প্রমাণিত হয়েছে।'

www.icsbook.info

তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কি কম্যুনিজম ছেড়ে দিচ্ছে? তাও নয়। কম্যুনিজম তাদের কাছে এখন আদর্শের নাম নয়, একটা শ্লোগান মাত্র। খুব সুবিধা এ শ্লোগানে, যা ইচ্ছে, তাই করা যায়। জনগণের হাত থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে এবং ধর্মীয় জীবনের বিলয় ঘটিয়ে 'সর্বশক্তিমান' সাজবার সুন্দর অপরূপ কৌশল এই কম্যুনিজম। এ 'সর্বশক্তিমান'দের আসল কথাই হলো শক্তি -সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নে এ শক্তিতে চিড় ধরেছিল। তাকে সংশোধন করার জন্যেই গরবাচেভের পেরেসস্ত্রয়কা এবং গ্লাসনস্ট। এ দুটো অস্ত্র হাতে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের 'সর্বশক্তিমান' হবার পথে গরবাচেভ অনেক দূর এগিয়েছেন। গ্রোমিকোকে সরিয়ে গর্বাচেভ যে প্রেসিডেন্ট হলেন তাও একক হাতে শক্তির পতাকা বুলন্দ করার জন্যেই। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে সরকারকে যেমন জনগণের উপর সর্বশক্তিমান হতে হয়, তেমনি রাষ্ট্র প্রধানকে সরকারের উপর 'সর্বশক্তিমান' না হলে চলে না। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রপ্রধান শেরেক বরদাশত করেন না। স্ট্যালিন করেননি, গর্বাচেভও করছেন না। গর্বাচেভও করছেন না। গর্বাচেভের কাছে স্ট্যালিনের রূপ বীভৎস। আমার সামনে গ্রোমিকো-গ্রীসিন ব্রেজনেভদের কেউ ক্ষমতায় এলে তার কাছে গরবাচেভ হবেন বীভৎস। আল্লাহর আনুগত্য বিমুখ মানব স্বেচ্ছা-চারিতার এক কদর্য রূপ। বিভিন্ন যুগে এ স্বেচ্ছাচারিতার নাম বিভিন্ন হয়েছে। আজকে তার এক নাম কম্যুনিজম। ক্রাইসিস মেটাবার নামে কম্যুনিজমই আজ মানবতার জন্যে এক বড় ক্রাইসিস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কম্যুনিষ্টরা আজ বড় বিপাকে। বিশেষ করে তাদের ইনটেলেকচুয়ালরা। তারা একটা অবাস্তব তত্ত্বকে ধ্রুব বলে ধরে নিয়ে মুখ উঁচু করে বুলি কম কপচানান। নিজেরা কিছু না বুঝে, অন্যের বুঝ ধার করে এতদিন তারা সব-জান্তার বড়াই করে এসেছেন। বললে কোন কথা তাদের কানে যায়নি। যাবার কথাও নয়। কারণ নিজ বুদ্ধিতে যারা চলে, নিজেদের বিবেক ও বিচার-বুদ্ধিকে যারা অনুসরণ করে, তারা কথা বললে বুঝে। কিন্তু যারা অন্যের মুখে কথা বলে, অন্যের কানে শোনে এবং অন্যের চোখে দেখে, তাদের বুঝাতে যাওয়া নিরুত্থক এরা উৎকট ধরনের শিক্ষিত মুর্খ। আমাদের দেশের এই বামপন্থী ইনটেলেকচুয়ালরা আজ চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন। তাদের দুর্ভাগ্য, তাদের শেষ আশ্রয়স্থলেই আজ আগুন ধরেছে। মার্কসবাদের ঘাঁটিতেই আজ মার্কসবাদ বিপন্ন। গর্বাচভ ক্ষমতায় আসার পর এখন শোনা যাচ্ছে, মার্কসবাদ এতদিন যে অর্থনীতি পরিচালনা করেছে, সে অর্থনীতি মানুষকে দু মুঠো খাবার দিতে পারেনি, বাঁচার জন্যে যে ন্যূনতম সামগ্রী প্রয়োজন, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। এই সেদিন গর্বাচভ সাইবেরিয়ায় বেড়াতে গেলেন। রাস্তার দু ধারে বুভুক্ষু মানুষ লাইন দিয়ে তারে বলল, তারা অভুক্ত, তারা নিঃস্ব। কঠোরতর লৌহশৃংখল বাঁধা এই মানুষরা এতদিন কথা বলতে পারেনি। 'গ্রাসনস্টের আড়ালে একটু শিথিলতার সুযোগ পেয়ে

www.icsbook.info

তারা মুখ খুলেছে। গর্বাচভ তাদের কি জবাব দিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু দেখা গেছে এই ঘটনার কয়েক দিন পর মস্কোতে অনুষ্ঠিত কম্যুনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির যে মিটিং-এ পরিবর্তন সূচিত হল, তা মার্কসবাদের গোড়া কেটে ছেড়েছে। এই পরিবর্তনে তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও নিলেন, এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, ক্রেমলিনের দু নম্বর নেতা কম্যুনিস্ট পার্টির অনড় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক প্রধান লিগাচেভকেও সরিয়ে দেয়া হল। এই পরিবর্তন শুধু মানুষের পরিবর্তন নয়, বড় রকমের আদর্শিক পরিবর্তনও। লিগাচেভকে সরিয়ে যাকে আনা হলো তিনি নতুন তাত্ত্বিক মেদভেদেভ। লিগাচেভের সাথে মেদভেদেভের তত্ত্বীয় পার্থক্য একেবারেই মৌলিক। লিগাচেভ বাজার অর্থনীতিকে সরাসরি প্রত্যাখান করেন। তিনি বলেন, 'বাজার অর্থনীতি কম্যুনিজমের আদর্শের একদম পরিপন্থী।' মেদভেদেভের মত কিন্তু এর একেবারেই উল্টো বাজার অর্থনীতির তিনি একজন বড় প্রবক্তা। লিগাচেভের জায়গায় নিয়োগ লাভের একদিন পরই তিনি রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের কাছে বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে বলেন, 'চাহিদা ও সরবরাহ নীতির ভিত্তিতেই কেবলমাত্র কার্যকর অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব। মেদভেদেভের এই বাজার অর্থনীতির সাথে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনই পার্থক্য নেই। আর মেদভেদেভের এই তত্ত্ব মার্কসীয় তত্ত্বের পরিষ্কার পরিপন্থী। মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বে শ্রমিক ছাড়া আর কোন কিছুর ভূমিকা নেই। শ্রমিক ও ভোক্তার মাঝখানে আর কারও অস্তিত্ব রাখা হয়নি সেখানে। ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, সংস্থাপক ইত্যাদি সবাইকে কার্লমার্কস শোষক বলে অভিহিত করেছেন। মার্কসের এই মূল্যতত্ত্বে চাহিদা ও সরবরাহ কোন গুরুত্ব বহন করে না। মার্কস হয়তো মনে করেছিলেন কোন জিনিস উৎপাদিত হবার পর তা ফ্যাক্টরী থেকে লাফ দিয়ে গিয়ে ভোক্তার মুখে পড়বে। কিন্তু তা পড়ে না, পড়তে পারে না। আর তাই শ্রমিকের শ্রমের মূল্য দিয়েই শুধু কোন পণ্যের মূল্য নিরূপিত হতে পারে না। পারে না বলেই মার্কসের বাজার অর্থনীতি রাশিয়ায় ফেল করেছে এবং আজ রাশিয়ায় নতুন বাজার অর্থনীতির প্রবর্তন হচ্ছে যা কম্যুনিজমের পরিপন্থী। উল্লেখ্য, মেদভেদেভ মার্কসের শুধু বাজার অর্থনীতি পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হননি, ঐ রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের আরও বলেছেন, ক্যাপিটালিস্টদের কাছ থেকেও শিক্ষা নিতে হবে।' কম্যুনিস্টদের শ্লোগানের সাথে যারা পরিচিত আছেন, তারা মেদভেদেভের এই কথায় নিশ্চয় বিস্ময় বোধ করবেন। ভাববেন পুঁজিবাদের কবরের উপর যেখানে কম্যুনিজমের প্রাসাদ তৈরি, সেখানে আজ রাশিয়ায় বিপ্লবের ৭০ বছর পর পুঁজিবাদ থেকে শিক্ষা নেবার প্রশ্ন উঠছে কি করে? মার্কসবাদের ট্র্যাজেডি এখনেই। লৌহ শাসনের কাল যবনিকা এতদিন পর্যন্ত মার্কসবাদের ব্যর্থতা ধামচাপা দিয়ে এসেছে। কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না। মৃত মার্কসবাদের পচা গন্ধ রাশিয়ার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। বিপর্যয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া রোধের জন্যেই পাগল হয়ে উঠেছেন গর্বাচভ। তাঁর 'গ্লাসনস্ট' এবং 'পেরেস্ত্রয়কা' এই প্রতিক্রিয়া রোধেরই কর্ম সূচী। এই কর্মসূচী নিয়ে গর্বাচভ কতদূর যাবেন তা জানি না। তবে

www.icsbook.info

অর্থনীতিতে মার্কসবাদের কোন চিহ্ন থাকছে না লক্ষণ দেখে তাই মনে হচ্ছে। মেদভেদেভের হাত বাজার অর্থনীতি পর্যন্ত গিয়েই থেমে থাকছে না। শিল্প কারখানার মালিকানার ক্ষেত্রেও বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। এমন ইংগিত নতুন তাত্ত্বিক নেত মেদভেদেভের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রের সব উৎপাদনশীল সম্পদ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হবে, একথা প্রত্যাখ্যান করে মেদভেদেভ সেদিন ঐ রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের বলেছেন, 'সমবায় ভিত্তিক' মালিকানা বা ব্যক্তি মালিকানায় ভাড়া খাটানোর যে এক্সপেরিমেন্ট বর্তমানে চলছে, তা বড় বড় শিল্প ইউনিটের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করতে হবে।' পাঠকরা আমার সাথে একমত হবেন, কম্যুনিস্ট মূল্যতত্ত্ব বাতিল করে প্রতিযোগিতামূলক ও দর-কষাকষি ভিত্তিক স্বাভাবিক বাজার অর্থনীতি চালু করার পর যদি শিল্প কারখানাও এইভাবে বেসরকারী মালিকানায় চলে যায়, তাহলে অর্থনীতিতে কম্যুনিজম বলে আর কিছু থাকে না।

আজ লিখতে চেয়েছিলাম লেবানন নিয়ে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ব হ্রাসের নতুন খবরটি পড়ে এ ব্যাপারে কিছু বলার লোভ আমি সামলাতে পারলাম না। খবরটিতে চোখ বুলিয়ে প্রথমেই আমার মনে যে প্রশ্নটা জাগল তা হল, এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের দেখাদেখি চীনে কম্যুনিজম এসেছিল, এখন কি চীনের দেখাদেখি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কম্যুনিজম বিদায় নেবে? সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কসীয় তত্ত্বের পরিপন্থী 'বাজার অর্থনীতির' দিকে যাচ্ছে, গত সপ্তাহে এ সম্পর্কে লিখেছি। এ 'বাজার অর্থনীতির চিন্তা, আমি বলব, চীন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নে সংক্রমিত হয়েছে। চীনে এখনও 'বাজার অর্থনীতি' একেবারে চালু হয়ে যায়নি, একথা ঠিক। কিন্তু দেং শিয়াও পিং এক দশক আগে ক্ষমতায় আসার সময় থেকেই এর জন্যে তৈরি হচ্ছেন। এ লক্ষ্যে অনেক খানি পথ এগিয়েছেনও তারা। গত ৩রা জুন তারিখে গ্রেট হলে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে দেং স্পষ্টই বললেন, The current price reform in China involves big risks, but can and will be accomplished, আর ঐ দিনই চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ঝাওজিয়াং ঐ সেমিনারে বলেন, 'Price will be guided by the market rather than fixed by the state'. বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে ঝাও জিয়াং এর এই কথাই অনেক পরে এই সে দিন শোনা গেল ক্রেমলিনের বর্তমান তাত্ত্বিক প্রধান মেদভেদেভের কাছ থেকে। সোভিয়েতরা যেন চীনাদের পায়ে পায়ে চলছে। গত পরশু খবরের কাগজে সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট পাটির কর্তৃত্ব হ্রাসের যে খবরটি পড়লাম, সে খবরটির জন্ম হয়েছে চীনে বলা যায় সেই এক দশক আগে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐ খবরে বলা হয়, কম্যুনিস্ট পার্টির ক্ষমতা খর্ব করে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে ঐ ক্ষমতা পূর্ণাংগভাবে সরকার এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত স্থানীয় পরিষদ সমূহকে দেয়া হবে। সন্দেহ নেই, এই সংস্কারের কথা বলা

www.icsbook.info

হচ্ছে ১৯৮৬ সালে গৃহীত সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির ২৭ তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে যাতে বলা হয়েছে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর কার্যাবলীর একটি সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণ করতে হবে। কিন্তু এ কথাগুলো চীনা নেতা দেং জিয়াও পিং বলেছেন অনেক আগে। ১৯৭৮ সালের পর দেং যে সংস্কারের সূত্রপাত করেন তার মূল কথাই হলে, উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী থেকে পার্টিকে পৃথক করা। দেং -এর মতে এ সবের উপর থাকবে পার্টির অপ্রতক্ষ এবং আদর্শিক নিয়ন্ত্রণ। গর্বাচেভ আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে এই কাজেই করছেন। এখানেই শেষ নয়, ভূমি ও শিল্পকারখানার মালিকানা প্রশ্নে চীন যা করেছে, করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তারও অনুসরণ করতে যাচ্ছে। চীনে আজ কৃষকরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে জমি লিজ নিচ্ছে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এর মালিক থেকে যাচ্ছে। শিল্প-কারখানাও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে ক্রমবর্ধমান হারে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। পিকিং-এর বর্তমান মোট ৫৫ হাজার শিল্প ইউনিটের ৫ ভাগই আজ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বলা হচ্ছে, আগামী দু' বছরের মধ্যে খোদ পিকিং -এর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প-কারখানার সংখ্যা মোট পরিমাণের ৩০ ভাগে নেমে আসবে। শুধু বড় শিল্প নয়, অস্ত্র কারখানার মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে দিয়ে দেয়ার কথা হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নও এ নীতিই অনুসরণ করতে যাচ্ছে। গত সপ্তাহের লেখায় শিল্প-কারখানা বেসরকারী হাতে লিজ দেয়া সংক্রান্ত সোভিয়েত তাত্ত্বিক প্রধান মেদভেদেভের যে কথা উল্লেখ করেছি তা থেকেও এটা পরিষ্কার। অর্থাৎ চীনের মত করেই সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কসবাদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই শুরুতেই যে প্রশ্ন তুলেছি তার উত্তর এই দাঁড়ায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের দেখাদেখি চীন মার্কসবাদ গলাধঃকরণ করেছিল, এখন চীনের দেখাদেখি সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কসবাদ বমি করছে। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, চীনারা তিন দশকেই মার্কসবাদকে চিনে ফেলে এবং তা থেকে উদ্ধার লাভের যাত্রা শুরু করে এখন থেকে এক দশকেরও বেশী আগে। কিন্তু সোভিয়েতদের মার্কসবাদের অসারতা বুঝতে সময় লাগে সাত দশক। এদিক দিয়ে চীনারা মনে হচ্ছে বেশী বাস্তববাদী এবং বুদ্ধিমান।

৪-১০-১৯৮৮

www.icsbook.info

এর আগের লেখায় আমি বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী সেবা সংস্থা সম্পর্কে বলেছিলাম, আমাদের দেশের জন্য ওরা কল্যাণকর নয়। এক ধরনের নব্য উপনিবেশবাদী লক্ষ্য সামনে রেখে তারা এদেশে কাজ করছে। সংখ্যালঘুদের ধর্মান্তরিত করে এবং সংখ্যাগুরুদের জাতিসত্তার বিকৃতি ঘটিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়। সন্দেহ নেই, তারা তাদের প্রকল্প এলাকায় জনচরিত্রে এক ধরনের বিপরীতমুখী প্রবণতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সুকৌশলে কাজ করছে। এসব কথা যখন লিখি তখন ভাবিনি যে, দেশীয় N. G. O দের ব্যাপারেও কিছু বলতে হতে পারে। কিন্তু এখন দেখছি বিজাতি - বিদেশীদের সাহায্যপুষ্ট কিছু স্বদেশী আমাদের দেশে আছে যাদের ব্যাপারে চোখ বন্ধ রাখার আর উপায় নেই। অবশ্য এ রকম একটা অনুভূতি আগেও ছিল, কিন্তু প্রকাশের পথ পায়নি। কিন্তু সম্প্রতি একটি কাগজে বাংলাদেশের উপর একটা সচিত্র বিবরণী পড়ার পর নির্বাক অনুভূতি ভাষা পেয়ে গেছে। কিছু না বলে তাই পারা যাচ্ছে না।

বিজাতি -বিদেশের সাহায্য পুষ্ট N. G. O. 'ব্র্যাক' ১৯৮৫ সালে 'A Quiet Revolution Women in Transition in Rural Bangladesh' নামে একটা বই প্রকাশ করেছে। বইটার লেখিকা Martha Alter Chen বইটা প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকায় ১৯৮৩ সালে। এর ২৬৫ পৃষ্ঠার একটা মানচিত্রে বাংলাদেশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হীন অবস্থায় দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ বইটার যিনি রচয়িতা তিনি হয়তো জানেন না বা মনে করেন না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ। এই বইটা যখন ১৯৮৫ সালে 'ব্র্যাক' বাংলাদেশে ছাপায়, তখন বাংলাদেশের ম্যাপটি ঠিকভাবেই ছাপানো হয়।

ঘটনার এখানেই শেষ। কিন্তু কথার শেষ তারপরও হয়নি। কথা উঠেছে ঘটনার সাথে ব্র্যাকের জড়িত থাকার ব্যাপার নিয়ে। ঘটনার যে বিবরণ উপরে পাওয়া গেল, তাতে ব্র্যাকের কোন প্রকার দোষ আমরা দেখি না। 'ব্র্যাক' ঐ মানচিত্রের জন্যে কোন প্রকারে দায়ী নয়। তার ছাপা বইয়ে মানচিত্র তো ঠিকভাবেই ছাপা হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে তার যে দায়িত্ব সে তা পালন করেছে। কিন্তু এই কৈফিয়তে সবকিছু ধুয়ে মুছে যায় না। গোল বেঁধেছে লেখিকাকে নিয়ে, লেখিকাদের সাথে 'ব্র্যাকে' - এর সম্পর্ক নিয়ে।

www.icsbook.info

লেখিকা নামের দিক দিয়ে ইংরেজ অথবা আমেরিকান মনে হয়। এবং তাঁর বই আমেরিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু তার সম্পর্কে প্রকাশিত বিবরণীতে বলা হয়েছে, লেখিকা মার্থা অলটার চেন দীর্ঘ সতের বছর ভারতে কাটিয়েছেন সেখানকার একজন পাদ্রীর কন্যা হিসেবে। তিনি অনর্গল বাংলা ও হিন্দি বলতে পারেন। মার্থা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মী পরিচয়ে একাধিবার বাংলাদেশে এসেছেন। সুতরাং তিনি বাংলাদেশকে জানেন না, এখানকার রাজনীতি ও ঘটনা প্রবাহ বুঝেন না তা নয়। অতএব লেখিকা সজ্ঞানে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাঁর বইয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র ঐভাবে দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সাথে লেখিকা সম্পর্কিত আরও কিছু তথ্য থেকে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, আসলে ব্যাপারটা কোন ষড়যন্ত্রেরই এক অসর্তক অথবা এক সাহসী প্রকাশ মাত্র। জানা যায়, লেখিকার বাংলাদেশস্থ সহকর্মীদের অনেকেই অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়ে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। এই বহিষ্কৃতদের একজনের নাম বলা হয়েছে জন পল। ইনি বার বার বাংলাদেশে এসেছেন এবং কয়েকবার বহিষ্কৃত হয়েছেন।

লেখিকা মার্থা ও জন পলদের সাথে 'ব্র্যাক'-এর সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। যোগাযোগ থাকার ভিত্তিতেই মার্থার বইটি 'ব্র্যাক' ছাপিয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে মার্থার বইটি আমেরিকায় প্রকাশিত হবার পর এ নিয়ে বাংলাদেশে লেখালেখি হয়। নিশ্চয় ব্যাপারটা 'ব্র্যাক' -এর অবগতির বাইরে থাকার কথা নয়। এরপরও বইটি ছাপা ব্র্যাকের জাতীয় রুচিবোধে বাধা উচিত ছিল, কিন্তু তা বাধেনি। এরপর জন পল বাংলাদেশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও 'ব্র্যাক' তাকে বারবারই বাংলাদেশে আসতে সহযোগিতা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের একটা প্রকল্পে 'ব্র্যাক' জন পলকে একটা কাজও জুটিয়ে দেয় বলে জানা যায়। এ থেকে একটা জিনিস সাবেত হয় যে, ব্র্যাক ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বাংলাদেশী জাতিসত্তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের সহযোগী অথবা এ ব্যাপারে নির্বাক ভূমিকা পালন করছে।

যে ষড়যন্ত্রের কথা এখানে উল্লেখ করছি, সে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা আজ খুবই স্পষ্ট। ব্র্যাক প্রকাশিত মার্থা অলটার চেন - এর বইয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম না থাকা কোন ভুলের ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। আমাদের ১৩০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের পার্বত্য চট্টগ্রামকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা একদা 'দক্ষিণ এশিয়ার আনতম অস্থির কেন্দ্র' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বলাবাহুল্য, বাইরে থেকে একটা মহল বিষয়টাকে এমনভাবে অবলোকন করছেন। বিদেশের কাগজে আজগুবি সব নিউজ ছাপা হচ্ছে। তুলে ধরা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের নানা রকম ভয়াবহ চিত্র। এসব প্রচারণাকে সম্বল করে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল - এর মত দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান ও রহস্যজনকভাবে বিশ্বব্যাপী অপপ্রচারে নেমেছে। আর সন্দেহ নেই এসব কিছুর পেছনে রয়েছে মার্থা অলটার চেন- এর ঘাঁটি ভারত। ভারত

www.icsbook.info

থেকেই নানা আজগুবি কাহিনী তৈরি করা হচ্ছে। এর সাথে সাথে বিএসএফসহ তাদের পাঠানো সন্ত্রাসবাদীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে গোপনে প্রবেশ করে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট-এর মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং এইভাবেই সে আজ কৃত্রিম উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। শ্রীলংকা সমস্যার জন্ম ভারত যেভাবে দিয়েছে, সেভাবেই আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তার ষড়যন্ত্রের যাত্রা সে শুরু করেছে। শ্রীলংকায় তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে তামিলরা, আর এখানে তারা হাত করতে চাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সরল, নিরীহ আমাদের উপজাতি নাগরিকদের। সীমান্তের ওপারে উদ্বাস্তু শিবির গড়ে একে তারা তাদের ষড়যন্ত্রের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। উদ্বাস্তুদের নাম দিয়ে তারা প্রচার করছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতভুক্তি চায় (পরিবর্তন, আগস্ট ৮৬)। উদ্বাস্তুদের দিয়ে তারা বলাচ্ছে যে, ১৯৩১ সাল থেকেই নাকি পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দারা ভারতের অন্তভর্ভুক্তি চেয়েছিল। এই হলো ভারতের মানসিকতা। এই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে ভারতের খৃষ্টান পাদ্রীর মেয়ে মার্থা অলটার চেন- এর মানচিত্রে। মার্থা অলটার চেন- এর মত আরো বিদেশী খৃস্টান মিশনারীরা যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন সেবা সংস্থার নামে কাজ করছে, তারাও এ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকা স্বাভাবিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যেসব উদ্ভট খবর বাইরে যাচ্ছে তার একটা বড় উৎস যে মিশনারীরা তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ যাতায়াত ও কাজ করার সুযোগ পেয়ে একদিকে তারা সেখানকার লোকদের বিভ্রান্ত করছে, প্রলুব্ধ করছে, অন্যদিকে নানা আষাঢ়ে গল্প তৈরী করে বাইরে পাঠাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গোটা বাংলাদেশে তথাকথিত বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজ বন্ধ হওয়া দরকার। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বেল্টে তাদের প্রবেশ অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়া উচিত। ব্র্যাক সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলতে চাই না। প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে ১৯৮৩ সালে মার্থার ঐ বই প্রকাশিত হবার পর নাকি একটা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার হাসর কি হয়েছে তা জানা যায়নি। এবারও আরেকটি তদন্ত কমিটি নাকি গঠিত হয়েছে, এও আগেরটার পরিণতি বরণ করবে কি না জানি না। তবে ব্র্যাকের মত স্বদেশী সংস্থার ব্যাপারে এইটুকু কথা অবশ্যই বলতে চাই, এরা যতদিন বিজাতীয় সাহায্য ও নানা এনামের মুখাপেক্ষী থাকবে ততদিন এরা দেশ ও জাতির জন্যে নিরাপদ নয়, মঙ্গলকর নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার, বিজাতিরা তাদের দেয়া সাহায্যের প্রতিটি পাইয়ের একটা রাজনৈতিক মূল্য চায়। এই মূল্য পরিশোধে যারা স্বীকৃত হয় তাদের দ্বারা দেশের ক্ষতি অবধারিত।

২১-০৭-১৯৮৭

www.icsbook.info

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর বাম বুদ্ধিজীবীরা পারলে এখনই যেন ধর্মকে এদেশ থেকে সমূলে উপড়ে ফেলেন। ধর্ম যদি হাত দিয়ে ধরার মত কোন বস্তু হতো, তাহলে এ বাম বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয় এতদিনে মনে হয় তাকে কুচি কুচি করে কেটে আত্মপরিতৃপ্তি লাভের ব্যবস্থা করতেন।

কিন্তু এঁদের জন্যে বড় আপসোসের ব্যাপার হল, এঁরা যখন মার্কসীয় তত্ত্ব গেলার নতুন আবেগে ধর্মের বিরুদ্ধে দা-কুড়াল নিয়ে ছুটছেন, তখন মার্কসীয় তত্ত্বের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে তাদেরই স্বগোত্রীয়রা ৭০ বছর ধরে ধর্মের মুণ্ডপাত করার পর এখন ধর্মকেই মানুষ হিসেবে বাঁচার একমাত্র অবলম্বন মনে করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ যারা ধর্মের এই উত্থান চাইছেন তাঁরা অন্য কেউ নন, রাশিয়া এবং রাশিয়ার কম্যুনিস্ট বিপ্লবেরই তারা শ্রেষ্ঠ সন্তান। এদের কয়েকজনের কথা কিঞ্চিত এখানে আলোচনা করতে চাই।

রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান লেনিন পুরষ্কার বিজয়ী সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য এবং বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ আইঘর শফরাভিচ তাঁর 'Does Russia have a future' প্রবন্ধে ধর্মীয় উত্থানের আকুল আকৃতি জানিয়ে প্রায় অতি চিৎকারের স্বরে বলছেন, "... এই হল রাশিয়ার অবস্থা। এ দেশটি মৃত্যু মিছিল পার হয়ে এসেছে, সময় এসেছে এখন ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরের প্রতি কান পাতার। কিন্তু ঈশ্বর তো মানুষকে দিয়েই ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সুতরাং তারাই আমরা, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, যারা ঈশ্বরের এ কণ্ঠস্বর শুনতে পারি। অথবা আমরা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না-ও করতে পারি এবং লাশ হয়ে শুয়ে থাকতে পারি সেই বন্যতার মধ্যে যা বিধ্বস্ত রাশিয়াকে গ্রাস করবে।" (From under the Rubble, Page - 294)

এখানে আইঘর শফরাভিচ রাশিয়ার যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে হৃদয়ের এই আকুতি প্রকাশ করেছেন তার চিত্র আইঘর শফরাভিচের ভাষায়, যা ঐ নিবন্ধেই বলেছেন, এই রকম ঃ "নিৎসের একটা সাহিত্য -নকশায় 'ঈশ্বর মৃত' বলে যে কথা বলা হয়েছিল, আমাদের দেশে তাই এখন বাস্তবতা এবং আজ আমরা তিন পুরুষ ধরে এখানে ঈশ্বরবিহীন এক ভয়ংকর জগতে বাস করছি।" শফরাভিচ তার ঐ নিবন্ধে সোভিয়েত জীবন সম্পর্কে আরও লিখেছেন ঃ "রাশিয়ায় জাতীয় বিবেক চারদিকের সহিংস সন্দেহের মধ্যে নির্বাসিত অপরাধীর মত পুলিশ প্রহরায় বাস করছে।... রুশীয় পূর্বপুরুষদের ইতিহাসকে এমন কুৎসিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে রুশীয়দের কোন অতীত ছিল, একথা ভুলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ... আজ সোভিয়েত জাতীয় চরিত্রের যে প্রকাশ ঘটেছে, তা সমাজতান্ত্রিক অভিশাপেরই বাস্তব ফল। এই

www.icsbook.info

সমাজতান্ত্রিক আদর্শ যেমন মানুষের ব্যক্তিজীবনের বিরোধী, তেমনি তা প্রতিটি জাতির শত্রু। এ আদর্শ তার স্বার্থ হাসিলের জন্যে মানুষের আশা - আকাংখাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে খুবই সফল কিন্তু জাতিসমূহের সর্বাধিক সর্বনাশই এর মূল প্রবণতা।"

আইঘর শফরাভিচের পাশে রাশিয়ার আরেকজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের উক্তিও এখানে উল্লেখ করতে চাই। তিনি হলেন আঁদ্রে শাখারভ। বিশ্ববিখ্যাত অণুবিজ্ঞানী শাখারভ রাশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে বলছেন, " আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে বাস করছি। কিন্তু অগণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের দৈহিক নিপীড়ন এর মূল কারণ নয়। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আহত না হলে মানুষ এ সবও সয়ে যেতে পারে।..... বর্তমান সোভিয়েত ব্যবস্থার কোন তুলনা নেই দুনিয়ায়। দৈহিক ও আর্থিক জীবনের নিপীড়ন ছাড়াও এই ব্যবস্থা মানুষের আত্মার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ দাবী করে। দাবী করে মিথ্যার স্তূপে বিবেকের সক্রিয় ও নিরবচ্ছিন্ন সহাবস্থান। যে মানুষ নিজেকে মানুষ বলে বোধ করে, সে আত্মার এই বিনাশসাধন এই আধ্যাত্মিক দাসত্বকে স্বীকার করে নিতে পারে না। আমাদের স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হলো আত্মার স্বাধীনতা। আমরা যদি একে দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রের পদানত হতে দেই, তাহলে আমরা মানুষ বলে গণ্য হবো না" (As breathing and con -ceiousness return by Alexander Solzhenitsyn)

প্রকৃতপক্ষে এই মানুষ বলে গণ্য হবার জন্যেই আজকের রাশিয়ায় ধর্মের উত্থান কামনা করা হচ্ছে। রাশিয়ার চিন্তাশীল ব্যক্তি যাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার শক্তি এখনও আছে, তারা পাগল হয়ে উঠেছেন কম্যুনিস্টদের দ্বারা নির্বাসিত ধর্মকে আবার জনজীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যে। সোভিয়েত ইউনিয়নের Art Historian ইউজেনি বারারানভ তাঁর 'The schism between the church and the world,' প্রবন্ধে বলেছেন, "খোদাহীন মানবতাবাদের প্রতিরোধ করা এবং অধর্মীয় মানবতাবাদে রূপান্তরিত হওয়া থেকে মানবতাবাদকে রক্ষার জন্যে খৃস্টিয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আজকের মত আর কখনও অনুভূত হয়নি। খোদাহীন মানবতাবাদ বিশ্ব মানবকে ধ্বংস করছে। .. খৃস্টীয় এ কর্মোদ্যোগ তার সংস্কার নয়, বরং খৃস্টীয় জীবন ও চেতনায় রূপান্তরের মাধ্যমে বিশ্ব-জীবনে নিয়ে আসবে রূপান্তর। ..

আমরা যখন এ পথানুসারী হব, একমাত্র তখনই আমরা খোদাহীনতার মোকাবিলা করে আমাদের এ পৃথিবীকে স্বকীয় নীতির উপর দাঁড় করাতে পারবো। একমাত্র তখনই যারা সত্যের সমীপবর্তী অথচ তার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের আহ্বানে আমরা সাড়া দিতে পারব।" (From under the Rubble) এখানে রাশিয়ার আরেকজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের কথাও হাজির করা যায়। তাঁর নাম ভাদিম বরিসভ। ঐতিহাসিক ভাদিম বরিসভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনষ্টিটিউট অব হিস্টোরি অব দ্যা সোভিয়েত একাডেমী অব সায়েন্সের -এর ছাত্র ছিলেন। তিনি তার Personality and National Awareness প্রবন্ধে বলছেন, "আমরা যদি

www.icsbook.info

আমাদের বিধ্বস্ত বিবেককে কোন আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের দিকে ফিরিয়ে নেবার পথ আমাদের মধ্য থেকে খুঁজে বের না করি তাহলে রাশিয়ার উত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থতা পীড়িত বেদনার শেষ চিৎকারে পরিণত হবে।"

বলে রাখি, রাশিয়ার বিবেক হিসেবে পরিচিত রাশিয়ার এই শ্রেষ্ঠ সন্তানরা তাদের এই অকপট সত্য প্রকাশের জন্যে অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। আলোকজাণ্ডার সোলঝেনিৎসিনকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে। আঁদ্রে শাখারভকে বছরের পর বছর দাস শিবিরে কাটাতে হয়েছে। আইঘর শুফরাভিচ চাকরিচ্যুত হয়েছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিন্তু নীতিচ্যুত হননি, সত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকেননি। তিনি সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মুখের উপর বলে দিয়েছেন, রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাকে তিনি তার দায়িত্ব বলে মনে করেছেন ঐতিহাসিক ভাদিম বরিসভও একই দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করে চলেছেন। বারবানভের মত, ভাদিম বরিসভের মত হাজারো রুশ সন্তান আজ তাদের দেশকে ধর্মহীন-সর্বনাশার অক্টোপাস থেকে উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

এসব খবর আমাদের বাম বুদ্ধিজীবী নামক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানা স্থানে যাপটি মেরে থাকা আঁতেলেকচুয়ালদের জানা নেই। থাকলে তারা টিএস সি'তে সেমিনার ডেকে ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে একটু লজ্জাবোধ করতেন। প্রশ্ন ওঠে, এদের এই দেউলিয়াপনা কেন?

এর উত্তর অনেকেই দিয়েছেন। বলা হয়, বাম বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত মূর্খ হয়ে থাকেন। কারণ ওরা জ্ঞানানু-সন্ধানের দরজা বন্ধ রেখে শুধু মার্কসবাদ নামের তত্ত্বই গলাধঃকরণ করে চলেন। বলে রাখি এখানে 'মার্কসবাদ' না বলে 'মার্কসবাদ নামের' বলার হাকিকত হলো, মার্কসীয় বহু তত্ত্বই আজ অপ্রদর্শনযোগ্য, তাই তাকে যখন প্রদর্শনযোগ্য করে আনা হয় তখন আর তা 'মার্কসবাদ' থাকে না।

যাক যা বলছিলাম, বাম বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞান একেবারেই অমুক্ত এবং আংশিক। কিন্তু আমাদের দেশের কলেজ -বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম বুদ্ধিজীবী শিক্ষক এবং মস্কোপন্থী কাগজে তঙ্কার কারণে ডংকা বাজানোরা এ আংশিক জ্ঞান থেকে ও মুক্ত। কারণ তাদের সমাজ বাদী খোলসের আড়ালে পুঁজিবাদী মনকে তৃপ্ত করার সংগ্রামে তারা রত থাকায় মার্কসবাদ পড়ারও সুযোগ তাদের হয় না। এই যখন অবস্থা তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদের প্রয়োগ দেখা এবং বারবানভ, ভাদিম বরিসভ, শফরাভিচ প্রমুখদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সময় ও সুযোগ তাদের কোথায়?

কিন্তু মুশকিল হলো, এই বাম বুদ্ধিজীবীরা যে নিজেদের ধর্মকে জানেন না তাদের মার্কসবাদও জানেন না এই কথাটাও জানেন না। এ এক ভয়ানক ধরনের কুপমণ্ড কতা যা সমাজের জন্যে বড় একটা বোঝা শুধু নয় মারাত্মক ধরনের একটা সমস্যাও। এই শেষ বিষয়টাও যদি তারা বুঝতেন, তাহলেও সমাজের, জাতির অনেক মঙ্গল হতো।

১৩-১০-১৯৮৭

www.icsbook.info

অশ্লীলতা একটি রুলিং ও একটি রিপোর্ট

সেদিন বিশ্ব নাট্য দিবস উপলক্ষে নাট্য শিল্পীদের একটা মিছিল হলো। মিছিলটি কারা কিংবা কোন্ গ্রুপ করেছে মনে নেই। তবে মিছিলের শ্লোগানে অভিনয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ শুনিনি কিংবা নাট্য বিষয়ের উপর সেন্সরশীপের বিরুদ্ধে ঐ মিছিলের শ্লোগানে কিছু বলা হয়নি। পাঠকদের স্মরণ থাকার কথা, প্রশাসন থেকে অভিনয় নিয়ন্ত্রণমূলক একটা আইন করার পর এক শ্রেণীয় নাট্য মহল ও নাট্য শিল্পীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা বলে এর দ্বারা তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। তারা অবাধ নাটক ও নাট্য-মঞ্চ দাবী করে। রাজপথে তাদের মিছিলও বের হয়। সম্ভবত সরকার কিংবা প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিদের সাথে তারা দেখাও করেন। এর ফল তারা হাতে হাতেই পান। আইনটির কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। স্থগিত ঘোষণার বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, আইনটি নিয়ে সরকার আরও চিন্তা ভাবনা করবেন। তারপর এটা বাতিল কিংবা কার্যকরী করা হবে। যা হোক, স্থগিত ঘোষণার পর এ নিয়ে কোন পক্ষ থেকেই কিছু বলা হচ্ছে না। বিশ্ব-নাট্য দিবস উপলক্ষে নাট্য শিল্পীদের যে মিছিল হলো, সেখানেও এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা দেখা গেলো না। স্থগিত বা বিবেচনার অর্থ তো বাতিল নয়। বাতিল যখন নয়, তখন এর বিরুদ্ধে তাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল কেন? তাহলে কি সরকার স্থগিত ঘোষণার আড়ালে আইনটাকে বাতিলই করে দিয়েছেন। এমনটা করা সরকারের পক্ষে বিচিত্র নয়। আইনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের দুঃখজনক মতবদল সরকার ইতিপূর্বেও করেছেন। ঢাকা শহরে দিনের বেলা ট্রাক চলাচল বন্ধ করে পরে আবার তা চালু করা হয় পরে আবার তা বন্ধ করেছেন আংশিকভাবে। এ সংক্রান্ত শাস্তি আইনের ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে। এর দ্বারা একটা জিনিস প্রমাণ হয়, জাতীয় স্বার্থে উচিত যা, করণীয় যা, তার উপর সরকার দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। যে কোন কারণেই প্রেসার গ্রুপের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের ক্ষেত্রে কি এমনটা হয়েছে?

এর উত্তর সরকারই দিতে পারেন। তবে আমি এ প্রসংগে কয়েকটা কথা বলতে চাই। সিনেমা শিল্পে সেন্সরশীপ আছে এবং বাকায়দা এর জন্য সেন্সরশীপ বোর্ডও আছে। সরকারের মনোনীত সদস্য নিয়েই এ বোর্ড গঠিত। এ বোর্ড কতখানি কি করতে পারেন সে কথা ভিন্ন। কিন্তু এ বোর্ডের যৌক্তিকতা আমরা কেউ অস্বীকার করি না। একে কল্যাণকর একটা পদক্ষেপ বলেই আমরা মনে করি। অর্থাৎ সিনেমা শিল্পে যথেচ্ছাচার চলতে না পারুক, সেখানে শ্লীল-অশ্লীলতা, নীতি-নীতি হীনতার প্রশ্ন দেখা হোক এটা আমরা সকলেই চাই। অনুরূপভাবে নাট্য অভিনয়ের জগৎও জাতীয়

www.icsbook.info

নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে পারে না। শ্লীল-অশ্লীলতা এবং জাতীয় নীতি ও মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ক্ষেত্রকে অবশ্যই আইনের গণ্ডীতে রাখতে হবে। দুনিয়ার সর্বাধিক মুক্ত সমাজ ও গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও অবশেষে নীতিবোধের এ শিক্ষাই গ্রহণ করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত ও গণতান্ত্রিক বলে কথিত সমাজেও স্বেচ্ছাচারিতার উপর নিয়ন্ত্রণের জোয়াল চাপানো হয়েছে। বেশী অতীতের অধিকতর রক্ষণশীল বলে কথিত মার্কিন সমাজে যাচ্ছি না, এই সেদিন মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তাই তুলে ধরছি। গত ১৯৭৩ সালে পাঁচটি অশ্লীলতা মামলায় সিদ্ধান্ত দানের সময় মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট তার রুলিং এ পরিষ্কার বলেছে, " যে রচনা যৌনতার প্রতি নাগরিকদের আকৃষ্ট করে, যে রচনায় যৌন আচরণ অত্যন্ত কদর্যভাবে চিত্রিত হয়, সেই রচনার প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।" মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের এই রুলিং এর আওতা এতই ব্যাপক যে, নাটক, সিনেমা ও সাহিত্যে যদি এর প্রয়োগ হয়, তাহলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র একটা পরিশীলিত মানে পৌছতে পারে। এই রুলিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অশ্লীলতা প্রতিরোধ করেছে তা আমি বলব না, তবে এই রুলিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতির ক্ষেত্রের অশ্লীলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে, যথাযোগ্য প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকে আহ্বান করছে এবং নাগরিকদেরকে অশ্লীলতা প্রতিরোধে তাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করছে। আর প্রকৃত ব্যাপার হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন অশ্লীলতার মহীরুহ দূর করা সহ সাংস্কৃতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে কিছুটা কাজ অবশ্যই করে যাচ্ছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অশ্লীলতা সংক্রান্ত একটা কমিশন গঠন করে। মার্কিন এটর্নি জেনারেল এডউইন মিসি'র নেতৃত্বে গঠিত ঐ কমিশন এক বছর ধরে তদন্তের পর ১৯৬০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, "অশ্লীলতার প্রচার ও যৌন অপরাধের মধ্যে সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। অশ্লীলতাকে নিরুৎসাহিত এবং সনাতন সামাজিক মূল্যবোধকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রিপোর্টে মোট ৯২টি সুপারিশ করা হয়েছে। এতে ২ হাজার ৩শ' ২৫টি ম্যাগাজিন, ৭শ' ২৫টি বই এবং ২ হাজার ৩শ' ৭০টি নাটক চলচ্চিত্রের তালিকা দিয়ে এগুলো সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।" মার্কিন এটর্নি জেনারেল এডউইন মিসির এই রিপোর্ট কিভাবে কার্যকরী রূপ নেবে এবং তা সেখানকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ যে সেখানে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এডউইন মিসি'র রিপোর্ট তারই সাক্ষী। তার রিপোর্টে আরেকটা জিনিস লক্ষণীয়। সেটা হলো, দেশে যৌন অপরাধের হার কমাতে হলে অশ্লীলতার প্রচার বন্ধ রাখতে হবে এবং সনাতন মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটাতে হবে।

আমরা যে কথা অবিরাম বলে আসছি, মার্কিন এটর্নি জেনারেল এডউইন মিসি তাঁর এই রিপোর্টে অবশেষে সে কথাই বলছেন। স্বেচ্ছাচারপুষ্ট নাটক, সিনেমা, অশ্লীল সাহিত্য রেডিও-টিভির অনেক প্রোগ্রাম অশ্লীলতা ছড়িয়ে একদিকে আমাদের মূল্যবোধকে খতম করছে অন্য দিকে যৌন অপরাধ বৃদ্ধি করছে। এর প্রতিকার হিসেবে

www.icsbook.info

আমরা বলে আসছি, যৌন অপরাধের উদ্বেগজনক বিস্তার এবং নারী নির্যাতনের আশংকাজনক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরকারের ঝাগাড়ম্বরপূর্ণ বাকযুদ্ধ শুধু নয়, শুধু কাগুজি আইন প্রণয়ন নয়, যৌন অপরাধের স্রষ্টা অশ্লীলতার উৎসগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা দেখছি, মার্কিন এটর্নি জেনারেল তার রিপোর্টে ২ হাজার ৩শ ২৫টি ম্যাগাজিন, ৭শ' ২৫টি বই এবং ২ হাজার ৩শ' ৭০টি নাটক চলচ্চিত্রকে অশ্লীলতা ছড়ানোর দায়ে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু আমাদের সরকার কয়টি ম্যাগাজিন, কয়টি বই, কয়টি নাটক, চলচ্চিত্রকে অশ্লীলতা ছড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত করেছেন এবং জনগণকে তা জানিয়েছেন? এর উত্তর হতাশাব্যঞ্জক। সরকার কার্যত কিছুই করেননি। মুসলিম জাতির জাতীয় মূল্যবোধের কথা বাদ দিলাম, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ১৯৭৩ সালের রুলিং এর নিরিখেই যদি বিচার করা হয়, তাহলে আমাদের নাটক, চলচ্চিত্র, আমাদের রেডিও-টিভি এবং আমাদের অনেক ম্যাগাজিনকে অশ্লীলতা ছড়ানোর দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। সরকার তা কি করছেন, না করতে পারেন? আমাদের ক্রিমিনাল কোডে অশ্লীলতা বিরোধী যতটুকু আইন রয়েছে তারও বাস্তবায়ন সরকার করেন না। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই আইনের আশ্রয় তো কেউ নেয় না, মামলা তো কেউ করে না! ঠিক আছে, জনগণ না হয় তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে অসচেতন, কিন্তু সরকার তার আইনের ব্যাপারে নির্বিকার থাকেন কি করে? সরকার অশ্লীলতা ছড়ানোর বিরুদ্ধে কয়টা মামলা দায়ের করেছেন? সরকার বাদী মামলা কি হয় না?

যাক, আলোচনায় ফিরে আসি। বলছিলাম নাটক অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের কথা। দেখা গেল, মার্কিন সমাজেও আজ এ নিয়ন্ত্রণের কথা উঠেছে। পশ্চিমের আরও অনেক দেশেই এমন চিন্তা আছে। সাভিয়েত ইউনিয়নে তো নাট্য মঞ্চ কঠোর আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আজ 'এইডস' আসার পরে পশ্চিমী দুনিয়া যেন তাদের সনাতন মূল্যবোধের দিকে ফিরে তাকাতে চাইছে। মুসলিম সমাজের মূল্যবোধ থেকে অনেক দূরে দাঁড়ানো পশ্চিমী সমাজেই যখন এই অবস্থা, তখন আমরা সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাচারিতার দিকে পা বাড়াতে পারি কি করে?

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনে কি আছে তার পুরো চিত্র আমার কাছে নেই। তবে প্রতিবাদকারীদের ভাষা, তাদের প্রতিবাদের ধরণ দেখে বুঝেছি, তাদের বল্গাহীন যাত্রা এবং যা খুশী তাই মানসিকতা সেখানে হয়তো বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এমন নিয়ন্ত্রণ সিনেমা শিল্পেও আছে, নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে থাকবে না কেন? কিন্তু সরকার নিজেই এই 'কেন' -এর প্রশ্ন তুলেননি। না তুলেই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই স্থগিত ঘোষণার আড়ালে মনে হচ্ছে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিলই হয়ে যাচ্ছে। আগেই বলেছি, আইনের ক্ষেত্রে সরকারের অস্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টান্ত আছে। তার সাথে আরো একটা যোগ হতেও পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জাতীয় স্বার্থের উপর সুবিধাবাদের এ বিজয় কি চলতেই থাকবে।

৩১-০৩-১৯৮৭

www.icsbook.info

অনেক দিন আগে পড়া একটা নিবন্ধে দেখেছিলাম, 'বিদ্রোহ -বিপ্লবের ফেব্রুয়ারী-ফাল্গুনকে আমরা রূপান্তরিত করেছি উৎস ও স্নিগ্ধ ছলনার মাস হিসেবে।' সন্দেহ নেই, সব দেখে ত্যক্ত বিরক্ত লেখক অত্যন্ত ক্ষোভের সাথেই কথা কটি বলেছিলেন। ক্ষোভটা নিশ্চয়ই অমূলক নয়। ছলনা করেছি আমরা গোটা একুশের ইতিহাসের সাথেই। যার যতটা জোর আছে সুযোগ আছে সে ততটাই একুশের ইতিহাসকে তার পক্ষে ঢেলে সাজিয়েছে। ফলে একুশের আন্দোলন যারা চোখে দেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি, তাদের পক্ষেও একুশে ফেব্রুয়ারীর হিরো সেজে বসা মোটেই কঠিন হয়নি। আর একুশের হিরো যারা, তারা একুশের মঞ্চে স্থান না পেয়ে হারিয়ে যাচ্ছেন, হারিয়ে যাচ্ছে একুশের প্রকৃত ইতিহাস। ছলনা শুধু একুশের ইতিহাসের সাথে নয়, ভাষার সাথেও চলছে। ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে বাংলা ভাষার প্রতি দরদ আমাদের উথলে ওঠে, নানা সুন্দর কথার খই ফুটে আমাদের মুখে। আর এ ব্যাপারে কেউ আমরা কারো চেয়ে কম যাই না। এই বাক সর্বস্বতা সময়ের সিঁড়ি বেয়ে একটা অভ্যেসের মতই চলে আসছে। কয়েকটা নমুনা মাত্র এখানে তুলে ধরছি।

১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর কথা। একটা খবরের কাগজে শিরোনাম বেরুল ঃ বাংলায় সব কাজ হচ্ছে : বলেছেন রাষ্ট্রপতি। 'খবরে বলা হলো,' রাষ্ট্রের উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত যাবতীয় সরকারী নথিপত্র ও অন্যান্য কাজকর্ম বাংলা ভাষায় শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান ও জাতির পিতা স্বয়ং নথিপত্র ও চিঠি ইত্যাদি সব কাজ বাংলায় করছেন।' ১৯৭৩ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারীর কথা। সেদিন খবরের কাগজে একটা সংবাদ শিরোনাম এই ছিল : 'সরকারী পর্যায়ে বাংলা প্রচলনে কমিটি গঠিত।' খবরটিতে বলা হলো, 'বঙ্গ-বন্ধুর কাছে কোন ফাইল পেশ করতে হলে তা বাংলায় লিখতে হবে।' এরপর ১৯৭৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী একটি খবরের কাগজে সংবাদ শিরোনাম ছিল : 'বাংলাকে অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।' বক্তব্যটা তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রীর। লক্ষ্যণীয় , সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের কথা এখানে অনুপস্থিত। ১৯৭৭ সালের ২১শে ফ্রেবুয়ারীর আরেকটা সংবাদ শিরোনাম : 'বাংলা চালু করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' এ প্রতিশ্রুতির কথা বলেছিলেন তদানীন্তন সেনাবাহিনী স্টাফ প্রধান এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিজে। তারপর ১৯৮০ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী একটি দৈনিকের সংবাদ শিরোনামে আমরা দেখি : 'সরকারী কাজ-কর্মে বাংলা প্রচলনের নিশ্চয়তা চাই। ' এটা চেয়েছিলেন তদানীন্তন সরকারী দলের সেক্রেটারী জেনারেল নিজে। এ নিশ্চয়তা তিনি কার কাছে চেয়েছিলেন তিনিই জানেন। ফেব্রুয়ারী

www.icsbook.info

উপলক্ষে আমাদের বাকসর্বস্বতার আর দৃষ্টান্ত দিতে চাই না। নিকট অতীতের কথাগুলো কারোই ভুলে যাবার কথা নয়। বাংলাভাষার দরদে শুধুই যে আমাদের কথার ফানুস ছুটেছে তা নয়। সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালুর শক্ত শক্ত সরকারী সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে বার বার। এবং এ ব্যাপারে কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই আমরা দেখি। ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের দস্তখতসহ তাঁর সচিবালয় থেকে জারি করা আদেশের বিষয়বস্তু ছিল এ আদেশ জারি হওয়ার সংগে সংগে সকল কর্মচারী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আধা সরকারী অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এ বিষয়ে কোন অন্যথা হলে উক্ত বিধি লংঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হবে। .. কোন বিদেশী সংস্থা বা সরকারের সাথে পত্র যোগাযোগ করার সময় বাংলার সাথে সাথে ইংরেজী অথবা সংশ্লিষ্ট ভাষায় একটি প্রতিলিপি পাঠানো প্রয়োজন।... এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।' আদেশের ৭ মাস পর তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ ১৯৭৫ সালের ২৩শে অক্টোবর আরেকটা নির্দেশ জারি করলেন। বলা হলো : "........... পুনরায় এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, সকল সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং আধা সরকারী দফতরে বাংলায় নথি ও চিঠিপত্র লেখা হবে।.... এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।' এরপর গত হল চার বছর। ১৯৭৯ সালের ১২ই জানুয়ারী কেবিনেট ডিভিশনের কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট থেকে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে একটা দীর্ঘ আদেশ প্রচার করা হয় যাতে বলা হয়েছিল, বাংলা ভাষা আমাদের জাতীয়তার অপরিহার্য অংশ এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা মূল প্রেরণা সুতরাং সর্বস্তরে বাংলাভাষা ব্যবহারে আমাদের ব্যর্থতা আমাদের বিঘোষিত নীতি ও লক্ষ্যের একটি দুঃখজনক খেলাফ। এখন থেকে মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রণালয়গুলোর সকল কাজ বাংলা ভাষায় হতে হবে।' এই চিঠিতে বাংলায় সকল পাঠ্য পুস্তক রচনা, এমনকি পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে বাংলায় পরীক্ষা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের সংস্থাপন বিভাগ থেকে এ ধরনের চিঠি ১৯৭৯ সালের ২৪ শে জানুয়ারী এবং এ সালেরই ২৪ শে ডিসেম্বর আরও দুটি চিঠি ইস্যু করা হয়। পুনরায় ১৯৮১ সালের ২৪শে মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বৈঠকে এবং ৮১ সালের ১২ই আগস্ট অফিস আদালতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি সভায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৮১ সালের ৬ই নবেম্বর ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে 'অফিস কাজকর্মে সর্বস্তরে' বাংলাভাষার ব্যবহারের জরুরী নির্দেশাবলী' নামে একটি নির্দেশ প্রচার করা হয়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন সংক্রান্ত সচিব কমিটির পরবর্তী বৈঠক ১৯৮২ সালের ১৮ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। আমার মনে হয় আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই। বলাই- বাহুল্য, এমন বৈঠকের সিলসিলা এখনও চলছেই। প্রতি বছরই ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে এমন বৈঠক বসে, সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় যা চোখ-কান একটু খাড়া রাখলেই দেখা যায়, শোনা যায়। সেদিন ২৪ শে

www.icsbook.info

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাস পড়ার ৭ দিন আগে, প্রেসিডেন্ট এরশাদের কণ্ঠ থেকেও সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্পর্কে কথা শোনা গেল। তিনি জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতার এক জায়গায় বলেছেন : জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি, 'বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সরকারী ফাইল ও চিঠিপত্র আজ থেকে বাংলায় লিখিত হবে। যদি কোথাও তার অন্যথা হয় তবে সে চিঠি বা ফাইল আমার কাছে পাঠাবার নির্দেশ দিচ্ছি। যারা এ সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটাবে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' ফেব্রয়ারীর প্রারম্ভে প্রেসিডেন্টের উচ্চারিত এ ঘোষণাকে চলে আসা ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে 'ফ্যাশন' বা ছলনা হিসেবে অভিহিত করতে এই মুহূর্তে চাই না। তবে তাঁর উচ্চারিত কথায় নতুন কিছু নেই, অতীতেরই পুনরুচ্চারণ। আজ থেকে প্রায় ১১ বছর আগে প্রেসিডেন্ট মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান যে আদেশ দিয়েছিলেন তার সাথে প্রেসিডেন্ট এরশাদের বক্তব্যের তেমন কোন অমিল দেখি না। আদেশের ব্যত্যয় ঘটলে সেখানেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, আর প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘোষণায় আছে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা 'অবিলম্বে' কার্যকরী করার কথা ছিল, আর প্রেসিডেন্ট এরশাদ তার ঘোষণা আজ থেকে অর্থাৎ ২৪ শে জানুয়ারী থেকে কার্যকরী করার কথা। দুই ঘোষণার মধ্যে বড় পার্থক্য হলো, শেখ মুজিবের আদেশে বিদেশেও বাংলায় চিঠি লিখার কথা যার সাথে প্রতিলিপি থাকবে ইংরেজী অথবা সংশ্লিষ্ট ভাষায়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘোষণা অনুসারে বিদেশে বিদেশী ভাষায় চিঠি লিখা যাবে। এদিক থেকে মরহুম শেখ মুজিবের ঘোষণা বর্তমান ঘোষণা থেকে কঠোরতর। আরেকটা বিষয়, শেখ মুজিবের ঘোষণা ছিল সরকারী আদেশ, কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘোষণা তার বক্তৃতার একটা অংশ মাত্র।

সুতরাং প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘোষণাকে ভাষা রাজনীতির ঐতিহ্যের ধারায় 'ছলনা' হিসেবে অভিহিত করা সংগত মনে না করলেও তার করার উপর আস্থা রাখার ভিত্তি আমাদের মতে খুবই দুর্বল। যদিও দুর্বল, তবু প্রতিবারের ঘোষণায় যেমন করে আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হতো, এবারও তেমনি আমরা আশা পোষণ করছি। একুশকে নিয়ে, বাংলাভাষাকে নিয়ে ছলনার যে সিলসিলা চলছে, তার যদি এই সাতাশিতে এসে শেষ হয়, তাহলে আমরা খুশিই হবো, জাতি এক লজ্জা থেকে বাঁচবে।

২৭-০১-১৯৮৭

www.icsbook.info

আমাদের পানি ব্যবহার ও চীনের দৃষ্টান্ত

খাদ্য সংকট ও খাদ্যাভাবের কথা আবার খবরের কাগজের হেড লাইনে এসেছে। কথা উঠেছে চালের উচ্চমূল্য নিয়ে। বলা হচ্ছে, চালের দাম আজ দেশের চৌদ্দ আনা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। একদিকে খাদ্যশস্যের এই উচ্চমূল্য, অন্যদিকে বেকারত্ব, ভূমিহীন ও দরিদ্রদের জীবনকে আজ দুর্বিষহ করে তুলেছে।

এই যে অভাব অনাহারের দৃশ্য তা একদিনের নয়, এক বছরের নয়। প্রতিবছরই আমরা এ দৃশ্যের মুখোমুখি হচ্ছি। অন্যদিকে আমাদের খাদ্য শস্যের উৎপাদন যে একেবারেই বাড়ছে না তা নয়। ৮৪-৮৫ সালে চালের উৎপাদন ছিল ১৪৩ লাখ টন, ৮৫-৮৬ সালে ১৪৯ লাখ টন এবং এবার এই পরিমাণ ১৬২ লাখ টনে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিমাণের দিক থেকে আমাদের দেশে খাদ্যাভাব থাকার কথা নয়। কারণ আমাদের দেশের খাদ্য চাহিদা এই পরিমাণ থেকে পূরণ হবার মত। কিন্তু ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ও নানা অপচয় বাদ দিলে পনর / বিশ লাখ টনের ঘাটতি দেশে থাকে। এই ঘাটতি আমদানি থেকে পূরণ করা হয়। সরকারের দাবী অনুসারে এই ঘাটতি পূরণের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরকার আমাদানি করে রেখেছেন এবং সে সব ব্যাপক হারে বাজারেও ছাড়ছেন।

সুতরাং অসুবিধা থাকার কথা নয়, খাদ্যাভাবের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হলো, বাস্তবতা সরকারের অংক মানছে না। অংক অংকের জায়গায় থাকছে, মানুষের দুঃখ দুর্দশা সে অংক ছাপিয়ে পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠছে। গ্রামাঞ্চল থেকে যে খবর আসছে, তা উদ্বেগজনক। দরিদ্র মানুষের বিধ্বস্ত ক্রয় ক্ষমতা তাদের অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য করছে। বলেছি, এ দৃশ্য শুধু এবারের নয়, প্রতিবছরের। সকলেই আমরা জানি এ অবস্থার কারণ, কৃষি-নির্ভর এই দেশের কৃষি উৎপাদন আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে না, আমাদের সামগ্রিক ভাগ্য উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়ক হতে পারছে না।

কেন পারছে না, সে ব্যাপারেই কয়েকটা কথা এখানে বলতে চাই। আল্লাহ আমাদের সম্পদ-সম্ভাবনা কম দেননি। কিন্তু আমরা যদি তার ব্যবহার না করি তাহলে দোষ তো আল্লাহর নয়। একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। জাপানের ধান উৎপাদনের জমি আছে ৫ মিলিয়ন হেক্টর। তাদের জনসংখ্যা ১২ কোটি। জাপান প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টন চাল রফতানি করে। আর আমাদের ধান উৎপাদনের জমি ১০ মিলিয়ন হেক্টর

www.icsbook.info

আর জনসংখ্যা ১০ কোটি। আমরা লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করি। এর কারণ হলো, জাপান প্রতি হেক্টরে উৎপাদন করে পাঁচ টন আর আমরা উৎপাদন করি প্রতি হেক্টরে মাত্র ১ টনের কিছু বেশী। আমাদের দুর্ভোগের কারণ এ হিসেব থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাপানের মাত্রায় পৌছতে পারলে আমরা কমপক্ষে ৩০ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ৩ কোটি টন চাল বিদেশে রফতানি করতে পারি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, সেটা আমরা পারছি না। না পারার অনেক কারণ চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পানি সম্পদের ব্যবহার। পানি সম্পদের সঠিক ব্যবহারই শুধু আমাদের চালের উৎপাদন মাত্রাকে ঐ পরিমাণে পৌছাতে পারে। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর - এই বর্ষা মওসুমে আমাদের দেশে ধানের উৎপাদন বাড়ার খুব একটা সম্ভাবনা নেই, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে নভেম্বর থেকে এপ্রিল এই শুকনো মওসুমকেই কাজে লাগাতে হবে। এই শুকনো মওসুমে ধান চাষের জন্যে প্রচুর পানি প্রয়োজন। কিন্তু এই পানির অভাবটাই আমাদের দেশে প্রকট। বর্ষাকালে আমাদের নদীগুলো দিয়ে প্রায় ৫০ লাখ কিউসেক পানি সাগরে বয়ে যায়। এ সময় সেচের কোনই প্রয়োজন থাকে না বাংলাদেশে। কিন্তু শুকনো মওসুমে যখন পানি চাই, তখন নদীতে প্রয়োজনীয় পানি আমরা পাই না। শুকনো মওসুমে আমাদের নদীগুলো দিয়ে প্রবাহিত হয় শুন্য দশমিক ২০ মিলিয়ন কিউসেক পানি। এর মধ্যে শূন্য দশমিক ১০ মিলিয়ন কিউসেক পানি নদীগুলোর নাব্যতার জন্যে প্রয়োজন। সেচের জন্যে তাহলে অবশিষ্ট থাকে শূন্য দশমিক ১০ মিলিয়ন কিউসেক। অথচ প্রয়োজন আমাদের কম করে হলেও শূন্য দশমিক ২৩ মিলিয়ন কিউসেক পানি। এই অবস্থাকে ভারতের ফারাক্কা বাঁধ এবং তাদের নদী নিয়ন্ত্রণ আরও কঠিন করে দিয়েছে। শুকনো মওসুমে আমাদের নদীগুলোর পানি প্রবাহ কমে গেছে। ফলে সেচের জন্যে যেটুকু পানি পাওয়া যেত তাও এখন পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশের উত্তরবংগ জুড়ে আজ পানির জন্যে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। আনুষংগিক উপসর্গ হিসেবে সে অঞ্চলে পানির স্তর নিচে নেমে গেছে এবং পুনঃ পুনঃ খরার আবির্ভাব অঞ্চলটিকে বিপর্যস্ত করছে।

আমরা সকলেই জানি, আমাদের এ দুর্ভোগের জন্যে ভারতের ফারাক্কা বাঁধ এবং ভারতের অবৈধ পানি নিয়ন্ত্রণই দায়ী। দায়ী করছি বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হচ্ছে না। চেষ্টা চলছে, কিন্তু ভারতের অন্যায় জেদের মাথা এখনও নত হয়নি। নত একদিন হবেই। সত্যের জয় অবশেষে হয়ই।

কিন্তু সে আশায় যদি আমরা সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি, তাহলে ততদিনে আমাদের দেশের এক তৃতীয়াংশ মরুভূমি হয়ে যাবে। কি করতে পারি আমরা?

www.icsbook.info

আমি এখানে চীনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। চীন একদিন পানি সংকটের দিক থেকে আমাদের চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থায় ছিল। একদিকে প্রচণ্ড খরা, অন্যদিকে প্রবল বন্যা তাদের অর্থনীতিকে বার বার বিধ্বস্ত করেছে যেমনটা হচ্ছে আমাদের। খ্রিষ্টপূর্ব ২০৬ সাল থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ১০২৬ টি প্রচণ্ড খরা এবং ১০২৯টি প্রবল বন্যা চীনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। মনে পড়ে ১৯২৮ সালের খরায় চীনে ১২ কোটি লোক অধ্যুষিত ১৩টি প্রদেশের শস্যখেত, বাগান ইত্যাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আবার পরেই যে বন্যা আসে, তাতে ৮০ লাখ হেক্টর জমি ভেসে যায়। আমাদের মতই তাদের শুকনো মওসুমে পানির প্রচণ্ড অভাব ছিল। পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা তাদের ছিল না। পরে চীন তার বিশাল জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই অভাব দূর করেছে। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত চীনে ১ কোটি ঘনমিটার পানির ধারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন দুই হাজারেরও অধিক জলাধার নির্মিত হয়। ১ লাখ ৩০ হাজার মাইল দীর্ঘ বাঁধ নির্মিত ও পুননির্মিত হয়। বন্যার গতিপথ পরিবর্তন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্যে বৃহৎ খাল খনন করা হয় প্রায় ১০০ টি। তিন কোটি অশ্বশক্তি সম্পন্ন তড়িৎ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয় পানি নিষ্কাশন ও পানি সেচ ব্যবস্থার জন্য। আরো বেশী জমি সেচের আওতায় আনার জন্যে উত্তর চীনে ১৩ লাখেরও বেশী কূপ খনন করা হয়। এ ছাড়াও ইয়োলো, হুয়াই, পার্ল, লিয়াও, সাংহুয়াও হান নদী সংস্কার ও বৃহৎ জলাধার নির্মাণের জন্যে বড় বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে চীন এক দিকে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসে, অন্যদিকে শুকনো মওসুমে পানি সংকুলানের ব্যবস্থা করে। যার ফলে তারা আজ ১০০ কোটি মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেও অন্যকে সাহায্য করার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

চীন যা করেছে আমরা তা সহজেই করতে পারি। আমাদের রয়েছে চীনের মতই বিশাল জনশক্তি, দেশ জুড়ে আছে মাকড়সার জালের মত নদী - মেখলা এবং ছোট ছোট জলাধার নির্মাণের প্রভূত সুযোগ। বাঁধ নির্মাণ ও নদী খননের মাধ্যমে আমরা বন্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। নদী ও খালের সংস্কার এবং জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে শুকনো মওসুমে পানি প্রয়োজনের বহুলাংশই পূরণ করতে পারি। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা হলে বর্ষা মওসুমেও বাড়তি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা হতে পারে।

এই সম্ভাবনার কথা কারই কখনও অজানা ছিল না। এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও প্রকল্প পরিকল্পনাও যে করা হয়নি তা নয়। ১৯৫৫ সালেই পূর্ব পাকিস্তান বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন বাঁধ ও পানি নিষ্কাশন কার্যক্রমের উপর বেশ কিছু

www.icsbook.info

স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প প্রস্তাব করে। ১৯৫৬ সালে ক্রুগমিশন গঠিত হয়। তারাও বাঁধ তৈরি, বন্যার পানির আকাংখিত খাতে প্রবাহিত করা, খাল ও নদী সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব করে। ১৯৬৩ সালে মিসিসিপি নদী কমিশনের নামে বিখ্যাত জেনারেল জন হারডিন বাংলাদেশের পানি সম্পদের উপর সমীক্ষা পেশ করে। এরপর নেদারল্যাণ্ডের অধ্যাপক জে, থিজসে বাংলাদেশের উপর তার রিপোর্টে পানি সংরক্ষণের জন্যে জলাধার নির্মাণ ও বেয়াড়া নদীসমূহ নিয়ন্ত্রণে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ১৯৬৪ সালে ২০ বছর মেয়াদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সম্প্রসারণ ও বাঁধ নির্মাণের সুনির্দিষ্ট মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭২ সালে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক অব রিকন স্ট্যাকশন এণ্ড ডেভলপমেন্ট সংস্থা বাংলাদেশের নিচু ও ছোট ছোট এবং শ্রমনির্ভর প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করে। অতঃপর বাংলাদেশ আমলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সেচ ও পানি উন্নয়ন খাতে বহু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তিরিশ বছরের এ দীর্ঘ সময়ে আলোচিত সব উদ্যোগের যোগফল হলো আমাদের মোট কৃষি জমির মাত্র ১৯ ভাগ কোন রকমে সেচের অধীনে আছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এই উনিশ ভাগের বৃহদংশই কোন পরিকল্পনা নয়, জনসাধারণের স্বপ্রচেষ্টাজাত উদ্যোগের ফল।

সুতরাং সেচ এবং পানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ এক বিরাট শূন্য ছাড়া আর কিছুই পায়নি। তাই জাপান যেখানে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন করে পাঁচ টন আমাদের সেখানে প্রতি হেক্টরে ১ টন হবেই। তারা যেখানে খাদ্য রফতানি করে, আমাদের সেখানে খাদ্য ভিক্ষায় হাত বাড়াতে হবেই। আল্লাহ নয়, আমাদের জমি নয়, আমাদের জনগণ নয়, আমাদের সরকারগুলোরই অব্যাহত ব্যর্থতা আমাদের সকল দুঃখ- দুর্ভোগের জন্যে দায়ী। এ ব্যর্থতা তারা ঢাকছে জনসংখ্যার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে। দোষ জনসংখ্যার নয়, দোষ আমাদের আচরণের, আমাদের অযোগ্যতার এবং আমাদের স্বার্থপরতা ও দেশপ্রেমহীনতার। এই উপলব্ধি অসহায় জনগণকে যারা পরিচালনা করেন শোষণ শাসন করেন সেই সরকারের মধ্যে না আসা পর্যন্ত খরার জ্বালাময় ছোবল, বন্যার সর্বগ্রাসী থাবা চলবেই এবং খাদ্যাভাব, খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষের অসহনীয় চাপ আমাদের বিপর্যস্ত করবেই।

০৮-০৭-১৯৮৭

www.icsbook.info

॥ এক ॥

বরফদেশ আইসল্যাণ্ডের রিকজাভিক শীর্ষ সম্মেলন স্বাভাবিকভাবেই যেন বরফ গলাতে পারল না। রিগ্যান-গর্বাচেভ আলোচনা সেখানে এমনই আছাড় খেয়েছে যে, মধ্যম পাল্লার পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণ প্রশ্নে একটা পূর্ণাঙ্গ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণের মত একটা অবধারিত বিষয়েও তারা সেখানে কোন কথা বলতে পারেননি। শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যাবার সময়টিতে দুই বিশ্ব-নেতার কার মুখ কেমন হয়েছিল আমি বলতে পারি না। তবে আলোচনায় রিগ্যান নায়ক এবং গরবাচভ ভিলেনের ভূমিকায় ছিলেন, এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। রিগ্যান তাঁর স্ট্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ কর্মসূচী (যাকে তারকা যুদ্ধ নাম দেয়া হয়েছে) নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসেছিলেন, আর গরবাচভ প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে আনতে। বিনিময় হিসেবে গরবাচভের ব্রিফকেসে অনেক প্রস্তাব ছিল। সেগুলো তিনি পেশ করেছেন। আশা করেছেন রিগ্যানের মনটা নরম হবে, কিন্তু তা হয়নি। ফলে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা স্বাভাবিকভাবে ভিলেন গরবাচভকেই আঘাত দিয়েছে বেশী। কারণ, পাবার আশাটা তারই বড় ছিল। তিনি মনে করেছিলেন, দৌড়ে জিতে যাওয়া রিগ্যানকে তিনি হাত ধরে দাঁড় করিয়ে একই সমান্তরালে আনতে পারবেন। কিন্তু পারেননি। না পেরে তিনি এ ধরনের কথা বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের এই জেদ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভিন্নতর এবং ভয়াবহতর এক প্রতিযোগিতার পথে পা বাড়াতে বাধ্য করবে। আসলে এটা ব্যর্থতারই একটা বড় ক্ষোভজনিত কথা।

এই ব্যর্থতা 'তারকা যুদ্ধ' প্রশ্নে যুক্তি-পাল্টা যুক্তির দড়া টানাটানিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্কার পরাজয়কেই তুলে ধরে। অথচ অনুরূপ দড়া- টানাটানিতে অতীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিতেছিল। সে দড়া টানাটানির শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। আজকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনির্শিয়েটিভের ন্যায় তারকা যুদ্ধের ট্রাম কার্ড, তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে তখন ছিল 'এ্যান্টি ব্যালাস্টিক মিসাইল' এর মত তারকা যুদ্ধের অস্ত্র। তখন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ছিলেন নায়কের ভূমিকায় আর দৌড় প্রতিযোগিতার (আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে) পিছিয়ে পড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন বি জনসন ছিলেন ভিলেনের ভূমিকায়। ১৯৬৭ সালের জুনে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন জাতিসংঘ বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য নিউইয়র্কে যান। এই সুযোগে জুনের ২৩ তারিখে নিউজার্সির গ্লাসবরোতে নায়ক

www.icsbook.info

কোসিগিন এবং ভিলেন জনসন সোভিয়েত 'এ্যান্টি ব্যালাস্টিক মিসাইল' (ABM) কর্মসূচী নিয়ে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় মার্কিন পক্ষ ABM কর্মসূচী থেকে সোভিয়েতকে বিরত রাখার জন্য এই যুক্তি তোলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি ক্ষেপনাস্ত্র বিধ্বংসী ABM কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যায়, তাহলে তার মোকাবিলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আক্রমণাত্মক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে যাতে করে সে সোভিয়েতের ঐ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিতে পারে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি তার ABM কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে, তাহলে অস্ত্র প্রতিযোগিতার মারাত্মক বৃদ্ধি ঘটবে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন কারো জন্যই শুভ হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যুক্তির উত্তরে কোসিগিন সে দিন জনসনের মুখের উপর নায়কসুলভ এই উক্তি ছুঁড়ে মেয়েছিলেন; আত্মরক্ষার অধিকারটা নৈতিক। কিন্তু আক্রমণের ব্যাপারটা অনৈতিক। গ্লাসবোরোয় এই সম্মেলনে কোসিগিন জিতে গেলেও, মার্কিন যুক্তির কাছে সোভিয়েতরা অবশেষে নতি স্বীকার করে। ABM কর্মসূচী থেকে সরে আসতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্মত হয়। ১৯৭২ সালে মস্কোতে নিক্সন ও ব্রেজনেভের মধ্যে ABM চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের ABM কর্মসূচীর উপর নিজেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সন্দেহ নেই, সোভিয়েত ইউনিয়নের ABM কর্মসূচী নিয়ে যে যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তির খেলা চলেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ (SDI) নিয়েও সে যুক্তির খেলাই চলছে। চলছে তা কয়েক বছর ধরে। সে দিন সোভিয়েতের ABM কর্মসূচীর বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে যুক্তিগুলো তুলেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন মার্কিন SDI কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সে যুক্তিই তুলছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বলছে, মার্কিন কর্মসূচী ভিন্নতর এবং ভয়াবহতর আক্রমণাত্মক পথ অনুসরণে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাধ্য করবে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ABM কর্মসূচীর সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার SDI এর পক্ষে এখন সে যুক্তিই প্রদর্শন করছে। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে SDI -এর মত আত্মরক্ষামূলক কৌশল কোন অস্ত্র নয়, সুতরাং তা অস্ত্র আলোচনায় আসতে পারে না। রিগ্যান আজ কোসিগিনের মত করেই বলছেন ঃ আত্মরক্ষার ব্যাপারটা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং নৈতিক বিধিসম্মত। আর আক্রমণের ব্যাপারটা একেবারেই অনৈতিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যুক্তির কাছে সোভিয়েতরা হেরে গেছে বলেই আইসলাণ্ডের রিকজাভিক শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে, যেমন ব্যর্থ হয়েছিল গ্লাসবোরো সম্মেলন ১৯৬৭ সালে।

গ্লাসবোরো সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হেরে যাবার পর ৫ বছরের মাথায় মস্কো শীর্ষ সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিতেছিল ABM চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। রিকজাভিক সম্মেলনে হেরে গেলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য এমন বিজয় কি আশা করা যায়? উল্লেখ্য, গ্লাসবোরোতে হেরে যাবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আক্রমণাত্মক শক্তিকে

www.icsbook.info

বহুমুখী করার হুমকি শুধু নয় কার্যকরী উদ্যোগও নিয়ে ছিল। লক্ষণীয়, সোভিয়েত ইউনিয়নও রিকজাভিক সম্মেলনে হেরে যাবার পর আক্রমণাত্মক অস্ত্রের ভয়াবহতা বিস্তারেরই হুমকি দিয়েছে। এ হুমকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কি বাধ্য করতে পারবে SDI ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কোন চুক্তিতে আসতে যেমনটা আসতে বাধ্য করেছিল মার্কিনীরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ABM ব্যাপারে?

এ প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব নির্ভর করে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের SDI কর্মসূচীর উপর। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণাত্মক অস্ত্র বিস্তারের যে হুমকি দিয়েছে, তা যদি সে বাস্তবায়িত করেও, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের SDI কর্মসূচীর কিছু এসে যায় না, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছুতেই SDI ব্যাপারে চুক্তিতে আসতে বাধ্য করতে পারবে না। কারণ, আক্রমণাত্মক অস্ত্রের মোকাবিলায় SDI কেই সে আরও উন্নত করবে এবং আরও আক্রমণাত্মক অস্ত্র তৈরি করবে। ABM -এর ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। এটা সবারই জানা, সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক অস্ত্রের বিস্তার দেখে তার সাথে ABM চুক্তিতে যায়নি, বরং ABM কর্মসূচীর ব্যর্থতাই সোভিয়েত ইউনিয়নকে ABM চুক্তি করতে ব্যধ্য করে। সে দেখেছিল, একদিকে তার ABM কর্মসূচী বহু চেষ্টার পরও সাফল্য লাভ করতে পারছেনা। অন্যদিকে মার্কিন আক্রমণাত্মক অস্ত্রের ভয়াবহ বিস্তার ঘটছে। এই অবস্থা নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারেই তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তাই সে তড়িঘড়িভাবে রাজি হয়েছিল ABM চুক্তিতে, যার মাধ্যমে সে চেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণাত্মক অস্ত্রের বিস্তার থেকে বিরত রাখতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি তার ABM কর্মসূচীতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারত, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক অস্ত্রের বিস্তার তাকে উদ্বিগ্ন করতে পারতো না এবং ABM চুক্তিও স্বাক্ষর হতো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের SDI ব্যাপারেও এই একই কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের SDI কর্মসূচী যদি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করে, তাহলে সোভিয়েতের নিছক আক্রমণাত্মক অস্ত্রের বিস্তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে SDI ব্যাপারে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে পারবে না।

এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি অস্ত্র আলোচনার সাথে SDI কে যুক্ত করেই রাখে, তাহলে অস্ত্র আলোচনার সামনে এই মুহূর্তে কোন সু-ভবিষ্যৎ দেখছি না। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি তার নিজস্ব সফল SDI কিংবা ABM ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে, তাহলেই শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এক সমান্তরালে এসে দাঁড়াতে পারে এবং একমাত্র সে ক্ষেত্রেই তার পক্ষে একটা সম্মানজনক চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব। এটা যতদিন সে না পারছে, ততদিন ভিলেনের ভূমিকাতেই তাকে অভিনয় করে যেতে হবে।

২১-১০-১৯৮৬

www.icsbook.info

॥ দুই ॥

জেনেভায় অনুষ্ঠানরত মার্কিন-সোভিয়েত অস্ত্র আলোচনার টেবিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি নতুন অস্ত্র চুক্তির প্রস্তাব পেশ করেছে। প্রস্তাবের মূল বক্তব্য হলো, মহাকাশ গবেষণা কঠোরভাবে সীমিত করা, আণবিক পরীক্ষা বন্ধ করা এবং ৯৬ সালের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সকল পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্র নির্মূল করা। জেনেভা অস্ত্র আলোচনায় সোভিয়েত মুখপাত্র আলেকজান্ডার মনাকভের মতে সমসাময়িক অস্ত্র আলোচনার প্রধান তিনটি বিষয়, যেমন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং মহাকাশ অস্ত্র-শস্ত্র এ প্রস্তাবে স্থান পেয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, আইসল্যাণ্ডের রিকজাভিক শীর্ষ বৈঠকে রিগ্যানও গরবাচভের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সমঝোতার উপর ভিত্তি করেই প্রস্তাবটি প্রণীত হয়েছে।

আলেকজাণ্ডার মোনাকভের এই বক্তব্য সত্য হলে প্রস্তাবটি একটা অর্থবহ ভবিষ্যতের দিকে অস্ত্র আলোচনাকে টানতে পারে। কিন্তু আমরা যারা রিকজাভিকের গোপন সমঝোতার বিষয়টা জানি না, তাদের কাছে এমন আশাবাদ খুব বোধগম্য নয়। সোভিয়েত পক্ষের এই প্রস্তাবের মধ্যে প্রায় সব কথাই আমাদের পরিচিত। শুধু একটাই নতুন কথা আছে সেটা হলো ১৯৯৬ সালের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্র নির্মূল করার বিষয়। কেন এবং কোন দৃষ্টিকোণের বিচারে ১৯৯৬ সালের ডেটলাইন ঠিক করা হলো তা আমরা জানি না। এই না জানা বিষয়টাই আমাদের কাছে নতুন।

কিন্তু এ নতুন বিষয়টা মূল বিষয় নয়। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এবং পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের বিনাশই হলো মূল বিষয়। এই মূল বিষয়ে একমত হলে তবেই একটা ডেটলাইন নির্ধারণের প্রশ্ন আসে। কিন্তু মূল বিষয়ের আলোচনাই যেখানে এখন পর্যন্ত কূল খুঁজে পায়নি, সেখানে ডেটলাইনের প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। আমার মনে হয় প্রস্তাবের এ দিকটির কোন অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছেও নেই। প্রতিপক্ষ কিংবা বিশ্বের মানুষের কাছে নিছক একটা চমক সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে সোভিয়েতরা এ ডেটলাইনটার উল্লেখ করেছে মাত্র।

সে যাই হোক, পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনার বয়স জাতিসংঘের বয়সের প্রায় সমান। 'কমিশন ফর কনভেনশনাল আরমামেন্টস' গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। এ সংস্থার মাধ্যমেই নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পক্ষে জোর প্রচারণার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বছর সাতেক চেষ্টার পর বুঝা গেল নিরস্ত্রীকরণের সামগ্রিক লক্ষ্য নিয়ে সামনে এগুনো কঠিন। তাই ১৯৫৫ সালের দিকে ঠিক হলো, সামগ্রিক ঐকমত্যে পৌছার আগে আংশিক ও আশু বিষয়সমূহের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে সামনে এগুতে হবে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্য সময়টাতে স্তরে স্তরে এগুলোর এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও জোরদার হয়ে উঠল। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ

www.icsbook.info

আন্তর্জাতিক তদারকির অধীন সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে একটি শক্তিশালী প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু যতই দিন গেল সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টা সোনার হরিণে রূপ নিতে লাগল। তাই ষাটের দশকের শুরুর দিকে এ কথা স্বীকার করা হলো সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ প্রায় নাগালের অতীত একটা বিষয়। সুতরাং একে পাশে ঠেলে রেখে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও সীমিতকরণের প্রতি ষোল আনা গুরুত্ব আরোপ করা হলো। অবস্থার নিরিখে গৃহীত এই বাস্তব দৃষ্টিভংগি উল্লেখযোগ্য ফলও দান করল। ১৯৬৩ সালে সম্পাদিত 'আবহাওয়ামণ্ডল ও উর্ধাকাশে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, ১৯৬৭ সালের ল্যাটিন আমেরিকায় আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, ১৯৬৮ সালের আণবিক অস্ত্রের বিস্তার নিরোধ চুক্তি, ১৯৭১ সালের সাগর তলে আণবিক অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত 'সি বেড ট্রিটি, ১৯৭২ সালের জীবাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, ১৯৭৪ সালের এবিএম, ট্রিটি, ১৯৭২ সালের প্রথম সল্ট চুক্তি, ১৯৭৪ সালের ভূ-অভ্যন্তরের আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি এবং ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় সল্ট চুক্তি এই সময়েরই উল্লেখযোগ্য অবদান। সন্দেহ নেই এসব সাফল্যকে সামনে রেখেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন ১৯৭৮ সালে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে সর্বসম্মত এক ঐতিহাসিক দলিল প্রণয়ন করে। ১২৯টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট এই দলিলে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসী পদক্ষেপের একটা রূপরেখা দাঁড় করানো হয়। ১৯৮২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ পুনরায় নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আরেকটি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়। এ অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ১৯৭৮ সালে প্রণীত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত Final Document এর প্রতি সদস্য-রাষ্ট্রগুলো আস্থাশীল থাকার শপথ উচ্চারণ করে।

জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের এত প্রয়াস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বে মারণাস্ত্রের সংখ্যা বেড়েছে, প্রকৃতির দিক দিয়ে তা আরও ভয়াবহতরই হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কৌশলগত মারণাস্ত্র সীমিতকরণ সংক্রান্ত প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে খুশী করেছিল এই চুক্তি। তারা ভেবেছিল, মানবতা বিধ্বংসী অস্ত্র না কমুক অন্তত তা আর বাড়বে না। কিন্তু মানুষের সে আশা পূরণ হয়নি। কৌশলগত অস্ত্র উত্তরকালে আরও মারমুখী হয়েছে। তাই আবার দ্বিতীয় সল্টের প্রয়োজন হলো। ১৯৭৯ সালে স্বাক্ষরিত হলো দ্বিতীয় সল্ট চুক্তি। হলো বটে, কিন্তু তা টিকলো না। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের মনে হলো, এ চুক্তির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অনেক এগিয়ে থাকল। সুতরাং সে সল্ট চুক্তির আর আনুমোদন দিল না। এই সুযোগে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের শক্তি ও সংখ্যা সে বাড়িয়ে চলল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে না পারে এ জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নও উঠি কি পড়ি অবস্থায় অস্ত্র প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু করেছে।

অস্ত্র প্রতিযোগিতার এই লড়াই-এ আজ আবার একটি নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে। সেটা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ' (SDI)

www.icsbook.info

নামক ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী একটি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা। প্রকৃতির দিক দিয়ে এটা কোন আক্রমণাত্মক অস্ত্র নয়, প্রতিরক্ষামূলক একটা কৌশল। কিন্তু যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন এই কৌশল আয়ত্ত করতে পারেনি তাই একে সে এক মুহূর্তে বরদাশত করতে রাজি নয়। তার বক্তব্য হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এই অস্ত্র প্রকল্প ত্যাগ না করে, তাহলে সে কোন অস্ত্রসীমিতকরণ চুক্তিতে যাবে না , উপরন্ত সে তার অস্ত্রশক্তি ভীষণ রকম বাড়িয়ে মার্কিন SDI-এর মোকাবিলা করবে। সবার কাছে পরিস্কার, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই মনোভাবই সাম্প্রতিক রিকজাভিক শীর্ষ বৈঠককে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

এই অতীতকে সামনে রেখেই জেনেভায় অস্ত্র আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ত্র চুক্তির যে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে এ সবকিছু জেনেশুনেই। সুতরাং এ দিক দিয়ে প্রস্তাবটি গুরুত্বের দাবী রাখে বৈ কি! কিন্তু আগেই বলেছি, গুরুত্ব দেয়ার মত নতুনত্ব এতে কিছু নেই। তিনটি প্রস্তাবের প্রথমটি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের SDI প্রকল্প নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে। এই প্রস্তাবের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাজি হবে না রিকজাভিক সম্মেলন দেখার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের তা আর না বুঝার কথা নয়। দ্বিতীয়টা অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের ব্যাপারে। আমি মনে করি, অস্ত্র পরীক্ষা যতদিন আছে, ততদিন অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধে কাউকেই রাজী করানো যাবে না। বাকী থাকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূল করার প্রশ্ন। যদিও এটাও একটা পুরাতন প্রশ্ন যা শুধু ব্যর্থতাই কুড়িয়েছে, তবু যেহেতু প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছে দুই বৃহৎ শক্তির একটি, তাই একে গুরুত্ব দেয়া যায়। আমরা ধরে নিতে পারি, প্রস্তাব উত্থাপক সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের অধীনে তার সমুদয় অস্ত্র নষ্ট করে দিতে রাজী আছে, যদি অন্যরাও তা করে। আমাদের এই ধরে নেয়াটা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যই উদ্বেগমুক্ত এক শান্তির বিশ্ব চাচ্ছে, যেমন চাচ্ছে পৃথিবীর শক্তি–বলহীন দুর্বল রাষ্ট্রগুলো। এদিক দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।

কিন্তু ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর শান্তি ও স্বাধীনতা হরণ প্রয়াসী সোভিয়েত ইউনিয়নের রক্তলোলুপ চেহারা যাদের সামনে আছে, তারা অবশ্যই অস্ত্রচুক্তি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সোভিয়েতের ভালমানুষি চেহারায় বিস্ময় বোধ করবেন। প্রশ্ন জাগবে, অস্ত্র আলোচনায় সোভিয়েতদের এমন শান্তিবাদী বিড়াল তপস্বী সাজার হেতু কি? হেতুটা আমার মতে এই হতে পারে: মার্কিন SDI পরিকল্পনা যা তার সব ক্ষেপণাস্ত্রকে অচল করে দিচ্ছে, তাকে পাগল করে তুলেছে।

যে কোন মূল্যে মার্কিনীদের SDI পরিকল্পনা তার বাতিল করা চাই। এজন্য সে অস্ত্র আলোচনায় ভূমি -শয্যা গ্রহণ করতেও বরজি। লক্ষণীয় যে, তাই-ই সে করেছে। ব্যাপারটা ঠিক কাপালিক কর্তৃক বৈরাগ্যের গেরুয়া বসন পরিধান করার মতোই।

www.icsbook.info

চমক সৃষ্টিকারী ঘটনা সৃষ্টি করে চলেছে ভারত। ইন্দিরা গান্ধী হত্যা, তারপর হাজার হাজার শিখের পাইকারী নিধনযজ্ঞ, ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনায় কয়েক হাজার বনি আদমের নিহত হওয়ার ঘটনা এবং সর্বশেষে সাম্প্রতিক গোয়েন্দা কেলেংকারীর ব্যাপারটা ছয় মাসের একটা ছোট পরিসরেই ঘটে গেল। ঘটনার এই সিরিজে গোয়েন্দা কেলেংকারীর ঘটনাই মনে হয় ভারতের তরুণ প্রধানমন্ত্রীকে বিব্রত করেছে সবচেয়ে বেশী। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু ভারতের জন্য বিরাট ক্ষতি নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার স্থান ভারতীয়রা খুব আনন্দের সাথেই পূরণ করেছে রাজীব গান্ধীকে দিয়ে। বিদ্রোহ তৎপরতার সাথে জড়িত শিখ জাতির নিধন ভারতের সংখ্যাগুরুদের প্রতীক-প্রতিভূ ভারত সরকারের জন্য রাজনৈতিকভাবে খুব দুঃখের কারণ নয়। ভূপালের ঘটনা হৃদয় বিদারক বটে, কিন্তু 'ওভার পপুলেশন'-এ আক্রান্ত ভারতের জন্য মোটেই তা বড় একটা ক্ষতি নয়। কিন্তু গোয়েন্দা কেলেংকারীর ঘটনা মনে হয় ভারত প্রশাসনের গোটা বিশ্বাস যোগ্যতার ভিতকেই নাড়া দিয়ে বসেছে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনাকে The most serious ever' বলে পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন।

ভারতে সব মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রবিন্দু প্রধানমন্ত্রীর নিজ সেক্রেটারিয়েটের অতিগোপন টেবিল থেকেই দিনের পর দিন ধরে শত শত ফাইলের সব তথ্য স্রোতের মত বাহিরে চলে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সেক্রেটারীর ব্যক্তিগত সহকারী টি. এন খার গোয়েন্দা গিরির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। তার সাথে গ্রেফতার হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের আরও দুজন শীর্ষ আমলা। এ ছাড়া প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আরও ১২ জন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন। যারা গ্রেফতার হয়েছেন তাদের অনেকের হাতে যেমন টি এন খার, ভারতের প্রতিরক্ষা, বিদেশ নীতি, আণবিক প্রযুক্তি ও প্রোগ্রাম সহ সরকারী তৎপরতা সংক্রান্ত সব গোপন ফাইলই ছিল। তদন্তকারী একজন অফিসারের মতঃ অ''ামাদের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন দলিলই অক্ষত নেই'

একথাই আরও পরিস্কার করে বলেছে 'দি হিন্দুস্থান টাইমস'। পত্রিকাটি লিখেছে, বিদেশীদের হাতে ভারতের যে দলিলগুলো তুলে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে : ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ভারতের সমস্ত প্রতিরক্ষা কেনা-কাটা ও পরিকল্পনার দলিল, সমস্ত সমরাস্ত্রের আধুনিকায়ন পরিকল্পনা, পকেট সাইজ নতুন লেসার মারণাস্ত্রের প্ল্যান, সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ও পাল্টা কার্যক্রমের প্ল্যান,

www.icsbook.info

পাকিস্তানকে সরবরাহকৃত মার্কিন উপগ্রহ ছবির কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত দলিল এবং পারমাণবিক গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ।' অর্থাৎ বলা যায়, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার গোটা ক্ষেত্রটিকেই বিদেশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

সে বিদেশটা কে, এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু এ পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। এবারের গোয়েন্দা কেলেংকারীর প্রথম খবর প্রকাশিত হবার পর এ পর্যন্ত কয়েক জন ফরাসী ও রুশ কূটনীতিক নয়াদিল্লী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাছাড়া পত্র-পত্রিকার খবরে ন্যাটো জোটভুক্ত দেশ পূর্ব ইউরোপীয় কোন কোন দেশ এবং কেজিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু নয়াদিল্লী সরকার মুখ খোলেননি। জানা যায়নি আসলে কে বা কারা এই কেলেংকারীর সাথে জড়িত। কূটনীতিক বহিস্কার থেকে বুঝা যায় ফরাসীরা এর সাথে জড়িত রয়েছে। বিভিন্ন আলোচক ফরাসীদের জড়িত থাকার যৌক্তিকতাও স্বীকার করছেন। তারা বলছেন, ভারতে সামরিক সরবরাহ ও সহযোগিতার দিক থেকে সাম্প্রতিক কালে ফরাসীদের স্থান রুশদের পরেই। তাছাড়া ভারতে ব্যবসায়িক স্বার্থও তার বাড়ছে। সুতরাং প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য তার প্রতিদ্বন্দীরা ভারতে কি করছে, কি দিচ্ছে তা তার জানা প্রয়োজন। মনে করা হচ্ছে ফরাসীরা এসব কারণে গোয়েন্দা কর্মে লিপ্ত হতে পারে। আবার বলা হচ্ছে নয়াদিল্লী থেকে বহিস্কৃত ফরাসী কূটনীতিক কর্ণেল এ্যালেন বলি সি আই এ -এর পক্ষে কাজ করেছে। সি আই এ-ই আসলে এই গোয়েন্দা কেলেংকারীর মূল পক্ষ। কিন্তু রুশ কূটনীতিকদের বহিস্কার এবং পূর্ব ইউরোপীয় কোন কোন দেশের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ এই তত্ত্বে ফাটল সৃষ্টি করছে। অবশ্য বলা হচ্ছে রুশ কূটনীতিকদের বহিষ্কার লোক দেখনো ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্ব শিবির ও পশ্চিম শিবিরের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য বিধানের কৌশল হিসেবেই ভারত এটা করেছে। এ তত্ত্ব কথার মধ্যে কতখানি সত্য আছে জানিনা, তবে এই সত্য যে, ভারতে এই ধরনের গোয়েন্দা কেলেংকারীর ঘটনা যেমন নতুন নয়, তেমনি এর সাথে মার্কিন ও সোভিয়েতের জড়িত থাকার ব্যাপারটাও নতুন বলা যাচ্ছে না। ১৯৮৩ সালে এক গোয়েন্দা কেলেংকারী ফাঁসের পর ধরা পড়লেন একজন মেজর জেনারেল, একজন এয়ার ভাইস মার্শাল এবং একজন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল। এরা সকলেই ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত। এই কেলেংকারীর সাথে জড়িত শোনা গেল সি আইএ-কে। ১৯৭৯ সালে রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন নয়াদিল্লী সফরে আসার আগের মুহূর্তে কেজিবি'র পক্ষে গোয়েন্দাগিরির অপরাধে দুজন রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হলো। সেবারও তাদের সহযোগী হিসেবে ধরা পড়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী। বড় ধরনের আরেকটা গোয়েন্দ কেলেংকারী ধরা পড়ে ১৯৭৮ সালে। সেবার পাকিস্তান বর্ডারে গোটা একটা ইণ্ডিয়ান আর্মি ব্রিগেডই পাকিস্তানের পক্ষে গোয়েন্দাগিরীর অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অনেক দেশই ভারতকে এইভাবে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে।

www.icsbook.info

এই যন্ত্রণা দেয়ার ব্যাপারটা নিন্দনীয় হওয়া উচিত ছিল। নিন্দা করতে রাজিও ছিলাম। কিন্তু ভারতের এই গোয়েন্দা কেলেংকারীর কাহিনী যখন পত্র পত্রিকায় পড়ছি তখন পড়ছি ভারতের নিজস্ব গোয়েন্দা তৎপরতার কাহিনীও। ভারতের আধুনিক গোয়েন্দা শক্তির নির্মাতা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রধান রামেশ্বর নাথ কাও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পর পদ্যত্যাগ করেছেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর অতি বিশ্বস্ত মিঃ কাও এর বীরত্ব গাঁথা গাইতে গিয়ে 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' অব ইণ্ডিয়ায় 'র' -এর মহৎ অবদানগুলোকে স্মরণ করা হয়েছে। এ স্মরণ গাঁথায় দেখা যাচ্ছে ভিন্ন একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে গোয়েন্দা কর্ম চালানো গৌরব ও কৃতিত্বের কাজ। 'র'-এর এই গৌরব গাঁথায় বলা হয়েছে: "সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে 'র' স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য প্রতিটি রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনার সাথে ঘনিষ্ঠ ছিল 'র'। অতঃপর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লাভের পরও এর সবকিছু 'র'-এর নখদর্পণে ছিল। 'র' এর এই কৃতিত্ব কাহিনীতে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে একটা মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তার ভারত সফরকালে মিসেস গান্ধীর সাথে এক বৈঠকে বসেন। মিসেস গান্ধীর পাশে ছিলেন রামেশ্বর নাথ কাও। জিয়াউর রহমানের কাছে এই লোকটির পরিচয় অজ্ঞাত ছিল না। আলোচনার এক পর্যায়ে মিসেস গান্ধীর এক প্রশ্নের জবাবে জিয়াউর রহমান কাও এর দিকে ইংগিত করে মিসেস গান্ধীকে বলেন, 'এই লোক আমার দেশ সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশী জানে।' জিয়াউর রহমানের এ কথার অর্থ নিঃসন্দেহে এই যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামরিক-কোন কিছুই ভারতের অজানা নেই। জেনেছে কি ভাবে? 'র'-এর মাধ্যমে। আর 'র' -এর কাছে সব তথ্য সব কথা পাখির মত উড়ে গেছে, তা নয়। 'র' -এর হাজারো এজেন্ট ঘুষ প্রলোভন ইত্যাদি ধরনের হাজারো অপকৌশলের মাধ্যমে এগুলো হাত করেছে। এখন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে 'র'-এর কাজ যদি গৌরবের হয়, কৃতিত্বের হয়, তাহলে মার্কিন রুশ ও ফরাসীরা টি, এন খার প্রমুখ এজেন্টের মাধ্যমে ভারতে যা করেছে সেটাও অবশ্যই গৌরব ও কৃতিত্বের। সুতরাং এ নিয়ে হৈ-চৈ-এর কি আছে ! গোয়েন্দাগিরির দোষে সম্প্রতি টি, এন, খারসহ যাদের গ্রেফতার করা হলো এবং অতীতে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের গ্রেফতার করা মোটেই বৈধ হয়নি। আমার এ তত্ত্বের সাথে নয়া-দিল্লীর 'র'-এর মালিকরা একমত হবেন না তা বলাই বাহুল্য। এক মত হলে গোয়েন্দা কেলেংকারী নিয়ে ঐ রকম হৈ-চৈ তারা করতেন না। এর পিছনে তাদের খাসা যুক্তিও আছে ঃ 'আমার শক্তি আছে আমি সি. আই, এ-এর ষড়যন্ত্র, কেজিবি'র ষড়যন্ত্র ধরছি, বাংলাদেশের শক্তি থাকলে সে 'র' কে ধরতো, ধরবে।' অর্থাৎ 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি। জানিনা, ভারতের এ নীতির

www.icsbook.info

জবাব বাংলাদেশ কি দেবে, তবে এতটুকু বলতে পারি, জোর যার মুল্লুক তার' -এ নীতি যতদিন থাকবে অধিকতর বলশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতের কাছ থেকে ঐ ধরনের যন্ত্রণ সইবার জন্য ভারতকে অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে। আর এনিয়ে অহেতুক হৈ-চৈ ও তার জন্য শোভন হবে না।

যাক এসব কথা। ভারতের সাম্প্রতিক গোয়েন্দা কেলেংকারীর যে দিকটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং যে কারণে আমার আজকের এ লেখা সেটা হলো কেমন করে অতো সস্তায় মানুষ দেশপ্রেম বিক্রি করতে পারে? নয়াদিল্লীর একজন উদ্বেগ-কাতর শীর্ষ আমলা বেদনার সাথে মন্তব্য করছেন ঃ "মনে হচ্ছে জাতির সর্বোচ্চ গোপন আমানত নিছক একটা গানের বিনিময়েই বিক্রি হয়ে গেছে।" কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে যারা ধরা পড়েছেন, তাদের অনেকে স্বীকার করেছেন, কোন সময়ই তাঁরা ৩০০ ডলারের বেশী পাননি। আর সাধারণভাবে একটা গোপন দলিলের জন্য ৪০ ডলার করে পেত (ভারতে ১ ডলার সম্ভবত ঃ ১২ টাকার বেশী নয়।) অনেক সময় এক বোতল হুইস্কির বিনিময়েও তাঁরা গোপন দলিল পাচার করেছেন। ব্যাপারটা উদ্বেগের বিষয় অবশ্যই। কেমন করে দেশপ্রেম এত সস্তা হয়ে যেতে পারে? এর উত্তরে ভারতের কেউ কেউ বলেছেন, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আমলারা খুবই কম বেতন পান। তাই অল্পেই তারা বিক্রি হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু নয়াদিল্লীরই একজন উর্ধ্বতন আমলা বলছেন, 'দেশটা তার সকল পর্যায়ে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হবার কারণেই গোয়েন্দ চক্র এমন উর্বর ক্ষেত্র পেয়ে যাচ্ছে।" আমার মতে এই দ্বিতীয় কারণই ঠিক। টি এন খার, মেজর জেনারেল, এয়ার ভাইস মার্শাল -এর মত লোকেরা নিছক বেতন কমের কারণে দেশপ্রেম বিক্রি করতে পারেন না। আসলে চরিত্রহীন ও দুর্নীতিবাজ হলেই শুধু এটা সম্ভব। এরা খুব কমদামে বিক্রি হয়। কয়েকটি ডলার, নাচ-গানের আসর মদের টেবিল, সুন্দরী নারীর একটু করে হাসি এদের কেনার জন্য যথেষ্ট। ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থায় এদের অবস্থিতি প্রচুর বলেই বোধ হয়। এক বোতল হুইস্কির বিনিময়ে জাতির অতি গোপনীয় দলিল আমরা বিক্রি হতে দেখছি। শুধু ভারতের কথাই বা বলি কেন, আমরা কি খুব ভালো আছি? খুব ভালো থাকলে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের একজন প্রেসিডেন্টের চেয়ে বাংলাদেশের খবর বেশী জানে কি করে?

১৪-০১-১৯৮৫

www.icsbook.info

সেদিন এক খবরে দেখলাম, কাদিয়ানীরা ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে বলে পাকিস্তানে ঘোষণা করা হয়েছে। এক রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশে তারা জানিয়েছে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদের উত্তরাধিকারী বা সাথীদের কাউকে 'আমিরুল মুমেনিন' অথবা 'সাহাবা' তার স্ত্রীকে উম্মুল মুমেনিন' এবং তার উপাসনার জায়গাকে মসজিদ' বলে অভিহিত করা যাবে না। মসজিদ থেকে নামাজের জন্য আহ্বানকে মুসলমানরা 'আজান' বলে, কাদিয়ানীরা তাদের প্রার্থনার আহ্বানকে 'আজান' বলে অভিহিত করতে পারবেনা। পাকিস্তানী পেনাল কোডের নতুন ধার। অনুযায়ী কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলিম তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে ইসলাম বলে পরিচয় দিতে পারবে না এবং তাদের বিশ্বাসের কোন প্রচারও তারা করতে পারবে না। কোন কাদিয়ানী যদি কথা অথবা লিখা অথবা দৃশমান কোন উপস্থাপনার দ্বারা এই কাজগুলো করে তাহলে তার জন্য তিন বছর জেল এবং জরিমানার ব্যবস্থা পেনালকোডে সংযোজিত করা হয়েছে।

খবরটি পড়ার পর স্বভাবতই দৃষ্টিটা আমাদের দেশের কাদিয়ানীদের দিকে যাবার কথা। কিছুটা গিয়েছেও। কিন্তু এ নিয়ে আমি এই মুহূর্তে মাথা ঘামাতে চাইনি। দেশে আমাদের সরকার আছে, এসব বড় বড় বিষয় নিয়ে তাদেরই মাথা ঘামাবার কথা। আর এ বিষয়টা এতই স্পষ্ট এবং ইসলামী বিশ্বে এতই আলোচিত যে, পুরো বিষয়টাই সরকারের চোখের সামনে রয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের এখন কলমের কসরত প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন দেখিনা।

সুতরাং আমার দৃষ্টিটা অন্য আরেকটা বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হল। বিষয়টা খুবই প্রকাশ্য। কিন্তু সেদিকে সরকারের এবং আমাদের কারো দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। এখানে আমার আলোচনার বিষয় খ্রিস্টানদের ধর্ম প্রচার। ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে খ্রিস্টানরা এদেশে আজ এমন কৌশলের পথে পা দিয়েছে যাতে করে পাকিস্তান কাদিয়ানীদের ক্ষেত্রে যা ভেবেছে, খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে সে রকম একটা ভাবার প্রয়োজন আমাদেরও দেখা দিয়েছে।

খ্রিস্টানরা আমাদের দেশে বহুদিন ধরে তাদের ধর্ম প্রচার করছে। পলাশীর যুদ্ধে আমাদের বিপর্যয়ের পর যখন ইংরেজরা এদেশের শাসনভার হাতে পেয়ে গেল তখন থেকেই এর শুরু। ইংরেজ শাসন এদেশ থেকে চলে যাবার পরও অবস্থাটা তেমনই আছে। আমরা বাধা দিতে পারিনি, বাধা আমরা দিতেও চাইনি। এখানে আমি বাধা

www.icsbook.info

বলতে বুঝাতে চাচ্ছি সহযোগিতার কথা। আমরা কখনও প্রত্যক্ষ কখন পরোক্ষভাবে এদেরকে সহযোগিতাই দিয়ে গেছি। একে আমরা এক ধরনের রাষ্ট্রীয় উদারতা বলি যা ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে বিশেষভাবে আমদানি করা হয়েছে। বলে রাখা ভালো এই কর্মটা আমরা সব সময় সজ্ঞানভাবে করছি তা নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় দেখা রাষ্ট্র প্রশাসনের কপালে আঁকা ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের দারুণ ভাবে বিভ্রান্ত করেছে। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে যে কোন বেঈমানী নেই, তা প্রমাণের জন্য আমরা রাষ্ট্রের সাথে নিজ ধর্মের কোন সম্পর্ক দেখাতে ভীষণ লজ্জাবোধ করেছি, পারতপক্ষে এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছি এবং অন্যদিকে খ্রিস্টানদের প্রচার কৌশলের বহুমুখী বিস্তারকে হাসিমুখে বরণ করেছি। আমরা এই হাসিমুখরা কোন সময়ই দেখতে চাইনি যে, পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষতা একটা সাইনবোর্ড মাত্র। এই সাইনবোর্ড তারা মাথার রেখেছে আমাদের মাথায় ঐ সাইনবোর্ডটা তুলে দেয়ার জন্যই। কিন্তু সাইনবোর্ডের আড়ালে তারা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য কোটি কোটি ডলার চার্চের মাধ্যমে প্রচারকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালে খ্রিস্টান মিশনারীদের বাৎসরিক বাজেট ছিল ৭০ বিলিয়ন ডলার, ১৯৮০ সালে বাৎসরিক এই বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১শ' বিলিয়ন ডলার, আর এই বছর অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে তাদের বাজেটের পরিমাণ ১২৭ বিলিয়ন ডলার। বাৎসরিক এই বিপুল বাজেটের টাকা ইউরোপ আমেরিকায় 'ধর্মনিরপেক্ষতার' সাইনবোর্ড মাথায় পরা রাষ্ট্রশক্তির মাধমেই আসে। খ্রিস্টধর্মের প্রসারকে তারা তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সাথে অবিচ্ছেদ্য করে দেখছে। তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাববলয়ের সবচেয়ে স্থায়ী ও নিশ্চিত বুনিয়াদও হলো তাদের খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী সুতরাং এ জনগোষ্ঠীর বিস্তারের স্বার্থে হেন কাজ নেই যা তাদের অকরণীয়। আসলে তাদের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ আমাদের বাঁদর নাচ নাচাবারই একটা মোক্ষম কৌশল। বাঁদরের হাত থেকে কোন জিনিস পেতে হলে নাকি নিজের হাতেরটা ফেলে দিতে হয়। দেখাদেখি বাঁদর যখন তার হাতেরটা ফেলে দেয় তখন দুটো কুড়িয়ে নিয়ে বাঁদরকে কাঁচকলা দেখিয়ে চলে যাওয়া যায়। আমাদের নিয়ে পশ্চিমের কমুনিষ্ট ও খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদীরা এই বাঁদর খেলাই খেলেছে। তাদের দেখাদেখি ধর্মনিরপেক্ষতার সাইনবোর্ড মস্তাকাপরিস্থাপন করে আমরা যখন আমাদের ধর্মের চলৎশক্তি রহিত করে ময়দান খালি করেছি তখন সেই সামাজ্যবাদীরা তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা সাইনবোর্ডের আড়াল দিয়ে এসে আমাদের ফাঁকা ময়দানটা দখল করে নিচ্ছে। উল্লেখ্য বৃটিশরা যখন এদেশে ছিল তখন আমাদের মাথায় ধর্ম নিরপেক্ষতার সাইনবোর্ড ছিল না। সে সময় তারা শাসন ক্ষমতায় থাকলেও খৃস্টধর্মের প্রসার তাই ছিল কম। কিন্তু তাদের চলে যাবার পর আমরা যখন তাদের ধর্ম নিরপেক্ষতার সবক গ্রহণ করলাম তখন থেকে খ্রিস্টধর্মের প্রচার এবং কমিউনিজমের প্রচার আমাদের ভূখণ্ডগুলোতে বেড়ে গেল। বাংলাদেশ সরকারের একটি বিভাগের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি সম্প্রতি এক

www.icsbook.info

উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ১ মিলিয়নেরও বেশী অর্থাৎ ১০ লাখেরও বেশী মুসলমান খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। খবরটা বড় উদ্বেগজনক এই কারণে যে, ১৯০ বছরের দীর্ঘ বৃটিশ শাসনে এর একশ' ভাগের একভাগ মুসলমানও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেনি। তাহলে মাত্র ১৫ বছরে এই অঘটন কি করে ঘটল? কারণ একটাই সেটা হলো ধর্ম নিরপেক্ষতার সবক আমাদেরকে এমন কাপালিকে পরিণত করেছে যে, আমাদের ধর্মের দাবীগুলোর একে একে আমরা কণ্ঠরোধ করেছি। আমি নিশ্চিত বলতে পারি আবু জাফর শামসুদ্দিনের মত আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বৃটিশরা এদেশ থেকে এত তাড়াতাড়ি না গেলে এতটা তাড়াতাড়ি ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার নামাবলী গায়ে দিয়ে ইসলামী মূল্য বোধের নিধনে অবতীর্ণ হতেন না। অস্তিত্বের স্বার্থেই সেদিন ধর্মীয় জীবনবোধের প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু পান হলেই পাটনী শালার মত সেদিনের সে কথা তাঁর আজ বেমালুমই ভুলে গেছেন। আসলে এই ধরনের অকৃতজ্ঞ বিভীষণ বুদ্ধিজীবীরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের এক প্রকারের পুতুল অথবা সেই নাচের বাঁদর। এঁরা যে এক প্রকারের সম্মোহিত অবস্থায় নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তা তারা মনেই করতে পারছেন না। এই বুদ্ধিজীবীরা তাদের এই বুদ্ধির দ্বার দেশের রাষ্ট্রনীতিকে অতীতে এমন দেউলিয়াপনার দিকে নিয়ে গেছেন যাতে শুধু আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির গোড় কাটারই ব্যবস্থা হয়নি অন্যান্য সর্বক্ষেত্রেও আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা উৎকট আকার ধারণ করেছে। আজকের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের চতুর্মুখী চক্রান্তের মাধ্য একটি স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতির যে জাতীয় নীতি-চেতনা প্রয়োজন এবং তার জন্য যে সাহস ও স্বকীয়তা প্রয়োজন তা এইসব বোল পাণ্টানো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবীদের কারণেই সৃষ্টি হতে পারেনি। যাক আমার মূল কথায় ফিরে আসি। আমি বলছিলাম ধর্ম প্রচারে খ্রিস্টানদের নতুন টেকনিকের কথা যা পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করার খবর পড়ে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। ঐ খবরে কাদিয়ানীদেরকে আমরা যে ধরনের ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করতে দেখছি, তা খ্রিস্টানরাও এদেশে শুরু করে দিয়েছে। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, আমাদের দেশে বাংলা বাইবেল এবং খ্রিষ্টানদের অন্যান্য সাহিত্য ও প্রচারপত্রে 'গড' এর অনুবাদ খ্রিস্টানরা করত ঈশ্বর বলে। এইভাবে হযরত ঈষা (আঃ) তাদের কাছে যিশু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আব্রাহাম 'হেল' 'নরক' প্যারাডাইজ, স্বর্গ এ্যাঞ্জেল স্বর্গীয় দূত ছিল। কিন্তু ইদানীং খ্রিস্টানরা তাদের লেখায় এসব পরিভাষার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। নিজেদের পরিচিত পরিভাষাগুলো বাদ দিয়ে তারা কোরআন-এর পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। প্রতিবছরই বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রে তারা পূর্ণপাতা বিজ্ঞাপন আকারে বাইবেল অথবা খ্রিস্টের বাণী প্রচার করে থাকে। মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত কোন মুসলিম সংবাদপত্রে ভিন্ন ধর্মের

www.icsbook.info

প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েজ কিনা আমি সে আলোচনায় যেতে চাই না। আমার বক্তব্য বিষয় হলো, ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপনে আল্লাহ, নবী, বেহেশত, দোযখ ফেরেশতা ইব্রাহীম (আঃ) ঈসা (আঃ) প্রভৃতি ধরনের ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারের ফলে বোঝাই যায় না যে এটা খ্রিস্টানদের বিজ্ঞাপন। এতে করে এদেশের বাইবেল সোসাইটিগুলো অসচেতন মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে কাছে টানতে পারছে। খ্রিস্টানদের কৌশলপূর্ণ পরিবেশনায় ঐসব অসচেতন মুসলমান খ্রিস্টানদের কথাকে ইসলামের অনুরূপই দেখে। তার উপর আছে নানা রকমের প্রলোভনের বিরাট রকমের আকর্ষণ। এ অবস্থায় অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মুসলমানরা খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং আমাদের পরিভাষা অন্যেরা নেবে এটা কোন দূষণীয় ব্যাপার না হলেও খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে বাস্তব অবস্থার বিচারে এটা আজ খুবই আপত্তিকর খ্রিস্টানররা ঐ পরিভাষাগুলোকে খ্রিষ্টধর্মের সাথে ইসলামকে এক করে দেখানো এবং সাধারণ মুসলমানদের এর দ্বারা আকর্ষণ করে তাদের বিভ্রান্ত করার কৌশল হিসেবেই ব্যবহার করছে। সুতরাং এটা এক ধরনের প্রবঞ্চনা এবং সেইহেতু অপরাধও।

এদেশে একশ্রেণীর খ্রিষ্টান এই কাজ দেদার ভাবে করে যাচ্ছে। কিছু কিছু সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ কাজে তাদের সহযোগিতা করছে। আর সরকারও সম্ভবত বিষয়টা দেখেও দেখছেন না। আমার মতে অবিলম্বে এই অবস্থার অবসান ঘটা দরকার। পাকিস্তান যেমন কাদিয়ানীদেরকে ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে ঠিক তেমনি আমাদের দেশে খ্রিস্টানদেরকে ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহারে বিরত থাকার জন্য বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশে মুসলমানদের মধ্যে আপত্তিকর পথে খ্রিস্টধর্মের প্রচার আমরা বন্ধ করব কি করবনা সে প্রশ্ন ভিন্ন কিন্তু তাদেরকে ইসলামী পরিভাষার অবৈধ ব্যবহার থেকে বিরত রাখা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজের পরিচয়সূচক কিছু বিষয় আছে, যা তাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। কোন ধর্মই নিজেরটা পরিত্যাগ করে অপরেরটা গ্রহণ করে না, গ্রহণ করতে দেয়াও হয় না। কোন সচেতন ধর্ম যখন কোন কোন ক্ষেত্রে এটা করে বুঝতে হবে কোন অশুভ উদ্দেশ্যেই তারা এটা করছে। উল্লেখ্য খ্রিস্টানরা ইউরোপ-আমেরিকার কোন বাইবেলে পরিভাষার এই রূপান্তর ঘটাচ্ছে না। এটা তারা করছে সম্ভবত শুধু বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশেই। অতএব নিঃসন্দেহেই এটা তাদের একটা প্রবঞ্চনামূলক পলিসি। এ পলিসির শিকার আর আমরা হতে চাই না। আমি আশা করি সরকার বিশেষ করে ধর্ম মন্ত্রণালয় বিষয়টির দিকে নজর দেবেন এবং খ্রিস্টানদের এ ষড়যন্ত্র যাতে আর সামনে বাড়তে না পারে তার ব্যবস্থা করবেন।

১৪-০৭-১৯৮৫

www.icsbook.info

তুর্কি খিলাফত পতনের যতগুলো কারণ আমরা দেখি তার মধ্যে একটা ছিল ইহুদীদের ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্র করেছে তারা ভেতর থেকে। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ইহুদীদের কাছে ফিলিস্তিনের জমি বিক্রয় অস্বীকার করায় তিনি তাদের জাতিগত প্রবল প্রতিহংসার শিকার হয়েছিলেন। নব্য তুর্কিদের মধ্যে এই ইহুদীরা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। ১৯০৯ সালের ২৭ শে এপ্রিল নব্য তুর্কিদের পক্ষ থেকে যিনি সুলতানের কাছে তার পদচ্যুতি পত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি একজন ইহুদী। নাম কারাসু। তিনি তুরস্কের একটি ফ্রি ম্যাসন লজ-এর প্রধান (Master) ছিলেন। বলা যায়, ইহুদীরা এইভাবেই সুলতান আব্দুল হামিদের উপর প্রতিশোধ নিয়ে বোধহয় দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাদের বিরোধিতার অর্থ কি?

তুর্কি খিলাফত উচ্ছেদে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপার সেদিন কতখানি স্পষ্ট ছিল জানি না, কিন্তু পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের কাছে গোপন থাকেনি। জানা যাচ্ছে, নব্য তুর্কি আন্দোলন সংগঠনে ইহুদী ফ্রি ম্যাসনের ভূমিকা ছিল খুবই মুখ্য। সিবতেন জেভি নামক একজন নেতৃস্থানীয় ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি এবং তার বিশাল অনুগামীদের ভূমিকা ছিল খুব সন্দেহপূর্ণ। তার অনুগামীরা নামে মুসলমান হলেও মুসলিম সমাজ থেকে তারা নিজেদের আলাদা করে রাখত। এই শ্রেণীর লোকেরা শুধু নব্য তুর্কিদের রাজনৈতিক দর্শনই পাল্টায় না, তাদের চরিত্রের সর্বনাশ করে। ঐতিহাসিকদের ভাষায় নব্য তুর্কিরা প্রকাশ্যে ফেজ খুলে ফেলা, মদ্যপান করা, শুকুর মাংস ভক্ষন করা ও প্রাচীনপন্থী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের রীতি-নীতিকে বিদ্রুপ করার কাজে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করতো না। (Luke- 145-6)।

তুর্কি খিলাফত ঘিরে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের একটা কঠিন সময়ে সুলতান আব্দুল হামিদকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়। সরানো হয় কারণ শত্রুদেরকে তিনি ভালো করে চিনতেন এবং তাদের মুকাবিলায়ও তিনি সমর্থ ছিলেন। তার সম্পর্কে ইতিহাসের রায় : ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন যেসব যোগ্যতম শাসক, সুলতান আব্দুল হামিদ ছিলেন প্রশ্নাতিতভাবে তাদেরই একজন (In the sultan Abdul Hamid Turkey unquestionably possesses one of the ablest rulers who have ever occupied the throne ot the Ottoman Empire,- History of the world. XXIV, 433) এই বিশাল বৃক্ষকে উৎপাটিত করার পর তার ভাই পঞ্চম মোহাম্মদ, পরে তার আরেক ভাই ওহিদুদ্দীনকে সিংহাসনে বসানো হয়, কিন্তু তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারেননি। মাত্র একদশকের

www.icsbook.info

মধ্যেই বিশাল তুর্কি খিলাফত বরফের মত গলে শেষ হয়ে যায়। এই সময়েই ফিলিস্তিন এবং জেরুসালেম মুসলমানদের হাতছাড়া হলো।

এই হাতছাড়া হবার কাহিনী বড়ই বেদনাদায়ক। সময়টা ১৯১৮ সাল। উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে গোটা ইউরোপ এবং পূর্বদিক থেকে রাশিয়ার সম্মিলিত আক্রমণ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড তখন ভেঙে দিয়েছে। এই সুযোগে দক্ষিণ দিক থেকে নিউজিল্যান্ড ও অস্টেলিয়ার সাহায্যপুষ্ট বৃটেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের উপর। শহরের পর শহর প্রদেশের পর প্রদেশের পতন ঘটল তাদের হাতে। মধ্যপ্রাচ্য ফ্রন্টে তুর্কিদের শত্রু তখন ঘরে বাইরে। পিছন দিক থেকে কর্ণেল লরেন্সের আরব বিদ্রোহ তাদের বুকে ছুরি মারছিল, আর সামনে থেকে এসে অবশিষ্ট কাজ সমাধা করছিল বৃটিশ বাহিনী। ফিলিস্তিন ফ্রন্টে বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল এডমন্ড এলেনবী।

১৯১৭ সালের ৮ জানুয়ারি ইংরেজরা ফিলিস্তিনের বাফা শহর সর্বপ্রথম দখল করে। আর ১৯১৮ সালের ২৬ শে অক্টোবর আলেপ্পো দখলের মাধ্যমে ফিলিস্তিন ফ্রন্টের যুদ্ধ তারা শেষ করে। তুর্কি বাহিনী ফিলিস্তিন ও জেরুসালেম রক্ষায় কোন ক্রটি করেনি। দু'বছরের যুদ্ধে এই ফ্রন্টে তুর্কি বাহিনীর ১২ লাখ সৈন্য শহীদ হয়, ৪ লাখ আহত হয় এবং বন্দী ও নিরুদ্দেশ হওয়ার সংখ্যা সোয়া লাখ। এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেও তুর্কিবাহিনী জেরুসালেম রক্ষা করতে পারলো না। পবিত্র নগরী জেরুসালেমের দায়িত্বভার হযরত ওমরের সময় মুসলমানদের হাতে আসার পর ক্রুসেডের শুরুতে ক্ষণিকের জন্য খৃষ্টানরা জেরুসালেম দখল করে নেয়। কিন্তু গাজী সালাহউদ্দীন অচিরেই উদ্ধার করেন পবিত্র নগরীকে তাদের হাত থেকে। তারপর গোটা ইউরোপ ৭টি ক্রুসেড পরিচালনা করেছে, কিন্তু জেরুসালেমে আর তারা পা রাখতে পারেনি। অবশেষে সেই জেরুসালেম চলে গেল বৃটিশের হাতে। তারপর ধীরে ধীরে ফিলিস্তিন সমগ্র আরব, সিরিয়া, মেসপটেমিয়া কুর্দিস্তান বৃটিশের হাতে গিয়ে পড়ল।

১৯১৭ সালের ফিলিস্তিন বৃটিশের হাতে চলে যাওয়ার পরই এখানে ইহুদীদের কাল হাত জেঁকে বসতে থাকে। যুদ্ধে বৃটিশরা ইহুদীদের যে সহযোগিতা পায় তার পুরস্কার হিসেবে বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিন তাদের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এই ১৯১৭ সালেই। তদানীন্তন বৃটিশ ফরেন সেক্রেটারী এ জে বেলফোর বৃটিশ জায়নিষ্ট ফেডারেশনের চেয়ারম্যান লর্ড রথচাইল্ডকে এই মর্মে যে চিঠি (2 Nov-1917) লিখেছিলেন তার একাংশ এই :

"His Majesty Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jews people, and will use their best endevour to facilitate the achievement of this object........"

www.icsbook.info

ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি গড়ে দেবার বৃটিশ প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর বিশ্ব ইহুদীবাদীদের প্রথম ও প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় ফিলিস্তিনের ইহুদীকরণ। এ জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সংখ্যায় ইহুদীদের ফিলিস্তিনে নিয়ে আসা। এই কাজেই ইহুদীবাদীরা হাত দেয়। ফলে ইহুদী আমগনের হার দ্রুত বেড়ে যায়। ১৮৮২ সাল থেকে বৃটিশ দখল পর্যন্ত ইহুদী আগমনের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার; কিন্তু পরবর্তী মাত্র ১১ বছরে ১ লাখ ১৩ হাজার ইহুদী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৩০ সালের পর ফিলিস্তিনে ইহুদী আগমন আরও দ্রুত হয়। ১৯৩১ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ৩ লাখ ৭০ হাজার ইহুদী ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করে।

এ প্রসঙ্গে হিটলারের জার্মানীতে ইহুদী নির্যাতনের বিষয় আলোচনা করতে হয়। আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে, হিটলারের ইহুদী নির্যাতনের সাথে ইহুদীবাদীদের যোগসাজস ছিল; যার লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনে ব্যাপক মাইগ্রেশনে ইহুদীদের বাধ্য করা এবং সেই সাথে বিশ্বব্যাপী ইহুদীদের জন্য সহানুভূতি অর্জন করা যা ইহুদী আবাস ভূমির প্রতিষ্ঠা ও তার নিরাপত্তার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কথাটা অনেকের কাছেই নতুন মনে হবে। কিন্তু ইহুদীবাদীদের ইহুদীবাদকে যারা জানেন তাদের কাছে ব্যাপারটা মোটেই নতুন মনে হবে না। ইহুদীবাদের চেহারা এমনই হিংস্র যার কোন তুলনা নেই।

ইহুদীদের উপর এই নাজি নির্যাতনের অনেক আগে ইহুদীবাদের প্রতিষ্ঠাতা থিয়োডর হার জেল বলেছিলেন "এ সেমেটিকরা আমাদের বন্ধু হবে। এ্যান্টি সেমেটিক দেশগুলো হবে আমাদের মিত্র।

(Herzls vol,l P-48) ইহুদীবাদীদের তত্ত্বটা এই রকম : এ্যান্টি সেমেটিকদের ভয়ংকর মুখটা যেখানেই তুমি দেখ তাদের বিরুদ্ধে যেয়োনা। বরং তাদের সহযোগী হও তাদের ব্যবহার কর যাতে করে পিতৃভূমি ইসরাইলে ইহুদীদের হিজরত করানো যায়।' এই তত্ত্ব অনুসারেই ইসরাইল রাষ্ট্রের স্রষ্টা ইহুদীবাদিরা শুরু থেকেই কঠোর এ্যান্টি সেমেটিক হিটলারের নাজী দলকে সহযোগিতা করে এসেছে। এবং তারাও নাজীদের কাছে সহযোগিতা পেয়েছে। I Paid Hitler বইতে Thyssen বিস্তারিতভাবেই বলেছেন, জার্মানী ও আমেরিকার ইহুদী ব্যাংকগুলো ইহুদীবাদিদের কথায় কিভাবে হিটলারকে দু'হাতে টাকা দিয়ে পোষণ করেছে। জার্মানীতে নাজিরা ক্ষমতাসীন হবার পর জার্মানীতে ইহুদীদের বিরাট সুদিন আসে। ইহুদিবাসী সংগঠনগুলো ১৯৩৫-৩৬ সালে নাজী সরকারের কাছ থেকে ১৯৩১ সালের অ-নাজী শাসনের তুলনায় তিনগুণ বেশি সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করে। ইহুদীবাদী সাপ্তহিক 'Judische Rundschan' এর প্রচার সংখ্যা ৫ হাজার থেকে ৪০ হাজারে উন্নীত হয়। জার্মানীর ইহুদীরা হিটলার কর্তৃক আরোপিত যে স্বতন্ত্র ধরনের হলদে পোষাক

www.icsbook.info

পরতে বাধ্য হয় তার প্রস্তাবক ছিলেন ইহুদিবাদী সাপ্তাহিকের সম্পাদক। তিনিই প্রথম এই আইডিয়ার উদ্ভাবন করেন এবং একে এই জনপ্রিয় শ্লোগানে পরিণত করেন : Wear it with pride the yellow star, ইহুদীবাদি সাপ্তাহিক এই শ্লোগান তোলার ৬ বছর পর নাজীরা ইহুদীদের জন্য এই পোশাকের প্রবর্তন করে। হিটলার ইহুদীদের চাহিদা অনুযায়ী একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। থিয়োডর হারজেল প্রস্তাবিত মাদাগাস্কারে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইহুদীবাদীদের সাথে আলোচনার জন্য জার্মানীর উর্ধতন নাজী রাজনীতিক Dr. H. Jalman Schacht-কে হিটলার ১৯৩৮ সালে লন্ডন পাঠান।

আবার ইহুদীবাদী নেতারা হিটলারের সাথে এই আলোচনায় জড়িত ছিলেন। (Protocols or the Israeli Knesset of 30-6-57) জার্মানী, হাংগেরী, অস্ট্রিয়া সব জায়গাতেই নাজীদের সাথে ইহুদীবাদীদের সহযোগিতার একটা মজবুত ক্ষেত্র ছিল। নাজীরা ইসরাইলে গমনেচ্ছু ইহুদী যুবকদের এমন কি কৃষি টেনিং দিয়ে উপযুক্ত করে তোলারও ব্যবস্থা করে। দু'জন বৃটিশ ইহুদীবাদীর লেখা বিখ্যাত বই The Secret Road'-এ এর বহুল স্বীকৃতি রয়েছে। এ বইতে বলা হয়েছে, কেমন করে দু'জন ইহুদী তরুণ ১৯৩৮ সালে বার্লিন ও ভিয়েনায় গেল, কেমন করে জার্মান গেস্টাপো প্রধান আইখম্যানের কাছে ইসরাইলের ইহুদীদের স্থানান্তর পরিকল্পনা পেশ করা হলো এবং কিভাবে আইখম্যান ইহুদীদের প্রস্তাব গ্রহণ করে ইসরাইল গমনেচ্ছু ইহুদী তরুণদের জন্য টেনিং শিবিরের প্রতিষ্ঠা করলেন ইত্যাদি। আইখম্যানের নির্দেশেই ইহুদীবাদী কর্মীরা ইহুদী যুবক সংগ্রহ করার জন্য গোটা জার্মানী এবং ইহুদী ক্যাম্পগুলোতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারতো। ইসরাইলে পাঠাবার জন্যই এসব যুবক সংগৃহীত হত। ১৯৪৪ সালেও আইখম্যান হাংগেরীয় ইহুদী নেতা Dr. Rudolf Kastner-কে হাজার হাজার ইহুদীবাদী যুবককে ইসরাইলে পাঠানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করে। বিনিময়ে Dr. Kastner আইখম্যানকে অ-ইহুদীবাদী ইহুদীদের কাবু করার ব্যাপারে সহায়তা করেন। ইসরাইলী আদালতেও এই যোগসাজশের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালে ইসরাইলী আদলত এ সম্পর্কিত এক রায় দান করে।

সবদিকের বিচারে ইহুদীবাদীরা তাদের তত্ত্ব অনুসারে জার্মানীতে এ্যান্টিসেমিটিক মনোভাব উদ্দীপ্ত করে এবং একে ব্যবহারের মাধ্যমে অগণিত নিরপরাধ অ-ইহুদীবাদী ইহুদীদের রক্তের বিনিময়ে ইউরোপ-আমেরিকার সমর্থন আদায় এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের পত্তন সম্পূর্ণ করে। এই যে লাভ তারা করল তার তুলনায় কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ ইহুদীর কোরবানী তাদের কাছে কিছু নয়। প্রয়োজনে ইহুদীবাদীরা জার্মানীর ঘটনা আরও সৃষ্টি করতে পারে। ইসরাইলী একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার একজন সম্পাদকের একটা খেদোক্তি এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বললেন : আমি যা চাই সে ক্ষমতা যদি আমার থাকতো তাহলে কুড়ি কুড়ি বুদ্ধিমান ও জাতীয় আদর্শে আত্মনিবেদিত ইহুদী

www.icsbook.info

যুবককে দেশে দেশে পাঠাতাম। যেখানে ইহুদীরা সুখের জীবন যাপন করছে, সেখানে গিয়ে তারা প্রবল ইহুদী বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করতো যাতে শ্লোগান উঠতো, শয়তান ইহুদী তোরা ইসরাইলে চলে যা, ভীত সন্ত্রস্ত ইহুদীরা তখন ইসরাইলের পথ ধরতো।"

সন্দেহ নেই জার্মানীতে ইহুদী হত্যা ইহুদীবাদীদের এই উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করেছে। জার্মানীর ইহুদী হত্যা ছিল ইহুদীবাদীদের বহুল আকাংখিত এক উৎসব। এই সময় থেকে ফিলিস্তিনে ইহুদী আগমনের হিড়িক পড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ইহুদী আগমনের হিসেবে আগেই দিয়েছি। ১৯৪৮ সালে যখন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো, তখন বিশ্বের দেশে দেশে ইহুদীদের খেদিয়ে ফিলিস্তিনে নিয়ে আসায় ইহুদীবাদী অভিযান আরও তীব্রতর হয়। এর ফলেই আমরা দেখি ১৯৪৮ সালের মে থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়ে সোয়া পাঁচ লাখ ইহুদী ফিলিস্তিনে আসে। পরবর্তী দুই দশকে (১৯৭০ পর্যন্ত) ইহুদীবাদীরা আরো সাড়ে আট লাখ ইহুদীকে ফিলিস্তিনে ধরে আনে। এই কাজ তাদের এখনো চলছে।

এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে একটা জাতির লোক কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে ধরে ধরে এনে মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মত টেস্টটিউব বেবী ধরনের পন্থায় অবৈধ ও কৃত্রিম একটা রাষ্ট্রকে অবশেষে কিভাবে জন্মদান করা হল সেদিকে নজর দেয়া যাক। আগেই বলেছি ১৯১৭ সালে বৃটেন ফিলিস্তিনের তুর্কী সৈন্যদের পরাজিত করে ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। 'মহাযুদ্ধের পর আরবদের স্বাধীনতা দেয়া হবে' এ প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে আরব বিদ্রোহীরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করে। কিন্তু ফিলিস্তিন দখল করার পর কিভাবে বৃটেনের প্রতিশ্রুতি পাল্টে যায়, বালফোরের ঘোষণা থেকে তা আগেই জানা গেছে, বালেফোরের এ ঘোষণাকে লয়েড জর্জ ইহুদীদের জন্য বৃটেনের একটি পুরস্কার বলে অভিহিত করেন। অপরদিকে ইহুদীবাদীরাও বৃটেনের জন্য পুরস্কারের একটা মূল্য সামনে রেখেছিল। আন্তর্জাতিক ইহুদী কংগ্রেসের সভাপতি নাহুম গোল্ডম্যান সে সময় ঘোষণা করেছিলেন, বৃটেন যদি ফিলিস্তিনীদের শতকরা ৬৫ ভাগ এলাকায় আমাদের জন্য একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়, তাহলে আমরা ফিলিস্তিনে বৃটেনের নৌ বিমান ও স্থল বাহিনীর জন্য ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে দিতে রাজী আছি। মার্কিন কংগ্রেসও ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন সরকারের কাছে এ আবেদন জানান যে, তারা যেন ফিলিস্তিনে অবাধ ইহুদী গমন এবং সেখানে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। বুদ্ধিমান বৃটেন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না নিয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে এটা সম্পন্ন করার জন্য ফিলিস্তিন প্রশ্ন জাতিসংঘে উত্থাপন করেন। জাতিসংঘে অনেক বাহাস বিতর্ক হয় এ নিয়ে। অবশেষে ইহুদী প্রভাবিত বৃটেন, মার্কিন ও রুশদের চাপের মুখে ১৯৪৭ সালের ২৯ নবেম্বর জাতিসংঘের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে তার

www.icsbook.info

১৮১ নং প্রস্তাবে ফিলিস্তিনীদের মোট আয়তনের ৫৬ ভাগ এলাকায় একটি ইহুদী রাষ্ট্র এবং অবশিষ্ট এলাকায় একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করার আহ্বান জানায়। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের শতকরা ৮ ভাগ ইহুদী (যাদের ৯০ ভাগই বহিরাগত) পেল ৫৬ ভাগ এলাকা এবং শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম বাসিন্দা পেল ৪৪ ভাগ এলাকা। এই ঐতিহাসিক অবিচার কর্ম জাতিসংঘের ভোটাভুটি নামক শক্তি সনদের প্রহসনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াসহ তেত্রিশটি দেশ ফিলিস্তিন বিভক্তির পক্ষে ভোট দেয়। মাত্র তেরটি দেশ এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। জার্মানীর ইহুদী নির্যাতনকে পুঁজি করে এবং ইহুদী অর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে জাতিসংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট কুড়ানো সম্ভব হয়। এইভাবে ১৮৯৭ সালের থিয়োডর পরিকল্পনা, ১৯১৭ সালের ব্যালফোর ঘোষণা এবং ১৯৪৭ সালের জাতিসংঘ প্রস্তাবের আশ্বাস ও আর্শীবাদ শীরে নিয়ে ফিলিস্তিন ত্যাগকারী বৃটিশ সৈন্যদের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ১৯৪৮ সালের ১৫ মে ইহুদীরা ইসলাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দান করে। অত্যন্ত বেদনার বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেনসহ পৃথিবীর তেত্রিশটি দেশ হিটলারের ইহুদী নির্যাতনের তুখোড় সমালোচক হয়েও হিটলারের চেয়েও অনেক বড় অপরাধ তারা করল। এদিকটির প্রতি অংগুলি সংকেত করতে গিয়েই জর্জ এ্যান্থনী নটিং ১৯৩৮ সালে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন "To place the brunt of the burden upon Arab palestine is a miserable evasion of the duty that lies upon the whole of the civilized world... No code of morals can justify the persecution of the one people in an attempt to relieve the persecution of another. The cure for the eviction of the Jews from Germany is not to be sought in the eviction of the Arabs from their homeland; and the relief of Jews distress may not be accomplished at the cost of inflicting a corresponding distress upon an innocent and peaceful population" (The Arabs, Page-331)

রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে ইসরাইলে ইহুদীরা ফিলিস্তিনী মুসলিম বাসিন্দাদের হত্যা, লুণ্ঠন ও উচ্ছেদের কাজ শুরু করে দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ সবকিছু হারিয়ে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। উপয়ান্তর না দেখে আরব দেশসমূহ ফিলিস্তিনীদের রক্ষায় এগিয়ে আসে। আরবরা যে এভাবে এগিয়ে আসবে তা ইহুদীরা জানত। এজন্য তারা বহু বছর থেকে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছিল অস্ত্র ও টেনিং দুই দিক থেকেই। তাই দেখা গেল গ্রান্ড মুফতি আমিন আল হুসায়নী ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের স্বেচ্ছাসেবকসহ পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলোর যে বাহিনী ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিয়ে এল তার সংখ্যা ৫৬ হাজারের বেশি নয়, আর ইহুদীরা এর

www.icsbook.info

মোকাবিলায় ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্য মাঠে নামাল। এরপরও সাফল্য আরবদের পক্ষেই এল। জর্দান বাহিনী জেরুসালেমসহ পূর্ব ফিলিস্তিন মুক্ত করল, ইরাক বাহিনী তড়িৎ গতিতে এগিয়ে ইসরাইলের রাজধানী তেল আবিবের তিন মাইলের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলো। অন্যদিকে মিসরীয় সৈন্যরা বীরশিবা ও গাজার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বসল। নব্য ইসরাইল রাষ্ট্রের যখন এই মুমূর্ষু দশা, তখন তার মুরব্বীদের চাপে জাতিসংঘের মাধ্যমে আপোষ ফায়সালার স্বার্থে ৪ সপ্তাহের জন্য যুদ্ধ বিরতি হয়। এই যুদ্ধ বিরতি ছিল মূলত ইসরাইলকে অধিকতর প্রস্তুতির সুযোগ দেয়া এবং আরবদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের সুবিধা করার জন্যই। তাই হলো। জাতিসংঘ আরব কিংবা ইহুদী সব পক্ষকে অস্ত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু জাসিংঘের এই নির্দেশ উপেক্ষা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোশ্লাভাকিয়া গোপনে ইসরাইলকে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ বিমান সরবরাহ করল (The Arabs by Anthony Nutting, Pages, 327, 328)। আরবরা মনে করছিল, আর এক ধাক্কা দিলেই ইসরাইল শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু রাশিয়া থেকে গোপন অস্ত্র সরবরাহের খবর তারা জানত না। ফলে যুদ্ধ যখন শুরু হলো, আরবদের অগ্রগতি তখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। পুনরায় যুদ্ধ বিরতি হলো জুলাইয়ের ১৮ তারিখে। ইসরাইল সোভিয়েত ব্লক থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধ বিমান আনার আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেল। অন্যদিকে আরবদের অস্ত্রের উৎস ছিল পশ্চিমী দেশগুলো যারা জাতিসংঘের প্রতি অপরিসীম অনুগত্য দেখিয়ে আরবদেরকে একটি বুলেটও সাহায্য দিল না। উপরন্তু আরবদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি এবং অনেকের সাথে আতাত গড়ে তোলার ষড়যন্ত্রের পথ তারা অনুসরণ করল। সুতরাং নতুন করে যখন যুদ্ধ শুরু হলো, আরবদের মাঝে দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা গেল। জর্দান নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করল। মিসর বীরশিবা থেকে পিছু হটে শুধু গাজা অঞ্চল আঁকড়ে ধরে থাকার মধ্যেই দখল শেষ করল। ইরাকী বাহিনী একা পড়ে যাওয়ায় তাকে পিছু হটতে বাধ্য হতে হলো। এইভাবে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর অঞ্চল ও গাজা এলাকা ছাড়া ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অংশ ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলো।

ইসরাইলের এই মিরাকল বিজয়ের একটি বড় কারণ ছিল, নবজাত ইসরাইল রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা। ইসরাইলের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ান ছিলেন একজন রুশ ইহুদী। সম্ভবত এই কারণেই ইসরাইল রাষ্ট্রকে সোভিয়েত ইউনিয়ন একান্তই নিজের বলে জ্ঞান করছিল। অবশ্য ফিলিস্তিনে ইহুদী ষড়যন্ত্রের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক আগে থেকেই যুক্ত। মস্কো ১৯২৯ সালে প্রখ্যাত গেরিলা নেতা ভলাদিমির গারটস্কিকে (ইনি পিটার্সবার্গ দখলের অভিযানে কম্যুউনিস্ট সেনা দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষ হত্যা করেছিলেন) ফিলিস্তিনে পাঠায় ইহুদী যুবকদের ট্রেনিং-এর দায়িত্ব দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক

www.icsbook.info

সহযোগিতার পরিমাণও উল্লেখ্যযোগ্য। ইহুীদের প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগেরই যোগানদার ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমেরিকা শতকরা ১৯, পশ্চিম ইউরোপ ১৬ এবং পূর্ব ইউরোপ ২১ ভাগ অর্থের যোগান দেয়। এই হিসেবে কম্যুনিস্টরা ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের শতকরা ৬১ ভাগ অর্থ সরবরাহ করে। এছাড়া মস্কো প্রেরিত প্রতিনিধি দল কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফিলিস্তিনে রুশ ইহুদীদের জন্য জমি কেনে।

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের এবং যুক্তির বিরুদ্ধে শক্তির যে বিজয় সূচিত হয়েছে, তার আর নিরসন হয়নি, বরং তা আরো শিকড় গেড়েই বসেছে। ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে ইসরাইল তার ঐ 'মিরাকল শক্তি' দিয়ে মিসরের গাজা ও সিনাই অঞ্চল, জর্দানের জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও জেরুসালেম এবং সিরিয়ার গোলান হাইট দখল করে নেয়। ইসরাইলের প্রতি আমেরিকাসহ পশ্চিমা শক্তির সহযোগিতা এবং আরবদের পিছনে দাঁড়ানো সোভিয়েত ইউনিয়নের মীরজাফরী ভূমিকার ফলেই এ মজার মিরাকল সম্ভব হয়। মজার বলছি এ কারণে যে মিসর ও সিরিয়া এ দু'জনেরই যে সমর শক্তি ছিল তা দিয়ে ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কয়েক ঘণ্টায় মুছে ফেলা সম্ভব ছিল, কিন্তু তা হয়নি। কারণ, রুশরা তাদেরকে অস্ত্র দিয়েছিল, টাকা কামাই ও বন্ধু সেজে রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য, ইসরাইলের কোন ক্ষতি করার জন্য নয়। তাই তো দেখা গেল, ১৯৭৩ সালে মিসর বাহিনী তাদের এক দুধর্ষ অভিযানে ইসরাইলের তৈরি তার অহংকার এবং অজেয় বলে কথিত বারলেভ প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙ্গে যখন বিদ্যুত গতিতে ইসরাইল অভিমুখে অগ্রসর হল, ইসরাইলের পতন টেকানোর জন্য তখন ওয়াশিংটন-তেল আবিবের মধ্যে সাহায্যের বিমান সেতু রচিত হল তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু মিসরের দিক থেকে তার সাহায্যের হাতই টেনে নিল না বরং চাপ দিল তাকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য।

'৭৩ এর পর আজ' ৮৫ সাল। এ বার বছর ধরে ফিলিস্তিনীদের উপর কৃত অন্যায়কে পাকাপোক্ত করা এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে সবদিক থেকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করার জন্য ইসরাইলের ঐ বন্ধুরা রীতিমত কূটনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। রেজাল্ট : সম্মুখ সমরে জয় যাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কূটনৈতিক যুদ্ধেও তারাই মার খাচ্ছেন। ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং তার সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে মিসর অবমাননাকরভাবে ইসলাইলের কাছ থেকে তার হারানো এলাকা ফিরে পেয়েছে। দক্ষিণ সীমান্তে আগের সেই উদ্বেগ অনিশ্চয়তা ইসরাইলের আজ নেই। পূর্বদিকে জর্দান সীমান্তের অবস্থাও কতটা এ রকমেরই। জর্দান আর আজ জর্দান নদীর পশ্চিম তীর দাবী করছে না এবং এ ধরনের কোন সমস্যা নিয়ে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে নামার সামান্য কোন ইচ্ছাও মনে হচ্ছে জর্দানের নেই। ফিলিস্তিনীদের এই এলাকা সে ফিলিস্তিনের জন্যই বরাদ্দ করে রেখেছে। সিরিয়া ইসরাইলের বিরুদ্ধে হৈ চৈ করছে ঠিকই কিন্তু সমস্যার গভীরে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় গোলান হাইটস নিয়ে সিরিয়ার

www.icsbook.info

কোন দুঃশ্চিন্তাই নেই। আজ দেড় যুগ গোলান হাইটস ইসরাইলের দখলে। ইসরাইলকে তার অবৈধ দখল থেকে সরাবার কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই সিরিয়া করেনি। উপরন্তু লেবাননে সিরীয় বাহিনীর যে ভূমিকা আমরা ১৯৭৯ ও ১৯৮২ সালে ইসরাইলী বাহিনীর দক্ষিণ লেবানন আক্রমণ, দখল ও গণহত্যা চালানোর সময় দেখেছি এবং যে ভূমিকা এখন আমরা দেখছি, সেটা জাতিগত প্রাণ কোন যোদ্ধার ভূমিকা নয়। সবদিক থেকে তাই মনে হয় সোভিয়েতমুখী সিরিয়া সরকার লোক দেখানোভাবে ইসরাইলের বিরুদ্ধে হৈ-চৈ করলেও তার সাথে কোন যুদ্ধে নামার ইচ্ছা তার মোটেই নেই। মনে হয়, তলে তলে সে আরেক ক্যাম্প ডেভিট-এর জন্য রাজী এবং এরই দরকষাকষির একটা উপায় হিসেবে সে নিজেকে লেবানন সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে প্রভাবশালী পক্ষ বানিয়ে রাখতে চায় যাতে ইসরাইল ও ইসরাইলের মুরুব্বীদের প্রয়োজন তাকে হয়। এরপর বাকি থাকে লেবানন রাষ্ট্র। আমরা জানি লেবানন আজ নিজেই বিপন্ন। সুতরাং ইসরাইলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তার কোনই ক্ষমতা নেই।

এ অবস্থায় ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের ভূমিকাই শুধু অবশিষ্ট থাকছে। ইসরাইল সীমান্তের আরব-রাষ্ট্রগুলোকে কূটনৈতিক পথে যেভাবে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দাঁড় করানো হচ্ছে, ফিলিস্তিনীদের ক্ষেত্রেও এ চেষ্টা করা হয়েছে। ক্যাম্পডেভিড চুক্তিতে ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন পিএলও স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে স্ব-শাসন বা 'স্বায়ত্তশাসন–এর কভারে ইহুদী আধিপত্যবাদী অস্তিত্ব মেনে নিতে রাজী হয়নি। এর পরই পিএল-এর উপর নেমে এল দূর্যোগ। ইসরাইল সীমান্তে পিএলও-এর শেষ সামরিক অবস্থান লেবাননে মার্কিনী মদদপুষ্ট ইসরাইল পিএলও-কে কচুকাটা করল এবং তাদেরকে উচ্ছেদ করল লেবানন থেকে। মৌনব্রত পালন করে সিরিয়া শধু ইসরাইলকে সহযোগিতাই করল না, উত্তর লেবাননে পিএলও-এর অবশিষ্ট শক্তিকে সে বিধ্বস্ত করল। এইভাবে ইসরাইল এবং সিরিয়া পিএলওকে আজ এমন অবস্থায় নিয়ে পৌঁছাল যার ফলে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সামরিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া তার পক্ষে কঠিন। সুতরাং অবস্থা এই দাঁড়াচ্ছে যে, ইসরাইলের চার সীমান্ত আজ নিরাপদ। এ দশকের সূচনাকাল পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে তার যে উদ্বেগ- উৎকণ্ঠা ছিল তা আজ প্রায় অন্তর্হিত। অর্থাৎ গত দশ বছরের ইসরাইল মরুব্বীদের কূটনৈতিক যুদ্ধ ইসরাইলকে এমন বড় বিজয়ের আসনে সমাসীন করেছে, যে বিজয় সে যুদ্ধ করেও লাভ করতে পারেনি।

তাহলে ৪০ লাখ ফিলিস্তিনী মুসলমানের দেশ ফিলিস্তিনের ভবিষৎ কি? এ প্রশ্নের জবাব খুব শক্ত। আরব দেশগুলো কোন পথ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করবে তার উপরই এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে। তবে পরিস্থিতি দৃষ্টে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান আপাততঃ ক্যাম্পডেভিড ধরনের সমাধানের দিকেই গড়াচ্ছে বলে মনে হয়। সবার চোখের সামনে তুলনাহীন হত্যাযজ্ঞ ও উচ্ছেদের শিকার হবার পর হতাশা ও বিক্ষুব্ধ পিএলও মিসরের

www.icsbook.info

মাধ্যমে তারই দৃষ্টান্ত অনুসরণে অত্যন্ত ধীরগতিতে হলেও 'আলোচনার মাধ্যমে সমাধান'-এর দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। হোসেন-আরাফাত চুক্তির অধীনে জর্দান পিএলও যুক্ত কমিটি গঠন এবং এই কমিটির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈঠকের পরিকল্পনা এই ক্ষেত্রে একটা বড় পদক্ষেপ। হতে পারে এর পরের পদক্ষেপটাই হল ইসরাইল-জর্দান ফিলিস্তিনীদের বৈঠক। তারপরই হয়তো জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকা নিয়ে ফিলিস্তিনী রাজ্য গঠিত হতে পারে। এ সমাধানটা হবে ক্যাম্প ডেভিড ধরনেরই। এ সমাধান ফিলিস্তিনীদেরকে পা রাখার একটা নিজস্ব জায়গা দেবে যার প্রয়োজন তাদের জন্য আজ খুব বেশি। যদি এই সমাধান আসে, তাহলে আরবরা এবং ফিলিস্তিনীরা অবস্থানগত দিক দিয়ে ১৯৬৭ সালের অবস্থার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাবে। কারণ ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ পর্যন্ত এ ভূখণ্ড দুটি আরবদের দখলেই ছিল। কিন্তু মূল প্রশ্নের সমাধান তো এর দ্বারা হচ্ছে না। ইহুদিরা অন্যায়ভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসে দেশের মালিক সাজার বিহিত এখনো হয়নি, বিহিত হয়নি যে লাখ লাখ বাসিন্দাকে উচ্ছেদ করেছে তারা। এই উদ্বাস্তুরা উদ্বাস্তুই থাকবে। তাদের জায়গা জমি সম্পদ ফিরে পাবে না, অথচ তাদের অধিকার মাড়িয়ে একটা স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে এবং অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রটি অতঃপর নাকে তেল দিয়ে আরামে ঘুমাবে তা কিছুতেই বৈধ নয়। ইসরাইলী ইহুদিরা জেরুসালেমকে রাজধানী ঘোষণা করেছে এবং সে রাজধানী এখন পুরোপুরি, কাজ করছে। এখান থেকেও তার নড়ার কোন লক্ষণ নেই। এগুলোর দিক থেকে চোখ বন্ধ রেখে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় একটা ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে, কিন্তু ঐ এলাকায় সত্যিকার শান্তির কোন পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না। হতে পারে না কারণ, ইতিহাসের শুরুতো ১৯৬৭ সাল থেকে নয়, কমপক্ষে ১৯৪৮ সাল থেকে হিসেবে করতে হয় এই ইতিহাসের বয়স। আগের এই ইতিহাসকে মুছে ফেলা যাবে না এটাই বাস্তবতা। ভার্সাইচুক্তির অবিচার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনে। আবার দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সন্ধি চুক্তিতে জার্মান যে অপারেশনের সম্মুখীন হয়েছে তা সবাই মেনে নিলেও জার্মানরা মেনে নেয়নি, যার একটা ফল অবশ্যই রয়েছে। সুতরাং ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনীরা আজ তিন যুগ ধরে যে জুলুমের অন্ধকারে বন্দী তারও মুক্তির একটা প্রভাত রয়েছে। কিন্তু রাতের অন্ধকার থেকে এই মুক্তির প্রভাত ছিনিয়ে আনার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হবে আরেক সালাহউদ্দিনের–গাজী সালাউদ্দিনের।

২১-০৮-১৯৮৫

www.icsbook.info

ওয়াশিংটন পোস্ট-এ প্রকাশিত একটি লেখায় 'জিম হোগল্যান্ড' পিএলও-ইসরাইল চুক্তিকে ইয়াসির আরাফাতের জন্যে 'আত্মসমর্পণের দলিল' বলে অভিহিত করেছেন। 'জিম হোগল্যান্ড' তার এ বক্তব্যকে খোলাসা করেননি। তবে এইটুকু বলেছেন যে, ১৫ বছর আগে ক্যাম্পডেভিড চুক্তি গ্রহণ করলে ফিলিস্তিনীরা গাজা ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের উপর নিশ্চিত অধিকার লাভ করতো, কিন্তু এখন যে চুক্তিতে তারা রাজি হলো, তাতে এ অধিকার কেমন হবে কি হবে সে বিষয়টা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর ঝুলে থাকলো।

শুধু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর ঝুলে থাকলো না, ভবিষ্যতটা ইসরাইলের দয়ার উপর নির্ভর করবে।

গত পরশু ১৩ সেপ্টেম্বর যে চুক্তি স্বাক্ষর হলো, তাতে কার্যতঃ ফিলিস্তিনীরা কি পেল? ১৩ অক্টোবর চুক্তিটি কার্যকরী হবার পর দয়ার দান হিসেবে ছোট্ট গাজা ও ছোট্ট জেরিকো অঞ্চলটুকু ফিলিস্তিনীরা ফেরত পাবে। কিন্তু তখনও তাদের দিকে উদ্যত থাকবে ইসরাইলী সৈনিকদের বন্দুক। কারণ ১৯৯৪ সালের ১৩ এপ্রিলের আগে জেরিকো ও গাজা থেকে ইসরাইলী সৈন্যরা যাচ্ছে না। ইসরাইলী এই সৈন্য প্রত্যাহারও ফিলিস্তনী নিয়ন্ত্রণের প্রকতি সম্পর্কে এখনও কিছুই ঠিক হয়নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত চুক্তি স্বাক্ষর হবে আগামী ১৩ ডিসেম্বর। যার শর্ত-শরায়েত শক্তিমান ইসরাইলের দয়ার উপরই নির্ভর করবে।

ওয়াশিংটনে সম্পাদিত গত পরশুর চুক্তি অনুসারে ৫ বছরের জন্যে যে 'সেলফরুল' ফিলিস্তিনীরা পাচ্ছে, তা পরিচালনা করবে নির্বাচিত একটি 'প্যালেস্টেনিয়ান কাউন্সিল'। কিন্তু এই কাউন্সিল কিভাবে কি দায়িত্ব পালন করবে ফিলিস্তিনীরা তা স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে ইসরাইলের সাথে একটা চুক্তি করতে হবে। সেই চুক্তিই ঠিক করবে কাউন্সিলের গঠন ও ক্ষমতা কি হবে এবং তার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের প্রকৃতি কেমন হবে। ঐ চুক্তির ব্যবস্থা অনুসারেই কাউন্সিলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। সুতরাং গোটা বিষয়টা ইসরাইলের সাথে ভবিষ্যত চুক্তি, অন্য কথায় ইসরাইলের দয়ার উপরই নির্ভর করবে।

ইসরাইলের দয়া ও অনুমোদনের অধীনে গাজা ও জেরিকো শাসনের জন্যে যে প্যালেস্টাইন কাউন্সিল গঠিত হবে, তার কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকারের চেয়ে বেশি কিছু হবে

www.icsbook.info

না। তার হাতে থাকবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ, প্রত্যক্ষ কর, এবং পর্যটন এই পাঁচটি বিষয়। একটি ইসরাইল–ফিলিস্তিনী কমিটি পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, অর্থ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, গাজা সমুদ্র বন্দর, বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম এবং গণমাধ্যম সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ পরিচালনা করবে। আর পররাষ্ট্রনীতি ও দেশরক্ষা এককভাবে পরিচালনা করবে তেলআবিব। অর্থাৎ ইসরাইলী শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও ডিক্টেশনের অধীন ফিলিস্তিনী শাসন কর্তৃপক্ষ হবে এক প্রকারের ঠুটো জগন্নাথ।

এই ঠুঁটো জগন্নাথকে ইসরাইলী সরকারের বড় বেশি আজ্ঞাবহ হতে হবে। ইসরাইল সরকারের কথায় তাকে উঠতে হবে, বসতে হবে এবং সর্ব উপায়ে ইসরাইলকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। কারণ স্থায়ী সমাধান ইসরাইলের মর্জির উপরই নির্ভর করবে। ওয়াশিংটনে সম্পাদিত গত পরশুর চুক্তি অনুসারে স্থায়ী চুক্তি সম্পাদনের কাজ শুরু হবে ১৯৯৫ সালের ১৩ ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে। আর এই চুক্তি সম্পাদনের কাজ শেষ হবে ১৯৯৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর। স্থায়ী চুক্তি সম্পাদনের জন্যে এই দীর্ঘ পাঁচ বছর সময় কেন নেয়া হলো? নেয়া হলো এই জন্যে যে, এই সময়ে দেখা হবে ফিলিস্তিনীরা ইহুদি ইসরাইলের কতটা অনুগত এবং কোন প্রকার বেয়াদবী ও বেয়াড়াপনা করে কি না। এই পরীক্ষায় পাস করতে হবে ফিলিস্তিনীদেরকে, বিশেষ করে ইয়াসির আরাফাত ও তার সাথীদেরকে অবশ্যই ইসরাইলের অত্যন্ত অনগত হতে হবে। অবশ্য শুধু অনুগত হলে চলবে না, ফিলিস্তিনীরা যারা ইসরাইলের সাথে বেয়াদবী করবে, শর্তহীন স্বাধীনতার কথা বলবে, তাদের আচ্ছা করে মার দিতে হবে, গলা টিপে ধরতে হবে। এই দুইটি পরীক্ষায় ইয়াসির আরাফাত ও তার পিএলও কৃতিত্বের পাস করতে পারলেই শুধু ইসরাইলের মর্জি মোতাবেক স্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হবে। গত ৪৫ বছর শত দুঃখ- কষ্ট ও যাযাবর জীবন সত্ত্বেও ফিলিস্তিনীরা স্বাধীন ছিল অথবা স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছে, কিন্তু এই চুক্তি তাদেরকে আইনগতভাবেই পরাধীন করলো এবং নিয়ে গেল ইসরাইলী শাসনের অধীনে।

গাজা ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এলাকা ও সেখানকার মানুষের প্রতি এই যে অবিচার করা হলো, তার চেয়ে বেশি অবিচার করা হয়েছে ১৯৪৮ সালে যে আরব ভূমি ইসরাইল দখল করেছে সেই ভূমির প্রতি এবং যে লাখ লাখ লোক উদ্বাস্তু হয়েছে তাদের প্রতি। গত পরশু সম্পাদিত চুক্ত অনুসারে ১৯৬৭ সালের পর যারা উদ্বাস্তু হয়েছে তারাই শুধু ফিলিস্তিনে ফেরত যেতে পারবে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যে ৩০ থেকে ৪০ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে তাদের দেশে ফেরার অধিকার ঐ চুক্তি দ্বারা চিরদিনের মত হরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত গোটা ইতিহাসটাই মুছে ফেলা হয়েছে। অথচ ইয়াসির আরাফাত এবং তার

www.icsbook.info

সাথীরা এই ইতিহাসেরই মর্মান্তিক সাক্ষী। নিজেদের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত এই ইতিহাস অস্বীকার করে জনাব ইয়াসির আরাফাত এবং তার পিএলও নিজেদেরকেই অস্বীকার করেছেন, জিরো করে তুলেছেন নিজেদের শক্তি, সামর্থ ও অস্তিত্বকে। এই জিরো'র আর কোনই মূল্য থাকবে না ইসরাইলের কাছে কোনই মূল্য দেবে না ইসরাইল এই জিরোদেরকে।

বিপ্লবী নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং তার বিপ্লবী সংগঠন পিএলও-এর এই মারাত্মক অধঃপতন ঘটল কি করে, এই ভাবে তারা জিরো'র কোঠায় এসে পড়লো কি করে? এই প্রশ্নটি গত ক'দিন ধরে আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছিল। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, ইসরাইল যা চায় অর্থাৎ স্বীকৃতি তা ইসরাইলকে নিঃশর্তভাবে শতকরা একশ' ভাগই দিয়ে দেয়া হলো, অথচ ফিলিস্তিনীরা কিছুতেই হাতে পেল না। পরে যা পেল তা পাওয়া নয়, পাওয়ার একটা নাটক মাত্র। কোন যাদু বলে এটা ঘটল? কেন ইয়াসির আরাফাত এবং তাঁর পিএলও নিজেদের নিঃস্ব করে শুণ্যের কোঠায় নামিয়ে নিয়ে এল? কিছু জবাব আমার সামনে এসেছে। ভেবেছি ইহুদিবাদী চক্রান্তের সাথে আমেরিকা এবং পশ্চিমী যোগ-সাজসের ফলেই এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভেবেছি, তাদের ষড়যন্ত্র ঠিকই আছে, কিন্তু সে ষড়যন্ত্রের কাছে ইয়াসির আরাফাত এবং তার পিএলও আত্মসর্পণ করল কেন? তারা নিঃস্ব উদ্বাস্তু, তাদের তো কিছুই হারাবার ছিল না নতুন করে! তাদের যে প্রাপ্য তা না পেয়ে কিংবা পাওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট চুক্তি না করে তারা ইসরাইলের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিতে গেল কেন?

এর একটা উত্তর অবশেষে পেয়েছি। উত্তর আমি পেয়েছি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভবন হোয়াইট হাউজের সবুজ চত্বরে হাজারো লোকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন পিএলও-ইসরাইল চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান থেকে। বুঝেছি, ইয়াসির আরাফাত এবং তাঁর সাথীরা আদর্শ নৈতিকতা ও জাতীয়তাবোধের দিক দিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েছেন। এই দেউলিয়াত্ব তাদের দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন, ইসরাইলী পররাষ্টমন্ত্রী শিমন পেরেস, চুক্তি স্বাক্ষরকারী পিএলও নেতা জনাব আব্বাস, ইসরাইল প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন এবং পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাতের বক্তৃতা শুনলাম। বক্তৃতায় ক্লিনটন তৌরাত, কোরআন, বাইবেল পাশাপাশি চলার কথা বললেন। তিনি বললেন মুসলমান, ইহুদি ও খৃষ্টান– এই তিন জাতির মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার কথা এবং তার মাধ্যমে ইতিহাসের একটা নতুন অধ্যায় উন্মোচনের কথা। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমরা সকলে ইব্রাহীম ইসহাক ও ইসমাইলের সন্তান। সর্বশেষে তিনি

www.icsbook.info

শান্তির পথে পরিচালনার জন্যে সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আইজাক রবীন জানালেন তাঁরা এসেছেন ইহুদীদের চিরন্তন রাজধানী জেরুসালেম থেকে শান্তির বার্তা নিয়ে। আর শিমন পেরেস বললেন, ইব্রাহিম ছিলেন শান্তির প্রবর্তক। তৌরাত শান্তির পক্ষে কি বলেছে সেই কথা দিয়েই তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। কিন্তু বেদনার বিষয়, ফিলিস্তিনী প্রতিনিধি জনাব আব্বাস এবং পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাতের বক্তৃতায় আল্লাহ, আল্লাহর রাসুলের নাম তো দূরের কথা 'মুসলিম' বা 'ইসলাম' শব্দের উল্লেখ একবারও শুনলাম না। তাঁদের বক্তৃতা শুনে বুঝা যায়নি তাঁরা কোন জাতির, কোন ধর্মের, তাঁদের জাতির পিতা কে, তাঁদের নবী কে, তাঁরা কোন ধর্মগন্থ অনুসরণ করেন কিংবা তাঁদের এতিহ্য ও ইতিহাস কি। বক্তৃতা শেষে ইয়াসির আরাফাত তিন্‌বার ধন্যবাদ উচ্চারণ করেছেন পাশে দাঁড়ানো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের প্রতি, কিন্তু একবারের জন্যেও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনি কিংবা সাহায্য চাননি আল্লাহর কাছে।

এই মর্মান্তিক দৃশ্য থেকে আমি বুঝেছি আইজাক রবিন এবং ক্লিনটনরা তাদের ইতিহাস- ঐতিহ্য অর্থাৎ ধর্মবোধের উপর অটল ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, অন্যদিকে পদস্খলন ঘটেছে ইয়াসির আরাফাতদের, তাঁরা ইতিহাস–ঐতিহ্য অর্থাৎ ধর্মবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। আর এভাবে যাদের পদস্খলন ঘটে তাঁরা অন্যের পায়ে গিয়েই পড়েন এবং অন্যের পা অবলম্বন করেই তাঁরা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। এবং তারা অন্যেরই হয়ে যান। ইয়াসির আরাফাত এবং তার সাথীরা তা-ই হয়েছেন।

আমার জিজ্ঞাসার এই জবাবটা আমার কাছে হৃদয়বিদারক, কিন্তু এটাই যে বাস্তবতা তা দু'চোখে অবলোকন করছি।

এই মুহূর্তে আরেকটা জিজ্ঞাসাও আমার মনে জাগছে। সেটা হলো, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের শাসক ও সমাজ নেতারাও কি সবাই ইয়াসির আরাফাত হয়ে গেলেন? দুঃখের বিষয়, তারাও ভূমিশয্যা নিয়েছেন ইয়াসির আরাফাতের মতই। কিছু করার নেই ঠিক আছে, কিন্তু সত্যকে সত্য, ন্যায়কে ন্যায় বলার মত সাহসটুকুও কি তাদের থাকবে না?

১৫-০৯-১৯৯৩

www.icsbook.info

আসামে ভারতের একটি পাপ

'পাপ বাপকেও ছাড়ে না' বলে একটা প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ বক্তব্যের তত্ত্বীয় যৌক্তিকতার কথা আমরা সকলেই জানি। তবে আমাদের গ্রাম বাংলার নিরক্ষর-অশিক্ষিত মানুষ যারা এই প্রবাদের স্রষ্টা। আমাদের জানা তত্ত্বকথা থেকে নয়, তাদের যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকেই এই প্রবাদের পত্তন করেছে। প্রকৃতই পাপ কাউকে ছাড়ে না। ভারতের ক্ষমতাসীনদের আসাম রাজনীতির দিকে নজর করলে এই কথাটা খুব বেশি মনে পড়ে। মনে পড়ে ব্যক্তিগতভাবে শুধু নয়, সামষ্টিকভাবে পাপ করলে সামষ্টিকভাবেই তার খেসারত দিতে হয়। ভারতের ক্ষমতাসীনরা আজ আসামে তাদের পূর্ব পাপের এক চক্রবৃদ্ধি জালে জড়িয়ে পড়েছে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুবাদে আসামে মন্ত্রিসভা গড়ার সুযোগ পায়। ক্ষমতায় এসেই বারদলই সরকার আসামী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। উপজাতি অসমীয়দের তারা কানে কানে বুঝাল এই বাঙ্গালীরা তাদের লুটেপুটে খেয়ে ভবিষ্যৎ শেষ করে দিচ্ছে, এদের খেদাতে হবে। এইভাবে হিন্দু কংগ্রেস উপজাতি অসমীয়দেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দু'হাত ধরে তুলে দাঁড় করাল। তারপর তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে শুরু করল যুগ যুগান্ত ধরে আসামে বসবাস করা বাঙালী মুসলমানদের উচ্ছেদ। হাজার হাজার লোককে তারা হত্যা করল, লুণ্ঠন করল তাঁদের বাড়ি ঘর, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল মাঠের পর মাঠ, তাদের শস্যক্ষেত। হাতির বহর লেলিয়ে বাড়ি ঘর তাদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। হাজার হাজার উদ্বাস্তু এসে আশ্রয় নিল সে দিনের পূর্ববাংলায়। হিন্দু কংগ্রেস সেই শূন্যস্থান ধীরে ধীরে পূরণ করল বাঙ্গালী হিন্দুদের দিয়ে। উপজাতি অসমীয়দের কোনই লাভ হল না।

দেশ বিভাগের পর দীর্ঘদিন অসমীয়রা এদিকে নজর দিতে পারেনি। পারেনি কারণ তাদের এত দিনের কুমন্ত্রণাদাতা কংগ্রেস তো আর নিজের বিরুদ্ধে অসমীয়দের কুমন্ত্রণা দিতে পারে না! কিন্তু চারদিকে তাকাতে শেখার পর এবং আশেপাশে নানা দৃষ্টান্ত অবলোকন করার পর অসমীয়রা চোখ খুলল। তারা আওয়াজ তুলল বিদেশী খেদানোর। আন্দোলন তারা শুরু করল। বলল, বিদেশীদের ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দেয়ার আগে কোন নির্বাচন তারা হতে দেবে না। কংগ্রেস একদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য যে অস্ত্র উপজাতি অসমীয়দের হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই অস্ত্র অসমীয় না এবার খোদ কংগ্রেসের উপরই ব্যবহার করল। আসামের বিরাট অঞ্চল থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ করার পর সেখানে যে হিন্দু বাঙ্গালীদের পুনর্বাসন শুরু হয়.

www.icsbook.info

একথা আগেই বলেছি। দেশ বিভাগের পর এই প্রক্রিয়া আরো দ্রুত হয়। একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে এবং রাষ্ট্রের গোটা প্রশাসন হিন্দুদের করায়ত্ত থাকার ফলে আসামে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক আগমন বেড়ে যায়। আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রবণতার দিকে নজর দিলেও এ কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। ১৯৫১ সালে আসামে লোকসংখ্যা ছির ৮০ লাখ ২৯ হাজার। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই লোকসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ১ কোটি ৪৬ লাখ ২৫ হাজারে। গোটা ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে প্রবণতা তার চেয়ে আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশ বেশি। সংখ্যার হিসেবে যার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ লাখ। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, দেশ বিভাগের পর ভিন্ন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অঞ্চল থেকে কোন মুসলমানই আসামে যায়নি, বরং সেখান থেকে অনেকে হিজরত করেছে এখানে। সুতরাং বাড়তি ২৪ লাখ লোক যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে তা আর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। উপজাতি অসমীয়দের আন্দোলন আজ এদেরই বিরুদ্ধে এবং বলা বাহুল্য এটা ভারত শাসনকারী কংগ্রেসেরই পাপের ফল।

কংগ্রেসের পাপ আজ আসামে যে কুৎসিত সন্তান প্রশ্ন করেছে কংগ্রেস তাকে ঠিকই চিনতে পারছে। কিন্তু প্রকাশ্যে তা স্বীকার করে নিতে সে নারাজ। বরং সে চাচ্ছে, আসামের অবশিষ্ট মুসলমানদের বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে উচ্ছেদ করতে এবং তাদের মূল্যে আসামের হিন্দু বাঙালীদের রক্ষা করতে। মিসেস ইন্দিরাগান্ধীর আমলে আসামে যে মুসলিম নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলো, তা এই ষড়যন্ত্রেরই ফল ছিল। আসামের আন্দোলনকারীদের সাথে গত ১৫ই আগষ্ট রাজীব গান্ধীর যে চুক্তি হয়েছে, সে চুক্তির আড়ালে এই ষড়যন্ত্রই চালানো হচ্ছে। আসাম চুক্তিতে বলা হয়েছে ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ সালের ২৪ শে মার্চ পর্যন্ত যারা আসামে গেছে তারা দশ বছর কোন ভোটাধিকার পাবে না। আর ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর যারা আসামে বসতি স্থাপন করেছে, তাদেরকে আসাম থেকে উচ্ছেদ করা হবে। এই চুক্তির দ্বারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এক সাথে দু'টি কাজ করতে চাচ্ছেন। এক, আসামের যুগ যুগান্ত ধরে বসবাসকারী মুসলমানের মূল্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসামে যাওয়া ঐ ২৪ লাখ মানুষের বসতি স্থাপনকে বৈধ করা। দুই, কংগ্রেসের বারদলই সরকার কর্তৃক উচ্ছেদ করার পর এখনও যেসব মুসলমান আসামে টিকে আছে তাদেরকে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পরের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে উচ্ছেদ করা। এই ষড়যন্ত্রে বর্তমান ভারত সরকার অন্ধ। অন্ধ বলেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী টের করতে পারেননি যে, তারই মাতা ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীই ১৯৭২ সালে ভারতের পার্লামেন্টকে জানিয়েছিলেন বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশী যারা ভারতে প্রবেশ করেছিল তারা সবাই ফিরে গেছে। মিঃ রাজীব গান্ধীর সরকার অন্ধ হলেও আসামের মানুষ কিন্তু অন্ধ

www.icsbook.info

নয়। আসামের সচেতন মহল ইতিমধ্যেই সরকারের এই মানসিকতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। আসামের গৌহাটি থেকে কোলকাতার দৈনিক আজকালের সাংবাদিক মিঃ বরুণ দাস গুপ্ত তার বিস্তারিত এক রিপোর্টে সরকারের দৃষ্টিভংগির সমালোচনা করে লিখেছেন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যদ্ধের সময় বহু বাংলাদেশী ভারতে এসেছিলেন তারা আর ফিরে যাননি এবং ১৯৭৫ -এর ভোটার তালিকায় তাদের নাম লাখে লাখে ঢোকান হয়েছে–কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তা বলাই বাহুল্য। (আজকাল ২রা সেপ্টেম্বর) সুতরাং বাংলাদেশী লেবাস পরিয়ে আসামের মুসলমানদের উচ্ছেদ করার যে ষড়যন্ত্র নিয়ে নয়াদিল্লীর কংগ্রেস সরকার আসাম চুক্তি করেছিলেন, তা মাঠে মারা যেতে বসেছে। বার দলই সরকারের আমলে উপজাতি অসমীয়দের হাতে তুলে দেয়া অস্ত্র যেভাবে তারা বিদেশী খেদাও আন্দোলনের মাধ্যমে দিল্লী সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে, ঠিক সেভাবেই রাজীব গান্ধীর আসাম চুক্তির ছত্রছায়ায় ১৯৫১ সালের পর আসামে যাওয়া সবাইকে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করার সব ব্যবস্থা আসামের আন্দোলনকারীরা সম্পূর্ণ করেছে। আসামে আজ যার ভোটার তালিকা প্রণয়ন করছে, তারা আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে যারা অসমীয় তারা পাইকারীভাবে ভোটাধিকার হারাচ্ছে এবং বিদেশী বলে চিহ্নিত হচ্ছে। কেমনভাবে তা হচ্ছে মিঃ বরুণ দাস গুপ্ত তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যেমন গৌহাটির টি কে দাস গুপ্ত পিডব্লিউডির এ্যাডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার। বাইশ বছর ধরে চাকরি করছেন। তাকে নোটিশ দেয়া হয়েছে তিনি নাকি ভারতীয় নন। তেজপরের অজিত সেন গুপ্ত। বয়স ৭৮ বছর। ১৯৪২ সালের ৭ই জানুয়ারি থেকে আসামের নাগরিক। তাকে নোটিশ দেয়া হয়েছে, কোন কালে কোন ভোটার তালিকায় তার নাম ছিল না, অতএব তিনি ভারতীয় নাগরিক নন। যখন তিনি ১৯৬০, ১৯৬৬ এবং ১৯৭১ সালের তালিকাতে তার নাম দেখালেন, তখন বলা হলো ভোটার তালিকায় নাম থাকা তার নাগরিকত্ব প্রমাণ করে না। এমন দৃষ্টান্ত একটি দু'টি নয়, লাখো পাওয়া যাবে। এইভাবে ছলে-বলে-কৌশলে লাখ লাখ লোককে আসামের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে। যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, ১৯৫১ সালের পর আসামে যাওয়া সেই ২৪ লাখ ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষসহ আরও লাখ লাখ মানুষ আসামে ভোটাধিকার হারাচ্ছে। আর আসামের আন্দোলনকারীরা এই সবাইকেই ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর আসামে প্রবেশকারীর তালিকায় ফেলে আসাম থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করবে। সুতরাং রাজীব গান্ধী মুসলমানদের উচ্ছেদ করে তাদের মূল্যে আসামে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষকে রক্ষার যে চাল চুক্তির মাধ্যমে চেলেছিলেন, তা একেবারেই ব্যর্থ হচ্ছে। চুক্তিটি এখন বুমেরাং হয়ে দিল্লী সরকারকেই আঘাত করতে উদ্যত। আর পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্য আসাম থেকে ব্যাপক হারে উদ্বাস্তু আগমনের ভয়ে ভীত।

www.icsbook.info

রাজীব গান্ধী ইতিমধ্যেই ভারতে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর আসাম চুক্তিকে 'অমানবিক অগণতান্ত্রিক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ও ভয়ংকর' বলে ভারতীয় পত্র পত্রিকায় অভিহিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে তিনি তাঁর মাতামহ ও শহীদ মায়ের দৃঢ়তার আদর্শে থাপ্পড় কষিয়েছেন।

এইভাবে আসামের আন্দোলনকারীদের সাথে তড়িঘড়ি চুক্তি সম্পাদন করে একই সাথে বাংলাদেশকে একহাত দেখানো এবং অসমীয়দের কাঁচকলা দেখিয়ে বাগে রাখার যে ব্যবস্থা করেছিলেন রাজীব গান্ধী তথা দিল্লী সরকারের জন্য মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিচ্ছে। মিঃ রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে অভিযোগটি আনা হয়েছে তা হলো, আসাম অসমীয়দের এবং সেখানকার ভারতীয়দের বিদেশী বলে চিহ্নিত করে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা করে তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও জাতিসত্তাকে এক রাখার কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক শক্তিকে ধসে দিয়েছেন। আসাম চুক্তির প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই ভারতের অন্যান্য জাতিসত্তাকে স্পর্শ করেছে। ভারতের উত্তরবঙ্গের তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নরেন দাস কয়েক দিন আগে ঘোষণা করেছেন, তারা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গ জুড়ে বিদেশী সমস্যা সমাধানের জন্য এক ব্যাপক ও যৌথ আন্দোলন শীঘ্রই শুরু করবেন। বিক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গও এই কথাই বলবে। তাদেরকে যদি আসামের বাঙালীদের গ্রহণ করতে হয়, তাহলে এরপর অবাঙালীরা পশ্চিমবঙ্গে থাকবে কেমন করে? 'আমরা বাঙালী' নামক সংগঠন ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে, তারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের বাঙালী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে একটি বাঙালী স্থানের দাবীতে এবং আসাম চুক্তির বিরোধিতায় পূজোর আগেই আন্দোলন শুরু করবে। এই মানসিকতার উত্থান ভারতের পূর্ব থেকে ধীরে ধীরে পশ্চিমেও সংক্রমিত হবে, যদি চুক্তি অনুসারে আসাম থেকে বিদেশী বলে চিহ্নিত হয়ে অঅসমীয়রা বহিষ্কৃত হয়। আবার চুক্তি থেকে যে পিছু হটবেন রাজীব গান্ধী, সেখানেও রয়েছে সমস্যা। সুতরাং নিজের ফাঁদে নিজেই আটকা পড়েছে রাজীব গান্ধীর সরকার আজ আসামে। এটা পাপেরই পরিণতি যার শুরু আসামের বার দলই সরকারের আমলে।

একথা বলাই বাহুল্য, রাজীব গান্ধী সরকারের ষড়যন্ত্র কোনক্রমেই বাংলাদেশকে স্পর্শ করতে পারবে না। আসামে কোন বাংলাদেশী নেই সুতরাং কাউকে সেখান থেকে নেবার প্রশ্ন উঠে না– একথা বাংলাদেশ আগেও বলেছে, এখনও বলছে, ভবিষ্যতেও বলবে এবং এটাই ঠিক। নয়াদিল্লী সরকার এটা মুখে স্বীকার না করুন কিন্তু ভারতের সচেতন সবাই এ বিষয়টা জানেন।

১৫-৯-১৯৮৫

www.icsbook.info

ইসরাইলী সন্ত্রাস ও তার সহযোগীর চেহারা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এক মুখ আমরা দেখছি। তিউনিসিয়ায় যখন ইসরাইলী বোমারু বোমা ফেলল তখন তার সাথে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্ত করেছি এই একটা যৌক্তিক ভিত্তির উপর যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের এমন একটা শক্তি ও সাহায্যের উৎস যার ইচ্ছা-অনিচ্ছা হিসেব করেই ইসরাইলকে কোন পদক্ষেপ নিতে হয়। সুতরাং তিউনিসিয়ার পিএলও সদর দফতরে বোমা ফেলার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সায় আছে। কিন্তু ইটালীর প্রমোদতরী আটক করার সাথে জড়িত চারজন ফিলিস্তিনীকে বহনকারী মিসরীয় বিমান মার্কিন সরকার কর্তৃক হাইজ্যাক হবার পর একথা মনে হচ্ছে যে, তিউনিসিয়ায় ইসরাইলী বোমাবর্ষণের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত। বোমারুগুলোর গায়ে ইসরাইলী প্রতীক চিহ্ন থাকলেও তা ছিল আসলে মার্কিনদেরই। এখন মনে হচ্ছে, ইসরাইলের এন্টেবী ও ইরাক অপারেশনও তার কোন একক ব্যাপার ছিল না। এখানেও মার্কিন হাত প্রত্যক্ষভাবেই কাজ করেছে।

ইসরাইল সেদিন তিউনিসিয়ায় এবং এর আগে ইরাকে যা করেছে এটা একটা রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসবাদ, আর মিসরীয় বিমান হাইজ্যাক করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা করল সেটা রাষ্ট্রীয় বিমানদস্যুতা। মার্কিন সরকারের একজন প্রতিনিধি মিসরীয় বিমান হাইজ্যাকের ব্যাপারটা যে খোদ প্রেসিডেন্টের নির্দেশেই হয়েছে সে কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, এমন কাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও করবে। মার্কিন মুখপাত্রের এই ঘোষণার মধ্যে শক্তির একটা অহংকার আছে। এ অহংকার প্রদর্শনের শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই একথা আমরা বলি না। কিন্তু তার এমন প্রকাশ বেমানান হয়েছে এই কথাই আমরা বলব।

অবশ্য মিসরীয় বিমান হাইজ্যাকের মধ্যে মার্কিনীদের খুব একটা কৃতিত্ব, যা নিয়ে ঐ অহংকার করা যেতে পারে, আছে বলে আমরা মনে করি না। মিসরীয় কোন সূত্র যদি মিসরীয় বিমানটির তিউনিস যাত্রার দিনক্ষণ মার্কিনীদের জানিয়ে থাকে, তিউনিসীয় কর্তৃপক্ষ যদি মিসরীয় বিমানটি তার দেশে না নামতে দেবার মার্কিনী নির্দেশ বা অনুরোধকে ওহির মর্যাদা দিয়ে থাকে এবং সর্বশেষে মিসরীয় বিমানটি যদি 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' অথবা নির্দেশানুগত অতি 'সুবোধ বালকের' ভূমিকা পালন করার মত হয় তাহলে মিসরীয় বিমানটি পাকা ফলের মতই গিয়ে মার্কিন কোলে অবতরণ করবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আসলে হয়েছে এটাই। মিসরীয় বিমান না হয়ে পিএলও-এর বিমান হলে হয়ত অন্য দৃশ্য দেখা যেত।

www.icsbook.info

মার্কিনীদের যে মুখ আমরা দেখছি তা নতুন-এই জন্য যে, তাতে আজ কোন নেকাব নেই। ইহুদীদের অবৈধ, জঘন্য, নৃশংস ভূমি দখলকে চিরস্থায়ী করার জন্য সেই মুখে আমরা ফিলিস্তিনী জাতিকে ধ্বংস করার একটা দৃঢ় শপথ উৎকীর্ণ দেখতে পাচ্ছি। আজ পরিষ্কারই মনে হচ্ছে, লেবাননসহ ইসরাইলের সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলো থেকে ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সুপরিকল্পিত উৎখাত এই ধ্বংস পরিকল্পনারই অংশ ছিল। অবশ্য একথা আমরা স্বীকার করি, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক নির্বুদ্ধিতা এবং সিরিয়াসহ অনেক আরব রাষ্ট্রে সংকীর্ণ স্বার্থপরতা সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। লাল ও বাদামী সাম্রাজ্যবাদের পাতা ফাঁদগুলোতে পা দিয়ে তারা ফিলিস্তিনী জাতির প্রতিরোধ শক্তির ধ্বংস এইভাবেই ত্বরান্বিত করে তুলেছে। আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে গেছে, মিসরের সাথে পিএলও-এর সম্পর্কের অবনতি এবং সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার জর্দানের সাথে পিএলও এর সংঘাত এবং সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার এবং সর্বশেষে লেবাননে ইসরাইল সিরিয়া অমল ও দ্রুজ সবাই মিলে ফিলিস্তিনীদের উপর নিধনযজ্ঞ চালানো ফিলিস্তিনী বিরোধী একটা দীর্ঘ মেয়াদী ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থিমাত্র। এই ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ অধ্যায় ছিল লেবানন থেকে ফিলিস্তিনীদের বহিষ্কার করে দুরবর্তী সব কেন্দ্রে তাদের এমনভাবে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে রাখা যাতে তারা কখনই আর ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে না পারে। ভাবতে বেদনা বোধ হয়, কোথায় ফিলিস্তিন আর কোথায় তিউনিসিয়া, আজ ভাগ্যের ফেরে ফিলিস্তিন থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে তিউনিসিয়ায় ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি, মনকে বুঝ দেয়া ছাড়া এই হেড কোয়ার্টারের কানাকড়ি মূল্যও নেই। ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধশক্তি এইভাবে ধ্বংস ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেও দেখা যাচ্ছে মার্কিনীদের তৃপ্তি হয়নি। তারা চাচ্ছে ইসরাইলীদের পর্বতপ্রমাণ অন্যায়ের দুর্বহ ভার বুকে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে, হাত পা ছোঁড়ার মত বেয়াদবি না করে ফিলিস্তিনীরা শেষ হয়ে যাক। কিন্তু ফিলিস্তিনীরা এইভাবে তাদের আত্মহনন করতে চায়নি বলেই ইসরাইল মার্কিন কর্তৃক পিএলও সদর দফতরে বোমা বর্ষণ এবং অবশেষে ফিলিস্তিনী বহনকারী মিসরীয় বিমান অপহরণের মত মার্কিন বিমানদস্যুতা।

তিউনিসিয়ায় বোমাবর্ষণ ও মিসরীয় বিমান অপহরণের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা সন্ত্রাসবাদের বিরোধী, সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করার লক্ষ্যেই তারা এটা করেছে।' সন্ত্রাসবাদ নিন্দাযোগ্য, শাস্তিযোগ্য, এ ব্যাপারে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। সন্ত্রাসবাদ আমরা সমর্থন করি না। এমন কি আমরা কয়েকজন ফিলিস্তিনী কর্তৃক ইটালীয় প্রমোদতরী হাইজ্যাককে সমর্থন করিনি। সবদিক থেকে এটা

www.icsbook.info

তাদের না করাই উচিত ছিল যা খোদ পিএলও কর্তৃপক্ষ বলেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা বলছে সে সন্ত্রাসবাদ এটা নয়। এটা আসলে যুগ যুগ ধরে অন্তহীন অবিচারের শিকার বিচারপ্রার্থী মজলুমী মানুষের একটা নিরুপায় কাজ মাত্র। আজ ৩৭ বছর হল তারা ঘর-বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে যাযাবরের মত তাঁবু জীবন যাপন করছে, শত শত নয় হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের আহাজারি অশ্রু এবং রক্তবন্যায় তারা ভাসছে, ইসরাইলের জেলে এবং ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলে ইহুদী বুলেটে তারা পাখির মত প্রাণ দিচ্ছে। তারা এর কি বিচার পেয়েছে? ৩৭ বছর ধরে জাতিসংঘ শুধুই কথার বাগাড়ম্বর চালাচ্ছে, কার্যত তাদের জন্য কিছুই করেনি। বিশ্বের কোন ফোরামে তারা না গেছে, বিশ্বের কোন প্রান্তে সে মজলুমদের আহাজারি না পৌছেছে? কি বিচার পেয়েছে তারা? কিছুই পায়নি। এই অবস্থার আত্মরক্ষার জন্য জালেমের বিরুদ্ধে কিছু করা কি সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায় পড়ে। সাইপ্রাসের লারনাকায় ফিলিস্তিনীরা তিনজন ইসরাইলী হত্যা করেছে বলে মার্কিনীদের রাগের অন্ত নেই। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিংকনের আমেরিকাবাসীদের, যারা সকল মানুষের প্রতি সমান সুবিচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমরা জিজ্ঞাসা করি ইসরাইলীদের রক্তের মূল্য আছে, ফিলিস্তিনীদের রক্তের মূল্য নেই? ইসরাইল যদি লারনাকায় তার তিনজন লোক হত্যার জন্য তিউনিসিয়ার পিএলও সদর দফতরে বোমা ফেলে শত জনকে হত্যা করতে পারে, তা হলে গত ৩৭ বছরে ইসরাইলীরা যত ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছে তার প্রতিশোধ নেবার অধিকার কি ফিলিস্তিনীরা রাখে না? এক তেল-আলজাতার ও সাবরা শাতিলায় যে হাজার হাজার মানুষকে ইসরাইলীরা হত্যা করেছে তার প্রতিশোধ নিতে গেলেই তো ইসরাইল উজাড় করে ফেলতে হয়। সুতরাং ফিলিস্তিনী কতৃক ইসরাইলী হত্যার যে ঘটনা ঘটছে, তা মজলুমের আত্মরক্ষার প্রয়াস, সন্ত্রাসবাদ নয়। এ প্রয়াস আজ তাদের বাঁচার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যারা জালেম ইসরাইলের বিচার করেনি যারা মজলুম ফিলিস্তিনীদের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করতে পারেনি, তাদের কোন অধিকার নেই ফিলিস্তনীদের এই পদক্ষেপকে মন্দ বলার। ফিলিস্তিনীরা যদি আত্মরক্ষায় এ প্রয়াস থেকে বিরত হয়, তাহলে জালেমের জুলুম তাদের সমাধি রচনা করতে পারে। বর্তমান মার্কিন প্রশাসন ইহুদী প্রেমে অন্ধ হয়ে বিচার-বুদ্ধির মাথায় পদাঘাত করে এই নির্জলা সত্যটাকে আজ মাড়িয়ে চলছে। কার্লোসের সন্ত্রাসবাদ এবং ফিলিস্তিনীদের আত্মরক্ষার প্রয়াসকে তারা এক করে দেখছে। আমরা বলব, মার্কিন প্রশাসন শুধু ন্যায়বিচার নয় মার্কিন নীতিবোধের কাছেও আজ অপরাধী। আফসোস, ইহুদী নিয়ন্ত্রিত প্রচার-মাধ্যম সৃষ্ট ধূম্র জালের মধ্যে মার্কিন জাতি তাদের প্রশাসনের এই অধঃপতন দেখতে পাচ্ছে না।

www.icsbook.info

ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্ম কাহিনী যারা জানে তাদের কাছে মার্কিন প্রশাসনের এই ভূমিকা, সোভিয়েত প্রশাসনের চরিত্র সবকিছুই পরিষ্কার। কিন্তু এই জানাটা কোন কাজে লাগছে বলে আরব বিশ্বের ভূমিকা থেকে অন্তত মনে হচ্ছে না। শুরু থেকেই দেখা যাচ্ছে, নিছুক মার্কিন অস্ত্র কিংবা সোভিয়েত অস্ত্রের উপর ভরসা করেই ইসরাইলকে শায়েস্তা করে আমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি। কিন্তু ইসরাইলের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র কোন সময়ই কাজে আসেনি। কাজে আসার কথাও নয়। কারণ মার্কিন ও সোভিয়েতরা তো তাদের দুধ-কলা দিয়ে পোষা সন্তানের কোন ক্ষতি করার জন্য অস্ত্র দেয়নি। ফলে আরব বা ফিলিস্তিনীরা শধু মারই খেয়েছে। সন্দেহ নেই, তাদের উপর ভরসা করলে এই মার খাওয়ার পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতেও ঘটবে। আমরা বিস্মিত হই, বেদনা বোধ করি যে তিউনিসিয়া মার্কিন যোগ সাজশের ফলে ইসরাইলী বোমাবর্ষণের শিকার হলো সে তিউনিসিয়া কি করে মার্কিন অনুরোধকে তসলিম করে ফিলিস্তিনীদের বহনকারী মিসরীয় বিমানকে তিউনিসিয়ায় নামতে দিল না। তিউনিসিয়ার এই মনোভাব মুসলিম উম্মার সচেতন সবাইকে আহত করেছে। এই যে নিন্দনীয় পরনির্ভরশীলতা এবং এই যে আত্মঘাতী আত্ম-পরিচয় বিমুখতা, যা সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে আছে আরব বিশ্বে এবং আমাদের সকলের মধ্যে তাই-ই আজকে আমাদের সকল ব্যর্থতা, সকল গ্লানি, সকল অপমানের জন্য দায়ী।

জানতে ইচ্ছে করে, আমাদের বুকের মাঝখানে চেপে বসা এই গ্লানি, এই অপমানের দুর্বিষহ ভার ঝেড়ে ফেলার জন্য আমাদের আত্ম-শক্তি সিংহ গর্জনে জেগে উঠবে কবে?

আর এই সাথে আরব বিশ্বসহ মুসলিম বিশ্বের মুসলিম জনগণকে পরিচালনার যারা দায়িত্ব পালন করছেন তাদের এই মিনতি জানাতেও ইচ্ছা করে, কথায় বাগাড়ম্বর একদমই পরিহার করে এবং গ্লানির আকাশ-স্পর্শি কালো তাজ মাথায় পরে বিশ্বসভার বদান্যতার দৃষ্টিকটু পসরা আর না সাজিয়ে নিজেদেরকে নিজেদের পরিমণ্ডলে গুটিয়ে এনে আত্মশক্তি বিকাশের কাজে একবার ব্রতী হোন এবং যে যার জায়গায় আল্লাহর পথের সৈনিকদের সংহারক না সেজে সহায়ক হোন।

১৩-১০-১৯৮৫

www.icsbook.info

সার্কের একটি অনুষ্ঠান

বড় একটা গর্ব ছিল, ধর্মবোধ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলার ব্যাপারে বাংলাদেশ অনেকের চেয়েই অগ্রণী। কোন একজনের কথা এটা নয়। আমরা সবাই এটা বলি সবাই এ নিয়ে গর্ব করি। এ গর্ব অমূলকও নয়। ইসলামের কেন্দ্রভূমি থেকে অনেক দূরে এই দেশ। উপমহাদেশে ৮শ বছর মুসলিম রাজত্বের কেন্দ্র ছিল দিল্লী। সেখান থেকেও বাংলাদেশ অনেক দূরে। এই কারণে সংঘাত সংঘর্ষের একটা বড় ক্ষেত্র ছিল এই বাংলাদেশ। অবাহত হাত বদলেরও শিকার হয়েছে অঞ্চলটা। তার উপর বৃটিশ শাসন এখানেই প্রথম চেপে বসে। তাদের জুলুম শোষণের সিংহভাগ এ অঞ্চলের মানুষকেই বহন করতে হয়। কিন্তু এরপরও এত মসজিদের সমারোহ আর কোন অঞ্চলে নেই। নামায-রোযার প্রতি এত পাবন্দ ইসলামী নীতি-বিধানের প্রতি এত অনুগত মানুষ এবং ইসলামী সভা জলসায় এত সমারোহ আর কোথাও দেখা যায় না। এ নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। আমাদের ক্ষমতাসীনরাও অনেক সময় এতে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন। বিশেষ করে সরকারের বিরুদ্ধে যখন কোন অনইসলামিক কাজের অভিযোগ আসে তখন একথা খণ্ডন করে তারা বলতে চান আমাদের চেয়ে বেশি ইসলাম আর কেউ করছে না। তাঁরা ইসলাম করুন বা না করুন তাঁদের মধ্যে ইসলাম থাক না থাক, জনগণের ধর্মভীরুতা এবং দেশের ইসলামী চরিত্রকে তাঁরা যে স্বীকৃতি দেন, এতে আমরা আনন্দ বোধ করি। আমরা ভেবে আশ্বস্তই হই, সরকার অন্তত জনগণের ধর্ম-ভীরুতা ও দেশের ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে যে-খবর নন এবং তাকে স্বীকৃতিও দেন, এ নিয়ে আমাদের মত গর্ববোধও করেন।

কিন্তু আমাদের স্বস্তিবোধকে সরকার, কিংবা বলবো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাটা ঘটেছে সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশসহ সার্ক সম্মেলনভুক্ত ৭টি দেশেরই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ই তার আত্মার পরিচয় বলে আমি সবগুলো অনুষ্ঠানই দেখেছি এবং বুঝতে চেষ্টা করেছি। জানতে চেষ্টা করেছি দেশগুলোর মানসহ পরিচয়। পরিচয় জানার এ প্রয়াসে অন্যান্য দেশের ধর্মনিষ্ঠ ঐতিহ্য-প্রীতি এবং স্বজাতিবোধ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় এসে আমি হোঁচট খেয়েছি বেদনাবোধ করেছি। বিষয়টা একটু বিস্তারিত বলতে চাই।

একটি জীবিত জাতির সংস্কৃতির যে দাবী সে ঐতিহ্য ও ধর্মবোধের বুনিয়াদ আমি অন্য সব দেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেখেছি। ভুটানের সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের বিষয় ছিল নাচ ও গান। কিন্তু এ নাচ ও গান বিজাতীয় কোন সংস্কৃতির অনুকরণ নয়, বরং তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের অংগ হিসেবে তা তারা প্রদর্শন করেছে। এখানে নাচ

www.icsbook.info

তাদের স্বর্গ থেকে আসা এবং দেবতার সামনে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত মঙ্গলের প্রতীক। নেপালের অনুষ্ঠানেও নাচ প্রধান ছিল। দেখা গেল, তাদের নাচও তাদের ধর্ম-বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। তাদের প্রথম নাচটা ছিল তাদের বিশ্বপ্রভু 'ভৈরব' ও তাদের বিশ্বমাতা কালীর নামে নিবেদিত একটি প্রার্থনা। দ্বিতীয়টাও অনুরূপ নাচই ছিল। শ্রীলকার সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানও ছিল নাচ ভিত্তিক। এখানে দেখি নাচ তাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতির তাকিদ। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত তাদের নৃত্য দেবীর কৃপা প্রার্থনা করে নৃত্য।" উপকূলবাসীদের স্রষ্টার বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করে নৃত্য, প্রভু বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রীলংকার হিন্দু সম্প্রদায়ের নৃত্য দেবতারূপী নৃত্য প্রভৃতি তারই প্রমাণ। মালদ্বীপের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ছিল। কোন মহিলা ছিল না। তাদের দলে, যাকে বলে নাচ তেমন কোন অনুষ্ঠানও ছিল না। তাদের প্রথম আইটেম ছিল শ্রমিকদের গাওয়া একটা প্রার্থনা সংগীত। দ্বিতীয়টাও ছিল কাওয়ালীটাইপ হামদ ও নাত। তারা জারীগানের মত এক প্রকার গানও শুনিয়েছে। সেই সাথে আফ্রিকা থেকে পাওয়া ড্রাম সংগীতও আমরা শুনেছি। তাদের অনুষ্ঠান দেখে তারা কে, তাদের অতীত কি এবং কোন বিশ্বাসের তারা অন্তর্ভুক্ত, তা জানা গেছে। পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও নাচ ছিল না। তাদের থেকে গান গজল ও কাওয়ালী শুনা গেছে। তাদের সে অনুষ্ঠান থেকেও তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও জাতি বোধের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বহুজাতিক ও বিশাল দেশ ভারতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় দিনে। তাদের অনুষ্ঠানেও নাচ ছিল। দেখা গেল তাদের নাচও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মাচারের অংগ। প্রথম নাচটি ছিল মন্দিরে দেবতার কাছে দেবদাসীর আরতি। দ্বিতীয় নাচটিও ছিল দেবতার নামে উৎসর্গিত। নর্তকীর পায়ে, হাতে ছিল নৃত্যের ভংগী, কিন্তু মুখে ছিল শবনম গচ্ছামী নমঃ নমঃ ইত্যাদির মত উক্তি। বুঝলাম, ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারকেই এখানে উপস্থিত করল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার শেষ দিনে পরিবেশিত হলো বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম আইটেম ছিল নাচ। পরে আরও কয়েকটি সম্মীলত নাচ পরিবেশিত হয়। প্রথমটি শাপলা নৃত্য, দ্বিতীয়টি বৃষ্টি আমার বৃষ্টি এবং তৃতীয়টি সোনার ধান' শীর্ষক নৃত্য। এ নাচগুলোর কোন ঐতিহ্যিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। ভারত, ভুটান, নেপাল প্রভৃতি দেশগুলোর নাচ এসেছে মন্দির থেকে। তাই ধর্মীয় আচারকেই তারা তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে নাচ দেখানো হল, তা কোত্থেকে এল? এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম এবং যাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক কমিটি গঠিত হয়েছে, তাদের ধর্মে তো অমন নাচের কোন অস্তিত্ব নেই! তাহলে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতিতে নাচ এল কোত্থেকে? এই প্রশ্নের জবাব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে না থাকায় এটা সাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নাচ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের তথা জাতীয় সংস্কৃতির অংগ যা তাদের ধর্মবোধের বিরোধী নয়। কিন্তু এটা সত্য নয়। সুতরাং আমি বলব আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অসত্য জিনিস চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। বিকৃত করা হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিকে।

www.icsbook.info

দুঃখের বিষয় যে যখন অন্যেরা তাঁদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের ধর্মবোধ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছে তখন আমরা বিজাতীয় নাচ দ্বারা সাংস্কৃতিক বিকৃতির পরিচয় দিয়েছি। বিষয়টা খুবই বেদনাদায়ক। আরেকটি কথা, কোন দেশে আঞ্চলিক কোন রীতিও থাকতে পারে। বাংলাদেশের ঐ নাচগুলো কি সে ধরনের কিছু? না তাও নয়। সে ধরনের কোন দাবী অনুষ্ঠানের উপস্থাপকরা করেননি এবং আমরা জানি এধরনের কোন দাবী করার সুযোগও তাদের নেই। সার্ক সম্মেলনে প্রদর্শিত নাচ তাহলে অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কোথায় পেলেন তা জানালে জনগণ খুব বাধিত হবে।

আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাতিবোধেরও কোন সন্ধান মেলেনি। ভারতীয় অনুষ্ঠানে পরিবেশিত গানগুলোর পদে পদে আমরা তাদের জাতিবোধের পরিচয় পাই। 'হাম হায় সাচ্চা হর নেশন সে' 'হাম জুলুম সে লড়নে ওয়ালে', 'হাম অমনকে রাখনে ওয়ালে', 'ভারতবর্ষ মানবতার এক নাম', ভারতবর্ষ সাম্যের এক নাম কণ্ঠে সবার একতার জয়গান', 'গঙ্গা-যমুনা ভাগিরথী যেথা মেশে', 'সারা জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা' প্রভৃতি সব গানের কলির মধ্য দিয়ে এক জাতিরূপকেই তারা সবার সামনে তুলে ধরেছে। এমনকি তাদের আঞ্চলিক সংগীতের মধ্যেও অর্থহীন কিছু ছিল না। তামিলনাড় র গণসংগীতে বলা হয়, 'জয় জয় ভারত সমগায়ন' এবং পাঞ্জাবের লোক সংগীতে বলা হয় 'ইসকা নাম হায় হিন্দুস্তান'। ভারতের শেষ সংগীতটা ছিল এই রকমঃ একদিন সূর্যের ভোর, এক দিন শক্তির ভোর, একদিন সত্যের ভোর, আসবেই একদিন আসবেই, মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস।' ভারতীয় উপস্থাপনার পাশে বাংলাদেশের গানগুলোকে রাখলে জাতিবোধ ও জাতিসত্তা প্রকাশের দীনতার লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত 'নদীর কূল নাই কিনার নাই', 'তুমি নাও বাইয়ো না মাঝি বিষম দইরাতে', 'বাড়ির কাছে আরশি নগর' 'আমি পুরব দেশের পুর নারী', 'নতুন পাতার নূপুর বাজে দক্ষিণা বায়' প্রভৃতি গানে দেশের নৈসর্গ খুঁজে পাওয়া গেলেও আমাদের জাতিবোধ খুঁজে পাওয়া যায় না। নৈসর্গ ব্যক্তি ও জাতি নিরপেক্ষ। আর সংস্কৃতি তো মানুষের। সুতরাং মানুষ এবং মানুষ বিনির্মিত জাতির পরিচয় তুলে ধরাই সংস্কৃতির মূল কথা। কিন্তু এ জাতিবোধের পরিচয় আমাদের কোন গানে দেখিনি। দেশাত্মবোধক গান আমাদের অনেক আছে, নজরুলের জাতিবোধ উদ্বোধক গান অজস্র রয়েছে কিন্তু সেদিকে আমাদের চোখে যায়নি। নজরুলের গান থেকে যা গাওয়া হয়েছে তা হল পূরব দেশের পুর নারী... এবং গাওয়া হয়েছে নতুন পাতায় নূপুর বাজে দক্ষিণা বায়ে...। জানি না গানগুলোর সিলেকশন কার। যিনিই হোন সার্ক সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও এধরনের জাতীয় অনুষ্ঠানের কোন জ্ঞান তার নেই তা বলতেই হবে। ভারতের গানগুলোর মধ্যে বারবার ভারতের নাম উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু আমাদের গানগেলোর মধ্যে একবারও বাংলাদেশের নাম উচ্চরিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এটা আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পকদের একটা অত্যন্ত লজ্জাজনক দৈন্য। এই দৈন্যে যারা ভুগছেন, তারা আর যাই হোক জাতির পক্ষ থেকে এ ধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।

www.icsbook.info

গোটা অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাদের জাতিসত্তার কোন পরিচয় ফুটে উঠেনি। ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা পাকিস্তান মালদ্বীপ এবং ভারতের অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁরা কোন জাতি, কোন ধর্মীয় দর্শন অনুস্মরণ তাঁরা করছেন। কিন্তু অনুবীক্ষণ লাগিয়েও সম্ভবত আমাদের অনুষ্ঠান থেকে তার পরিচয় মিলবে না। জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল বাংলাদেশের সাংস্কতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি সালাম দেরার সৌজন্যটুকুও পালন করেননি। তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যের ৫ মিনিটের মধ্যেই একটা টেলিফোন পাই। অনুষ্ঠান দেখছিলাম তাই বিরক্তির সাথে রিসিভারটি তুলে নেই। ওপার থেকে একটা কণ্ঠ শুরুতেই বলল আমার একটা অভিযোগ আছে। আমি বললাম কি অভিযোগ? উত্তরে কণ্ঠ বলল, 'আবু হেনা মোস্তফা কামাল হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ না কি? আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন তিনি আমাদের সালাম কিংবা কোন কিছুই দিলেন না! কেন? হিন্দুদের সালাম পেয়েছি তিনি দিলেন না। (উল্লেখ্য ভারতীয় দল নমস্তে, নমস্কার ও সালাম' তিনটই দিয়েছেন।) আমি তাকে বললাম এ অভিযোগ তার কাছেই করুন বরে আম রিসিভার রেখে দিলাম। বিরক্ত হলেও পরে ভাবলাম, টেলিফোনকারী বিষয়টা ঠিকই ধরেছেন। তার এ কথা সকলেরই কথা বলে আমার মনে হলো এ বিচ্যুতিটা ছোট, কিন্তু অবশ্যই সাধারণ নয়। আমার খুবই ভালো লেগেছে যে, ভারতীয় দল তাদের গানের অনুষ্ঠান শুরু করে তাদের ঋগ্বেদের একটি স্তোত্র দিয়ে। আমাদের সাংস্কৃতিক দল কি এমন জাতিবোধের পরিচয় দিতে পারতেন না? কিন্তু তা তারা পারেননি। উপরন্ত আমার মনে হয়েছে তারা দেশের সংখ্যাগুরু জনগণের আশা আকাঙ্খা, পরিচয় ও অধিকারকে নিদারুণভাবে কণ্ঠরোধ করে মেরেছেন তাদের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ আইটেমে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকলকে মিলিত মিশ্রিত করে দেখান হয়। নাম দেয়া হয় সে অনুষ্ঠানের এক তারে বাঁধা। সাংস্কৃতিক প্লাটফরমে এমন মিশ্রণ সম্মিলনের কোন তৎপর্য আমি খুঁজে পাইনি। কোন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক এমন সহাবস্থান অবশ্যই বাঞ্ছিত কিনতু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এমন মিলন মিশ্রণ কি সম্ভব, না উচিত? মোগল সম্রাট আকবর দ্বীন ই-এলাহী গড়ার মাধ্যমে। চেষ্টা একদিন করেছিলেন এ কিন্তু ইতিহাসের কড়া চপেটাঘাতে তা ব্যর্থ হয়। যাদের খুশী করার জন্য তিনি এটা করেছিলেন সেই হিন্দু তোদড়মলরাও এটা গ্রহণ করেনি। আমাদের নয়া। আকবরর দ্বীন ই-এলাহী'র যে নতুন প্রয়াস চালাচ্ছেন তা তাদেরকেই দেউলিয়া বানাবে তোদড়মলদের মন এর দ্বারা মিলবে না। ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিষ্কারভাবেই এর প্রমাণ দিয়ে গেল।

সার্ক-এর সাংস্কৃতিক অংগনে এই ব্যর্থতা অথবা ষড়যন্ত্র এবং জাতীয় জীবনকে এমন বেইজ্জতি বিকৃত করার জন্য দায়ি কে? এ জিজ্ঞাসার জবাব সরকারই ভাল জানেন এবং তাদেরই এটা দেখা উচিত। আমি শুধু বলব আমাদের সাংস্কতিক অংগনে এই কাল মেঘ জাতীয় জীবনের এক কাল রাতের দূর ইংগিতবহ। আমরা যেন একে ছোট করে না দেখি।

২২-১২-১৯৮৫

www.icsbook.info

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জনগণের দাবী আদায়ের সংগ্রাম লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে অনেক সংকট, বাধার অনেক বেড়াজাল অতিক্রম করতে হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন কতখানি সাফল্যের সাথে এটা পারে তার উপর নির্ভর করেই রচিত হয় তার পাওয়া না পাওয়ার ব্যালান্সশীট। যে সব বাধা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শেষ করার বিনিময়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে, সে বাধাগুলোর মধ্যে মস্কোপন্থী বলে পরিচিত কম্যুনিষ্টরা বোধ হয় এক নম্বরে আসার যোগ্য। বিশ্বের অজস্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে খুন করার তাজা রক্তে ওদের হাত রঞ্জিত। জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো ঐক্যের স্বার্থে দু'হাত বাড়িয়ে দেয়, বুকে টেনে নেয়। কিন্তু বিনিময়ে তাঁরা যা দেয় তা হল ঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত। এ ছুরিকাঘাতের পূর্ব পর্যন্ত তারা জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল ও আন্দোলনের সাথে আঠার মত লেগে থাকতে চায়, এমনকি নাম ভাঁড়িয়ে এবং নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় আপাততঃ বিলুপ্ত করে হলেও। মিসরে আমরা এটাই দেখেছি। সেখানকার কুম্যনিষ্ট পার্টি নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে সবাই নাসেরের জাতীয়তাবাদী দলে প্রবেশ করে। প্রবেশ করার পর ভিতর থেকে নাসেরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দেশকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিল। আফগানিস্তানের জাতীয়তাবাদী সরকারকেও কম্যুনিষ্টরা ঘুনের মত খেয়ে শেষ করে ফেলে। অবশেষে তা ধসে পড়ে কম্যুনিষ্টদের পদ প্রান্তেই। এমন দৃষ্টান্তের তালিকা অনেক বড়। ভারতে ইন্দিরার পিছনেও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পাটি (C. P. I) অনেক দিন ধরেই ঘুর ঘুর করছে। কিন্তু অজ্ঞাত অপরিচয়ের সূত্র থেকে আসা কম্যুনিষ্ট নেতারা রাজনৈতিক বৃদ্ধিতে এখনও নেহেরু পরবারের সাথে পেরে ওঠেননি। তবে তার হাল ছাড়েননি। ইন্দিরা গান্ধীর অনেক চোখ রাঙানি ও গাল-মন্দ খেয়েও সিপি আই-এর একটি ভাগ হয়ে যাওয়া গ্রুপ ইন্দিরার ছায়ায় ছায়ায় এখনও ঘুরছে। ফল কি হয় ভবিষ্যতই বলবে।

বিশ্বের যতগুলো জাতীয়তাবাদী দল ও আন্দোলনকে মস্কোপন্থীরা একেবারেই হজম করে ফেলেছে, তার মধ্যে ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্দশাই সবচেয়ে মর্মান্তিক। ভিয়েতনামের দেশ-প্রেমিক তরুণরা ফরাসীদের কবল থেকে তাদের প্রিয় মাতৃভুমিকে মুক্ত করে একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মালিক হাতে চেয়েছিলেন। তারা যখন আন্দোলন শুরু করে তখন নগুয়েন আই কোয়াক ওরফে হো চিমিন মস্কোর রাজনৈতিক স্কুলের ছাত্র মাত্র। দেশের মুক্তিকামী জাতীয়ভাবাদী তরুণরা দেশের জন্য ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে যখন জীবন দিতে শুরু করে, তখন

www.icsbook.info

কম্যুনিষ্টদের কোন টিকির অস্তিত্বও ভিয়েতনামে ছিল না। অনেক অনেক পরে তারা মস্কোর দেয়া পরিকল্পনা নিয়ে ভিয়েতনামে প্রবেশ করে। তাদের প্রথম টার্গেট ছিল জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রবেশ করা। দ্বিতীয় টার্গেট ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শেষ করা এবং জাতীয়তাবাদীদের প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে কৌশলে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সাধন করা। ভিয়েতনামে কম্যুনিষ্টরা এটাই করেছে। ভিয়েতনামী মুক্তি সংগ্রামের হাজার হাজার তরুণকে তারা হত্যা করেছে। জাতীয়তাবাদী তরুণরা যারা ক্যান্টনে ট্রেনিং নিতে যেতো, তাদের ফটো কমুনিষ্টরা সরবরাহ করতো ফরাসী পুলিশকে। ফলে ট্রেনিং থেকে ফেরার পথে অধিকাংশ তরুণই ফরাসী পুলিশের জালে আটকা পড়ে শেষ হয়ে যেত। ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রিয় নেতা ফ্যান বৈ চৌকে হো চি মিন-এর কম্যুনিষ্টরা এক লাখ পিয়াস্তার ঘুষ নিয়ে ফরাসী পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। ফ্যান বৈ চৌকে ভিয়েতনামের ফরাসী সরকার ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। এইভাবে ভিয়েতনামে জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের একটা দুর্বল ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশেষ থাকল না। ফলে যখন সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্ল্যাটফরম থেকে বিপ্লব হলো, তখন ভিয়েতনামী জনগণের জন্য কোন জাতীয় সরকার এলো না, এলো মস্কোর অনুগত কম্যুনিষ্ট সরকার।

এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে মস্কোপন্থীরা বড়ই সিদ্ধহস্ত। রাশিয়ায় লেনিন ট্রটস্কি কর্তৃক ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে সাফল্য অর্জনের মধ্য দিয়েই কম্যুনিষ্টদের এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতির যাত্রা শুরু। রাশিয়ায় সে ষড়যন্ত্রের কাহিনীটা চমকপ্রদ। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলো পাঠকদের দেয়া যেতে পারে।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে জারকে উৎখাত করে রাশিয়ায় যে বিপ্লব সংঘটিত হল, তার লক্ষ্য ছিল রাশিয়ায় একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এ সাধারণতন্ত্র টিকেও ছিল ১৯১৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে অদ্ভুত রকমের জঘন্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বলশভিকরা সাধারণতন্ত্রবাদী সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে সমর্থ হয়।

রুশ সাধারণতন্ত্রের বিপ্লবী সরকারের অধীনে বলশেভিকরা ছিল একটা ক্ষুদ্র দল। সাধারণতন্ত্রের আট মাসের রাজনীতিতে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক দ্বন্দ্বে বলশেভিকরা কোন সময়ই ভালো করতে পারেনি। এমনকি তারা তাদের সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায় ও সোভিয়েত সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্মেলনেও বলশেভিক মতকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়নি। ২৫ আগষ্ট (১৯১৭) মস্কোতে নতুন রুশ সাধারণতন্ত্রের সব গ্রুপ ও সব মতের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কয়েকদিন ধরে অবাধে বক্তৃতা চলে। সকলের মতামতের পর বলশেভিকরা লজ্জাজনকভাবে পরাজয় বরণ করে। পরাজিতের যে ভাষা হয় সে ভাষাতেই তারা বলে, "মস্কো সম্মেলন বিপ্লবপন্থীদের কাজ পণ্ড করতে উদ্যত, সুতরাং সমগ্র দেশের মত এ সম্মেলনে প্রকাশ পায়নি।"

www.icsbook.info

পুনরায় বলশেভিক বিপ্লবের মাত্র ১ মাস ১০ দিন আগে অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর (১৯১৭) তারিখে রুশ সাধারণতন্ত্রের অধীনে আরেকটি গণতান্ত্রিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের ব্যাপারে বলশেভিকদের উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাদের হাঁক-ডাকে সবার মধ্যে একটা আশংকা ছিল যে, এবার সম্মেলনে তারা বড় রকমের বিজয় লাভ করবে। কিন্তু ফল হয় উল্টো। বলশেভিকরা এবারও মারাত্মকভাবে পরাজয় বরণ করে। যখন তুমুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট গঠনের প্রস্তাব পাস হয়।

বলশেভিকদের অতিক্ষুদ্র দল তখন 'হ্যাঁ বা না' কিছু না বলে চুপ করে বসেছিল এবং পরে তারা সদলবলে ওয়াক আউট করে। অধিবেশন শেষে সকল গণতান্ত্রিক শক্তি বিপ্লবী সরকারের কাছে ওয়াদা করে যে "অতঃপর তারা বিপ্লববাদীদের সাথে কোন সংশ্রব রাখবে না।"

অধিবেশন শেষ হওয়ার সম্ভবতঃ দিন দুই পরে সকল পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে একটি ১২৩ সদস্যের পার্লামেন্ট গঠিত হয় এবং নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। পরাজিত ও বিক্ষুব্ধ ট্রটস্কি আক্রোশে ফেটে পড়ে বলেন, গভর্ণমেন্ট ও পার্লামেন্টের সাথে একযোগে তারা কিছুতেই কাজ করবে না। আমি এর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করছি।' ট্রটস্কির নির্দেশ অনুসারে বলশেভিকরা পার্লামেন্ট পরিত্যাগ করে। এটা সম্ভবতঃ ২০ অক্টোবরের ঘটনা। এই ঘটনার ১৭ দিন পরেই এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বলশেভিকরা রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে। কি করে তা সম্ভব হল?

সম্ভব হয়েছে ঘৃণ্য সব ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। অনেক ষড়যন্ত্রের মাত্র দুটি নিয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই। এ দু'টি ষড়যন্ত্রের একটি ছিল রুশ সৈন্য বাহিনীর শৃঙ্খলা ও আনুগত্য ধ্বংস করা। ১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লবের পর পরই বলশেভিকরা এই কাজ শুরু করে। তারা সৈনিক সমিতির মাধ্যমে কতকগুলো দাবী-দাওয়া তুলে ধরে। সে গুলোর মধ্যে ছিল সৈনিকরা যে অপরাধই করুক মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না, নিম্ন পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের সৈনিকরাই মনোনীত করবে, সব অস্ত্রশস্ত্র সৈনিকদের কাছে থাকবে, সেনাদলের পর্যবেক্ষণের ভার সৈনিক সমিতির উপর ন্যস্ত থাকবে। তারাই সকলের অভাব-অফিযোগের বিচার করবে সৈনিকরা সামরিক অফিসারদের অভিবাদন করবে না, ইত্যাদি। এছাড়া সর্বসাধারণের মত বক্তৃতা করা সভা-সমাবেশে যোগদানকেও তাদের অধিকার বলে ধরা হয়। দাবী-দাওয়ার এই সস্তা শ্লোগান প্রায় গোটা সেনাবাহিনীকেই আচ্ছন্ন করে ফেলে। শৃংঙ্খলা সম্পূর্ণরূপেই ধসে পড়ে। সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। বহু জায়গায় সৈনিকদের দ্বারা অফিসার নিহত হয়। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সেনাবাহিনীর শৃংঙ্খলা বিধানই দেশের এক নম্বর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এর উপর আরেকটা উপসর্গ এসে যোগ হয়। বলশেভিকরা সেনা বাহিনীর সাধারণ সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় যে, যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। ফ্রন্ট থেকে সৈনিকরা সরে এলেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। এই অপপ্রচার নতুন রুশ

www.icsbook.info

সাধারণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ এক সমস্যার সৃষ্টি করল। ফ্রন্টের অনেক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকরা সরে আসায় সীমান্তের বহু এলাকা ও শহর জার্মানদের অধিকারে চলে গেল। খোদ পেট্রোগ্রাদ নগরী জার্মান হুমকির মুখো-মুখি হলো। বাল্‌টিক সাগরে রুশ নৌ-সৈন্যদের দ্বিধাগ্রস্ততার ফলে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ জার্মানদের অধিকারে চলে গেল।

অপর ষড়যন্ত্রটি ছিল এই ঃ বৈদেশিক আগ্রাসনের সাথে যোগসাজস। তখন রাশিয়ায় খোলামেলাই সকলে বলত, লেনিন বার্লিনে জার্মান সম্রাট কায়সারের সাথে বসে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে কিভাবে রুশ সরকারের পতন ঘটানো যায়। রুশ সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে একদিকে তাদের হীনবল করা, অন্যদিকে জার্মানীর অগ্রাভিযান–এ দু'য়ের ফল যা দাঁড়ায় তার মধ্যে এই অভিযোগেরই সত্যতা মিলে। লক্ষণীয় ব্যাপার ৭ই অক্টোবর রাশিয়ায় নতুন পার্লামেন্ট গঠিত হয়, ৮ই অক্টোবর নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় আর এই আট তারিখেই বিশাল জার্মান নৌবহর বাল্টিক সাগর অতিক্রম করে রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। আর এই সময়ই বলশেভিকরা বিপ্লবের হুমকি দিয়ে পার্লামেন্ট ত্যাগ করে। সবটা ব্যাপার যেন সাজানো গোছানো বলেই মনে হয়। দেখাও গেলো রুশ বাহিনী যখন বিশৃঙ্খল, বিল-শেভিকদের সহযোগী জার্মান বাহিনী যখন পেট্রোগ্রাদের দিকে আসছে, ঠিক তখনই ট্রটস্কি তার লোকদের নিয়ে পেট্রোগ্রাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করে নিয়ে বলশেভিক শাসনের ঘোষণা দান করল। রুশ সাধারণতন্ত্রের নেতা কারেনস্কী গণতন্ত্রের পথেই সব সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। নিজেদের মধ্যে রক্তপাত তিনি চাননি। চাইলে কাজাখ বংশোদ্ভুত রুশ সর্বাধিনায়ক কর নিলফ-এর পরামর্শ গ্রহণ করে যার প্রতি বলশেভিকরা ছাড়া সবার সমর্থণ ছিল, সহজেই সেনা বাহিনীকে কঠোর শৃংখলার মধ্যে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারতেন। কিন্তু রক্তপাত ও কঠোরতা তিনি চাননি। ফলে কারেনস্কীর গণতান্ত্রিক শক্তি বলশেভিকদের ষড়যন্ত্রের শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে।

আমার আজকের নিবন্ধ এখানেই শেষ করতে চাই। শেষ করার আগে বলি, বিশ্বের জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল ও আন্দোলনের নেতারা সবাই যেন কারেনস্কীর মতো। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে গিয়ে এবং নিজের মত করে সবাইকে দেখতে গিয়ে কারেনস্কীর মতই তারা বৈরী শক্তির ষড়যন্ত্রের হাতে মার খাচ্ছে। কারেনস্কীর সামনে বলশেভিক ষড়যন্ত্র ছিল বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্রের কোন ইতিহাস তার সামনে ছিল না। থাকলে হয়তো তিনি ভুল করতেন না এবং রাশিয়ার ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখিত হতো। এখন অবস্থা তখনকার মত নয়। আজকের গণতান্ত্রিক দল ও আন্দোলনের সামনে কম্যুনিষ্টদের ষড়যন্ত্রের সব ইতিহাসই রয়েছে। এর পরও ভুল হচ্ছে। আসলে আমরা ততটা ইতিহাস সচেতন নই। ইতিহাসের রূঢ় চপেটাঘাত না খেলে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম কাটতে চায় না। কিন্তু কতদিন আর চলবে এটা? কতদিন আর সিন্দাবাদ বয়ে বেড়াবে তার দৈত্যকে।

৩১-০৫-১৯৮৪

www.icsbook.info

আনন্দ মঠ নিয়ে মজার বিতর্ক শুরু হয়েছে পশ্চিম বংঙ্গে। গত ১৫ই ডিসেম্বর পশ্চিম বংগের নৈহাটিতে আনন্দ মঠের শতবার্ষিকী পালন করা হলো। উল্লেখ্য, ১৮৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর বংকিমের আনন্দ মঠ প্রকাশিত হয়। আনন্দ মঠের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই এই বিতর্কের শুরু। এই বিতর্কের প্রধান ভূমিকায় আছেন পশ্চিমবংগ সিপিএম সম্পাদক ও বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সরোজ মুখার্জী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব কুমার মুখার্জী, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস (ই) সভাপতি আনন্দ গোপাল মুখাজী, ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সত্তরকারের আইনমন্ত্রী সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ প্রমুখ।

সরোজবাবু আনন্দ মঠকে সাম্প্রদায়িক বলে সমালোচনা করেছিলেন। একে বংকিম জীবনের একা ত্রুটি বলে উল্লেখ করেন। সরোজ বাবুর এই কথায় তেড়ে উঠেছেন প্রণব মুখাজী। তিনি বললেন, কম্যুনিষ্টরা কবিগুরুকে বুর্জোয়া আখ্যা দিয়েছিল এবং নেতাজী সুভাষ বসুকেও দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিলো। বিশেষ করে নেতাজী সম্পর্কে ওদের বিভ্রান্তি কাটাতে কম্যুনিষ্টদের কুড়ি বছরের বেশি সময় লেগেছে। হয়ত আনন্দ মঠকে বুঝতেও তাদের আরও কুড়ি বছর সময় লাগবে। এরপর প্রণব বাবু বললেন, আনন্দ মঠের বন্দেমাতরম মন্ত্রই ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা।

প্রণব বাবুর এই উক্তির ত্বরিৎ জবাব দিয়েছেন সরোজ বাবু। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'প্রণব মুখার্জী কে? সে আনন্দ মঠের কি বুঝে? ওর বাবা বামদা মুখাজী যদি আনন্দ মঠ নিয়ে কথা বলতেন তাও না হয় বুঝা যেত।' প্রণব বাবু সরোজ বাবুর এই আক্রমণের জবাব দিয়েছেন কিনা জানি না। তবে জবাব দিতে এগিয়ে এসেছেন পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের (ই) সভাপতি আনন্দ গোপাল মুখার্জী। তিনি প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন, সরোজ মুখাজী আনন্দ মঠের কি বুঝে? প্রত্যেক বিপ্লবীর কাছেই আনন্দ মঠ প্রেরণার বস্তু। আনন্দ গোপাল বাবুর সহায়তায় এসেছেন প্রাক্তনমন্ত্রী ও ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর ভক্তিভূষণ ও ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ। ভক্তিভূষণ বাবু বললেন, 'আমি থাকলে সরোজ বাবুকে যোগ্য জবাবই দিতাম।' উল্লেখ্য, সরোজবাবু ফ্রন্ট কমিটির মিটিংএ আনন্দ মঠের শতবর্ষ নিয়ে তাঁর আপত্তি প্রকাশ করেন। ভক্তিভূষণের অপর সহযোগী অশোক ঘোষ আনন্দ মঠকে সাম্প্রদায়িক

www.icsbook.info

প্রেরণার স্বরূপ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে আনন্দ মঠ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনার দাবী জানান। সর্বশেষে আছেন পশ্চিম বংঙ্গ রাজ্য সরকারের আইন মন্ত্রী সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ। তিনি বলছেন, "যারা বলেন আনন্দ মঠ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনারা একজন মুসলমানকে দেখান যিনি আনন্দমঠ পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? আনন্দ মঠ কি সত্যিকার জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক?... জনসংঘ নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে মনে করে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের জাতীয়তাবাদ আর জনসংঘের জাতীয়তাবাদ এক নয়। আনন্দমঠের জাতীয়তাবাদ ঐ জাতীয়।"

আনন্দ মঠ নিযে উপরের বিতর্কে দু'টো পক্ষ দুই প্রান্তিক চিন্তার উপর দাঁড়ানো। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস (ই) এবং ফরোয়ার্ড ব্লকসহ অধিকাংশরাই বলছেন, আনন্দমঠ স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্বোধক এবং আজকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং আনন্দ মঠের জাতীয়তাবাদ একই। অন্যদিকে সিপিএম এবং মনসুর হাবিবুল্লা বলছেন, আনন্দ মঠ সাম্প্রদায়িক এবং বর্তমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই।

পশ্চিম বঙ্গে আনন্দ মঠ নিয়ে এই ঝগড়ার ইতিটা কিভাবে আমি বলতে পারি না। তবে আনন্দ মঠ দিয়ে আনন্দ মঠকে যতটা চিনি, আনন্দমঠের পরের ইতিহাস যা বলে, তার বিচারে সরোজ বাবু ও মনসুর সাহেবদের অবস্থানটা বড়ই দুর্বল। কংগ্রেস রাজনীতির যে দর্শন ছিল এবং এখনো যা আছে তার সাথে হিন্দু মহাসভা এবং জনসংঘীদের কোনই পার্থক্য নেই। পার্থক্য যেটা সেটা বহিরাবরণের। আনন্দ মঠ যে তখন হিন্দুদের মধ্যে কোনই বিতর্কের সৃষ্টি করেনি, সবাই একে লুকে নিয়েছিল এ কথা অমি বলি না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আনন্দমঠের মুলমন্ত্রের লেখক কালি প্রসন্ন ঘোষকে লিখেছিলেন, 'আমি আনন্দ মঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপর আত্মোদর পরায়ণ জাতির উন্নতি নাই।' কিন্তু এই সাথে তিনি একথাও বলেছিলেন, একদিন দেখিবে- বিশ ত্রিশ বছর পর একদিন দেখিবে এই গান লইয়া বাংলা উম্মত্ত হইয়াছে। বঙ্কিমের এই কথাটিই অরবিন্দ যেভাবে তুলে ধরেছেন তা এই : "বঙ্কিম ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন একদিন আসবে যেদিন আনন্দ মঠের বন্দে মাতরম ধ্বনিতে গোটা ভারত উচ্চকিত হবে। বিস্ময়করভাবে তার ভবিষ্যত বাণী ফলেছে।"

অরবিন্দের সাথে আমরাও একমত। আনন্দ মঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। আর নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন বসে কোলকাতায় ১৮৮৬ সালে। এই

www.icsbook.info

সম্মেলনে কবি হেমচন্দ্র 'রাখি বন্ধন' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতায় কবি হেমচন্দ্র আনন্দ মঠের 'বন্দেনি মাতরম'কে জাগরণের শ্লোগান হিসেবে উদ্বৃত করেন। এইভাবেই আনন্দ মঠের বন্দে মাতরম সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করল। বিপিন চন্দ্র পালের সম্পাদনায় বাংলা থেকে যখন 'বন্দেমাতবম' নামে পত্রিকা বের হলো,. সেই সময় ভারতের অপর প্রান্ত থেকে লালা লাজপত রায়ের সম্পাদনায় আরেকটি পত্রিকা বের হলো। হিন্দুদের পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ-গল্পে আনন্দমঠ ও আনন্দ মঠের বন্দে মাতরম হলো অত্যন্ত পবিত্র আলোচনার এক বিষয়। ১৯০৫ সালে জনৈক যোগীনাথ সরকারের হাত দিয়ে 'বন্দেমাতরম' নামে সংগীতের একটা সংকলন বের হলো। ভারতের এক প্রান্তের এ সংকলনটির ভূমিকা লিখলেন আরেক প্রান্তের (মহারাষ্ট্রের) সখারাম গনেশ দেউকর। মাত্র ২৩ দিনে পুস্তিকাটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সময়টা হিন্দুদের বংগভংগ রহিতকরণ আন্দোলনের সময়। মুসলিম স্বার্থবিরোধী এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই হিন্দুদের দ্বারা সৃষ্টি হলো স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আনন্দ মঠের স্রষ্টা বাবু বঙ্কিম চন্দ্রের মুসলিম নিধনে নিয়োজিত সন্তান সেনা'দের বন্দে মাতরম'কে শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এক কথায় বলতে চাই, সরোজবাবু যাকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন, সেই 'বন্দে মাতরম', সেই 'আনন্দ মঠ', ভারতীয় হিন্দুদের উত্থান-চিন্তার সাথে ছিল একাত্ম। স্বয়ং সরোজবাবুও এটা অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি কংগ্রেসী হিসেবে ৯৩০ সালে জেলে যান। বন্দে মামতরম' ধ্বনি দেয়ার জন্য জেলে সরোজ বাবু বেত খেয়েছিলেন। আর ঐ সালেই সরোজ বাবু ও তাঁর সঙ্গীরা দমদম জেলে 'আনন্দ মঠ' মঞ্চস্থ করেছিলেন– যে আনন্দ মঠে আছে 'ধর্ম' গেল জাতি গেল, মান গেল, কূল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?" এখন সরোজ বাবু বলছেন, এগুলো তারা করেছেন না বুঝে। এটা সরোজ বাবুর একান্তই বক্তিগত মত। আর একটা জিনিস ভুল মনে হওয়া এবং বাস্তবতা দু'টো সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র জিনিস। তার একার এক উপলব্ধি দিয়ে তাঁর জাতির বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেন না, পারলেও তা আরেক ভুল হবে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় হিন্দুদের উত্থান চিন্তা থেকে এবং তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে আনন্দমঠীয় আদর্শকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যয় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থ বলেছেন, 'বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন... সব গিয়া এক পথে দাঁড়িয়াছে। সে পথ জন্মভূমিকে উপাসনা– জন্ম ভূমিকে মা বলা-জন্মভূমিকে ভালোবাসা– জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনিএই কার্যকরিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই। তিনি আমাদের অন্তদ্রষ্টা। সে মন্ত্র বন্দে মাতরম'।'

www.icsbook.info

সুতরাং আনন্দ মঠ নিয়ে বিতর্কে প্রণব বাবুরাই জিতে যাচ্ছেন। তাই বলে সরোজ বাবু ও মনসুর সাহেবরদের সব কথাই বেঠিক তা বলি না। বর্তমান ভারতের শাসনতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ আনন্দমঠীয় জাতীয়তাবাদ থেকে ভিন্ন সরোজ বাবু ও মনসুর সাহেবদের এই কথা বহিরাবরণের দিক দিয়ে পুরোটাই ঠিক, কিন্তু অন্তর্গত দিক দিযে পুরোটাই বে ঠিক। অন্ততঃ ভারতীয় সংখ্যা লঘুদের আজ কোনই সন্দেহ নেই যে, ধর্ম নিরপেক্ষতার পোষাক ভারতের শাসনতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ আর এস এস ও জনসংঘ, অন্যকথায় আনন্দ মঠীয় দর্শনকেই বাস্তব রূপ দেবার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রমাণ তালাশের প্রয়োজন নেই। ভারতীয় হরিজন, খৃষ্টান, মুসলিম, শিখ, প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের কথাগুলো কান পেতে শুনলেই সব স্বকর্ণে শোনা যাবে। এরপর সরোজ বাবু ও মনসুর সাহেববরা যেখানে আনন্দ মঠ ও বন্দে মাতরম'কে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, বক্তব্যের সে অংশটা তাদের ষোল আনাই ঠিক। আনন্দ মঠ ও বন্দে মাতরম সব অর্থ ও সব দিকের বিচারেই সাম্প্রদায়িক-একান্ত ভাবেই হিন্দু সম্প্রদায়ের নিজস্ব মর্ম কথা। তাইতো দেখি, স্বাধীনতা আন্দোলনের যৌথ মঞ্চে যখন হিন্দুরা বন্দে মাতারম শ্লোগান দিয়েছে, তখনই মুসলমানদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহ আকবর ধ্বনি। যৌথ আন্দোলনের দ্বিধা-বিভক্তির এখান থেকেই শুরু, শেষ হয়েছে ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে। প্রসংগক্রমে বলে রাখি, আনন্দ মঠের 'নেড়েদের তাড়াইয়া হিন্দুয়ানী' রক্ষার শ্লোগান শুধু হিন্দুদের জাগায়নি মুসলমানদেরও জাগিয়ে তুলেছিল। এই জাগারই উত্তর ফল তাদের স্বতন্ত্র আবাস-ভুমি। সুতরাং আনন্দ মঠ ইতিহাসের একটা মাইলষ্টোন। সরোজবাবুরা যাই বলুন এর শতবার্ষিকী খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এর উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানাই।

০৬-০১-১৯৮৩

www.icsbook.info

সুকর্ণ, সুহার্ত ও ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার চতুর্থ কিস্তি যাত্রা শুরু করলেন সেদিন। উল্লেখ্য ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্ট চতুর্থবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে নির্বাচিত করেছে। খবরটা একটা সুখবর অবশ্যই। বিশেষ করে আমরা যারা অস্থিরতায় অবিশ্বাস করি, মুসলিম বিশ্বের স্থিতিশীলতা চাই তাদের জন্য তো বটেই। পুরাতন ও অভিজ্ঞের প্রতি জাতির আস্তা নবায়নের ব্যাপারটা জাতির সুস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। তাই খবরটা নিঃসন্দেহে আনন্দের। আনন্দের হওয়া উচিত, এমন সব খবরই কিন্তু সবসময় আনন্দের হয় না। দুঃখের সাথেই বলতে হয়, প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর ক্ষেত্রেও এমনি একটা ছোট্ট 'কিন্তু' ঘটে গেছে। সেই 'কিন্তু'টা কি বলছি।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে নতুন করে শপথ গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট সুহার্তো যে সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে প্রথমেই যে কথা সকলের সামনে এসেছে সেটা হলো ঃ ধর্ম ও রাজনীতিকে তিনি কিছুতেই এক সাথে মিশতে দেবেন না। সংবাদ লিখিয়েরা মন্তব্য করেছেন ইসলাম ভিত্তিক দলগুলোর অসুবিধা করার জন্যই সুহার্তো এ পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এটা নতুন কথা বলছেন তা নয়। এই বলা তিনি আগেও বলেছেন। শুধু বলা নয় আমলও করেছেন এই কথার উপর। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে ঐ 'কিন্তুটা' কেন? 'কেন'-এর উত্তর এই ঃ খারাপ থেকে মানুষ ভালোটাই আশা করে। আমাদের সে আশাই ছিল। আশা ছিল, তিনি নতুন কথা বলবেন। কিন্তু তা বলেননি তিনি। পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তার কণ্ঠে। তাই তাঁর সৌভাগ্যে পুরোপুরি আনন্দ হতে পারেনি। দুঃখটা এখানেই।

একে মাসির দরদ বলে অনেকে বিদ্রুপ করতে পারেন। কিন্তু জেনে রাখা ভালো মুসলিম সমাজে মাসিও নেই, 'মাসির দরদও' নেই। সবাই এখানে ভাই ভাই। আর নির্দেশ হলো, ভাইকে ভাই-এর জন্য ভাবতে হবে, কথা বলতে হবে কাজও করতে হবে। রাজনৈতিক জাতীয়তার দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ভাই এর জন্য ভাই আজ খুব কম ক্ষেত্রেই কিছু করতে পারি। কিন্তু তাই বলে ভাববও না, কথাও বলব না তা তো টিক নয়। আর দুঃখ করার বিশেষ হেতুও আছে।

পনেরআনা মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ায় এই দুঃখের সুত্রপাত তার স্বাধীনতার উষালয় থেকেই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সেখানে এক বিরামহীন প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল সেখানকার ইসলাম প্রিয় জনতা। কিন্তু স্বাধীনতার সুবর্ণক্ষণটি যখন এল, তখন ঔপনিবেশিক শক্তির তৈরি ডঃ সুকর্ণের মত আদর্শ নিরপেক্ষ লোকেরা সামনে স্থান পেয়ে গেল। শুরু হলো ইসলামপ্রিয়দের

www.icsbook.info

জনরাজনীতির সাথে ঔপনিবেশিক মানস সন্তানদের প্রাসাদ-রাজনীতির দ্বন্দ্ব। ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতি পর্যায়ে ২১শে মে থেকে ১৬ই জুলাই পর্যন্ত দুই পর্যায়ে সাংবিধানিক কমিটির বৈঠক চলে। ইসলামী জনমতের চাপে ঐ সময় সাংবিধানিকভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সংবিধানের অন্যতম ভিত্তি 'আল্লার প্রতি ঈমান'-এর দাবী অনুসারে 'রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে এ আকীদার বিশ্বাসী নাগরিকদেরকে ইসলামী শরীয়িত মোতাবেক জীবন যাপনে বাধ্য করা'। ১৯৪৫ সালের ২২ শে জুন তারিখে ডঃ সুকর্ণসহ ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরাও এতে দস্তখত দেন। কিন্তু এই বছরই ১৭ আগষ্ট তারিখে ডঃ সুকর্ণ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথীরা লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত নিরবে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের এ ওয়াদাকে বদলে ফেলেন। তারপর আজ পর্যন্ত গোটা সময়ে জনতার রাজনীতি প্রাসাদ-রাজনীতির হাতে নিষ্পেতি হয়ে এসেছে। সুকর্ণর আমলে ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম নির্বাচনে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেও জনতার রাজনীতির প্রতিক ইসলামীপন্থীরা পার্লামেন্টে ভালো সিট পেরে গেল এবং পরবর্তী নির্বাচনের যখন আরো ভালো করার বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তখন ডঃ সুকর্ণ নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের প্রবর্তন করলেন। বিভিন্ন নামে এটাই চলছে এখনও। জনতার সাথে শাসন চত্বরের সেই যে ফারাক সৃষ্টি হয়েছিল, তা বেড়েছে বৈ কমেনি।

এই ধরনের জন্য বিচ্ছিন্নতার পরিণাম কখনও শুভ হয় না, ইন্দোনেশিযার জন্যও হয়নি। জন বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ জাতির আদর্শ ও আত্মশক্তির বুনিয়াদ থেকে বঞ্চিত হওয়া। কিন্তু শুন্যতা বলতে কোন জিনিস নেই। নিজের আদর্শের ঘরটা শূন্য রাখলে তা শুন্য পড়ে থাকে না, অন্ত চিন্তা, অন্য আদর্শ এসে তা দখল করে নেয়। ডঃ সুকর্ণের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। স্বীয় আদর্শের উপর নিপীড়ন চালিয়ে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে চাইলেন, কিন্তু আদর্শ নিরপেক্ষতা নামক এ শুন্যতা স্বাভাবিক নয় বলে কম্যুনিষ্ট আদর্শ এসে চারদিক থেকে তাকে গিলে ফেলল। শাসন চত্বরের সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা ও অর্বাচিনতা এই ভাবে জাতির জীবনে একসংকট নিয়ে এল। জনতার ইসলামী আদর্শ প্রিয়তাকে পুঁজি করে কমুনিষ্ট বিরোধী একটি অভ্যুত্থান ঘটল। ইন্দোনেশিয়ার এই সংকটে কম্যুনিষ্ট পরিচয়ের ৫ লাখ ইন্দোনেশীয় মানুষ নির্মমভাবে নিহত হলো। এই পাঁচ লাখ মানুষের রক্তে যদি ইন্দোনেশীয়দের জীবনে মুক্তির সুর্যদয় ঘটতো, তাহলেও একটা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু তা হলো না। ডঃ সুকর্ণরপরবর্তী শাসকরা সুকর্ণ-যুগের পরিণতি থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করলেন না। বিস্ময়ের ব্যাপার, সুকর্ণ যুগের যে ভ্রান্তনীতির শিকার হলো ৫ লাখ মূল্যবান জীবন, সেই ভ্রান্ত নীতিকেই পরবর্তী শাসকরা মাথায় তুলে নিলেন। ডঃ সুকর্ণের ধর্মনিরপেক্ষ বা আদর্শ নিরপেক্ষতার দ্বারাই চালিত হচ্ছেন দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, যে অপদেবতার কারণে সুকর্ণের পতন ঘটল সে অপদেবতাকেই মালয়েশিয়ার এখনকার সরকার মাথায় তুলে নিলেন। ফল যা হবার-তাই হয়েছে। সুকর্ণ-যুগে এই অপদেবতা যে যে ফল প্রসব করেছিল, সে ফলই সে প্রসব করছে এখন ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে। সুকর্ণ-যুগের নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র আরো

www.icsbook.info

পাকাপোক্ত ভাবে আজ স্থান নিয়েছে এসে ইন্দোনেশিয়ায়। প্রাসাদ রাজনীতি জন তার রাজনীতিকে নিষ্পিষ্ট করছে আগের মত করেই। জনতার রাজনীতির প্রতীক ইসলাম পন্থীদের যাত্রাপথে আগের মত করেই বাধার প্রাচীর খাড়া করা হয়েছে। আলোচনায় দুঃখজনক গভীরতায় আমি যেতে চাই না। ১৯৭৭ সাল এবং গত মে মাসের নির্বাচনের ঘটনাবলী এবং পদ্ধতি প্রোগ্রাম যারা পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা জানেন, কি মারাত্মক প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হয়েছে সেখানে জনতার আদর্শপন্থীদের। (নির্বাচনের সময় জনসভাগুলোতে ইসলামপন্থীদের শুধু নিহতের সংখ্যা ১১৭, আহত ও গ্রেফতারের বিরাট তালিকা তো করেছেই। এর পরও তারা ভোট পেয়েছে ২ কোটি, আর ক্ষমতাসীনরা পেয়েছেন ৪ কোটি ৭ লাখ।) তাই বসেছিলাম সুকর্ণ যুগে ধর্ম নিরপেক্ষতার বা আদর্শ নিরপেক্ষতার অপদেবতা যে যে ফল প্রসব করেছিল তার সবগুলোরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বর্তমান আমলেও।

ক্ষমতার চত্বর থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে যে আদর্শিক শুন্যতার সৃষ্টি করা হয়েছে তার ফলেই এই অপদেবতার আবিভাব। সুকর্ণ ও সুহার্ত যুগের দৃশ্যটা এদিকে থেকে একই রকম। পার্থক্য রূপের প্রকৃতির নয়। ডঃ সুকর্ণর আমলে আদর্শিক শূন্যতার সুযোগে দেশটাকে গিলে ফেলতে উপক্রম করেছিল কম্যুনিষ্টরা। আর সুহার্তোর আমলে এ কাজটা করছে খৃষ্টানরা। ইন্দোনেশিয়ায় খৃষ্টানদের ভূমিকা সম্পর্কে লন্ডনের 'মুসালমিডিয়া' ১৯৮২ সারের এক রিপোর্টে লিখেছে, "ইন্দোনেশিয়ার খৃষ্টান মিশনারীরা সর্বাধিক প্রভাবশালী শক্তি। তারা সুহার্তোর ক্যাথলিক স্ত্রীর মাধ্যমে কাজ করছে। এই খৃষ্টান গ্রুপটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ এবং দেশের আমলা প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা দেশকে বিভিন্ন প্রভাব বলয়ের বিভক্ত করে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দেশব্যাপী স্কুল, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় তাদের গতি অবাধ। এমনকি গ্রামাঞ্চলে পানি এবং বিদ্যুতও সরবরাহ করছে তারা। এর জন্য দেদার পয়সা পাচ্ছে তারা ভ্যাটিকান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমী রাষ্ট্র এবং চার্চসমূহ থেকে।" ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্র ও জনজীবনে খৃষ্টানদের প্রভাব সম্পর্কে এর চেয়েও চাঞ্চলকর বিবরণী দিয়েছে চার্চসমূহ। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্র ও জনজীবনে খৃষ্টানদের প্রভাব সম্পর্কে এর চেয়েও চাঞ্চল্যকর বিবণী দিয়েছেন গডফ্রে জনসন। তিনি লিখছেন– 'ইন্দোনেশিয়ায় খৃস্টানরা সরকারি পৃষ্টপোষকতার সুযোগে বেশি লাভবান হয়েছে। গত বিশ বছরে এদেশে গীর্জার সংখ্যা চারগুণ এবং খৃষ্টানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় খ্রিস্টান মিশনারীদের জাল বিছানা রয়েছে। প্রত্যেক মিশনারী প্রতিষ্ঠানের পৃথক বিমানও রয়েছে। কেবল মাত্র একটি প্রদেশে তাদের বিমান সংখ্যা ৪১। ইরানের শাহ যেমন নিজের গোপন গোয়েন্দা সার্ভিসের জন্য সংখ্যালঘুদের থেকে লোক ভর্তি করতেন, সুহার্তও ঠিক তেমনি খৃষ্টানদের ব্যবহার করছেন। সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন বাহিনীর প্রধান সিকিউরিট ও রাজনীতির কো-অডিনেটিং মন্ত্রী প্রভৃতি বড় বড় পদে খৃষ্টানদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে।" এ দু'টি

www.icsbook.info

বিবরণী থেকে ইন্দোনেশিয়ার খৃষ্টান তৎপরতার যে চিত্র পাওয়া গেল, তারপর এখানে আর কিছু আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। যে কথা এখানে বলতে চাই তাহলে, ডঃ সুহার্তোর সরকারের পক্ষে ইসলামকে পিছনে ঠেলে দিয়ে আদর্শিক শূন্যতার সৃষ্টি করে শূন্য অবস্থায় থাকা কিন্তু সম্ভব হয়নি। খৃষ্টবাদ এসে শূন্যস্থান পুরণ করে নিয়েছে। এটাই নিয়ম। প্রকৃতির প্রতিশোধ এ রকমই।

সুহার্ত সরকারের দুর্বলতার কারণে খৃষ্টানরা এই সুযোগ করে নিয়েছে তা মোটেই ঠিক নয়। সরকারের পিছনে সেনা বাহিনীর শক্তিশালী সংগঠন (ABRI) রয়েছে। আরও রয়েছ অতি সুসংগঠিত আমলা সংগঠন (KORPRI)। সর্বোপরি রয়েছে সরকারের রাজনৈতিক সংগঠন 'গোলকার"। চারদিক থেকে আটঘাট বাঁধা এ সরকারের হাতে ঐতিহ্যবাহী জনসমর্থনপৃষ্ঠ শক্তিশালী সংগঠনগুলোই যখন মার খাচ্ছে তখন এ কথা বলা যায় না যে, সরকারের দুর্বলতার পথ ধরে খৃষ্টানরা তাদের স্থান ঐভাবে করে নিয়েছে। আসল কথা ঐটাই। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আদর্শ নিরপেক্ষ হতে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সরকার খৃষ্টবাদের শিকার হয়েছেন এবং জনগণকেও ফেলেছেন মারাত্মক বিপদে।

ইন্দোনেশিয়ার এই অতীতকে সামনে রেখেই প্রেসিডেন্ট সুহার্তর সাম্প্রতিক বক্তব্যের বিচার করছি। আগেই বলেছি অভিজ্ঞ সুহার্তোর পুনঃ নির্বাচনটা আনন্দের। কিন্তু ধর্ম ও রাজনীতিতে একসাথে মিশতে না দেয়া সংক্রান্ত তার পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি যখন তিনি করলেন, তখন আনন্দটা আর আনন্দ থাকতে পারেনি। মনে হয়েছে, শতকরা ৯০ জন ইন্দোনেশিয়ার আদর্শ ইসলামের উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে খৃষ্টবাদকে সামনে এগিয়ে নেবার কাজটা ভবিষ্যতে আরও জোরদারই তিনি করবেন। এটা বড় বেদনাদায়ক এবং অবাঞ্ছিত একটা দৃশ্য। খৃষ্টানরা কিংবা অন্য কোন আদর্শ তাদের নিজ চেষ্টায় আগে বাড়বে এ নিয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু দুঃখ হলো, আমরা তাদের ষড়যন্ত্রের বাহন সাজছি। ধর্ম নিরপেক্ষতা আসলে খৃষ্টান, কম্যুনিষ্ট ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী শক্তির একটা সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের নাম। এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রীয় ভাবে আদর্শ ও লক্ষ্যহীন করে তুলে সেখানে নিজেদের জায়গা করে নেয়াই এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য। মুসলিম দেশসমূহ আজ এই ষড়যন্ত্রের শিকার। ষড়যন্ত্রের এমন শিকার হবার কারণেই অনেক মুসলিম দেশে আজ রাজনীতি থেকে ধর্মকে নির্বাসনের কথা বলা হচ্ছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠতে দেখা যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া এরই একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। সুতরাং প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর কথায় আমরা আনন্দিত নই বটে কিন্তু তাঁর জন্য নিশ্চয়ই ভ্রাতুসুদভ ব্যথা অনুভব করি। তিনি যদি ইসলামের শত্রুদের পাতা ধর্ম নিরপেক্ষতার ফাঁদকে ভেঙে দিতে পারতেন, তাহলে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়ার জন্য তা কতই না ভালো হতো!

২০-০৩-১৯৮৩

www.icsbook.info

ভারতে এই কথাটা এখন জোরেশোরে চলছে যে, গান্ধী নেহেরু গংরা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যই তাড়াহুড়া করে মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। দেশের স্বার্থের চেয়ে তারা তাদের ব্যক্তি স্বার্থকেই বড় করে দেখেন। প্রমাণ হিসেবে গান্ধীর এক জেহাদ ঘোষণার উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে। ঐ ঘোষণায় মিঃ গান্ধী নাকি বলেছিলেন, "নেহেরু, প্যাটেল প্রমুখ নেতারা ক্ষমতার পিছনে ছুটছেন সুতরাং জনগণের উচিত নতুন নেতা খোঁজা----।" তাদের মতে বিদ্যুত চমকের মত মিঃ গান্ধী একথা বলেন কিন্তু নিজেই আবার নেহেরু- প্যাটেলের দলে মিশে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাদের বক্তব্য, এ ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল বৃটিশ রাজ ও নেহেরু পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা কেন্দ্রিক যোগসাজশের ফল। যখন ভারতকে অবশেষে স্বাধীনতা দিতেই হবে তখন যাদের দিয়ে কাজ হবে তাদের হাতে ক্ষমতা দেয়াই ভালো, এই যোগ সাজশেরই ফল বৃটিশ রাজ্যের ক্ষমতা হস্তান্তর। ভারতবাসীদের এই বিতর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। আমি জানি না, অভিযোগে যা বলা হচ্ছে ভারতে ঐভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে কি না এবং নেহেরু- প্যাটেলের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যে তাদের নিছক আত্ম-প্রতিষ্ঠার কোন মনোভাব কাজ করেছে কি না। তবে সত্যের খাতিরে একথা বলতেই হয় বৃটিশ রাজ তার পছন্দনীয় লোকদের ছাড়া অন্যদের হাতে ক্ষমতা দেয়নি। একথা ভারতের জন্যই নয় ঔপনিবেশিক শক্তিরা যেখানেই তাদের উপনিবেশ ত্যাগ করে সরে গেছে, সেখানেই চেষ্টা করেছে তাদের তৈরী লোকরাই যাতে ক্ষমতায় আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। প্রশ্ন হলো সরে যাবার মুহূর্তে তারা এই কীর্তিটা কেন করেছে?

প্রশ্নটার উত্তর নব স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলোর শাসন ও শিক্ষা সংস্কৃতির দিকে নজর করলেই পাওয়া যাবে। সকলেই আমরা জানি, ঔপনিবেবশিক শক্তি কবলিত দেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে দেশকে সবদিক থেকে স্বাধীন করার জন্য। স্বাধীনতা চেয়েছে তাদের জাতীয় আদর্শ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সবকিছুকে বিদেশী আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর অধিকাংশ দেশে কি ঘটেছে?

দেশগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে এলে দেখা যাবে, বিদেশীরা তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তাদের জাতীয় স্বার্থ হাসিলে যে পর্যায়ে ছিল, উপনিবেশ ছেড়ে চলে যাবার পর তাদের ঐ স্বার্থ-যেন আরও বেশী পরিমানেই তাদের

www.icsbook.info

হাসিল হয়েছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পশ্চিমী ঔনিবেশিক শক্তিগুলো ছিল খৃষ্টান। রাজ্যবিস্তারে যেমন, তেমনি রাজ্য রক্ষায় খৃষ্টান ধর্মকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে। খৃষ্টান ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছিল, খৃষ্টান মিশনারীরা ছিল খৃষ্টানদের দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের অগ্রবাহিনী। খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের রাজ্যজয়ে যেমন সহযোগিতা করেছে, তেমনি খৃষ্টান শাসকরা স্থানীয় জনগনের মধ্যে খৃষ্টধর্মের বিস্তারকে তাদের রাজ্যরক্ষার জন্যও অপরিহার্য মনে করতো। এজন্য তারা চেষ্টাতদ্বিরও কম করেনি। কিন্তু তারপরও তাদের এশিয়া আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতে খৃষ্ট ধর্মের প্রসার তাদের শাসনকালে খুব উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা গেল, তারা চলে যাবার পর তারা তাদের তৈরী করা যাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে গেল তাদের আমলে খৃষ্টধর্মের প্রসার উদ্বেগজনকভাবে বেশী। দেখা যায়, ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত একশ-দেড়শ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে আফ্রিকায় খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৪৮ লাখে। আর ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের সংখ্যা দাঁড়ায় গিয়ে ৩ কোটি ১৭ লাখে। অর্থাৎ পরবর্তী মাত্র ১৭ বছরে আফ্রিকায় খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ১ কোটি ৬৭ লাখ। এরপর পরবর্তী ৬ বছর অর্থাৎ ১৯৭২ সালে এসে খৃষ্টানদের সংখ্যা পৌছে ৪ কোটি ১৭ লাখে। এখানে ছয় বছরে বৃদ্ধি ১ কোটি। হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকায় খৃষ্টান জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসেবে ঐ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছেই। এশিয়ার চিত্র এ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে খারাপই বলা যায়। গোটা আফ্রিকায় আজ সাড়ে ষোল লখ বিদেশী ধর্ম যাজক কাজ করছে অন্যদিকে এশিয়ায় সোভিয়েত এলাকা বাদ দিয়ে শুধু অকম্যুনিষ্ট এলাকাতেই প্রায় ২৭ লাখ বিদেশী ধর্মযাজক রয়েছে।

লক্ষ্যণীয়, এই শতকের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত ঔপনিবেশীক শাসনের সক্রিয়কাল। উপরের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, ঔপনিবেশিক অর্থাৎ খৃষ্টান শাসনের সক্রিয় কাল শেষ হবার পর এবং এদেশীয়দের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা আসার পরই খৃষ্টবাদের বিস্তার আরও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। কারণ আগে যা বলেছি সেটাই। ঔপনিবেশিকরা চলে যাবার পর যারা ক্ষমতায় এলেন, তারা ঔপনিবেশিকদেরই হাতে গড়া লোক। স্বাভাবিকভাবে এদেশীয় লোক হওয়ার কারণে তাঁরা সাবেক প্রভুদের কাজ আরও অধিক কার্যকারিতার সাথে সম্পাদন করতে পেরেছে। খৃষ্টান মিশনারীদেরকে তারা দেখেছে সাবেক প্রভুর গৌরবপূর্ণ স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে। সুতরাং দেশীয় শাসকরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ও সাহায্য সহযোগিতা দান করতে কোনই কার্পণ্য করেনি। সন্দেহ নেই, এ ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েই খৃষ্টানরা আজ ইন্দোনেশিয়ার শাসন কাঠামোর মূলে গিয়ে স্থান করে নিতে পেরেছে। বিস্ময়ের সাথে আমাদের

www.icsbook.info

দেশেও আমরা দেখছি, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে খৃষ্টানদের নিয়ন্ত্রিত প্রভাবিত বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে অঢেল বিদেশী অর্থ ব্যবহার এবং ইচ্ছা মাফিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এইভাবে সাবেক কলোনী-গুলোতে খৃষ্টধর্মের এই অব্যাহত বিস্তার সাবেক ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রত্যক্ষ লাভ। কিন্তু সাবেক ঔপনিবেশিক প্রভূরা তাদের গড়া। লোকদের দিয়ে যে পরোক্ষ লাভ করছে সেটাই প্রকৃতপক্ষে সাবেক কলোনীর জনগণের জন্য বড় বেশী মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব্য শাসককুলের জন্য ঔপনিবেশিক প্রভুরা ধনন্তরী যে বটিকা রেখে গেল তার নাম ধর্মনিরক্ষেতা। ধর্ম নিরপেক্ষতার গায়ে তারা প্রগতিশীলতার এমন এক রং মাখাল যে, নব্য শাসককুল মনে করলেন একে বাদ দিয়ে আধুনিক জমানার মানুষ হওয়া যায় না। অতঃপর নব্য শাসককূল প্রগতিশীল' হওয়ার জন্য নিজের জাতি সত্তারই যে গোড়া কেটে বসলেন তা তারা মনে হয় অনুভবই করতে পারলেন না। মুখটিপে হাসল বিদায় হওয়া ঔপনিবেশিক প্রভূর।

বলাবাহুল্য, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষের পক্ষে দ্বন্দমান কোন বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকা স্বাভাবিক নয়। এই সংগত কারণেই সাবেক কলোনীর নব্য শাসকরা ধর্ম নিরপেক্ষ হতে গিয়ে নিজের আকিদা-বিশ্বাস থেকে বহু দূরে সরে গেছেন। অতঃপর নিজের ধর্ম-বিশ্বাস এবং এর দাবী সম্পর্কে ভয়াবহ ধরনের অজ্ঞতা। এবং 'আধুনিকতা' নামক এক প্রকার পশ্চিমী দর্শনের মোহ তাঁদেরকে পশ্চিমী আকিদা-বিশ্বাসেরই কাছাকাছি নিয়ে গেল। অন্ততঃ তাকে অস্বীকার করার শক্তি সে হারিয়ে ফেলল। আর ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির প্রদর্শন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে পশ্চিমের আকিদা-বিশ্বাসকে এমনভাবে তারা স্বাগত জানাল যা শুধু লজ্জা নয়, জাতিসত্তার গোড়া কাটারও উপক্রম করল। ব্যাপারটা কেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

একটি মুসলিম দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত একদল যীশু খ্রীস্টের জন্ম দিবস উপলক্ষে দেয়া বক্তব্যে বললেন, 'মহান যিশুর ত্যাগ ও সেবার আদর্শ মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত হোক ও ন্যায়ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক।' কথাটা সাধারণ দৃষ্টিতে মোটেই দোষণীয় ঠেকে না। কিন্তু শেষ আসমানী কিতাব আল-কোরআন এবং শেষ নবীর (সঃ) সুন্নতে আস্থাশীল একজন মুসলিম হিসেবে যখন চিন্তা করা হবে তখন কথাটা শুনে প্রচণ্ড একটা হোঁচট অবশ্যই খেতে হবে। বাইবেলের 'যিশু' এবং ঈসা (আঃ) যদি একই হন, তাহলে যিশুকে আমরা নবী হিসেবে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আজকের সমাজ গড়ায় তার কিছু করার আছে, এ কথার উপর আমরা ঈমান আনতে পারি না। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে আসা আসমানী কিতাব আল-কোরআন এবং তাঁর সুন্নাহ প্রবর্তিত হবার পর

www.icsbook.info

আগের সব কিতাব ও শরিয়ত বাতিল হয়ে গেছে। শোষণমুক্ত কোন সমাজ গড়ার কাজেই আর তাকে ডাকা যেতে পারে না। হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে আল্লার নবী সেই আল্লারই এটা বিধান। সন্দেহ নেই, সুস্পষ্ট বিষয়ে মর্মান্তিক অজ্ঞতার কারণেই নিজের ঈমান-আকিদার গোড়া কেটে ঐভাবে যিশুকে আজকের সমাজ গড়ার কাজে আহ্বান জানানো হয়।

এই মর্মান্তিক অজ্ঞতা আজ আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে দিচ্ছে। আদর্শিক ক্ষেত্রে আমাদের পরিচয়হীনতা আমাদের গোটা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই ঠিকানাহীন করে দিচ্ছে। জাতি সত্তার এমন ভাসমান দশা নিয়ে স্বাধীন জাতি গঠন, স্বাধীন জাতির স্বাধীন দেশ গঠন সম্ভব হয় না। হয়না তার প্রমাণ এশিয়া আফ্রিকার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সাবেক কলোনীগুলো। এই দেশগুলোর রাজনৈতিক সিষ্টেম, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামো সবই আজ ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এখানে থেকে সেখানে, ভেসে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে যাদের কাছ থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতার সবক নিয়ে আমাদের এই অবস্থা, তারা কিন্তু পেছন দরজা দিয়ে এক মন রাজ্য পরিচালনা করছে যার একটা প্রদেশ আমাদের এদেশটিও। একদিন সুযোগমত তারা এই অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে তুলবেন। সাবেক 'ঔপনিবেশিক প্রভূরা আমাদেরকে এতটাই বিভ্রান্ত করছে যে তাদের এই জলজ্যান্ত প্রতারণা আমাদের কিছুতেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছেনা।

জাতীয় এই দূরবস্থার অবসান কিসে? উত্তর জটিল নয়। আমাদের মত দেশের শাসন চত্বরে বিচরণ করা লোকদের আজ একটা কথা ভালো করে বুঝতে হবে যে, ধর্ম নিরপেক্ষতা নামক বস্তুটি সাবেক ঔপনিবেশিক প্রভুদের এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের নাম। এই সাথে আরও বুঝতে হবে, জাতীয় আদর্শ ও মুল্যবোধে আমাদের যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির অবকাঠামো দান করে, তা সংরক্ষণের নামই স্বাধীনতা। বাইরে থেকে টেকনিক টেনোলজি আমরা অবশ্যই আনব কিন্তু, তাকে সেট করতে হবে আমাদের জাতীয় অবকাঠামোর মধ্যে। সাবেক ঔপনিবেশিক প্রভূদের চক্রান্তে হারিয়ে যাওয়া এই মৌল জীবনবোধকে যতদিন না আমরা পুনর্জীবিত করছি, ততদিন, আমাদেরকে আজকের ন্যায় ঘা খেয়ে খেয়ে কলুর বলদের মত ঘুরেই মরতে হবে।

২৯-৯-১৯৮৩

www.icsbook.info

মার্কিন ইতিহাসে ইহুদি প্রশ্ন

মার্কিন কর্তৃপক্ষের একটা বিবৃতি পত্রিকায় পড়লাম। ওতে বলা হয়েছে, ইসরাইলকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্টও জাতিসংঘ ত্যাগ করবে। আমরা সবাই জানি, বিশেষ চুক্তি কিংবা যে কোন দিক দিয়েই হোক ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্টের বন্ধু। বন্ধুত্বের খাতিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একথা বলতে পারে ঠিক। কিন্তু একথা মেনে নেবার পরও মার্কিন কর্তৃপক্ষের ঐ কথাকে আমার স্বাভাবিক মনে হয়নি। মার্কিন জাতির ভাগ্যকে এইভাবে ইসরাইলের সাথে জড়িত করা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। বিশেষ করে একথা যেখানে পরিষ্কার যে, ইসরাইল মার্কিনীদের তোয়াক্কা করে কোন সিদ্ধান্ত নেয় না। বহু বিষয়েই মার্কিনী মতকে ইসরাইল পদদলিত করেছে। এমন কি তারা একথা মুখের উপরই বলে দিয়েছে যে, ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুকুমবরদার নয়। সবাই দেখতে পাচ্ছে, ইসরাইল তার স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করে চলেছে,অন্য পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটা পারছেনা। মার্কিন উদ্যোগে গঠিত কোন জোটেই ইসরাইল এখন পর্যন্ত তাকে শামিল করেনি। অনাগত ভবিষ্যতে ইসরাইলের কাছ থেকে একটা ষ্ট্রাটেজিক সাপোর্টের আশা ছাড়া মার্কিন জাতির আর পাবার কিছুই নেই। ইহুদীবাদী বেয়াদব ইসরাইলীদের কাছ থেকে এ আশার ব্যাপারটাও খুব নিশ্চিত নয়। এই অবস্থায় ইসরাইলের সাথে মার্কিন জাতিকে, আবার বলছি, ঐভাবে ব্রোকেটেড করা সত্যই বিস্ময়কর।

বিস্ময়কর আরও এই কারণে যে, মার্কিন কৃর্তপক্ষের এই প্রবণতা মার্কিন জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরও বিরোধী। ইতিহাস বলে, ইহুদীরা মার্কিন জাতির প্রতি সুমনোভাব পোষণ কখন করেনি। মার্কিন জাতির ইতিহাসের এক মহা দুর্যোগকাল অর্থাৎ তাদের গৃহযুদ্ধের সময়কার অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রিন্স অটোভন বিসমার্ক বলেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্টকে দু'টো অংশে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহযুদ্ধের অনেক আগে 'হাই ফায়নান্সিয়াল পাওয়ার অব ইউরোপ, (High Financial Power of Europe) কর্তৃক গৃহীত হয়। ইহুদী ব্যাঙ্কাররা ভয় করছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এক রাষ্ট্র ও এক জাতি হিসেবে থাকে তাহলে যে অর্থনৈতিক শক্তি সে হবে তাতে পৃথিবীতে আধিপত্য করা ইহুদী পুঁজির পক্ষে কঠিন হবে। সুতরাং রথচাইল্ডের হাত সক্রিয় হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইহুদী পুঁজির উপর নির্ভরশীল দু'টো দুর্বল দ্বন্দ্বমান গণতন্ত্রে বিভক্ত করার মধ্যে তারা সীমাহীন লাভের স্বপ্ন দেখল। সুতরাং তারা তাদের এজেন্টদের দ্বারা দাস প্রথাকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টিতে সব চেষ্টা নিয়োজিত করে।" (LA VIELLE FRANCE, NO, 216, March 1921)।

ইতিহাস আরও বলে, তীক্ষ্ণধী আব্রাহাম লিংকনের কাছে ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায, বিদ্রোহী দক্ষিণের কোন দোষ নেই, মার্কিনী

www.icsbook.info

জাতির অসল শত্রু হলো ইহুদি পুঁজি। ইহুদী অদৃশ্য হাতকে তিনি সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেন। আন্তর্জাতিক ব্যাংকের মাধ্যমে আসা ইহুদী পুঁজির প্রভাব থেকে মার্কিনী জাতিকে রক্ষায় তিনি সযত্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিন 'বণ্ড' বিক্রির মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ এবং অঙ্গ রাজ্যগুলোর মাধ্যেমে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের মধ্যে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং স্থানীয় ব্যবস্থাকে তিনি সক্রিয় করে তোলেন। আন্তর্জাতিক ইহুদী ব্যাংক-ঋণ ব্যবস্থার বিকল্প লিংকনের এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহুদীরা আতংকিত হয়ে উঠে। এর পরেই আব্রাহাম লিংকনের উপর নেমে আসে এক দুঃখজনক মৃত্যু। প্রিন্স অটোভন বিসমার্ক বলেছেন, "লিংকনের নিহত হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খৃষ্টবাদের জন্য ছিল এক বিপর্যয়। লিংকনের দূরদর্শী পরিকল্পনা আঁকড়ে ধরে রিস্ক নিয়ে সামনে এগিয়ে চলার আর কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল না। পৃথিবীর সম্পদকে আত্মসাৎ করার নতুন আকাঙ্খা নিয়ে এগিয়ে এল ইসরাইল সন্তানরা। আমি ভয় করছি ইহুদী ব্যাংক তাদের দক্ষতা কূটকৌশলের মাধ্যমে মার্কিনীদের অতুল সম্পদের নিয়ন্তা সাজবে এবং এ সম্পদ দিয়েই তারা কলুষিত করবে আধুনিক সভ্যতা।" (ঐ)

বিসমার্ক এ কথাগুলো বলেছিলেন ১৮৭৬ সালে। এরও প্রায় একশ' বছর আগে এর চেয়েও আরও স্পৃষ্ট কথা বলেছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় ইহুদীদের বিশ্বাস ঘাতকতা ও চক্রান্তের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, "ওদের (ইহুদীদের) হাত থেকে যদি তোমরা মুক্ত হতে না পার, তাহলে দু'শ' বছরের মধ্যেই আমাদের সন্তানরা কৃষি মাঠের কামলায় পরিণত হবে এবং ওরা হাত মুখ ধুয়ে ফরাসে বসে আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণের ছড়ি ঘুরাবে। আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমরা যদি ইহুদীদের ছেঁটে ফেলতে না পার, তাহলে তোমাদের সন্তানরা তোমাদের কবরে অভিসম্পাৎ বর্ষণ করবে।"

বলার অপেক্ষা রাখে না, বিসমার্কের কথা অনেক আগেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের এ ভবিষ্যৎ বাণীও আমার মনে হয় ফলতে যাচ্ছে। ফ্রাংকলিন ঐ ভবিষ্যৎদ্বাণী করার পর ১৯৬ বছর পার হয়ে গেছে। তাঁর দু'শ পারহতে আর চার বছর বাকি। এখনও মার্কিনীরা কৃষি মাঠের কামলায় পরিণত হয়নি সত্য, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫ লাখের মত ইহুদী বলতে গেলে আজ ২২ কোটি আমেরিকানের ভাগ্য নিমন্ত্রণ করছে। ব্যাংক, বীমা, শিল্প এবং রাজনীতির মূল চাবিকাঠি এখন ইহুদীদের হাতে। একমাত্র কৃষিই প্রকৃতপক্ষে এখনও মার্কিনরা নিজেদের হাতে রাখতে পেরেছে। সুতরাং কৃষি মাঠের কামলা সাজতে তাদের দেরী আছে বলে মনে হয় না। মার্কিনীদের অবাক অসহায় মনে হচ্ছে ইহুদীদের কাছে। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এক বুলেটিনে (Saudi Report, 13 Sept, '82) ওয়াশিংটন থেকে টম মারটেলা লিখেছিলেন, "এ বছর মার্কিন কংগ্রেস যখন জনগণের ট্যাক্স বাড়াতে এবং শিক্ষা, চিকিৎসা ও দরিদ্রদের সহায়তা দানের ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ করতে বাধ্য হচ্ছে, ঠিক তখনই মার্কিন

www.icsbook.info

সংসদের ইহুদী-বন্ধুরা ইসরাইলকে বাড়তি ৩০০ মিলিয়ন ডলার দেবার জন্য একপায়ে খাড়া।" মার্কিন সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ট্যাক্স ফ্রি ইসরাইলী বণ্ডের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলারের বিরাট অংক ইসরাইলে চলে যায়। এতে মার্কিন সরকারের শুধু ট্যাক্স বাবদই ক্ষতির পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন ডলার। ঋণ ও মঞ্জুরী আকারে যে বিশাল মার্কিন অর্থ ইসরাইলে যায়, সেটা সবারই জানা।

বস্তুত মার্কিন অর্থনীতি ইহুদীদের হাতে চলে যাবার পর তাদের রাজনীতিও এখন ইহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ কারণেই ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেবার সাধ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। যেন ইহুদীদের কাছে মার্কিনী বিবেক আজ বন্দী। অর্থাৎ বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্বকীয়তা থেকে আজ পুরোপুরিই সরে গেছে। জর্জ ওয়াশিংটন-আব্রাহাম লিংকনের আদর্শ থেকে নিক্সন, ফোর্ড, কার্টার ও রিগ্যানদের নীতি-বোধের পার্থক্য আজ আকাশ স্পর্শী। মার্কিনী জাতির পিতা জর্জওয়াশিংটন বলেন, "তারা (ইহুদীরা) আমাদের শত্রু সৈন্যদের চাইতেও আমাদের প্রতি বেশী শত্রুভাবাপন্ন। আমাদের স্বাধীনতা এবং আমরা যে মহান লক্ষ্যে কাজ করছি, তার জন্য তারা শতগুণ বেশী বিপজ্জনক। বড় দুঃখ যে, সমাজের কীট এবং আমেরিকার সুখ-সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় শত্রু এই লোকদের আমরা আরও আগে চিহ্নিত করতে পারিনি।" (Maxims of George Washington by A, A Appeleton co,) এই জর্জ ওয়াশিংটনেরই উত্তরসুরী রিগ্যানরা আজ স্বদেশেই শুধু ইহুদীদের মাথায় তুলে রাখছেন না, ইহুদীদের লাঠি হিসেবে পৃথিবীর অন্য স্থানেও ইহুদী স্বার্থ চরিতার্থ করছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, ইতিহাস ঐতিহ্যের শিক্ষা উপেক্ষা করে কেন আজকের মার্কিন রাষ্ট্রের কাণ্ডারীরা এই ইহুদী স্বার্থমুখী নীতি অনুসরণ করে চলেছে? এর কারণ হয়তো অনেকই আছে। তবে এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণের কথাই আমার মনে পড়ছে। গত ১৯৭৮ সালের খবর, দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারী এজেন্ট ব্যবসায়ী বলে পরিচিত তুং-সু-পার্ক দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪২০০০ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রাখার ব্যাপারে মার্কিন কংগ্রেসকে সম্মত রাখার লক্ষ্য নিয়ে কংগ্রেসের ৩০ জন সদস্যকে মোট ৮ লাখ ৫০ হাজার ডলার পেমেন্ট করেছিলেন। অর্থাৎ মার্কিন বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করার জন্যই কংগ্রেস সদস্যদের উপঢৌকন কিংবা ঘুষ দেয়া হয়েছিল। আমি মনে করি, মার্কিন রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইহুদী পুঁজির এই ধরনের ঘুষ বা উপঢৌকন এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে। বোধ হয় ১৯৭৮ সালের দিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত 'Palestine' Forum'-এ এসম্পর্কিত তথ্য পড়েছিলাম। 'Is America's Foreign Policy for sale' শীর্ষক নিবন্ধে কোন মার্কিন কংগ্রেসম্যান কোন তারিখে কোন ইহুদী সংস্থার কাছ থেকে কি পরিমাণ ঘুষ নিয়েছেন তা বলা হয়েছে। যে সব সিনেটর বিভিন্ন ইহুদী সংস্থার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর হাওয়ার্ড এই বেকার, সিনেটর রবার্ট ডব্লিউ প্যাকডউ ও সিনেটর হাগ ও স্কট এবং ডেমোক্রাটিক দলীয় সিনেটর বাচ বেহ, সিনেটর

www.icsbook.info

মাইক গ্রাভেল, সিনেটর হুবার্ট হামফ্রে, সিনেটর গেল ডবলিও এ জ্যাকসন, সিনেটর এডমণড্এস, মুস্কী, সিনেটর জন পাস্টার, সিনেটর উইলিয়াম ডি প্রোক্সমিয়ার, সিনেটর আব্রাহাম বিবিকফ এবং সিনেটর জন্য ডি টানির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাননীয় সিনেটগণ ঐ বিবরণী অনুসারে বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ নিম্নলিখিত ইহুদী সংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন ঃ জিউইস ন্যাশনাল ফাণ্ড, এজেন্সী ইউনাইটেড জিউইস এ্যাপিল, ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ফর ইসরাইল, আমেরিকান জাইওনিষ্ট ফেডারেশন, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর জিউইস ওম্যান, টেম্পল বাথ সালুন, টেম্পল ইমানুয়েল ব্রদারহুড, আটলান্টা জিউইস ওয়েলফেয়ার ফেডারেশন, বিনাই বিরিথ আই ডি এল, টেম্বল জুদিয়া, টেম্পল সিনাই, ফ্রেণ্ডস অব হিব্রু ইউনিভারসিটি, বিসাই, জিওন ফাউণ্ডেশন ইত্যাদি। আমি আমার এ বক্তব্য দ্বারা কাউকে ছোট করতে চাই না কিংবা কারো বদনাম করা আমার লক্ষ্য নয়। যে কথাটা আমি এখানে বলতে চাই তা হলো টাকা দিয়ে মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা যায়। এখানে বলতেই হচ্ছে, কোরিয়ার তুং সু পার্ক যেমন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য অটোপাসম্যান, জোসেফ আডাবো রবার্ট লিগেট, কর্ণেলিয়াস গালাডার, রিচার্ড হান্না প্রমুখদের অর্থ দিয়েছিলেন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য, তেমনি মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটের যে সব সদস্য নির্বিচারে ইসরাইলকে সমর্থন করেছেন এবং অন্ধভাবে আরবদের বিরোধিতা করেছে, তারা কিংবা তাদের অনেকেই অটোপাসম্যান ও রিচার্ড হান্নার মত ইহুদীর উপঢৌকন পেয়েই তা করেছেন। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও সিনেট নির্বাচনে ইহুদী পুঁজির ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা কমবেশী সবারই জানা। আমি মনে করি মার্কিন রাজনীতিকে ইহুদী স্বার্থমুখী করার ক্ষেত্রে হোয়াইট হাউজ ও ক্যাপিট্যাল হিলের মার্কিন মরালিটিতে ধ্বংস নামানোর ক্ষেত্রে এই ইহুদী পুঁজিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাদের অর্থের অনর্থকারী প্রভাবই ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের ভাগ্যের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যকে এনে জুড়ে দেয়ার মত বিস্ময়কর কাণ্ড করছে যার কারণে মার্কিনীরা। আজ বলতে পারছে, ইসরাইলকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জাতিসংঘ ত্যাগ করবে।

এই সাথে আরেকটা বিষয়ে আমার বড় বিস্ময় লাগছে। সেটা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধাররা যে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিপরীত পথে চলে মার্কিন জাতির পিতা যাকে মার্কিন জাতির 'মহান লক্ষ্যে'র জন্য শতগুণ বেশী বিপজ্জনক' এবং 'আমেরিকার সুখ-সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় শত্রু' বলে আখ্যায়িত করেছেন সেই ইহুদীদেরই স্বার্থ রক্ষা করে যাচ্ছেন, এটা কি মার্কিন জাতির কারোই নজরে পড়ছে না? কারোই কি নজরে পড়ছে না ইহুদীবাদিরা কিভাবে কৌশলে মার্কিন মরালিটিকে ধ্বংস করছে এবং তাদেরকে সবদিক থেকে নিঃস্ব ও বিচ্ছিন্ন করে তুলছে?

২২-১২-১৯৮৩

www.icsbook.info

প্রায় দু-শ' বছর আগে এ্যাডামস স্মিথ টাকার যে সজ্ঞা দিয়েছিলেন, তাতে টাকাকে বিনিময়ের মাধ্যম এবং মূল্য পরিমাপক হিসেবে দেখানো হয়েছিল। বস্তুতঃ টাকার এই পরিচয় আগেও ছিল এবং পরেও আছে, কিন্তু স্মিথ সাহেবদের প্রবর্তিত অর্থনীতি অবশেষে টাকার পরিচয়ের তালিকায় আরেকটা পরিচিতি যোগ করেছে। সে পরিচয়টাকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে বোধ হয় উল্লেখ করা যায়। না, এর দ্বারা আমরা পুঁজিবাদী শোষণাকে বুঝাচ্ছিনা। আমি যে শোষণের কথা বলছি, তা আজকের পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী দুই অর্থনীতিই সমানভাবে চালাচ্ছে। এই শোষণ ব্যবস্থায় যে বিনিময় চলছে, তাতে পণ্যের কোন ভূমিকা নেই। টাকাই হয়কে নয় করছে, আবার নয়কে করেছে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক টাকার জিনিস আমরা কিনি বিশ টাকায় আর আমাদের এক টাকার জিনিস ওরা কিনে ওদের এক টাকার বিশ ভাগে একভাগ দিয়ে । আমাদের উন্নয়নশীল দেশগুলোর চিত্র কমবেশী এই একই রকম। টাকার মানের এই বৈষম্যের কারণে আমেরিকার এক কোটি টাকার পণ্য আমাদেরকে দিয়ে পাচ্ছে আমাদের বিশ কোটি টাকা, আর আমরা ২০ কোটি টাকার পণ্য তাদেকে দিয়ে পাচ্ছি ওদের ১ কোটি টাকা। উন্নয়নশীল দেশের অনেক দুর্বলতা ছাড়াও এই এক টাকার মানের মার প্যাঁচেই তারা সিন্দাবাদের ভূতের মত বিরাট ঘাটতির বোঝা বয়ে চলেছে।

এই সিন্দাবাদের ভূতের হাত থেকে বাঁচার কোন দূরবর্তী সম্ভাবনাও নজরে পড়ছে না। তার উপর রয়েছে ক্রমবর্ধমান আমদানি প্রবণতা এবং রফতানী পণ্যের মূল্য হ্রাসের অসহনীয় চাপ। অবস্থাটা ঠিক দু'ধারী তলোয়ারের মত। আসতেও কাটে যেতেও কাটে। উন্নয়নশীল দেশ বিধায় তাদের জন্য শিল্পপণ্য ও শিল্প-প্রকল্পের আমদানি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক উঁচু মূল্য দিয়ে ধার দেনা করে এই আমদানির দাবী উন্নয়নশীল দেশগুলো মেটায়। কৃষকের রক্ত পানি করে উৎপাদিত কাঁচামাল তারা বিদেশে রফতানি করে, কিন্তু মূল্য পায় না। ফলে ঘাটতির বোঝা বাড়ে। ঘাটতি মেটানোর জন্য উন্নত দেশগুলোর পরামর্শ অনুসারে ঋণ নেয়া হয়। ঋণ তারা অতি আগ্রহ ভরেই দেয়। উন্নয়নশীল দেশের 'পার-ক্যাপিটা ইনকাম' এবং 'পার্সেজিং পাওয়ার' বাড়ানোর চিন্তায় রাতে তাঁদের ঘুম হয় না। দেদার হাতে ঋণ যোগান দিয়ে তারা তাদের সুনিদ্রার ব্যবস্থা করে। লাভ এতে তাদের বহুবিধ। এক, মাল বিক্রি হওয়ার মাধ্যমে গোডাউন খালি হল এবং কলকারখানার চাকা সচল থেকে

www.icsbook.info

মন্দা রোধ করল। দুই প্রকল্প বিক্রির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ, সূদ ও প্রকল্পের আনুসংগিক পণ্য বিক্রির অব্যাহত সুযোগ লাভ হলো। তিন, ঋণগ্রস্তের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি এবং পানির দরে কাঁচামাল কেনার সুযোগ হয়ে গেল এবং চার, ঋণগ্রহীতা দেশের অর্থনীতির নিজেদের অর্থাৎ উন্নত দেশসমূহের প্রয়োজনের নিরিখে ঢেলে সাজাবার মূল্যবান উপায় হাতে এল। উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশের সাথে এই স্বার্থের ব্যবসায়ই চালাচ্ছে। তাদের স্বার্থের রথ সচল রাখতে গিয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মাথায় ঋণের পাহাড় জমছে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট ঋণের পরিমান দাঁড়িয়েছে ৫৪০ বিলিয়ন ডলার। এক ১৯৮০ সালেই এই ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ১২৪ বিলিয়ন ডলার। সামনে এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির হার দ্রুততর হবে বলেই বোধ হচ্ছে। আজ সম্পদ সম্পদশালীদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, তেমনি বিশ্বের চলমান অর্থনীতিতে বিশ্বের সম্পদ উন্নত ধনী দেশগুলোর হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যেই উন্নত বিশ্বের একষট্টি কোটি মানুষ বিশ্বের মোট ইনকামের শতকরা ৭৭ ভাগের মালিক বনে গেছে। আর উন্নয়নশীল দুনিয়ার ৩শ' ৪৪ কোটি মানুষ বিশ্বের মোট আয়ের মাত্র শতকরা ২৩ ভাগ আয় নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে। বাঁচার মত এই বেঁচে থাকা নয়। উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ মানুষই এই কারণে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছে। এদের 'পার ক্যাপিটা ইনকাম' উন্নত দেশের লোকদের জন্য হাসির বস্তু। ওরা কুকুরের জন্যও এর চেয়ে অনেক বেশী খরচ করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানুষের 'পার ক্যাপিটা ইনকাম' বাড়ানোর চেষ্টা না হচ্ছে তা নয়। এক্ষেত্রে রফতানি বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির শ্লোগানটাই মুখ্য। এ ব্যাপারে চেষ্টাচরিত্র করার ফোরামও হয়েছে। আংকটাড-এর ফোরামে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের লক্ষ্যে 'উত্তর-এর দেশগুলো থেকে উদার সাহায্য এবং অনুন্নত দেশগুলোর রফতানি বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু এখনও তা কোন ফল প্রসব করেনি। উন্নত দেশগুলোর সংরক্ষণবাদী মানসিকতা আরও যেন দৃঢ়ই হচ্ছে। তারা তাদের প্রকল্প ও পণ্য শুধু অনুন্নত দেশগুলোর ঘাড়ে চাপাতেই চায়, উন্নয়নশীল দেশের কোন শিল্পপন্য তারা তাদের দেশে ঢুকতে দিতে নারাজ। এই অবস্থায় পড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রফতানিমুখী শিল্পের মাধ্যমে ঘাটতির বোঝা ঘাড় থেকে নামানোর স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে নয়, এই শিল্পগুলো তাদের গলায় কাঁটার মত বিঁধছে। উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশের রফতানি শক্তি প্রতিযোগিতায় উন্নত দেশগুলোর সাথে পারার কথা নয়। ফলে সুখ স্বপ্নটা দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হচ্ছে। মালয়েশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম টিন উৎপদনকারী দেশ হয়েও প্রতিযোগিতার কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে সে বার বারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বছরের শুরুর দিকে এই খাতে কোটি কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখিন হওয়া ছাড়াও তার এই শিল্পের দরজায় তালা পড়ার

www.icsbook.info

উপক্রম হয়েছিল। উন্নয়নশীল দেশের বেশীর ভাগ রফতানি নির্ভর শিল্প আজ এই পরিস্থিতিই মোকাবিলা করছে কিংবা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্ব পরিস্থিতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য মার্কেটের এই প্রতিযোগিতা এমন একটা লড়াই যে লড়াই-এ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জেতার সম্ভাবনা কিছুমাত্রও নেই বলে আমার মনে হয়। কারণ, অর্থনৈতিকভাবে তারা দুর্বল তো বটেই, কিন্তু এ লড়াই-এ জেতার জন্য অপরিহার্য যে রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন সেটা তাদের আদৌ নেই। কিন্তু এর পরেও রফতানি বাণিজ্যের সোনার হরিণকে কব্জা করার জন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ পাগলের মত দৌড়াচ্ছে।

আমার মনে হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে বিপথে চালিত করার জন্য উন্নত দেশগুলোর পাতা এটা একটা ফাঁদ।

দুঃখের বিষয়, এ ফাঁদের ভয়াবহতা আমরা অনেকেই বুঝছিনা। 'ফ্রেন্স ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ইনটিটিউট'-এর প্রফেসর এমেরিটাস ৭৮ বয়স্ক কৃষিবিদ রোন ডেমন্ট সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের এক বৈঠকে সাহায্যেদাতা দেশগুলোর কু মতলবের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন, "সাহায্যদাতা দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মনোহারী ও বিলাস প্রকল্পের জন্য সাহায্য দেয় এবং টাকা দেয় খাদ্য আমদানির জন্য।" অর্থাৎ দুঃখী অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো বর্তমানে আর্থিক দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাক এবং তারা স্বনির্ভর হয়ে উঠুক, সাহায্যদাতা দেশগুলো আন্তরিকভাবেই এটা চায়না। মনোহারী বিভিন্ন শিল্প-প্রকল্পের মোহে আচ্ছন্ন করে এবং খাদ্য খাতকে পরনির্ভরশীল রেখে শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সবদিক থেকেই শোষণ করতে চায়। এই মানসকিতাকে রোনডেমন্ট বিশ্ব ব্যাংকের ঐ বক্তৃতায় সুন্দরভাবে দৃষ্টান্ত সমেত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, "চাষীদেরকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহ দেয়া হয়না। ঋণ ও কারিগরি সাহায্য রফতানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ হয়, মৌল খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য নয়। সেনেগালের চাষীরা, চীনা বাদাম, শাদ ও তানজানিয়ার চাষীরা তুলা, কিংবা জাম্বিয়ার চাষীরা তামাক উৎপাদনের জন্য দেদার সার কীটনাশক ওষুধ সাহায্য পাচ্ছে, কিন্তু এই দেশগুলোতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য এই ধরনের সহায়তা মূলক কোন প্রকল্প নেই।" বস্তুতঃ এই কারণেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কারখানার চিমনি আকাশ স্পর্শ করতে গেলেও খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা এখনও প্রাচীন যুগেই রয়ে গেছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের এই সুজলা সুফলা সুন্দর দেশটাও উন্নয়নশীল দেশসমূহের এই সাধারণ ভাগ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমরা বৈদেশিক মুদ্রায় যে সাহায্য সহযোগিতা পাই তার খুব অল্পই প্রত্যক্ষ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যয় হয়। আজ আমরা আরও বাড়তি সহায়তা

www.icsbook.info

দানের পরিবর্তে সার, কীটনাশক ওষুধ, সেচ যন্ত্র, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছি।

আমি আজকের লেখা শুরু করেছিলাম অর্থনীতিতে টাকার ভূমিকা নিয়ে। দেখা গেল 'বিনিময়ের মাধ্যম' ও 'মূল্যের পরিমাপক' শান্তশিষ্ট টাকা বেচারা পশ্চিমী অর্থনীতিবিদদের হাতে পড়ে আজ দরিদ্র দেশগুলোর ঘরে সিঁধেল চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আরও দেখা গেল, সাহায্য, ঋণ ও বাণিজ্য সবই একইভাবে সিঁধ কাটায় রত। এর মধ্যে আবার পশ্চিমী বিশ্ব থেকেই রব উঠছে, '৩০-এর চেয়েও এক ভয়াবহ মন্দা বিশ্বকে গ্রাস করতে আসছে। সত্যই এর কোন সঙ্গত কারণ আছে কিনা জানি না, তবে আমার মনে হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বের উপর শিল্পোন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়ন জোরদার করারই এটা একটা পূর্ব প্রস্তুতি। অনেক বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকে '৩০ এর মন্দার একটা উত্তর ফল হিসেবে চিত্রিত করেছেন। সত্য মিথ্যা! যাই হোক, শিল্পোন্নত বিশ্ব আজ মার্কেট-সন্ধানী যে যন্ত্রদানবগুলোর সৃষ্টি করেছে, তার আহার যোগানোর জন্য যে প্রতিযোগিতার লড়াই অবশ্যম্ভাবী তা আর এক বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনতেও পারে।

যাই হোক। আমার বক্তব্য অর্থনীতি নিয়ে। আরো স্পষ্টভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ে। মনে করি শিল্পোন্নত বিশ্বের মার্কেট সন্ধানী আগ্রাসী ফ্রাংকেনষ্টেইনের মুখে উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনীতি অর্থাৎ মানুষের অর্থনীতিকে বাঁচানোর আজ একমাত্র পথ হলো সবদিক দিয়ে যতটা সম্ভব স্বনির্ভরতার সন্ধান করা। প্রথমে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা অর্জন করে শিল্প ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব স্বনির্ভরতা অর্জনের মধ্যেই দেশ ও জাতির মঙ্গল নিহিত। এজন্য নিজস্ব লোক দিয়ে নিজস্ব উন্নয়ন মডেলের অনুসরণে নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তির সন্ধান করতে হবে। সাহায্য আমরা উন্নয়নশীল দেশরা চাই বটে কিন্তু সে সাহায্য আমাদের প্রণীত প্রকল্পে আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেকই হতে হবে। এটা কোন ক্লোজডোর নীতি নয়, আমাদের বাঁচার উপায় মাত্র। আজ থেকে বিশ বছর আগে প্রফেসর রেনেডেমন্ট আফ্রিকার নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর পশ্চিমী ধাঁচের উন্নয়ন নীতিকে 'এক অবাস্তব যাত্রা' বলে অভিহিত করেছিলেন। সেনেগালের প্রেসিডেন্ট লিউপোল্ড সেংঘর সেদিন রেনে ডেমন্টের উপর খুবই ক্ষেপেছিলেন। কিন্তু দু'বছর আগে সেংঘর সবিনয়ে ডেমন্টকে বলেছেন, "আমার সেদিন ভুল হয়েছিল, আপনার উপদেশ শোনা আমার উচিত ছিল।" এ উক্তি শুধু প্রেসিডেন্ট সেংঘরের নয় এ উক্তি হওয়া উচিত গোটা উন্নয়নশীল দেশের। আপনশক্তি ও সত্তার সন্ধান না করাই উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রধান দুর্বলতা।

৪-৯-১৯৮২

www.icsbook.info

পতনেরও একটা তল আছে। সে তলে পতিতের পা যখন গিয়ে পড়ে, তখন স্বাভাবিক নিয়মেই তার সম্বিত ফিরে আসে। প্রবৃত্তির তাড়না যখন বিবেককে মোহের আচ্ছাদনে ঘিরে রাখে, বন্দী রাখে, তখন উন্নতির দিকে উত্থানের শক্তি আর থাকে না। প্রগতির বদলে অধঃগতিই হয় তখন স্বাভাবিক পরিণতি। আগেই বলেছি এই অধঃগতির একটা শেষ আছে। এই শেষটাকে যদিও একটা বহুতল দালানের শেষ তলের আংগিক মাপা যায় না, তবু এটাকে এক সময় জলজ্যান্তভাবেই দেখা যায়। একজন লোককে দেখা যাচ্ছে ভীষণ মার খাচ্ছে– নীরবে বিনা প্রতিবাদে মার খেয়েই যাচ্ছে। কিন্তুএমনটা সব সময় দেখা যাবে তা স্বাভাবিক নয়। একটু আগেই যাকে বিনা বাক্যব্যয়ে মার খেতে দেখা গেল, একটু পরেই তাকে দেখা যাচ্ছে চোখে-মুখে প্রতিরোধের আগুন নিয়ে ফুঁসে উঠতে। এটাই নিয়ম। একটা পর্যায়ে গিয়ে দলিত মথিত আহত সত্তাও তার চারদিকের অমঙ্গলের শক্তিকে আঘাত হানার জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায়। এইভাবেই চারদিকের কুহকের কালো চাদর ছিঁড়ে ফেলে পতনের পংক থেকে বিবেক মাথা তুলে দাঁড়ায়। আমরা দেখলাম, ৬০-এর দশকের শুরু থেকে কি এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হলো। ওরা গৃহের 'অন্ধকূপ' থেকে মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে আসতে চায়– চায় ওরা পরিবারের সনাতনী শৃঙ্খল ভেঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে। তারা করলও তাই। তারা এমন কি বিবাহ ও মাতৃত্বকেই একটা ঝামেলা হিসেবে ভাবতে শুরু করল। নারী মুক্তির এই পতনটা ছিল যতখানি তীব্রগতির, বিস্ময়ের ব্যাপার বিবেকের উত্থানটাও ঘটল ততই তাড়াতাড়ি। ৭০-এর দশকের শেষ থেকেই হাওয়া উল্টা বইতে শুরু করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং নারী মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কিত একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা বেটি ফ্রিডম্যান নিজেই তার সমীক্ষা থেকে জানাচ্ছেন, নারী মুক্তি আন্দোলনের গোঁড়া সদস্যরাও মুক্তি আন্দোলনের মানসিকতা থেকে স্বহস্তে অর্জন করা সুফলের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিদারুণ নিসঙ্গতা ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। নীরব গৃহকোণের আপন জনদের কল-গুঞ্জনে মুখরিত একটি পরিবেশে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে তাদের 'মুক্ত' প্রাণ এখন বড়ই ব্যাকুল। বেটি ফ্রিডম্যান তাঁর এক সমীক্ষায় কিছু নারী মুক্তি আন্দোলন কর্মীর হা-হুতাশ তুলে ধরেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া

www.icsbook.info

টেলিভিশনের একজন মহিলা একজিকিউটিভ তাকে বলছেন, এই চাকরী পেয়ে আমি খুব খুশী। কিন্তু আমার প্রশ্ন, যারা সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন, এখন তাদের স্বামী-সন্তান-সন্ততি রয়েছে। অথচ যাঁরা আজ এর বাস্তব ফলভোগ করছেন, তাদের কি হবে?' ফ্রিডম্যানের কাছে নিউয়ার্কের আরেকটি 'মুক্ত-নারী'র ব্যাকুল প্রশ্ন, 'মা হতে না পারলে তার নারী সত্তা কি পূর্ণ হতে পারবে?' হার্ভার্ডের আরেকটি মহিলা সার্জনের প্রশ্ন, আমি বিয়ে করতে চাই, মা হতে চাই। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? হাসপাতালে এক নাগাড়ে ৩৬ ঘণ্টা কাজ করে ১২ ঘণ্টার ছুটি পাই, এই অল্প সময়ের মধ্যে সন্তান ধারণ তো দূরের কথা, স্বামী সোহাগের দোসর হওয়াই কি অকল্পনীয় নয়? এসব প্রশ্নের জবাব বেটি ফ্রিডম্যান কি দিয়েছিলেন আমি জানি না। বলাবাহুল্য, এ সবের মধ্যে নারীদের তাদের সনাতন নারী জীবনে ফিরে আসার পিয়াসাটাই মুখ্য। অথচ মাত্র এগার বছর আগে এই নারীরাই নিউইয়র্কের ফিফথ এ্যাভেনিউ তোলপাড় করে তুলেছিল (২৬শে আগষ্ট, ১৯৭০) এইসব শ্লোগানে ঃ 'চাকরি ও শিক্ষায় সমান অধিকার' চাই, চাই 'ভ্রূণ মোচনের অধিকার,' চাই 'রাজনৈতিক ক্ষমতা,' পারব না আমরা '২৪ ঘণ্টা শিশু প্রযত্নের দায়িত্ব' গ্রহণ করতে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষের চেয়ারে বসা এই মহিলাদেরই চোখের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে একটি শিশু এবং একটি গৃহকোণের পবিত্র পরিবেশে পরিবার রচনার স্বপ্ন। একেই বলে বিবেকের উত্থান। শয়তানী কুহকের কাল আবরণ ভেঙ্গে স্বাভাবিকতার স্বর্নোজ্জ্বল শিখরে উঠার জন্য বিবেকের উত্থান এইভাবেই ঘটে।

আজকের এই ভূমিকা বড়ই দীর্ঘ হয়ে গেল। আসলে আজকের লেখাটা শুরু করেছিলাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের একটা বক্তব্যকে সামনে রেখে। অবশ্য ভূমিকাটা দীর্ঘ হলেও প্রসঙ্গান্তর ঘটেনি। পার্থক্যটা শুধু এই যে, ক্যালিফোনিয়া, হার্ভার্ড, নিউইয়র্কের ঐ মহিলাদের আত্মোপলব্ধিটার ক্ষেত্র সীমিত পরিসরের আর রিগ্যান সাহেব যা বলেছেন তার ব্যাপ্তিটা গোটা জাতীর জীবন ঘিরে। তাঁর সেই কথাটা এই ঃ 'আমরা অপরাধের মহামারীর মধ্যে বসবাস করছি। গত বছর এই মহামারী বাইশ হাজারেরও বেশী মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে।" জাতির উদ্দেশে প্রচারিত বেতার ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই বক্তব্য রাখেন গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে। বক্তৃতায় মহিলাদের নিরাপত্তার ব্যাপারেই তাঁর উদ্বেগ ছিল বেশী। উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট একটি অপরাধ বিল পাস করবার জন্যে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানানো উপলক্ষেই এই কথাগুলো বলেছেন। ঐ বিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি বলেছেন আমি

www.icsbook.info

জানি না, অধিকতর কার্যকর শাস্তির পক্ষে অপরাধ আইনের সংশোধন দাবী করেছেন বলেই মনে হয়।

মিঃ রিগ্যানের এই দাবীকে স্বাভাবিকতার দিকে প্রত্যাবর্তনের একটা প্রয়াস বলে অভিহিত করা যেতে পারে। শাস্তির কঠোরতাকে নিন্দা করার একটা রোগ চলে আসছে পশ্চিমী দুনিয়ায়। ইসলামের হাতকাটা আইনকে , ব্যভিচারের শাস্তিকে তারা হিংস্র ও বর্বর বলে অভিহিত করে এসেছে। কঠোর শাস্তির বিধান যে মানব সমাজে শান্তির জন্য, মানব মর্যাদা ও অধিকারকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য একথা তারা মোটেই বুঝতে চায়নি। বেত্রাঘাতের শাস্তিকে এরা বর্বর বলে থাকে, কিন্তু এদেরই বিধান মতে পর্দার অন্তরালে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিছক অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করার জন্য বিচিত্র ধরনের যে লোমহর্ষক শাস্তি দেয় সে কথা তারা হিসেবেই আনতে চায় না। অথচ এদের এই শাস্তি কাউকে সংশোধন করে না বরং আরও হিংস্র ও পশু করে তোলে। অন্যদিকে চুরি, ব্যভিচার, খুন ইত্যাদির যে কঠোর শাস্তির বিধান ইসলাম করেছে তা বাস্তবায়িত করলে সমাজের লোকেরা তা দেখে সংশোধন হবার সুযোগ পায়। শাস্তি আইনের এদিকটাকে তথাকথিত সভ্যতা ও মানবতার ধুয়া তুলে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বিদ্রুপ করা হয়েছে। এর ফলও পশ্চিমীরা হাতে হাতেই পেয়েছে। রিগ্যান সাহেবের বক্তব্য এ কথারই প্রতিধ্বনি করছে। সুন্দর বহিরাংগ নিয়ে পশ্চিমী সমাজ আজ একটা ম্যকাল ফলের মত দাঁড়িয়ে আছে। ধর্ষণের ভয়ে মেয়েরা সেখানে সততই সন্ত্রস্ত থাকে। সেখানে মিছিল বের করতে হয়। দরজায় নক হলে তারা দরজা খুলতেও ভয় পায়। পারিবারিক শান্তি বলতে যা বুঝায় সেটা আজ সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। ১৯৪০ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের যে হার ছিল, সেটা এখন আড়াই গুণেরও বেশী বেড়েছে। নিউইয়র্ক শহরের প্রতি ৭০ জনের একজন 'হিরোইন' সেবী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হেলথ ম্যাগাজিন'-এর একটি রিপোর্টে প্রকাশ, মদ্য পানজনিত কুফল প্রতিরোধেই সরকারকে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়। এর মধ্যে ১ বিলিয়ন যায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বাবদ, ৫ বিলিয়ন যায় তাদের সাহায্য সহযোগিতা বাবদ, দুই বিলিয়ন যায় এ সম্পর্কিত পুলিশ বাবদ এবং ৭ বিলিয়ন যায় মামলা ও তাদের জেল খরচা বাবদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ২৫ মিনিটে একটি করে বড় ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়। আর প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৩টি হত্যা, ৫টি বড় ধরনের মারধোর, ৩০টি ডাকাতি এবং ৩০০০টি ছোট-খাট চুরির ঘটনা ঘটে। এই নিউইয়র্ক সিটিতেই ১০ কোটি ডলার খরচ হয় অপরাধ দমন প্রচেষ্টায়। উল্লেখ্য, এই হিসেব বেশ আগের। তারপর অবস্থার আরও ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। মহিলা ও ১৮ বছরের নীচের কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার

www.icsbook.info

কিশোর, ১ লাখ ১৬ হাজার কিশোরী এবং সোয়া তিন লাখ মহিলা ধরা পড়েছে। এই একই বছর খুনের অপরাধে ধরা পড়েছে দেড় হাজার কিশোর এবং আড়াই হাজারের মত মহিলা। ধরা পড়ার সংখ্যাই যদি এই দাঁড়ায়, ধরা পড়েনি এমন সংখ্যা কত দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। মিঃ রিগ্যান অপরাধের মহামারীতে গত বছর ২২ হাজার মানুষের জীবন ছিনিয়ে নেয়ার যে কথা বলেছেন আমার মনে হয় সত্যের পরিধিটা আরও বড় হবে।

আমেরিকার এই অবস্থা ইউরোপেও সমভাবেই পরিদৃশ্যমান। এর অর্থ, আমরা যতই সভ্য হবার দাবী করি, মানুষের মর্যাদা আমরা পদদলিত করছি এবং তা করে পশু আচরণকেই বরণ করে নিচ্ছি।

এই অবস্থা নিয়ে মিঃ রিগ্যানের কণ্ঠে বিলাপেরই সুর আমরা প্রতিধ্বনিত হতে দেখি। শাস্তি আইনকে আরও কিছুটা কার্যকরী রূপ দিয়ে তিনি বোধ হয় চান এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। কিছু ফল তিনি এর দ্বারা পাবেন না তা নয়। কিন্তু যে পতন দশার উত্তর ফল এটা, তা মাত্র এইটুকুতেই নিবারণ ঘটানো সম্ভব নয়। এজন্য মানব মর্যাদার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। তথাকথিত 'মানবতাবোধ' যে এই মর্যাদার মান চিহ্নিত করতে পারে না তা প্রমাণ হয়েই গেছে। এই মর্যাদা নিরূপণ ও সংরক্ষণের জন্য মানবের যিনি স্রষ্টা তারই মানদণ্ড প্রয়োজন।

সন্দেহ নেই, আমরা অবশেষে সেদিকেই ফিরছি। পতনের শেষ তলে আমাদের পা মনে হয় ঠেকে গেছে। এখন একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। অনেক দেশেই এর লক্ষণ ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। অপরাধের ফ্রাংকেনষ্টেইন দেখে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিলাপ ধ্বনি তারই একটা প্রমাণ বলা যায়।

১৫-৯-১৯৮২

www.icsbook.info

প্রায় বছর দুই আগে একটা গবেষণাপত্র পড়েছিলাম। গবেষণা পত্রটি ছিল ইহুদীদের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত অদৃশ্য জগতের কাণ্ডকারখানা নিয়ে। এই গবেষণা কর্মের উপসংহার পর্যায়ে লেখক ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ানের একটা ভবিষ্যতবাণী উদ্বৃত করেছিলেন। ডেভিড বেন গুরিয়ানের বক্তব্যটা ছিল এই রকম ঃ "১৯৮৭ সালের পর আর কোন যুদ্ধ থাকবে না। জেরুজালেমের জাতিসংঘ (সত্যিকার জাতিসংঘ) নির্মাণ করবে নবীদের মাজার যা হবে আন্ত মহাদেশীয় রাষ্ট্র ইউনিয়নের কেন্দ্র। আর এখানে স্থায়ীভাবে বসবে বিশ্ব রাষ্ট্র ইউনিয়নের সকল বিবাদ মীমাংসার আদালত।" লেখক উল্লেখ করেন, যিশুর ভবিষ্যতবাণীর উপর ভিত্তি করেই ডেভিড বেন গুরিয়ান এই ভবিষ্যত উক্তি করেছিলেন। ইহুদীদের এই বিশ্ব-রাষ্ট্র স্বপ্নের অগ্রগতির একটা রূপরেখা আঁকতে গিয়েই লেখক উপসংহারের এক জায়গায় লিখেছেন ঃ 'ইহুদীরা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকের রাষ্ট্রমূহকেই নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা একই সাথে কম্যুনিজম ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদকে দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করে চলেছে।" এই বক্তব্যের পক্ষে লেখক যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্য সরবরাহ করেছেন। যুক্তি ও তথ্যগুলো সামনে আসার পর কোন প্রশ্নই আর অবশিষ্ট থাকে না। তবু স্বীকার করতে হয়, আমার বিস্ময় কিন্তু তার পরও কাটেনি। কিছুতেই আমার বুদ্ধিতে আসেনি, গুটিকতক ইহুদী কিসের জোরে কেমন করে এই অবিশ্বাস্য ধরনের কাজ করে যাচ্ছে।

এই বিস্ময়ের ঘোর না কাটতেই আরেক বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছি সম্প্রতি। দিন কয়েক আগে আরব আমিরাতের এক বুলেটিনে ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বি, কন কু'-এর উপর একটা আলোচনা পড়লাম। আলোচনাটি তৈরী হয়েছে মিঃ কন কু' এর ১৩৪ পৃষ্ঠার গবেষণা নিবন্ধের উপর। গবেষণা কর্মিটির নাম, "The Social Reality of Artificial Mind and Body Control' পাঠক বিরক্ত হতে পারেন, দেহ ও মন নিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম ব্যবস্থায় যে বাস্তবতা তার সাথে ইহুদীদের বিশ্ব রাষ্ট্র স্বপ্নের সম্পর্ক কি? আমার নিবেদন আমারও নতুন বিস্ময়ের সূত্রপাতটা এখানেই এবং আমি একথাই বলছি। আমি আমার কৌতুহলের তাড়নায় সামনে এগুতে গিয়ে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি, ইহুদী বিজ্ঞানীরা তাদের জাতীয় স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য বিজ্ঞানের জটিল পন্থাকে এক

www.icsbook.info

অদ্ভুতভাবে কাজে লাগাচ্ছে। বিশ্ব ব্যাপী ইহুদীদের স্নায়ুতত্ত্ববিদ, মনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও মনো বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থার (jio) সহায়তার গত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে 'ব্রেনওয়েভ' পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের দেহ মনঃ নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক পন্থার উন্নয়ন ও ব্যবহার করে আসছে। উল্লেখ্য, আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ এবং অষ্ট্রেলিয়ার অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও স্নায়ুবিদ্যা, মনোবিদ্যার মত জটিল বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগুলোতে ইহুদী বিজ্ঞানীরা আধিপত্য করে আসছে। আর আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থার হাতে এরা এক সুতায় গাঁথা পুতুলের মত নাচছে। মিঃ কন কু' লিখছেন, ইহুদী স্নায়ু বিশারদরা 'মস্তিষ্কের ক্রিয়া নিরুপণ' (Electroen ephalogram) (EEG) এবং 'চক্ষু তারার গ্রহণ ক্রিয়া রেডিং' (Electromyogram) (EMG) প্রক্রিয়াকে সম্প্রতি কম্পিউটার ও সিলিকন কণা ব্যবহারের মাধ্যমে অ-ইহুদীর মধ্যে (EMG)-কে উৎক্ষেপ করার পন্থা আবিষ্কার করেছেন। এর দ্বারা অ ইহুদী ব্যক্তিরও আচরণকে প্রভাবিত করা যাচ্ছে। মিঃ কন কু' লিখছেন, EEG প্রক্ষেপনের মাধ্যমে নানা প্রকার আবেগ ও মনোবিকার সৃষ্টি করা যায়। সাবধানতা, অসাবধানতা, সন্দেহ প্রবণতা, বিশ্বাস, ক্লান্তি, উদ্যমতা, অলসতা, প্রভৃতি দৃষ্টান্তসমূহ এ সম্বন্ধীয় বহুদিকের কয়েকটি। তাছাড়া EEG এবং EMG-এর সমন্বয়ে শরীরের ক্রিয়া ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, দীর্ঘ ১৩ বছর ঐ কুৎসিত ইহুদী নিয়ন্ত্রণের শিকার মিঃ কন কু' লিখছেন, কৃত্রিম দেহ ও মনোনিয়ন্ত্রণের অধীন হবার পর কতকগুলো বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় ঃ এক, শিকার ব্যক্তি তার চলাফেরার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে নিতে বাধ্য হয়। দুই, প্রবণতাগত পরিবর্তন আসে (যেমন অতিতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিরক্তি ইত্যাদি)।

মিঃ কু এর মতে গত ষাট ও সত্তরের দশক থেকে ইহুদীদের এই দেহ ও মনো নিয়ন্ত্রণী তৎপরতার বিরাট পরিব্যাপ্তি ঘটেছে। 'ব্রেন ওয়েভ' প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়ার ব্যাপক স্থাপন, 'ইলেক ট্রনিক কংট্রোল' কৌশলের দ্রুত উন্নতি এবং রিমোট কনট্রোল' দক্ষতার পরিবৃদ্ধির সুযোগে পৃথিবীর বড় বড় শহর এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ছোট ছোট শহরকেও তারা তাদের নিয়ন্ত্রণী আওতার মধ্যে এনেছে। মিঃ কু'র মতে 'Control devices are everywhere' পাবলিক বিল্ডিং, সামরিক ঘাঁটি, পুলিশ ষ্টেশন, বড় বড় হাসপাতাল ও হোটেল, বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র, প্রধান প্রধান পত্রিকার সম্পাদনা কক্ষ, রাজনৈতিক, সামরিক, গোয়েন্দ বিভাগ, শিক্ষা, ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বাড়ী ও কর্মক্ষেত্র এমনকি যাত্রী ও সামরিক বিমান, যাত্রী ও পণ্যবাহী অথবা সামরিক জাহাজ এবং বাস ও ট্রেনেও তারা তাদের

www.icsbook.info

নিয়ন্ত্রণী কৌশলের স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে। কত প্রকাশক, কত সংবাদপত্র ও সাংবাদিক কত রাজনীতিক, আমলা ও দায়িত্বশীল, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তিকারী কত বোর্ড যে তাদের আজ্ঞাবহ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যারা তাদের পথের কাঁটা তাদেরকে ঐ নিয়ন্ত্রণী কৌশলেই ইহুদীরা পর্যুদস্ত করে থাকে। মিঃ 'কু' লিখছেন, 'সামাজিক, মানসিক ও দৈহিকভাবে তারা বিধ্বস্ত হয়ে যায়।' প্রসিডেন্ট কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং এবং জর্জ ওয়ালেসের উপর আক্রমণ এই দিক দিয়ে রহস্যপূর্ণ। ইউরোপ আমেরিকার আরব সংস্থাগুলোকেও তারা ঐ কন্ট্রোল কৌশলের জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবদমিত ও অফলপ্রসূ করে রাখে।

এইভাবে মিঃ 'কু' ইহুদীদের অদৃশ্য ষড়যন্ত্র জগতের এক বিচিত্র কাহিনী তুলে ধরেছেন তাঁর নিবন্ধে। তাঁর সব কথা আমার আলোচ্য নয়। আলোচ্য বিষয় হলো, ইহুদী তৎপরতার এই বিস্ময়কর দিকটা। এই বিস্ময়কর দিকটা সামনে আসার পর আগের বিস্ময়কে আর বিস্ময় বলেই মনে হচ্ছে না। মিঃ কু'র উপরোক্ত কথাগুলোর একাংশ সত্য হলেও ইহুদীরা পূর্ব ও পশ্চিমের সরকারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, 'কিংবা' কম্যুনিজম ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদকে কব্জায় রাখার ব্যাপারটা খুবই সাধারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই সাধারণ ব্যাপারটা আরও সহজবোধ্য হবার আরো অনেক লক্ষণ খুবই সুস্পষ্ট। ইহুদীরা বিভিন্ন জাতির স্বকীয়তা ধ্বংসের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মিঃ কুর মত সমাজ ও বিশ্ব ঘটনা প্রবাহের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ৫০-এর দশক থেকে শুরু হওয়া এবং ৬০-এর দশক থেকে বেড়ে যাওয়া নারী মুক্তি ধরনের আন্দোলন ইহুদী ষড়যন্ত্রেরই ফল। আসলেই এই আন্দোলনগুলোর পিছনে গঠনমূলক কোন সামাজিক লক্ষ্য নেই, আছে শুধু অমার্জিত ধরনের জৈবিক কিছু প্রবণতা। প্রসঙ্গক্রমে খুব সবিনয়ে বলে রাখি, আমাদের দেশের নারী মুক্তি আন্দোলন সম্প্রতি বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইনের মত জাতীয় ঈমান আকিদার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু মৌলিক নীতি-নিয়মের সংস্কার বা বাতিল দাবী করে সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে ইহুদীদের জাতি নিধন পরিকল্পনারই সহায়তা করেছে। উল্লেখ্য, ইহুদীদের সর্পিল ষড়যন্ত্রের সব চেয়ে উদ্বেগজনক প্রকাশ ঘটেছে এই জাতি নিধন চক্রান্তের মধ্যে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বহুজাতি সমিকরণ আন্দোলনের পিছনে ইহুদীরাই সবচেয়ে উৎসাহী কর্মী। আরও দেখা যাবে, আন্তঃজাতি সম্পর্ক সমন্বয় বিষয়ক সব আইন প্রণয়নের দাবীতে ইহুদী সংস্থাগুলোই বেশী সোচ্চার। এতে মনে হবে জাতি সত্তার বিলয় ঘটিয়ে এক মানুষ হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হবার ব্যাপারে

www.icsbook.info

ইহুদীরাই বেশী আগ্রহী। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই, ইহুদী জাতি সত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারে তারা আপোষহীন। কোন ইহুদী ছেলেই অইহুদীকে বিয়ে করতে পারে না। দেখা যায়, যে ইহুদী বহুজাতি সত্তার মিলন কমিটিতে সদস্য সেই ইহুদীই আবার ইহুদীদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কমিটির একনিষ্ঠ কর্মী। সুতরাং প্রমাণ হয়, ইহুদীরা অন্য সব জাতি সত্তার বিলুপ্তি চায়, শুধু তাদের ইহুদী জাতি সত্তা ছাড়া। জাতীয়তাবোধ মানুষের আত্মরক্ষা শক্তির প্রধান একটি উৎস। এ শক্তি থেকে মানুষকে ছিন্ন করে ইহুদীরা বিশ্বের জাতিসমূহকে সুতা কাটা ঘুড়িতে পরিণত করতে চায়। তাদের পরিকল্পনা অনুসারে ইহুদীরাই শুধু জাতি সত্তা নিয়ে টিকে থাকবে এবং তারাই পৃথিবীর নির্মূল হয়ে যাওয়া আদর্শহীন, লক্ষহীন দুর্বল জাতিসমূহের উত্তর রাজত্ব করবে। জেরুসালেমকে রাজধানী করে বিশ্ব রাষ্ট্র কায়েমের ইহুদী পরিকল্পনা তাদের মতে এই ভাবেই বাস্তবায়িত হবে।

উল্লেখ্য, অঞ্চল, বর্ণ ও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তার উপর এই আঘাত হানার অনেক আগে ইহুদীরা ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার গোড়া কাটার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। পুঁজিবাদী বিশ্বে তারা সরবরাহ করে ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং কম্যুনিষ্ট বিশ্বে দেয় ধর্মহীনতা। দু' একটি নগণ্য দৃষ্টান্ত ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিমের সব দেশেই ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র গেলোনোর ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি কম্যুনিষ্ট ও পুঁজিবাদি দুনিয়ার সব ইহুদী মিলে ধর্মের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠন করেছে। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ভাষার মানুষ ইহুদী হলেই এই রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। ইহুদীরা তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতদূর এগিয়েছে তাদের এই সাফল্যই প্রমাণ। দুর্ভাগ্যের বিষয় পনর আনা মুসলিম দেশই ধর্ম-নিরপেক্ষতা কিংবা সমাজতন্ত্রের ইহুদী ষড়যন্ত্রের ফাঁস গলায় পরে নিজেদের ধ্বংসের উপর ইহুদী বিজয়কে আহ্বান করছে। সাড়ে ৮ কোটি মুসলিমের দেশ বাংলাদেশও এই অধঃগতির মিছিল থেকে বাইরে নয়।

আজ গোটা আলোচনাটাই হলো হতাশার। আসলে বিশ্ব পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। ধর্ম ও জাতীয় নীতিবোধ বিচ্যুত আমরা এবং পৃথিবীর অন্যান্য অ-ইহুদী জাতি গোষ্ঠী চরিত্র ও দায়িত্ববোধহীনতার ভয়াবহরোগে আক্রান্ত। আমার মনে হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি হয়, তাহলে ইহুদী অথবা ইহুদী নিয়ন্ত্রিতদের হাতে থাকা যুদ্ধের বোতামগুলো তা আমেরিকার হোক কিংবা রাশিয়ার, একই শত্রুর উপর আঘাত হানবে। অনেকে দেখবে তারা তাদের নিজেদের অস্ত্রেই ধ্বংস হয়েছে। কেমন করে

www.icsbook.info

অস্ত্র প্রতিযোগিতায় রাশিয়া এগিয়ে গেল, কেন পশ্চিম ইউরোপে আণবিক অস্ত্র বিরোধী মিছিল হয়, পূর্ব ইউরোপ বা রাশিয়ায় হল না, কেন এম এক্স মিজাইল পরিকল্পনা মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে গিয়ে আটকে গেল, তা ইহুদী কবলিত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সরকারগুলো আজ না বুঝলেও একদিন অবশ্যই বুঝবে, অথবা বুঝবার হয়তো সময়ই পাবে না। আমি মনে করি, বুঝবার পথ একটাই আছে তাহলো চরিত্র ও দায়িত্ববোধের দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা। আর পরকালে জওয়াবদিহীর ভয়সম্পন্ন ধর্মজীবনে প্রত্যাবর্তন ছাড়া এই চরিত্র ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টিও সম্ভব নয়। ধর্মহীন মানবতার শ্লোগান একটা ইহুদী ষড়যন্ত্র, এটা ধ্বংসই ডেকে আনছে। সুতরাং ধর্ম জীবনে আশ্রয়লাভের মধ্যেই ভাবী বিশ্বের শান্তি ও স্বস্তি নির্ভর করছে। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক এবং আমরা জানি বা না জানি, বিশ্ববাসীর প্রতি শান্তির এ আহ্বান জানানোর দায়িত্ব মুসলমানদের। কিন্তু বিশ্বব্যাপী তাদের গড় চেহারাটা দেখলে হতাশার মেঘ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠে। একথা 'একশ' ভাগই সত্যি। কিন্তু তবু আমার কাছে হতাশার মধ্যে আশার আলো এই যে, ইহুদীদের ষড়যন্ত্র পরিনত রূপ নিতে-যাচ্ছে। এটাই বলে দেয়, হকের নিশানবরদাররা জাগবে–তাদের জাগতেই হবে। ইসলামী আন্দোলনের নামে এই জাগরণের বুদবুদ মুসলিম জাহানের সব জায়গাতেই উঠছে। বুদবুদ কবে পরিবর্তনকারী বিপ্লবের রূপ নেবে আমি জানিনা, কিন্তু দিন রাত্রির মতই এর আগমন সত্য। মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলো এই সত্য উপলব্ধি করলে জাতির কতই না মঙ্গল হতো।

১৬-১২-৮২

www.icsbook.info

আজকের পৃথিবীটা একটা গ্রামের মত। গ্রামরূপ বিশ্বের পরিবেশ-পরিস্থিতি বাড়িরূপ জাতি-রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করছে। যুদ্ধ, শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটা আরও বেশী সত্য। কোন দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে তা দুনিয়াকে না পোড়ালেও উত্তপ্ত করে। ২০০১ সালে ধ্বংস হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার, কিন্তু তার ফলে বলা যায় বদলে গেছে গোটা দুনিয়ার পরিস্থিতি। আফগান ও ইরাক যুদ্ধ গোটা দুনিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। ছোট হয়ে যাওয়া এই পৃথিবীতে জাতিসংঘের ছায়ায় দাঁড়ানো জাতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অনেক দিক থেকে আজ যেমন আগের চেয়ে অনেক বেশী নিশ্চিত হয়েছে, তেমনি অপর কিছু দিক থেকে এই নিরাপত্তা বিরাট ঝুঁকির মধ্যেও পড়েছে। আগের মত কোন দেশ অবশ্য আজ সরাসরি দিগ্বীজয়ে নামছে না, শুধু শক্তির উপর ভিত্তি করে এক দেশ আরেক দেশকে আক্রমণ করে বসছে না। আগ্রাসনের অতীত এই চেহারা আজ পাল্টে গেছে। আজ অস্ত্রই শুধু দ্বিগীজয়ের হাতিয়ার নয়। বাণিজ্য, আর্থিক সাহায্য, কূটনীতি, মিডিয়া, সংস্কৃতি প্রভৃতিও আজ আগ্রাসনের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সামগ্রিক এই দিকের বিচারে জাতি-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আজ আগের চেয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত ছোট রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তার দিক দিয়ে আজ জটিল অবস্থার সম্মুখীন। তার উপর বাংলাদেশ ঘিরে ভূ-রাজনৈতিক যে পরিমণ্ডল, তা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্যে বাড়তি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ভূখণ্ড গঠনের পেছনে যে ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা রয়েছে তাও বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি সব সময় আঙ্গুল উঁচিয়ে রয়েছে।

আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান, নতুন করে জাতিসংঘের গঠন বিশ্বের রাজনৈতিক চেহারা পাল্টে দেয় এবং আগ্রাসী হওয়ার মত শক্তিগুলোর চরিত্রেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। এক দেশ আরেক দেশের উপর নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার মত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ৪৫ বছরের দীর্ঘ ঠাণ্ডা যুদ্ধকালে যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ট্যাংকের তলায় হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের স্বাধীন সত্ত্বাকে পিষ্ট করেছিল, যদিও মার্কিন সৈন্য গ্রেনেডা ও হাইতিতে অবতরণ করেছিল এবং কিউবার

www.icsbook.info

উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত-চীন কোরিয়া ও ভিয়েতনামে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল এবং লাখ লাখ মানুষের জীবন হরণ করেছিল, এরপরও এই আগ্রাসনগুলো ছিল একক নয়, সামষ্টিক। দুই পক্ষে দুই ব্লক, পুঁজিবাদী ও কম্যুনিজম, আগ্রাসী শক্তির ভূমিকা পালন করেছে। তারাই দখল করে নিতে চেয়েছিল গোটা দুনিয়া। ১৯৯০ সালের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে কম্যুনিষ্ট ব্লকের বিলুপ্তি ঘটে এবং বিশ্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের একমাত্রিক প্রভাবের অধীনে চলে আসে। এই সময় আগ্রাসন আবার নতুন এ সামষ্টিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখন জাতিসংঘ- আমব্রেলা মাথায় পরে, কিংবা জাতিসংঘকে নিষ্ক্রিয় করে মিত্রদের পাশে রেখে জাতি রাষ্ট্রের উপর আগ্রসন চালানো হচ্ছে। আফগানিস্তান, ইরাক ও সুদানের সার্বভৌমত্ব পদদলিত করা এবং ইরান ও কোরিয়ার সার্বভৌম রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্তের কণ্ঠরোধের চেষ্টা এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এই আগ্রাসনে অগ্রবাহিনী হিসাবে অর্থনৈতিক অবরোধ এবং সামরিক সরঞ্জামের আদান-প্রদানে বিধি-নিষেধ আরোপকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই প্রত্যক্ষ আগ্রাসন, হস্তক্ষেপ ছাড়াও সাহায্য নামক অর্থনৈতিক শাসন, কূটনৈতিক চাপ, মিডিয়া সন্ত্রাস ও সাংস্কৃতিক বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের ছোট ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্বল, ভীত ও অসহায় খাতকে পরিনত করা হচ্ছে।

এক কথায় আজকের দুনিয়ায় নেকড়ে ও মেষ শাবকের মধ্যে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অসম লড়াই চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অতীত বিশ্ব ব্যবস্থায় নেকড়ে সরাসরি মেষ শাবককে ধরে খেয়ে ফেলতো, কিন্তু বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে নেকড়ে মেষ শাবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার যুক্তি হিসাবে স্বকল্পিত কারণ সৃষ্টি করে। সে কারণকে বাহন সাজিয়ে মিত্রদের সাথে নিয়ে জাতিসংঘের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সমর্থনে অসহায় মেষ শাবকের ঘাড় মটকায়।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঃ

বিশ্ব পরিস্থিতিগত উপরোক্ত নিরাপত্তা-সমস্যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি বর্তমান। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত সাহায্য নামক মাদক বাংলাদেশও গ্রহণ করেছে। যদিও সাহায্য নির্ভরতা আমরা অনেক কমিয়েছি, কিন্তু এখনও সাহায্য না হলে আমাদের চলছে না। ফলে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও ডোনারদের ইচ্ছা ও হুকুমের কাছে আমাদের জনস্বার্থ, রাষ্ট্রের চাহিদা, নিরাপত্তা-প্রয়োজন, প্রভৃতি কোন কিছুরই মূল্য থাকছে না। তাদেরই চাপে রাষ্ট্র বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকে 'মানববাধিকার' হিসাবে মান্য করে মাথায় তুলে রাখতে হচ্ছে, রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে জলজ্যান্ত

www.icsbook.info

মিথ্যা অপরাদ ও অপপ্রচারকে 'গণতান্ত্রিক অধিকার' বলে স্বীকার করতে হচ্ছে, উড়ে এসে জুড়ে বসা ভূয়া 'আদিবাসিদের দাবীকে মানার জন্যে 'প্রকৃত আদিবাসি' বলে স্বীকার করতে হচ্ছে, উড়ে এসে জুড়ে বসা ভূয়া 'আদিবাসিদের দাবীকে মানার জন্যে 'প্রকৃত আদিবাসি' জনগণ ও দেশের সংবিধানের কণ্ঠরোধ করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এইভাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছি।

বাংলাদেশের উপর এই পরিস্থিতিগত বিপদ ছাড়াও আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত স্বাতন্ত্র লাভের শুরু থেকেই আমাদের বড় প্রতিবেশীর প্রবল বৈরীতা আমাদের তাড়া করে ফিরছে। এই ভূখণ্ড যখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল, তখনও এ বৈরীতা ছিল। একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করার পরও এই বৈরীতা তারা পরিত্যাগ করেনি। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ ভারত মেনে নিয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান টিকে থাকুক তা চায়নি। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তারা সাহায্য করেছে, তাদের হাজার হাজার সৈনিক জীবন দিয়েছে এ যুদ্ধে, কিন্তু তারা চায়নি যে, বংলাদেশ প্রকৃতই এক স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে পরিণত হোক। তারা আশা করেছিল, বাংলাদেশ সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের দ্বিজাতিত্বের দর্শন পরিত্যাগ করবে, মুসলিম পরিচয়কে পেছনে ঠেলে দেবে, দেশ বিভাগ তাদের কাছে ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়াবে এবং একদিন রাষ্ট্রীয় সীমানা তাদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে না। আমাদের যুদ্ধের সমাপ্তি এবং আমাদের স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকেই এ ধরনের কথা তারা শুরুও করে দেয়। ১৯৭৩ সালে কলকাতায় প্রকাশিত A. T. Dev- এর ডিকশনারীতে দেয়া ম্যাপে বাংলাদশেকে ভারতের একটা প্রদেশ হিসাবে দেখানো হয়। সেই সময় কলকাতার দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে 'The Chief Minister of Bangladesh' বলে অভিহিত করা হয়। কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক Statesman তার 'Reunion of India নিবন্ধে লিখে ...now is the time of work for a United States of India with the merger of this country Bangladesh and... পরে কলকাতার আনন্দবাজার গ্রুপের ইলাজী দৈনিক টেলিগ্রাফ 'Bangladesh are voting against partition with their feet' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখে, "পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা ১৯৭১ সালে। এখন দ্বিতীয়বার তারা প্রত্যাখ্যান করছে দেশ বিভাগকে। পাকিস্তান ছিল প্রথম স্বপ্ন, দ্বিতীয় স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদ যা রূপ পেয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রে। এই দ্বিতীয় স্বপ্ন বাংলাদেশকে তারা আজ প্রত্যাখ্যান করছে।"

টেলিগ্রাফ-এর এ সম্পাদকীয়টি ছাপা হয় ১৯৯২ সালের ২৫শে অক্টোবর সংখ্যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাপারে ভারতীয়রা

www.icsbook.info

একই ধারণা পোষণ করছে। সর্বশেষ ২০০৫ সালের ২৪ এপ্রিল নিউইয়র্কে উভয় বাংলার শিল্পীদের অনুষ্ঠানে ভারতীয় অভিনেতা চিরঞ্জীত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দুই বাংলার সীমানা মুছে ফেলতে হবে। সীমানা চিহ্ন থাকবে না। আমাদের ভাষা এক, সংস্কৃতি এক। আমরা একান্নবর্তি পরিবারের মতো বসবাস করতে চাই। এ স্বপ্ন আমাদের নেতারাও দেখতেন। এপার বাংলা ওপার বাংলা একাকার হতে এই অনুষ্ঠান দিয়ে যাত্রা শুরু হলো। অপেক্ষা করুন অদূর ভবিষ্যতেই সব দেখতে পাবেন।" ভারতীয়দের এই মানসিকতা স্বাধীনতা- উত্তরকালের সরকারের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' নামের উচ্ছেদ তারা এই সময় করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হল, কলেজ, ইত্যাদির নাম থেকে 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতীয়দের এই মানসিকতা বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার জন্যে সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এই মানসিকতার কারণেই বাংলাদেশের সাথে কোন সমস্যার সমাধানেই তারা আসছে না। বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে চাপের মধ্যে রেখে লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া তাদের একটা কৌশল হতে পারে। বাংলাদেশের ভেতরে অন্তর্ঘাত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ বিরোধী মনোভাব প্রমোট করা, ভেতর থেকে বাংলাদেশকে অকার্যকর করে তোলা এবং পরিশেষে হস্তক্ষেপ করা ভারতীয় এই লক্ষ্যের অংশ হতে পারে। কলকাতার আজকাল পত্রিকায় ২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল, ১৯৮৯ তারিখে প্রকাশিত এক রিপোর্টে এরই ইঙ্গিত রয়েছে। ভারতীয় অভিনেতা চিরঞ্জিত বাবুর 'অপেক্ষা করুন, অদূর ভবিষ্যতেই সব দেখতে পাবেন' উক্তিটি একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার দিকই ইঙ্গিত করে। সেই পরিকল্পনাটি নিশ্চয়ই ১৭ই আগষ্টের বোমা সন্ত্রাসের চেয়ে অনেক বড় কোন পরিকল্পনা!

বাংলাদেশের নিরাপত্তা সমস্যা ঃ

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি একটা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। জাতির মধ্যে এই ঐক্য-সংহতি আসে জাতির বা রাষ্ট্রের উৎস, উদ্দেশ্য ও আদর্শের ঐক্য চেতনা থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়েই আমাদের অজ্ঞতা সবচেয়ে বেশী। সাতচল্লিশে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলে যে দর্শন কাজ করেছে, সেই দর্শনই আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র চেতনার ভিত্তি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার যে

www.icsbook.info

ঘোষণা দান করে, তাতেও ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে স্বাতন্ত্রচেতনার ভিত্তিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। শেখ মুজিবও পাকিস্তানের জেল থেকে দেশে ফেরার পর এই দৃষ্টকোণ থেকেই বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন। পরে ভারতের চাপে সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা সংযোজিত হলেও ১৯৭৫ সালে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর জনগণের চাহিদা অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিদায় দিয়ে সংবিধানের জনপ্রিয় চরিত্র আবার ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগসহ দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী মহল ভারতীয় ইচ্ছার অনুসরণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র চেতনার দর্শনকে অস্বীকার করছে। এর বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র চেতনা রক্ষার ভিত্তি কি হতে পারে, এ সম্পর্কে তাদের কোন বক্তব্য নেই। তাদের বাঙালী জাতীয়তাবাদত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র রক্ষার ভিত্তি তো নয়ই, বরং এই জাতীয়তাবাদ ভারতের একটি প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের সাথে একাকার হয়ে যাবার একটা নিমিত্ত হতে পারে। কলকাতার চিরঞ্জীব চট্টপাধ্যায় তার উক্তিতে এবং টেলিগ্রাফ তার সম্পাদকীয়তে এই একাকার হয়ে যাবার দিকেই ইঙ্গিত করেছে। ভারতীয়দের এই অভিলাষ বোঝার ক্ষেত্রে অজ্ঞতাই আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করছে। এই অজ্ঞতা দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক। টমাস জেফারসন বলেছেন, 'কোন জাতিই যুগপৎ' অজ্ঞ ও স্বাধীন ছিল না এবং তা থাকতেও পারে না (If a nation expects to be ignorant and free, it expects what never was and never will be)' টমাস জেফারসন একটা পরম সত্য এখানে তুলে ধরেছেন। অজ্ঞতাকে পাপ বলা হয় এই জন্যই। অজ্ঞ নিজকেই চেনে না, রাষ্ট্রকে চিনবে কি করে? এই অজ্ঞতা দোষে দুষ্ট আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা যে ডালে তাদের আশ্রয় সে ডালেরই গোড়া কাটছেন। এদরে কারণেই জাতীয় ঐক্য সংহতি গড়ে উঠছে না। তাদের অজ্ঞতা জাতির অস্তিত্বকেই কুঠারাঘাত করছে। কেউ কেউ বলেন, তারা অজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ। সেটা হলে তারা আরও বিপজ্জনক। সজ্ঞানভাবে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র চেতনাকে অস্বীকার, রাষ্ট্রীয় নীতি-কার্যক্রমে মুসলিম পরিচয়ের প্রতি বৈরীতা এবং বাঙালী জাতীয়তার নামে চিরঞ্জীব বাবুদের টোপ গলধকরণকে ষড়যন্ত্রের অংশ বলা যুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের নিরাপত্তার এটাই মৌলিক সমস্যা।

নিরাপত্তা সম্পর্কিত দুর্বলতা ঃ

একজন বিখ্যাত মণিষী বলেছেন, 'স্বাধীনতা ভংগুর তাই তা রক্ষা করা প্রয়োজন (Freedom is fragile and must be Protected)। আর টমাস জেফারসন বলেছেন, 'স্বাধীনতার মূল্য হলো অনন্তকাল সতর্কতা (The Price of freedom is

www.icsbook.info

eternal vigilance)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার যে দাবী সার্বক্ষণিক সতর্কতা, সেটা আমরা দেখাতে পারিনি। আমাদের এই দুর্বলতাই স্বাধীনতাকে ভংগুরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আজ প্রকাশ্যে সাতচল্লিশ পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবার কথা বলা হয়, আজ প্রকাশেই দেশবিভাগ ভুল হয়েছিল বলা হয়। এসব কথার অর্থ, এরা প্রকাশ্যেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তারা কথা বলছে। এই কথা আগে দু'একজনে বলত, আড়ালে-আবডালে বলত। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অবাধ বাক-স্বাধীনতা এবং অঢেল পত্র-পত্রিকার প্রকাশের সুযোগ নিয়ে এই স্বাধীনতা বিরোধিরা মাথা তোলে। মনে পড়ে, এ সময় আওয়ামী লীগ ও জাসদ লবী থেকে 'A Herelic' নামে একটা বই ছড়ানো হয়। তাতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক কথার সাথে বলা হয়, 'এই উপমহাদেশই আমাদের দেশ এবং আমরা এই উপমহাদেশের নাগরিক হিসেবেই বাঁচতে চাই। কেটে বিচ্ছিন্ন করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ পুনঃসংযোজিত করার সক্রিয় আন্দোলনই আমাদের প্রত্যাশা পূরণের পথ রচনা করতে পারে।' এই সময়ই ১৯৯১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ঢাকার একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে 'Continent Resurrection Movement' নামে এখন পর্যন্ত অপরিচিত একটা সংস্থা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে যে, তাদের লক্ষ্য উপমহাদেশের অখণ্ডতা। তারা '৪৭ এবং '৭১-এর বিভক্তি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন।' এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাত্র একদিন পর ৩১ ডিসেম্বর ('৯১) তারিখে ঢাকা পিজি হাসপাতাল মিলনায়তনে একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কংগ্রেস নেতা মাওলানা আসাদ মাদানি উপস্থিত ছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ ও জাসদ এর কয়েকজন শীর্ষ নেতা। এ সেমিনারেও ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে এবং '৪৭ পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবার কথা বলা হয়। এই পিজি সেমিনারের ৩০ দিন পর ঢাকার সাপ্তাহিক বিচিন্তা 'উপমহাদেশের মানচিত্রের আসন্ন পরিবর্তন' শিরোনামে একটা কভার স্টোরি প্রকাশ করে। এই স্টোরিতে 'উপমহাদেশে পুনরুজ্জীবন আন্দোলন'-এর উপর একটি রিপোর্ট এবং এ আন্দোলনের নেতার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়। আন্দোলনের নেতা তার সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ঠিক '৪৭-এর আগস্টের পূর্বে ভেঙ্গে যাবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই।... ভারতের আগ্রহেই এটা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জাসদ এর সর্বোচ্চ দু'জন নেতা এই প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।'

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিনাশী ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত বিদেশী রাষ্ট্রের ক্রীড়নকরা তাদের এই লোমহর্ষক কথা বলার জন্যে এমন একটা সময় বেছে নেয় যখন দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পর দেশে সবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তখন

www.icsbook.info

গণতান্ত্রিক সরকার হয়তো নানা বিবেচনায় কোন পদক্ষেপ নিতে যাননি। পরে ষড়যন্ত্রকারীরাও পর্দার আড়ালে চলে যায়। তারাই আজ নানা নামে নানা ছদ্মবেশে নানা মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। এরা দেশের ভেতরে ও বাইরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অকার্যকর প্রমাণ করা এবং বিদেশী হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানানোর জন্য আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এসব কাজ যারা করছেন, তারা এভাবে না সেভাবে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো হিন্দু-বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ। নাম শুনলে মনে হবে সংস্থাটি সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বমূলক কোন সংগঠন। আসলে তা নয়। এটা পুরোপুরিই এখন রাজনৈতিক সংগঠন এবং পুরোপুরিই আওয়ামী স্বার্থের সাথে যুক্ত। মনে করা হয়, আওয়ামী লীগ সরাসরি যে কথা বলতে পারে না, সেসব কথা এই ঐক্য পরিষদের মাধমে বলায়। বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলার ভারতের একটা বড় ইস্যু হলো, 'অনুপ্রবেশ'-এর অভিযোগ। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে ভারতকে সহযোগিতা করছে। আর আওয়ামী লীগের কথাকে ভারতের স্বার্থে প্রপাগাণ্ডা হিসাবে ব্যবহারের দায়িত্ব পালন করে থাকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদ। আওয়ামী সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভারতে গিয়ে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের অনুপ্রবেশ অভিযোগকে সমর্থন করেন ১৯৮৮ সালে। তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে বলেন, 'অত্যাচারের মুখে হিন্দুরা ভারতে চলে আসছেন। যশোর, ফরিদপুর, খুলনা ও গোপালগঞ্জে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চলছে। ফলে ভয়ে দেশ ছাড়ছেন তারা।' ১৯৮৯ সালে আবার তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম করার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধছে।' শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলার পর হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ কোরাশ গাইতে শুরু করে। ১৯৯২ সালের ১৮ই এপ্রিল নরসিংদীতে জনসভার পর ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের জাতীয় সম্মেলনে ঐক্য পরিষদ বলে, 'অত্যাচারের মুখে তিন কোটি সংখ্যালঘু প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পালিয়ে গেছে।' চট্টগ্রামের আরেকটি সম্মেলনে সি আর দত্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ সংখ্যালঘু দেশ ত্যাগ করেছে বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে অতি সম্প্রতি ঐক্য পরিষদের নিমচন্দ্র ভৌমিক দাবী করেন, ১৯৭১ সালের পর ভারতে চলে যাওয়া ১ কোটি হিন্দুকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে ভোটার বানাতে হবে।' আওয়ামী লীগ ও হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের এইসব কথা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের অনুপ্রবেশ-ষড়যন্ত্রকে বৈধ রূপ দেবার জন্যেই বলা হয়।

www.icsbook.info

হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের ঠিক এ রকমই আরেকটা কাজ হলো বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বানানোর চেষ্টা। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পর এই চেষ্টা তারা নিজেরা করেছে, অন্য ভারাটেদের দিয়েও করিয়েছে। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ 'Bangladesh program 2001' নামক একটা বই নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশ করে গোটা দুনিয়ায় ছড়ায়। বাংলাদেশ সন্ত্রাসী দেশ-এই কথাই বলা হয় গোটা বইয়ে। বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ছবি ছাপিয়ে তার নিচে লিখা হয়, 'প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন ইসলামী চরমপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার বাংলাদেশী তালেবান...এককালের একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে মৌলবাদী ইসলামী রাষ্ট্রে পরিনত করার চক্রান্তে লিপ্ত।.....যারা অচিরেই আরো ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, বৌদ্ধমূর্তি, গির্জা, মন্দির এবং সম্ভবত জাদুঘর, লাইব্রেরী ও আধুনিক সভ্যতার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।' এই বইটির সম্পাদনায় ছিলেন দ্বিজেন ভট্টাচারিয়া, সুব্রত বিশ্বাস, রতন বড়ুয়া, প্রদীপ দাস ও শিতাংশু গুহ। এই বই লিখার পর গোটা ২০০২ সাল ধরে তারা তাদের ভাড়াটেদের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাদেশ 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র,' 'তালেবান রাষ্ট্র' বলে প্রচার চালিয়েছে। ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউতে প্রকাশিত Bertil lintner এর 'A cocoon of Terror' (April 4, 02), Time-এ প্রকাশিত Alex Perry এর 'Deadly cargo' (Oct 10, 02), Bertil Lintner এর 'Bangladesh : Celebration and bombs' (Observer, Dec, 23, 02) এবং BBC চ্যানেল ফোর-এর পক্ষে সাজানো নিউজ তৈরীর জন্যে বাংলাদেশে ভুয়া পরিচয়ে আসা জেইবা মালিক ও লিও পোল্ড নামক দু'জন সাংবাদিকের কাণ্ড তাদের এই তৎপরতার মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র সাজাবার এবং এই সন্ত্রাসের সাথে কতকগুলো ইসলামী নাম ও সংগঠন জড়িত করার ইন্দো-আওয়ামী প্রচেষ্টা সফল হয়েছে গত ১৭ আগস্ট (২০০৫) প্রায় ৫শ বোমা হামলা ঘটানোর মাধ্যমে। এই কাজের জন্যে ২০০১ সাল থেকে জামাতুল মোজাহেদীন, ইত্যাদি নামের গোপন গ্রুপ তারা তৈরী করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জনযুদ্ধের মত ভারতে সৃষ্ট গ্রুপ। তাদের সম্মিলিত প্রয়াসেরই ফল ১৭ই আগস্টের বোমা-সন্ত্রাসের ঘটনা।

হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ সকল বিচারে বাংলাদেশের চরম বৈরী একটা সংগঠন। বাংলাদেশের ক্ষতি করার বাইরে তাদের আর কোন কাজ নেই। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্যে ন্যাককারজনক সব অপপ্রচার এবং উস্কানীমূলক কাজ তারা করে থাকে। মুসলমানরা 'মোহাম্মদ' ও 'আলহাজ্ব' শব্দ ব্যবহার করবে,

www.icsbook.info

এটাও তাদের বরদাস্ত নয়। ২০০০ সালের ৬ই জুন তাদের একটা অনশন প্রোগ্রামের শেষ দিন তারা পরিপূর্ণ বাঙালী হওয়ার জন্যে 'মোহাম্মদ', 'আলহাজ্ব' শব্দ পরিত্যাগ করার আহ্বান জানায়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সব রকম চেষ্টা তারা চালায়। গত বছর নিউইয়র্কের জাতিসংঘ প্লাজায় অনুষ্ঠিত তাদের এক প্রোগ্রামে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের আহ্বান জানায়। (বাসস, ১৮/৫/০৪)। এ অনুষ্ঠানে ভারতীয় নাগরিকরা হাজির ছিল। মনে করা হয়, লক্ষ ডলারের এ অনুষ্ঠান ভারতীয় টাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার বছর খানেক আগে ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ তারিখে হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের নিউইয়র্ক শাখার এক অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে' এই অজুহাত তুলে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানায়। এ অনুষ্ঠানে ভারতীয় নাগরিকরাও বক্তৃতা করেন। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের বক্তব্য মাঝে মাঝে ঔদ্ধত্যের সকল সীমাও ছাড়িয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'তে ২২ জুলাই, '৯৩ তারিখে হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীয় সভায় মূল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে বলা হয়, 'যে যাই হিসাব দিক না কেন আমরা বাংলাদেশে ৪ কোটি সংখ্যালঘু রয়েছি। একজন সংখ্যালঘু ছেলেকেও যদি কারাগারে নেয়া হয়, যদি তাদের উপর জুলুম চালানো হয়, তাহলে বাংলাদেশের কবর খোঁড়া হবে।' (ইনকিলাব, ২৩ জুলাই, '৯৩)। বাংলাদেশের জন্যে কবর খোঁড়ার কথা কে বলতে পারে? কোন নাগরিক বলতে পারে না। বলতে পারে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরম বৈরী কোন বিদেশী বা বিদেশের এজেন্ট। ইন্দো-আওয়ামী লবীর এখনকার সবচেয়ে শক্তিমান সদস্য হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদও এ ধরনেরই একটা সংগঠন।

কিন্তু এদের বিরুদ্ধে দেশের কোন আইনকে আমরা কার্যকরি দেখছি না। যা ইচ্ছা তাই বলা, যা ইচ্ছা তাই করার এদের স্বাধীনতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সমাজ বিজ্ঞানী আল রাইনি বলেছন, Freedom without obligation is anarchy.' অর্থাৎ বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা হলো নৈরাজ্য। বাধা-বন্ধনহীন স্বাধীনতা পেয়ে তারা আজ এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে।

এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা সেনাবাহিনীর উপরও হাত দিতে চায়। প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশে নিরাপত্তার প্রধান স্তম্ভ। 'Defence of a Country without a defence force' তত্ত্ব সামনে এনে তারা সেনাবাহিনী রাখাকে গরীবের ঘোড়া রোগ ধরনের কাজ বলে থাকে। চারদিকে প্রতিবেশী সবদেশে সেনাবাহিনী থাকবে আমাদের থাকবে না,

www.icsbook.info

কিংবা নামমাত্র থাকবে, এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এই কথাগুলো আজ যারা বলছে, তারা বড় প্রতিবেশীর কাছে স্বাধীনতা বন্ধক রাখতে চায়। এদের কারণেই আমাদের ১৫ কোটি মানুষের সেনাবাহিনী উপযুক্ত সংখ্যায় এবং উপযুক্ত উপায়-উপকরণে গড়ে উঠতে পারছে না। অথচ একটা স্বাধীন দেশের জন্যে তার স্বাধীনতা রক্ষার উপযুক্ত শক্তি অর্জন অপরিহার্য। একজন মনিষী (Pericles) বলেছেন, 'স্বাধীনতা কেবল তাদেরই সম্পত্তি, যারা এটাকে রক্ষা করার সাহস ও শক্তি রাখে।' আরও স্পষ্ট ভাষায় Patric Henry বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত : শক্তিছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। সেই শক্তিকে বিসর্জন দিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য (unfortunately nothing will preserve, but down right force, whenever you give up that force, you are ruined.)। সন্দেহ নেই, এই শক্তি অর্জন না করা আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। অন্ততঃ দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর উদাহরণ সামনে রাখলে কমপক্ষে তিন লাখ সৈন্যের একটা সেনাবাহিনী আমাদের থাকা উচিত।

আমাদের নিরাপত্তার শরীরে ব্যাধি হিসাবে আরও যারা কাজ করছে তারা হলেন এক শ্রেণীর লেখক, বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ কথা ও নানা কাজের মাধ্যমে দেশের সাথে যে বৈরীতা করছে, এরা লেখার মাধ্যমে তাই করছে। এদের নিয়ে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নেই। এরা ইন্দো-আওয়ামী দেহেরই একটা অংশ।

স্বাধীনতা ও ধর্ম :

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সংবিধানের মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয় সংশ্লিষ্ট রাখার বিরুদ্ধে বলতে গেলে ক্রুসেড শুরু করা হয়েছে। ইন্দো-আওয়ামী লবী সংবিধানের বিসমিল্লাহ, আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস, রাষ্টধর্ম ইসলাম, ইত্যাদি মুছে ফেলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তার সাথে ধর্ম-পরিচয়ের এই বিষয়টি একেবারেই অচ্ছেদ্য। রজার টনি (Roger Tawny) একটা সুন্দর কথা বলেছেন, 'আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপস্থিতি যে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বের সকল শক্তির বিরুদ্ধে একাই দাঁড়াতে সাহস যোগায়।' আর মার্কিন সিনেটের Chaplain Richard Holverson বলেছেন, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস অন্তর্হিত হলে জাতির স্বাধীনতা নিরাপদ হতে পারে না (the liberation of a nation cannot be secure when belief in god is abandoned),' এই কথাগুলো বাংলাদেশের জন্য আরও বেশী সত্য। কারণ যে দ্বিজাতিতত্ব দর্শনের ভিত্তিতে উপমহাদেশ ভাগ

www.icsbook.info

হয়েছে, সে দর্শনই বাংলাদেশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চেতনার রক্ষা কবচ। অন্য কথায় মুসলিম জাতি-পরিচয় বাংলাদেশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চেতনার রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই রক্ষা কবচের যদি বিলয় ঘটানো হয়, তাহলে বাংলাদেশের রাষ্ট্র সীমানা রক্ষার ভিত্তিই অবশিষ্ট থাকবে না। ইন্দো-আওয়ামী লবী এটা জানে বলেই রাষ্ট্রের সাথে ধর্ম পরিচয়কে সংশ্লিষ্ট করার বিরোধিতার নামে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তার বিলয় ঘটাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তার জন্যে রাষ্ট্র ও সংবিধানের সাথে আমাদের ধর্ম পরিচয় তাই অপরিহার্য।

নিরাপত্তার প্রশ্ন আপোষযোগ্য নয় ঃ

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রশ্নটি আপোষযোগ্য নয়। কোন কিছুর সাথে এর 'দেয়া-নেয়া' চলতে পারে না। কেউ স্বাধীনতার গোড়া কাটবে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে দুর্বল করবে, আর সরকার সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করে রাখবে তা চলতে পারে না। প্যাট্রিক হেনরী বলেছেন, 'জনগণের স্বাধীনতাকে গভীর আন্তরিকতার সাথে রক্ষা করুন। এই দুর্মূল্য মানিক্যের দিকে অগ্রসরমান যে কারো উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন (guard with jealous attention the Public liberty. suspect everyone who approaches that jewel)।' কিন্তু আমরা এটা কি করছি? সরকার এটা করছেন? করছেন না। করলে 'হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ' ঐ ঔদ্ধত্য চালাতে পারছে কেমন করে? প্রতিপদে বাংলাদেশের ক্ষতি করার চেষ্টা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কবর রচনা করতে চাওয়ার পর তারা বুক ফুলিয়ে চলতে পারে কি করে? তাদের সৃষ্ট নানা প্রশ্ন ও বিকৃত নানা তথ্য দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে কলুষিত করছে, মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তির পরিসর ধীরে ধীরে বাড়ছে। সেই '৯১-এর দিকে তাদের যে রাখ-ঢাক ছিল, যে ভয়-দ্বিধা ছিল তা এখন নেই। বিপজ্জনক কথাগুলো মানুষের গা সহা হয়ে যাচ্ছে। বিভ্রান্তির দিকটা মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে উঠছে। বিষয়টা উদ্বেগজনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিচারক জাস্টিস লার্নেড হ্যান্ড এক মন্তব্যে বলেছেন, 'স্বাধীনতার অবস্থান মানুষের অন্তরে। সেখান থেকে তা উঠে গেলে কোন সংবিধান, কোন আইন, কোন আদালতই তাকে আর ধরে রাখতে পারে না।' আমাদের শত্রুদের অপপ্রচার ও ভ্রান্তি ছড়ানোর লক্ষ্য এটাই। দেরীতে হলেও এ বিষয়ের প্রতি আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে আজ গুরুত্ব দিতে হবে। ২০০১ সালে যদি 'Bangldesh program 2001' বইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র প্রমাণের হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের অপচেষ্টাকে রুখে দেয়া হতো, ভাড়াটে বারটিল লিন্টনার, আলেক্স পেরী, জেইবা ও লিওপোল্ডদের পেছনে যারা ছিল তাদের

www.icsbook.info

সকলের মুখোশ যদি উম্মোচন করা যেত এবং তার প্রতিবিধান হতো, তাহলে ১৭ই আগস্টের দেশব্যাপী বোমা-সন্ত্রাস তারা ঘটাবার সুযোগ পেতো না। ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষতি আমাদের হয়েছে, এখন সতর্ক হলে ভবিষ্যতটা আমাদের রক্ষা পাবে।

উপসংহার ঃ

উপসংহারে আমি কথা আর বাড়াবো না। একজন পশ্চিমা মণিষীর কথা দিয়ে আমার আজকের উপস্থাপনার ইতি টানতে চাই। মণিষী জন ফিল্পট কুরন বলেছেন, 'যে শর্তে ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দান করেছেন, তাহলো স্বাধীনতাকে সদা সতর্ক পাহারায় রাখা। এই শর্ত যদি সে ভঙ্গ করে তাহলে তার অপরাধের দণ্ড হবে দাসত্ব (The condition upon which god hath given liberty to man is eternal vigilance, which condition if he breaks, servitude is at once the consequence of his crime, and the punishement of his guilt).' আমরা এ পরিণতি চাই না। আল্লাহ্ এ পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

৭ই সেপ্টেম্বর, ০৫, তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিষয়ক এক সেমিনার পঠিত।

www.icsbook.info

ISBN 984 8685 56-1

9 789848 685563